প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ।] জানুয়ারী, ১৮৯৯। [প্রথম সংখ্যা।

প্রয়াস।

সাহিত্য-কাননে অরুণ-কিরণে, কি প্রসন্ন বহে বায়,
কি আশ্বাস-গীতি, উৎসাহ-ভারতী, মাধুরী ছড়ায়ে যায়।
ভাসে প্রকৃতির মহিমা-কূজন, ভকতি উথলে মনে,
বিতরে কল্পনা, পারিজাতবাস, সুধারস বরিষণে।
ভাব-মন্দাকিনী, বহিছে সুধীরে, কি বিশদ কল-ভাষ,
স্ফুরিত উল্লাসে হৃদয়-সরোজ, ছড়ায় বিমল হাস।
কিবা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ! কমলআসনা, ত্রিদিব বীণার তানে,
জাগায় প্রয়াস, "সাহিত্য-সেবকসমিতি"র প্রাণে প্রাণে।
সাধিয়া প্রয়াস, করিয়া চয়ন, এ তুচ্ছ প্রসূন-রাজি,
পূজিছে নবীন সেবকসমিতি বরদাচরণ আজি।
প্রবীণ সাহিত্য-গুরুজন, নিত্য সুমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে,
সাধহ কল্যাণ, যেন এ প্রয়াস সিদ্ধ হয় চিরতরে।
হও অগ্রসর, সবে এ পূজায়, কি নবীন কি প্রবীণ,
কর্ত্তব্য-সাধনে, সফল "প্রয়াস" কর সুখে প্রতিদিন।

সাহিত্য সমাজের উপকারিতা।

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সঙ্গীত বিষয়ে মুদ্রাদোষ যেরূপ বর্জ্জনীয়, ভাষা বিষয়ে গ্রাম্যতাদোষও সেইরূপ বর্জ্জনীয়। রচনা এবং রুচি উভয়ই পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ না হইলে ভাষা বিশুদ্ধ হয় না। অনেক স্থলে ভাবের সমাবেশ থাকিলেও ভাষার শৈথিল্য, রচনার সৌন্দর্য্য নষ্ট করে; এবং কুরুচি পূর্ণ ভাষাপ্রয়োগে রচনা অনেক সময়ে ভদ্র সমাজের পাঠের অনুপযুক্ত হয়। 'দুগ্ধফেননিভ শয্যোপরি কুপোকাৎ হয়ে রয়েছেন' বলিলে ভাষার যেরূপ গ্রাম্যতাদোষ হয়, "চাঁদিমা" "জোছনা," "ভালো" "সৌজন্যতা" "লজ্জাস্কর" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে ভাষার সেইরূপ যথেচ্ছাচারিতা দোষ প্রকাশ পায়। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ শব্দ প্রয়োগ এবং ভাবব্যঞ্জকশব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও স্ব স্ব মনোমত শব্দ আবিষ্কার করা কথনই বাঞ্ছনীয় নহে; উহাতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া বরং ক্ষতি হয়। "সপ্তর্ষি" শব্দ বর্ত্তমান সত্ত্বে ও Great Bear বা Ursa Major এর স্থানে "বৃহদ্ভল্লুক" বা বৃহদৃক্ষ বলিলে, Galaxy বা Milky Way এর স্থানে চিরপ্রচলিত "ছায়াপথ" না লিখিয়া "দুগ্ধপথ" লিখিলে যথেচ্ছাচারিতা দোষ হয় না কি? ভাষা সম্বন্ধে গ্রাম্যতা ও যথেচ্ছাচারিতাদোষ যেরূপ নিন্দনীয়, ভাব সম্বন্ধে ততোধিক নিন্দনীয়। ভাবের গ্রাম্যতা ও যথেচ্ছাচারিতাদোষ কাহাকে বলে সে বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

যেরূপ কুরুচিপূর্ণ ভাব প্রকাশে জনসাধারণের কোনও উপকারের সম্ভাবনা নাই বরং যদ্দ্বারা চিত্তমালিন্যের সমধিক সম্ভাবনা, এবং যেরূপ ব্যক্তিগত কুৎসাপূর্ণ ভাব প্রকাশে আপন বিদ্বেষ প্রবৃত্তি

চরিতার্থ ভিন্ন অন্য কাহারও কোনও লাভ নাই, বরং ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা, সেরূপ ভাবসমূহের বর্ণনাকে ভাবের গ্রাম্যতা দোষ বলা যায়। আজকালকার কতকগুলি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রে যেরূপ প্রকাশ্যভাবে ব্যক্তিগত কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধাদি থাকে, তাহাতে ঐ সকল সংবাদপত্রের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। প্রকাশ্য সংবাদপত্রে যাহাতে এরূপ গ্রাম্যতা দোষ স্থান না পায়, তদ্বিষয়ে সম্পাদকদিগের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। গভীর ও গুরুতর প্রসঙ্গে অতিশয় চলিত ভাব সমূহের পুনরবতারণাকেও গ্রাম্যতাদোষ বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা বর্জ্জনীয় হইলেও মার্জ্জনীয়।

ভাবের যথেচ্ছাচারিতাদোষ কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। যেরূপ ভাবের দ্বারা সত্যের অপলাপ হয় এবং যদ্দ্বারা বিসদৃশ ও বিশৃঙ্খল ঘটনা সমূহের সূচনা হয়, তাহাকেই ভাবের যথেচ্ছাচারিতাদোষ বলা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ "রাজাবাহাদুর" নামক প্রহসনের "ধোপানী"র গান উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।* বাবুদের বৈঠকখানায় আসিয়া "চাঁদ পারা মুখ" বিশিষ্টা রজকবধূকে ঐরূপ নৃত্যগীত করিতে কখনও শুনা যায় না। যাহা কেহ কখনও

---

* সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থ ঐ গান এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

মুখপোড়া লোকে মুখ দেখেনা সকালে।
নইলে ধুয়ে আনতুম কোন কালে॥
ভাঁটা জলে কাচা, চোর কাঁটা বাচা,
সাজি মাটির নয়কো ভাঁটি, ধোয়া সাবান জলে॥
বড় সারেস্তা মিস্তিরি, করেছে চেপে ইস্তিরি
মন্তর মত পাটায় ফেলে আছড়েছে তালে তালে।
এখন ইংরাজি পিরাণ, আর ধোয়া ধুতির মান,
ঝুলিয়ে কোঁচা বেরোও বাছা, চাক্ চিকণে সবাই ভোলে।

দেখেন নাই বা শুনেন নাই সেরূপ ভাবের সমাবেশকে যথেচ্ছাচারিতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

ভাব ও ভাষা পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ; উভয়ের উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ। ভাষা শিশুর ক্রীড়নক নহে; উহা মানব হৃদয়ের ভাব সমূহ সম্যগ্‌ভাবে ব্যক্ত করিবার একমাত্র উপায়। এই অভেদ্য নিগূঢ়-রহস্যপূর্ণ বিস্ময়কর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য সৃষ্টি; এবং মানব হইতে মানবমন অধিকতর বিস্ময়কর। চন্দ্রসূর্য্য-তারকারাজি পরিশোভিত অসীম অনন্ত নীলাকাশ, অরণ্য পর্ব্বত জীবজন্তু পরিপূর্ণা সসাগরা বসুন্ধরা, অতীব আশ্চর্য্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ভাস্করাচার্য্য, কেপলার, নিউটন ও লাপ্লাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পৃথিবীতে বসিয়া, সুদূরস্থিত নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছেন, যে অল্পায়ু মানব নিবিড় অরণ্যস্থলে সুরম্য সৌধাবলি বিরাজিত নগর স্থাপন করিতেছেন, দুর্ভেদ্য পর্ব্বতভেদ করিয়া রেলপথ বিস্তার করিতেছেন, অতলস্পর্শ সাগর হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহার বক্ষের উপর দিয়া অবাধে বাষ্পীয়পোত চালাইতেছেন ও অবলীলাক্রমে প্রাণিগণ পরিপূর্ণা পৃথিবী শাসন করিতেছেন, উহাদের মন কি আরও বিস্ময়কর নহে? ফটোগ্রাফ, ফনোগ্রাফ, সিনেম্যাটোগ্রাফ, রণ্টজেন্ আলোক প্রভৃতি যে সমস্ত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে, ঐ সকলের আবিষ্কারকর্ত্তাদিগের অসাধারণ মস্তিষ্ক কি আরও আশ্চর্য্য-কর নহে? কিন্তু ভাষা না থাকিলে সেই অত্যাশ্চর্য্য মানবমনের বিকাশ ও প্রকাশ সম্ভব হইত না। আবার ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার উন্নতি স্বতঃই আসিয়া পড়ে; তখন আর প্রাচীন মিশরবাসীদিগের "হায়রোগ্লিফিক্স্" এর মত সাঙ্কেতিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না; উন্নত

ভাব প্রকাশের জন্য উন্নত ভাষার আবশ্যক হয়। ভাষা যে কেবল মাত্র মানবহৃদয়ের দর্পণস্বরূপ এরূপ নহে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতঃ সেই অনাদি মধ্যান্ত, বাক্য, জ্ঞান ও ধ্যানাতীত সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী বিশ্ব-স্রষ্টার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় দান করে বলিয়াই বাক্—দেবী। দেবী স্বরূপিনী ভাষা যে কলুষিত করে, এবং ঐ দেবীকে কলুষিত ভাব প্রকাশের জন্য কে নিযুক্ত করে, তাহার শাস্তিবিধান আবশ্যক।

কিন্তু শাস্তিবিধানকর্ত্তা কে হইবে? অপরাধ অতি গুরুতর, জুরির সাহায্যে ইহার বিচার আবশ্যক। উপযুক্ত জুরি নির্ব্বাচন করিতে হইলে, দেশের কৃতবিদ্য লেখকগণ লইয়া একটি সাহিত্য-সভা স্থাপন করা উচিত। রচনা ও ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় আদর্শ নিয়ম নির্দ্দেশ, এবং যিনি তাহা প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান, ও তাহা যিনি লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে নিরপেক্ষভাবে তাঁহার দোষ প্রদর্শন, এই সকলই ঐ জুরির কার্য্য। অনেকে হয়ত বলিবেন এরূপ আদর্শ মানিয়া চলিলে প্রতিভার ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্য সমালোচক ম্যাথু-আরণল্ডের মতে উহার সম্ভাবনা নাই, এবং আমাদেরও তাহাই বিশ্বাস। সাহিত্য বিষয়ে জুরি-স্থানীয় কোনও সভা না থাকিলে যে একেবারে চলেনা এরূপ নহে; ভাল মন্দ বিচার করিতে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই সক্ষম; কিন্তু ঐসকল শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অভিমত প্রকাশের জন্য একটি কেন্দ্র আবশ্যক; কারণ ঐরূপ একটি কেন্দ্র থাকিলে শিক্ষিতব্যক্তিদিগের নিরপেক্ষ অভিমত অল্পায়াসপ্রাপ্য হয় এবং ঐ সভা যাহা অনুমোদন করিবেন তাহাতে লোকের অধিকতর আস্থা ও ভক্তি থাকিতে পারে, এবং ঐ সভাই সাহিত্য বিষয়ক অপরাধ সমূহে জুরির কার্য্য করিতে পারেন।

অবশ্য আশা করা যায় বহুসংখ্যক শিক্ষিতব্যক্তি গঠিত সভার অভিমত নিরপেক্ষ হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবাবস্থা না হইলেও এখনও কৈশোর অবস্থা মাত্র; কিন্তু ইহারই মধ্যে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রভৃতি উজ্জ্বল রত্ন মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অমর কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিভার হানি হইবে না এবং গ্রাম্যতা দোষ কুরুচি ও যথেচ্ছাচরিতা দোষ বর্জ্জিত হইয়া ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা।

"সাহিত্যপরিষদে" অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত মণ্ডলী রহিয়াছেন, ঐ সভা ইচ্ছা করিলেই সাহিত্যে জুরির স্থান অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আর নূতন কোনও সভার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় "সাহিত্যপরিষদের" উদ্দেশ্য আমাদিগের প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য হইতে ভিন্ন। সাহিত্যপরিষদে বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণের পুস্তকাদির সমালোচনা হয় না। এরূপ সমালোচনে সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। সুবিধা, গ্রন্থকার স্বয়ং প্রত্যুত্তর দানে সমালোচকের ভ্রম দেখাইয়া দিতে অথবা নিজ উদ্দেশ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ। অসুবিধা, অনেক অপ্রিয় সত্য বলিয়া গ্রন্থকার দিগের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়। কিন্তু অপ্রিয়ভাজন হইবার ভয়ে জাতীয় ভাষা ও ভাবের উন্নতি বিধান চেষ্টায় নিশ্চেষ্ট থাকা কোনও মতেই উচিত নহে। আর এক কথা, সমসাময়িক সমালোচনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও মানসিক উন্নতির বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হওয়া যায়; তদ্বিষয়ে ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্যের মূল্য অধিক। ঐরূপ সমালোচনা যে একেবারে নির্ভুল হইবে এমন কোনও কথা নাই; কিন্তু তথাপি উহা হইতে তৎকালীন মানসিক ও সামাজিক উন্নতির

বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। আর গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁহাকে যথেচ্ছ আক্রমণ করিলে গ্রন্থকারের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিবার কোনও উপায় থাকে না। মহাকবি সেক্সপীয়রের যে সহস্র সহস্র সমালোচনা ও কবির উদ্দেশ্য বিষয়ক অনুমান রহিয়াছে, সেক্সপীর জীবিত থাকিলে উহার অধিকাংশই অনর্থক হইত। আর এক কথা, "সাহিত্যপরিষদে" দেশের অনেক কৃতবিদ্য গণ্য মান্য ব্যক্তি থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত ভাষার উন্নতিবিধায়ক কোনও আদর্শ নিয়মই তাঁহাদের দ্বারা প্রদর্শিত হয় নাই; এ বিষয়ে তাঁহারা একটু মনোযোগ করিলে বঙ্গভাষার যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে আলোকিত করিবার জন্য "পরিষদ"কেই আমরা সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করি। অতএব "পরিষদ" আমাদের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, সাহিত্যের ভাষা ও ভাব-গত দোষান্ধকার বিনাশ করিয়া বিশুদ্ধ আলোক বিতরণে আদর্শ পথ উন্মুক্ত করুন ইহাই এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র "সাহিত্যসেবকসমিতি"র ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আমরা এক্ষণে আমাদের দীন "প্রয়াসের" বিষয় দু-একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। কেবলমাত্র খ্যাত নামা লেখকগণের প্রবন্ধ প্রকাশ না করিয়া, উৎসাহ অভাবে যে সকল সুনিপুণ নবীন লেখকের উদ্যম এবং প্রতিভা পরিস্ফুট হয় না, এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পূজায় সমান অধিকারী হইলেও, বা আন্তরিক অনুরাগ থাকিলেও অনেক মাসিকপত্র যাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদানের জন্যই আমাদের "প্রয়াস"। তাই আজ আমরা ভগবানের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, বঙ্গের চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় সাহিত্যগুরু-দিগের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং বর্ত্তমান সাহিত্যাচার্য্যদিগের

সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া, নবীন উৎসাহে নবীন লেখক লইয়া সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইলাম। আমরা সাহিত্যসেবকমাত্র, সেবায় ক্রুটি হইলে আশা করি, সাহিত্যগুরুগণ আমাদিগকে বিশুদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত পূর্ব্বক পূজার পদ্ধতি সম্যগ্‌ভাবে দেখাইয়া দিবেন। আর যদি নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ প্রদানে তাঁহাদের অস্ফুট প্রতিভার কিছুমাত্রও বিকাশ হয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কথঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হয় তবেই আমাদের "প্রয়াস" সফল হইবে।

বিষবৃক্ষ—অনুশীলন।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট সুপরিচিত; উহা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বলরত্ন এবং তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার সমুদয় উপন্যাস-গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম Romantic বা অলৌকিক এবং দ্বিতীয় Realistic বা প্রাকৃতিক। যে সমস্ত উপন্যাসে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বা অতিরঞ্জিত বর্ণনার সমাবেশ থাকে, অথবা যাহাতে ইতিহাসবর্ণিত দুই একটি চরিত্রের ছায়ামাত্র অবলম্বনে লেখকের স্বকল্পিত ঘটনা সমূহ উল্লিখিত হয়, তাহাকে এক কথায় অলৌকিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। এই অলৌকিক উপন্যাসের লক্ষণ অত্যুক্তি। আর যাহাতে সাংসারিক ঘটনা সমূহ এরূপ যথাযথভাবে বর্ণিত থাকে যে পড়িলেই উহা সত্য অন্ততঃ সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে এক কথায় প্রাকৃতিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। যথার্থ উক্তিই ইহার লক্ষণ। এই কারণেই "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে

প্রাকৃতিকের অন্তর্গত করিলাম; তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট উপন্যাসগুলিকে অলৌকিক শ্রেণীভুক্ত করা গেল। বিষবৃক্ষ অনুশীলনের চেষ্টাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সকলের মত সমান হইবে এরূপ আশা করা যায় না, তবে আমাদের বিবেচনায় বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। এই দুই খানি পুস্তকের মধ্যে কাহাকে যে প্রথম এবং কাহাকে যে দ্বিতীয় স্থান প্রদত্ত হইবে, তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। বঙ্কিমবাবু না কি স্বয়ং বলিতেন কৃষ্ণকান্তই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। কিন্তু বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এই উভয় পুস্তকেরই মূল ঘটনা প্রায় একরূপ; অথচ বিষবৃক্ষে চরিত্রবৈচিত্র অধিক দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণকান্তের উইলে কেবল মাত্র ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলালের ছবিই হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে; কিন্তু বিষবৃক্ষে সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দ, হীরা, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র, ও দেবেন্দ্র সকলেরই চরিত্র অতিশয় পরিস্ফুট হওয়াতে হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। এই চরিত্রবৈচিত্রের জন্যই বিষবৃক্ষকে আমরা শীর্ষস্থান প্রদান করিবার পক্ষপাতী; অন্ততঃ আমরা দুইখানিকেই একাসনে বসাইতে চাই। বিষবৃক্ষ প্রসঙ্গে কৃষ্ণকান্ত সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উভয়ের মূল ঘটনা (plot) ও পরিণাম প্রায় একরূপ। এক অল্পবয়স্কা সুন্দরী বিধবাই উভয় পুস্তকের অনিষ্টের মূল। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল উভয়েরই চরিত্র প্রথমে নির্দ্দোষ ছিল; উভয়েই আপনাপন স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং উভয়েই অতুল ঐশ্বর্য্যসুখের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু উভয়েই আপাতমধুর রূপজমোহের (উহা যে প্রকৃত ভালবাসা নহে পরে প্রমাণ করিব) বশীভূত হইয়া পরে বিষময় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পতিব্রতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীদিগকেও

অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিষবৃক্ষে হীরাদাসী, নগেন্দ্রের সহিত সূর্য্যমুখীর, কৃষ্ণকান্তের উইলে ক্ষীরি ঝি, গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল। কিন্তু মূল বৃত্তান্তে এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ব্যক্তিগত চরিত্রে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও এক বিষয়ে গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। রূপজ-মোহের বশীভূত একই অবস্থাপন্ন নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের কার্য্যকলাপ কত ভিন্ন! নগেন্দ্র, সহধর্ম্মিণীর সম্মতি ও শাস্ত্র অনুসারে কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল, সহধর্ম্মিণীর প্রতি প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া রূপতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য রক্ষিতারূপে স্থিতা রোহিণীর সহিত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পাপের প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছিল। গোবিন্দলালের মোহ ছুটিল বটে, কিন্তু অমূল্যরত্ন ভ্রমরকে জন্মের মত হারাইলেন। নগেন্দ্রের রূপনেশা ছুটিয়াছিল, এবং কুন্দকে রোহিণীর মত না রাখিয়া শাস্ত্র সঙ্গত বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহারই পুরস্কার স্বরূপই যেন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে হারাইয়াও পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই পতিব্রতার জ্বলন্ত ছবি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও প্রভেদ আছে। সূর্য্যমুখী ভ্রমর অপেক্ষা বয়সে বড় এবং অধিকতর বুদ্ধিমতী; ভ্রমর তীক্ষবুদ্ধিতে সূর্য্যমুখীর সমকক্ষা না হইলেও এক বিষয়ে সূর্য্যমুখী হইতে ভিন্ন। সূর্য্যমুখীর নিকট স্বামীই সর্ব্বস্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পতি-দেবতা ভ্রমরের নিকট স্বামী পরমারাধ্য হইলেও ধর্ম্ম অধিকতর শ্রেষ্ঠ। আর কুন্দ ও রোহিণী উভয়ের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। মূল ঘটনা ও পরিণামের এতাদৃশ সৌসাদৃশ্য সত্ত্বেও ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিমবাবু এরূপ কৌশল দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই উভয় পুস্তকের নূতনত্ব, মাধুর্য্য ও কৌতুহল হ্রাস হয় নাই।

বিষবৃক্ষের প্রথমেই যেন আখ্যায়িকার আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমেই যে নগেন্দ্রের নৌকা-যাত্রা ও প্রবল ঝটিকার অবতারণা দেখিতে পাই, উহা ভবিষ্যতে প্রবল রিপুরূপ ঝটিকার-দ্বারা রূপ-তরঙ্গে নগেন্দ্রের মনতরি উদ্বেলিত হইবার সূচনা মাত্র। এক ভগ্ন গৃহে স্তিমিত প্রদীপে মুমূর্ষু পিতার পার্শ্বে আমরা কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ পাই। দীপ নির্ব্বাণের সহিত কুন্দের পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, কুন্দের ক্ষুদ্র হৃদয়ও ঐ গৃহের ন্যায় অন্ধকার। কুন্দ পিতার মৃত্যু জানিতে পারিল না; সে আপনার ভাবী অমঙ্গল ও মৃত্যুর বিষয়ও তথন কিছুই জানে না। পিতাকে নিদ্রিত মনে করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। পরে ক্লান্তি বশতঃ নিজে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিল সেই বৃত্তান্ত পড়িয়াই, পাঠক অভাগিনী কুন্দের পরিণাম বুঝিতে পারিলেন। এরূপ স্বপ্ন সম্ভব কি অসম্ভব, সে বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে চাই না; যাহা আমরা জ্ঞানে ও কল্পনায়ও আনিতে পারি না, সেরূপ অনেক বস্তু এ বিশ্বে থাকিতে পারে। আর উহা অসম্ভব ভাবিলে বা একবারে পরিহার করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না; কারণ কুন্দ যথন নগেন্দ্র ও হীরাকে প্রথম দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল, উহা যে স্বভাবজ সহজ জ্ঞানে (instinct) সম্ভব হইতে পারে না, তাই বা কে বলিল?

আরও এক কথা ঐ স্বপ্ন কুন্দনন্দিনীর জীবনের ঘটনাস্রোত ফিরাইতে পারে নাই; উহা অবাধে চলিয়াছিল, ঐ স্বপ্ন না দেখিলেও যেরূপ চলিত, দেখিয়াও সেই ভাবেই চলিয়াছিল। শকুন্তলায় দুর্ব্বাসার শাপ যেরূপ প্রধান অঙ্গ ও অপরিত্যাজ্য, বিষবৃক্ষে কুন্দ-নন্দিনীর স্বপ্ন সেরূপ নহে, উহা ত্যাগ করিলেও পুস্তকের অঙ্গ-হানি হয় না।

নগেন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া কুন্দকে আপন গৃহে আনিলেন। পারিজাত

বৃক্ষের চারা স্থানচ্যুত হইয়া মাটির দোষে বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। অবস্থাভেদে মানব ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে, কোনও বিষয়ে ইচ্ছা বলবতী হইলেও অবস্থা প্রতিকূল হইলে উহার সিদ্ধি হয় না, কিন্তু অবস্থা অনুকূল হইলে যেরূপ ইচ্ছা পূর্ব্বে কখনও ছিল না, তাহারও উদয় এবং সিদ্ধি হয়। নগেন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে সুখী ছিলেন, ধন, মান এবং পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল; তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। দয়া পরবশ হইয়া কুন্দকে গৃহে আনিলেন, এবং অতি যত্নের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু অভাগিনী কুন্দের অদৃষ্টে সুখ ছিল না। সে বিবাহের তিন বৎসর পরেই বিধবা হইল। তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর। অগত্যা সূর্য্যমুখী অসহায়া কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন, বিষবৃক্ষের বীজ-বপন হইল। কুন্দর স্ফুটনোন্মুখ যৌবন ও অনুপম লাবণ্য নগেন্দ্রের চিত্তে অঙ্কিত হইল, অনেক চেষ্টা করিয়াও নগেন্দ্র হৃদয় হইতে সে ছবি মুছিতে পারিলেন না। রূপসীর রূপদর্শনে যখন ঋষিদিগের এমন কি মহাযোগী মহাদেবেরও চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় বর্ণিত আছে, তখন প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে যে কুন্দের স্নিগ্ধ রূপ-মাধুরী নগেন্দ্রকে মুগ্ধ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নগেন্দ্রের দোষ দিতে পারেন, কিন্তু আমরা উহা নগেন্দ্রের দোষ বলিয়া ধরি না, উহা মানব হৃদয়ের স্বভাবিক দুর্ব্বলতা মাত্র। ঐ দুর্ব্বলতা দুর্দ্দমনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে অদম্য নহে। মনের অসাধারণ দৃঢ়তা থাকিলে ঐ দুর্ব্বলতা যে দমন করা যাইতে পারে, চন্দ্রশেখরে প্রতাপ চরিত্রে বঙ্কিমবাবু স্বয়ংই তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু সংসারে প্রতাপের সংখ্যা অতি বিরল, নগেন্দ্রের সংখ্যাই অধিক। বঙ্কিম বাবু নগেন্দ্রকে আদর্শচিত্রে চিত্রিত না করিয়া, সাধারণ মনুষ্যের মত বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াই, নগেন্দ্রের প্রতি আমাদের এত সহানু-

ভূতি হয়। নগেন্দ্রের চিত্ত-সংযম শক্তি না থাকিলেও সংযম প্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল, এবং সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করিয়াছিল; প্রথম হইতেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই। এক দিকে কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞান, অপর দিকে রূপ-মোহের প্রবল তাড়না, নগেন্দ্রের হৃদয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; নগেন্দ্র তর্ক যুক্তি দ্বারা ঐ যুদ্ধে জয় লাভ করিতে না পারিয়া সুরার সাহায্য লইল। এইটি তাঁহার বিষম ভ্রম। উন্মাদকারিণী সুরার সেবায় কখনও কি চিত্ত-সংযম সম্ভব? বরং উহা তাঁহার দেব-প্রকৃতি লুপ্তপ্রায় করিয়া কাম-প্রবৃত্তি অধিকতর উত্তেজিত করিয়াছিল। তথাপি নগেন্দ্র পশুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কুন্দকে বিবাহ করা ব্যতীত অন্য চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। নগেন্দ্র মনে করিয়াছিলেন তিনি যথার্থই কুন্দকে ভাল বাসিতেন। কিন্তু উহা তাঁহার ভ্রম মাত্র, উহা যথার্থ প্রেম নহে, রূপ-মোহ মাত্র; নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠেই ইহার উপলব্ধি হইতে পারে।

"প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। দুজনে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে। আর কেহ নাই অথচ দুই জনেই নীরব, সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না। কিন্তু সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি ইহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্ব্বদা ভাবিতেন "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়"। আজিকার দিন এই সময় কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়"।

নগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন "যেমন ছিল তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?" কুন্দনন্দিনী বড় ব্যথা পাইলেন, বলিলেন "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ, তাহা আমি আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে।" নগেন্দ্র বলিল ঐ কথাটি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ

করিয়া গেল।" ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন, কিন্তু নগেন্দ্র ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন "এটি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই, সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত রহিলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন "কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ? কুন্দ কহিলেন "না"।

ন। কেবল একটি ছোট্টটো "না" বলিয়া আবার চুপ করিলে। তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?

কু। বাসি বই কি?

ন। "বাসি বই কি"? এ যে বালক ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয় তুমি আমায় কখনও ভালবাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা ভীরু-স্বভাব, কথা জানেন না"।

কুন্দনন্দিনীর ক্ষুদ্র হৃদয় গভীর প্রেমে পূর্ণ, নগেন্দ্র সে হৃদয়ের গভীরতা বুঝিতে পারেন নাই। হৃদয় প্রেমে ভরা অথচ মুখে কথা ফুটে না, ইহার মর্ম্ম কয়জনে বুঝে? হ্যাম্‌লেট বুঝেন নাই, ওথেলো বুঝেন নাই নগেন্দ্রও বুঝিলেন না, তাই হেলায় অমূল্যরত্ন হারাইলেন। কুন্দনন্দিনীর কথা পড়িলেই ডেস্‌ডিমোনাকে মনে পড়ে, এবং ডেস্‌ডিমোনার সহিত তাঁহার তুলনা করিতে ইচ্ছা করে। উভয়েই ভীরু স্বভাব, কথা জানেন না, অথচ হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর সময়ে একটিবার মাত্র কুন্দের মুখ ফুটিয়াছিল। নগেন্দ্র যখন গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ" কুন্দ, যে কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না, আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সহিত কথা কহিল, বলিল "তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ

করিয়াছ? কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, কাল যদি একবার আমার নিকট এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি, তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না"।

কি প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা, কি মধুর তিরস্কার! কুন্দনন্দিনীর একবার মাত্র মুখ ফুটিয়াছিল, ডেস্‌ডিমোনার তাহাও ফুটে নাই। ওথেলো কর্তৃক শ্বাসরুদ্ধা মুমূর্ষু ডেস্‌ডিমোনাকে যখন এমিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল কে তাঁহার এরূপ অবস্থা করিয়াছে? ডেস্‌ডিমোনা উত্তর করিলেন

"No body ; I myself ; farewell ;
Commend me to my kind lord ; O farewell.

সূর্য্যমুখীর ভালবাসা অপেক্ষা কুন্দের ভালবাসা যেরূপ কিছু কম নহে, সেইরূপ কুন্দের স্বার্থ-ত্যাগও সূর্য্যমুখীর স্বার্থ-ত্যাগ অপেক্ষা কম নহে। কুন্দ ঐ স্বার্থ-ত্যাগে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সূর্য্যমুখীরই জন্য উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অনেকে হয়ত একথা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু চতুরা কমলমণি যখন কুন্দকে তাহার নিজের ও নগেন্দ্র উভয়ের মঙ্গলের জন্য আপনার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, কুন্দের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, কমল বলিলেন "চক্ষের আড়াল হইলে, দাদাও ভুলিবে, তুইও ভুলিবি। নহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল, সোনার সংসার ছারখার গেল"। কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন "যাবি? মনে করিয়া দেখ দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে?" কুন্দ খানিকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল "যাব"।

অনেকক্ষণ পরে কেন? কমল তাহা বুঝিল। বুঝিল যে, "কুন্দ-নন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল।"

এই প্রাণের প্রাণ বলি দিতে যাওয়া কি সূর্য্যমুখীর স্বার্থ-ত্যাগ অপেক্ষা কোন অংশে কম? কখনই নহে, বরং আরও কঠিন। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের প্রেমে বঞ্চিত হইলে, নগেন্দ্রের সুখের জন্য আত্ম সুখে বলি দিয়াছিল। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের প্রেম লাভ করিয়াও বাসনা-পরিতৃপ্তির পূর্ব্বেই আত্মসুখে বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। নগেন্দ্র স্বয়ং বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করিলে কুন্দ বলিয়াছিল "না"; নগেন্দ্র সহস্র মুখে অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলে কুন্দ বলিয়াছিল "না" এরূপ অবস্থায় "না" বলিতে পারে কয়জন? মৃত্যুকালে কুন্দ বলিয়াছিল "মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব, বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা হয় না"। অতৃপ্ত বাসনা সত্ত্বেও পরের জন্য এরূপে আত্মসুখে ও জীবনে জলাঞ্জলি দিতে কয় জন পারে?

কুন্দ, তুমি অভাগিনী হইলেও, আমরা দেবী বলিয়া তোমার ভক্তি করি, স্বার্থ-ত্যাগ সম্বন্ধে শত শত বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে আমরা যাহা না শিখি, তোমার ঐ একটি ছোট্টো "না"তে তদপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষালাভ করি। স্বর্গের পারিজাত তুমি স্বর্গীয়সুবাস বিলাইতে ক্ষণেকের জন্য কঠিন মর্ত্তভূমে ফুটিয়াছিলে, তোমার মত পারিজাত সংসার কাননে মধ্যে মধ্যে ফুটে বলিয়াই সংসার এখনও মরুভূমে পরিণত হয় নাই।

আর সূর্য্যমুখী? সূর্য্যমুখী আদর্শ হিন্দু পত্নী। হিন্দু পত্নীর আদর্শ

অপেক্ষা পত্নীর উচ্চতর আদর্শ জগতে আর কোথাও আছে কি? দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী কবি কল্পিত চিত্র হইলেও কোনও দেশের কোন কবি কি ঐরূপ আদর্শ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন?

"যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যে আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন" এ কথা যখন সূর্য্যমুখীর মুখে শুনিলাম তখনই বুঝিলাম তিনি সাবিত্রী, সীতা ও দময়ন্তীর অযোগ্যা নহেন। কিন্তু এক বিষয়ে সূর্য্যমুখী তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু স্বামীকে স্বেচ্ছায় অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ওরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগের পর সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ অনেকে অসঙ্গত মনে করেন। কিন্তু ওরূপ সমালোচক অপেক্ষা বঙ্কিমবাবু মানবচরিত্র অধিক বুঝিতেন, তাই তিনি সূর্য্যমুখীর স্ত্রীজাতিসুলভ স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বজায় রাখিয়াছেন। স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া চোখের উপর আপন স্বামীর অন্য স্ত্রীর সহিত একত্রে বাস কোন স্ত্রীলোকেই সহ্য করিতে পারে না। যে বলে "আমি তোমার ভালবাসা চাই না, তোমাকে ভালবাসিয়াই আমি সুখী" সে হয় আদৌ ভালবাসে না, না হয় ঘোর মিথ্যাবাদী। সূর্য্যমুখী মিথ্যাবাদিনী নহেন, তিনি প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভাল বাসেন বটে কিন্তু প্রতিদান পাইবারও আশা করেন। কমলমণি যখন বলিলেন "তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী, তথাপি বলিতেছ এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?" সূর্য্যমুখী বলিলেন "দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ"। সূর্য্যমুখীর আমিত্ব একেবারে যায় নাই, কাহারও

যায় না। কমল যথার্থই বলিয়াছিল "তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা"। সূর্য্যমুখী স্বয়ংই গৃহত্যাগের কারণ কমলকে লিখিয়াছিলেন "কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব, কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না"। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই, যাঁহারা অস্বাভাবিকতা দোষ দেন তাঁহারা বঙ্কিমবাবুর অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্র কম বুঝিয়াছেন।

কমলমণি আদর্শহিন্দু পত্নী, হিন্দু পত্নীর স্বামীর প্রতি অটল বিশ্বাস, স্বামী হিন্দু স্ত্রীর সর্ব্বস্ব, দেবতা অপেক্ষা পূজ্য, স্বামীদেবতাকে হিন্দু স্ত্রী অবিশ্বাস করিতে জানেন না, তাই কমলমণি সূর্য্যমুখীর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন "তুমি পাগল হইয়াছ, নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না তাহার মরাই মঙ্গল"। কমলমণি যেরূপ রসিকা তেমনি পতিব্রতা। রসিকা রমণী অনেক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কমলমণির অন্যান্য গুণ সকল রমণীতে দেখা যায় না। কমলমণি সদাই প্রফুল্ল, তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চ, অতি কোমল, সকলেরই প্রতি সহানুভূতি। কমলমণি রমণীকুলে রত্ন, সে রত্ন যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাঁহার মত সুখী আর নাই। সূর্য্যমুখী বুদ্ধিমতী হইলেও যখন হীরা-দাসীর কথায় বিশ্বাস করিয়া কুন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন "কুন্দ হরিদাসী কে আমরা জানিয়াছি। আমরা জানিয়াছি সে তোমার উপপতি। তুই যা তা জানিলাম। আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়িতে স্থান দিই

না। তুই বাড়ি হইতে এখনই দূর হ, নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে', তখন আমাদের বাস্তবিক সূর্য্যমুখীর উপর রাগ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ কথায় পরে কমলমণির কার্য্য দেখিয়া আমাদের চক্ষে জল আসিয়াছিল। ঐ দারুণ কথা শুনিয়া কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল, পতনোন্মুখ কুন্দকে কমল ধরিয়া শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন ও আদর এবং সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "বউ যাহা বলে বলুক, আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না"। কমলমণির হৃদয় প্রেম, স্নেহ ও মমতায় পরিপূর্ণ, তাঁহার প্রফুল্লচিত্তজনিত রসিকতায় প্রীত হইতে হয়, তাঁহার মধুর চিরপ্রেমময়ী স্নিগ্ধ প্রকৃতি দেখিয়া মোহিত হইতে হয় ও দেবী বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সূর্য্যমুখীর উপর যেমন আমাদের একবার রাগ হইয়াছিল, কমলমণির উপরও সেইরূপ একবার রাগ হইয়াছিল। নগেন্দ্র যখন কুন্দকে বলিলেন "সূর্য্যমুখী বরাবর ভালবাসিত, বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন, লোহার শিকলই ভাল"। তখন কুন্দনন্দিনী প্রাণে ব্যথা পাইয়া সহৃদয় স্নেহময়ী কমলমণিকে মর্ম্মপীড়া জানাইবার ইচ্ছা করিলেন, কমলমণি কুন্দকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন এবং "আমার কাজ আছে বলিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলেন। কিন্তু রাগ হইলেও আমরা কমলের দোষ দিই না, কারণ সূর্য্যমুখীর জন্য তাঁহার মন তখন অত্যন্ত খারাপ ছিল সে অবস্থায় ওরূপ ব্যবহার অস্বাভাবিক না হইয়া বরং স্বাভাবিকই হইয়াছে।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে আমরা আর অধিক কথা বলির না, ও অনেক কথা বলা হইল না, যাহা বলা হইয়াছে উহাতে সমালোচনা করা হয় নাই অনুশীলনচেষ্টার আভাব দেওয়া হইয়াছে মাত্র কিন্তু হীরা ও দেবেন্দ্রের সম্বন্ধে দু'এক কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হয় এই জন্ত দুই চারিটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। হীরা দেবেন্দ্রকে

ভালবাসিত এবং দেবেন্দ্রের জন্য সে সব করিতে পারিত। বহু যত্নে হীরা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল কিন্তু দেবেন্দ্রের প্রলোভনে মহারত্ন হারাইল এবং যে দেবেন্দ্রের জন্য বহু যত্নে সঞ্চিত অমূল্যরত্ন হারাইল সেই দেবেন্দ্রের দ্বারাই সে কেবল পরিত্যক্ত নহে, অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল, ইহা "স্ত্রীলোক মধ্যে অতি অধমারও অসহ্য"। তাই হীরা প্রতিহিংসা পরবশ হইল, প্রতিহিংসা অনলে কুন্দকুসুম দগ্ধ হইয়া গেল, দেবেন্দ্র মৃত্যু শয্যায়ও "পদপল্লবমুদারং" ভুলিলেন না, হীরাও উন্মাদিনী হইল। হীরা সাধারণ দাসীর মত নহে, সে নষ্ট চরিত্রা নহে, সে কেবল দেবেন্দ্রপ্রেমে পাগলিনী। আর দেবেন্দ্র? বঙ্কিমবাবু স্বয়ং বলিয়াছেন দেবেন্দ্র-চরিত্র প্রথমে অতি নিষ্কলঙ্ক ছিল। কিন্তু হৈমবতীই দেবেন্দ্রের অধঃপতনের মূল; হৈমবতী কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্ম-পরায়ণা; হৈমবতীর সহিত পরিণয়ই দেবেন্দ্রের কাল হইল। ধনলোভে দেবেন্দ্রের পিতা ঐ বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন, অর্থলোলুপ পিতা দ্বারা পুত্রের চিরসুখে কিরূপ ব্যাঘাত ঘটে ইহা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

মতপরিবর্ত্তন।

আমার একটা দুর্ব্বুদ্ধি ছিল। স্বাভাবিক সাহসিকতা ও আধুনিক শিক্ষার ফল হইতেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ব্বুদ্ধিরও বিকাশ পাইতে লাগিল। যখন আমি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম তখনও আমার সেই দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ নাস্তিকতা আমার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমার অসীম সাহস, ছেলে বেলা হইতেই

অপদেবতা বা ভূত প্রেতের অস্তিত্বও মনের মধ্যে স্থান দিতে ঘৃণা করিত এবং সেই সময় হইতে ভূত প্রেতের অন্বেষণার্থে কত ভগ্নগৃহ, জনশূন্য অট্টালিকা, নিবিড় কানন, বৃক্ষ শাখাদি সমাচ্ছন্ন জটিল পথ,—যেখানে সূর্য্যরশ্মিও প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় এমন সকল স্থানে, নিশীথ অন্ধকারে আমি যখন তখন ভ্রমণ করিতাম এবং আমার চিরসহচর অসীম সাহস, আমাকে অবাধে তাহার মধ্য দিয়া লইয়া যাইত। আমি সেই সময়ে ঐ সকল স্থানে উচ্চৈঃস্বরে ঐ সকল অপদেবতাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিতাম কিন্তু হায়, কেহই উত্তর দানে আমাকে আশ্বস্ত করিত না। আমি শেষে নিরাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিতাম।

শুনিয়াছিলাম পল্লিগ্রামের শশ্মান অতীব ভীষণ এবং নিশীথ সময়ে বিশেষতঃ অমাবস্যা নিশীথে তথায় গমন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত; কিন্তু আমার প্রবল সাহস, সেই ভীষণ স্থান দর্শন করাইতে আমাকে বঞ্চিত করে নাই। আমি কতবার বর্ষাকালের অমাবস্যারাত্রে একাকী সেই সকল স্থানে বসিয়া ভিজিতে ভিজিতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু ভূতপ্রেতের আবির্ভাব কুত্রাপি আমার গোচরীভূত হয় নাই। আমার সাহস, এইরূপে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল, যে বিশ্বাস বলে আমি অপদেবতার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও মনোমধ্যে স্থান দিতে পারি নাই এবং সেই জন্য উহাদের কথা অলীক স্বপ্নবৎ বলিয়াই আমার নিকট নিয়ত প্রতীয়মান হইত।

কালক্রমে আমি কলেজ ক্লাসের ছাত্র হইলাম। এবং পড়াশুনায় বেশ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন, এদিকে যেমন অপদেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া এক প্রকার দৃঢ়তা লাভ করিয়াছিলাম, তেমনি আবার অপর দিকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমার অবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল।

আমি তখন সহপাঠীদিগের সহিত ঐ সম্বন্ধে যে কত তর্ক করিয়াছিলাম এবং কত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা যে তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু অপদেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন মনের দৃঢ়তা ছিল, দেবতাদি বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তখনও তেমন দৃঢ়তা লাভ করিতে পারি নাই। কত ধর্ম্ম যাজকের উপদেশ শুনিয়াছি, কত সাধু মহান্তদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছি কিন্তু নাস্তিকতাই আমাকে বিশিষ্টরূপে পোষণ করিয়া আমাকে ক্রমে ক্রমে নাস্তিকতার পথে প্রবেশ করাইল। আমার সাহস ও শিক্ষা মিলিয়া এইরূপে একটী হিন্দুসন্তানকে ধীরে ধীরে অহিন্দু ও নাস্তিক করিয়া বোধ করি, শয়তান বা চার্বাকের শিষ্য করিয়া তুলিল।

আমার পিতা পরম হিন্দু। ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধার জন্যই আমাকে ও আমার সহোদরদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু হায় কে জানিত যে তাঁহার সে বাসনা সফল করিয়াও আমি বিপথে চালিত হইব। নিষ্ঠাবান পিতা স্বধর্ম্মাচরণে যেরূপ যত্নবান, তাঁহার হৃদয়স্থিত স্নেহ প্রস্রবণও আমাদের প্রতি সেই রূপ মুক্ত। প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে আমরা, বিশেষতঃ আমি, তাঁহার মনে কষ্ট প্রদান করিয়াও তাঁহার অসীম স্নেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমি নাস্তিক, আমি অখাদ্যভোজী (যদিও এ ভোজন কার্য্যটা বাহিরে বাহিরে চলিত) সুতরাং আমার এই স্বভাবের জন্য যে তাঁহার কষ্ট হইত না, ইহা আমি কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তখন আমার মন, আমাকে এমনি এক হিতাহিত জ্ঞানের উপর দণ্ডায়মান করাইয়াছিল, যে স্থানে দাঁড়াইয়া আমার এই অদূরদর্শী অহংজ্ঞান, আমার ভক্ত পিতা মাতার যে কি কষ্ট তাহা দেখিতে পাইত না। সে কেবল দেখিত আমি ন্যায়ের উপর বিচরণ করিতেছি এবং

আমার বিশ্বাসও হৃদয়স্থিতা ভক্তি দেবীকে—যাঁহার করুণাস্রোত প্রভাবে মানুষ মানুষ হইয়া থাকে—বিদায় করিয়া দিয়া হৃদয়কে মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং আমার মনের বিশ্বাসে আমি আমাকে একজন ন্যায়বান ব্যক্তি বলিয়াই বিশ্বাস করিতাম; এবং ধর্ম্মকর্ম্মকেও এক প্রকার ভণ্ডামী বলিয়াই আমার জ্ঞান হইয়াছিল।

এই বিশ্বাসই আমাকে ধর্ম্ম শাস্ত্রের ধার দিয়াও যাইতে দেয় নাই এবং শাস্ত্রাদি অনুশীলন না করিয়াই, তাহাদিগকে উপকথা বা উপ-ন্যাসের মধ্যে ফেলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

এইরূপে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা সম্বলিত এই মানব নামধারী জীবটী কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, বিএল, উপাধিতে বিভূষিত হইয়া, তদানিন্তন বঙ্গীয় যুবক মণ্ডলীর মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে পিতার আনন্দ ও ভবিষ্যতের স্বোপার্জ্জন আশা যদিও বর্দ্ধিত হইয়াছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে পুত্রটী পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা পিতার পক্ষে দুর্ব্বোধ হইলেও, পুত্রের অন্তঃকরণ যে সে অভিমানে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহা বাহুল্য বলা মাত্র।

যাহাহউক, এতক্ষণে বুদ্ধিমান পাঠককে হয়ত বলিতে হইবে না যে আমার এই জীবন কাহিনীর মধ্যে আমিই নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত নায়িকার গন্ধ মাত্র না পাইয়া, নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেছেন, আমার একান্ত অনুরোধ তাঁহারা যেন এখান হইতেই বিদায় গ্রহণ করেন। প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম বিলাস লীলা চিত্রিত করিবার জন্য আমি লেখনী ধারণ করি নাই। কেবল মাত্র এই নাস্তিক অনাচারীর জীবনের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্যই প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

যাঁহাদের জীবনগতি এইরূপ সংগ্রামের সহিত বিজড়িত, তাঁহারাও যে এ কাহিনী হইতে উপকার লাভ করিতে পারিবেন সে ভরসাও আমি সম্পূর্ণরূপে করিতে পারি না। তবে ঘটনা যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিয়া যাইব।

কতিপয় বৎসর গত হইল, এখানকার একজন রত্নব্যবসায়ীর মোকদ্দমা হাইকোর্টে হইতেছিল। আমি তাঁহার মোকদ্দমা সংক্রান্ত দলিলাদি অনুবাদ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং একার্য্য আমি সুবিধামত বাড়ীতে বসিয়াও করিতাম। তখন পৌষ মাস। সেই সময়ে এক দিন আমাদের বাটীর সকলেই কালীঘাটে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। সেদিন আমাদের হাইকোর্টের ছুটি ছিল, বোধ হয় সে দিন রবিবার। পিতা আমাকে জানিতেন যে আমি ঠাকুর দেবতাদি কিছুই মানি না সুতরাং আমি তথায় যে যাইব না তাহা তিনি পূর্ব্বে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে আমরা সকলেই কালী দর্শনে চলিলাম, বাড়ীতে কেহই রহিল না, তুমিত সেখানে যাইবে না জানি অতএব তুমি বাড়ীতে থাকিও। বাড়ী হইতে আজ আর বাহির হইও না; আমরা সন্ধ্যা আরতি দেখিয়া ফিরিব"। আমি অগত্যা সম্মত হইলাম এবং একাকীই বাড়ীতে রহিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের সন্ধ্যা দেখিতে দেখিতেই আসে। আমি আলো জ্বালিলাম; সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া উপরের ঘরে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে উক্ত মোকদ্দমার দলিলাদির অনুবাদ করিতেছি। তখন পর্য্যন্তও আমাদের বাড়ীর কেহই কালীঘাট হইতে ফিরেন নাই। আমি যে ঘরে বসিয়া লিখিতেছি সেটী আমার পড়িবার বা বসিবার ঘর। হিমের জন্য সমস্ত দরজা জানালা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম; টেবিলের উপর হারিকান ল্যাম্প জ্বলিতেছে।

আমি অনন্যমনে লিখিয়া যাইতেছি। এমন সময়ে একটা খট্ খট্ শব্দ আমার কাণে আসিল। আমি ইন্দুরের উপদ্রব মনে করিয়া "দূর্ দূর্" করিলাম; শব্দও থামিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার সেইরূপ শব্দ শুনিলাম, মনে হইল বাহিরে বুঝি কেহ শব্দ করিতেছে; আলো লইয়া দ্বার খুলিলাম, বেশ করিয়া বারাণ্ডা প্রভৃতি স্থান অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; আর কিসের যে শব্দ তাহাও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। শব্দ আবার মিলাইয়া গেল। আমি পূর্ব্ববৎ আলো লইয়া ঘর বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিলাম; মনটা তখন একটু অস্থির হইয়াছিল। দুই কি চারি ছত্র মাত্র লিখিয়াছি আবার সেই শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল ঘরের মধ্যেই শব্দ হইতেছে। তখন ভাল করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে, যখন সোফার দিকে ফিরিয়া দেখি, তখন দেখিলাম একটী মানব-মূর্ত্তি; আমার কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়াই তাহাকে মনে হইল। তখন আমি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলাম—"প্রিয়নাথ, তুমি কখন আসিয়াছ? আর এ ঘরেইবা কেমন করিয়া প্রবেশ করিলে, আমি চারি দিক্ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি।"

সোফার পার্শ্বস্থিত সেই মূর্ত্তি উত্তর করিল—"আপনি ভাল করিয়া দেখুন, আমি "প্রিয়নাথ" নহি, আমি "কৃপানাথ"।

তাহার এই কথা শুনিয়া আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আমি একবার সাহসে নির্ভর করিয়া, ভাল করিয়া দেখিলাম— দেখিলাম আমারই মধ্যম সহোদর কৃপানাথ—যে আজ দশ বৎসর হইল আমাদিগকে কাঁদাইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এই ভ্রাতা আমার অত্যন্ত অনুগত ছিল এবং আমার স্বভাব ও রীতি নীতির সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া সেও একজন নাস্তিক হইয়া উঠিতেছিল।

তখন আমি হারিকান ল্যাম্পটাকে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দ্রুত বাহিরে যাইব বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিলাম। উঠিবামাত্র সেই মূর্ত্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দাদা, আপনাকে সাহসী বলিয়াই বরাবর জানি; এবং সেই জন্যই আজ একাকী পাইয়া আপনাকে দেখা দিতে আসিয়াছি। আমার কিছু প্রার্থনা আছে; আপনি শ্রবণ করুন। আমাদ্বারা আপনার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই—আপনি একবার বসুন।"

আমি অগত্যা চেয়ারে বসিলাম। বসিয়া সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি যে 'কৃপানাথ' তাহা আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব।" আমার এই কথা শুনিয়া সেই মূর্ত্তি টেবিলের অপর পার্শ্বে ঠিক্ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হায়! কে জানিত যে যাহাদের দর্শন ও যাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য স্থানে, অস্থানে, বিজনে, গহনে, শ্মশানে একাকী অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিয়া শেষে নিরাশ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি—আজ এই সার্শি খড়খড়েবিশিষ্ট, সোফা, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আস্‌বাব্ পরিশোভিত পরিচ্ছন্ন আবাসগৃহে আমারই কালপ্রাপ্ত সহোদর—যাহার চিন্তা আজ কতদিনই হইল মনের মধ্যে ভ্রম-ক্রমেও স্থান পায় নাই—সেই "কৃপানাথ" আসিয়া আমারই সম্মুখে দাঁড়াইবে!

আমি এক প্রকার স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আমাকে নীরব দেখিয়া কৃপানাথ কহিল—"দাদা, আমি অনেক দিন হইতেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সুবিধা পাই নাই; কারণ আজ যেমন আপনাকে একাকী পাইয়াছি, এমন আর একদিনও দেখি নাই। আমি জানি আপনি ব্যতীত আমাদের পরিবারের মধ্যে আর

কাহারও নিকট আমি দেখা দিলে ভয়ে তাহার চৈতন্য লোপ পাইবে ও আমারও কোন উপকার হইবে না।”

আমি খুব সাহসের সহিত বলিয়া উঠিলাম—“তুমি কি আমাদের সকলকেই দেখিতে পাইয়া থাক ?”

উত্তর হইল—“হাঁ, সকলকেই ; কিন্তু আপনাদের সহিত মিলিবার মিশিবার ক্ষমতা আমার কিছুমাত্র নাই। এই যে আমি আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানবাকৃতিতে কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি দেখিতেছেন, ইহাতে আমার যে কি কষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। একটী ক্লার্নেটে ফুঁ দিয়া স্বর বাহির করিতে আপনাদের ন্যায় দেহীর যেরূপ কষ্ট হয়, আপনার সহিত কথা কহিতেও আমার ততোধিক কষ্ট হইতেছে জানিবেন। অতএব আমার প্রার্থনাটা একবার আপনি শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবেন।”

আমি বলিলাম—“তোমার প্রার্থনা শুনিবার পূর্ব্বে আমি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আশা করি তুমি উত্তর দানে বঞ্চিত করিবে না।”

কৃপানাথ বা প্রেতমূর্ত্তি বলিল—“আপনি যদৃচ্ছা প্রশ্ন করিতে পারেন কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এরূপ ভাবে থাকিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। যত শীঘ্র ও সংক্ষেপে পারেন শেষ করিয়া লইয়া আমার প্রার্থনা শুনুন।”

আমি তখন তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সদুত্তরও পাইয়াছিলাম। যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে ভাল স্মরণ নাই ; তবে যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিব, আর বলিব না সেই কথাগুলি—যে সকল কথা কাহারও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। কারণ সে সকল কথা বড় অস্পষ্ট ও অস্ফুট,

আজিও আমি তাহার প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারি নাই এবং সেই জন্যই তাহা প্রকাশ করিতে বাসনা নাই।

কবে, কোন্ তারিখে, কখন, কোথায়, কৃপানাথের মৃত্যু হইয়াছিল কে তাহার চিকিৎসা করিয়াছিল, সামান্য ক্রটিসত্ত্বেও সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়াছিলাম। মৃত্যুর পর তাহার কি ঘটিয়াছিল ও এখন কিরূপ অবস্থায় আছে সেই সকল সম্বন্ধেও কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছিলাম; তাহারও উত্তর পাইয়াছিলাম কিন্তু সেই সকল উত্তরের মধ্যে কতকগুলি সংলগ্ন ও কতকগুলি অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে গুলি অসংলগ্ন ছিল তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য বুঝাইতে বলিয়াছিলাম কিন্তু সেই প্রেতমূর্ত্তি তাহার কিছুই বিশ্লেষণ করিতে পারিল না।

আমি শেষে তাহার প্রার্থনা শুনিলাম। তাহার প্রার্থনার মধ্যে অনেক কথা হইতেই আমার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবার সূত্রপাত হইল। তাহার প্রার্থনার মধ্যে যে সকল কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই—অথবা যাহা ভুলিবার শক্তি পর্য্যন্তও আমার নাই —সেই সকল কথা এ স্থলে বলিব। আর ইহারই সহিত তাহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনাও মিশাইয়া মিলাইয়া বলিব। যখন প্রতি প্রশ্ন ও উত্তর ঠিক্ স্মরণ হইতেছে না, তখন এইরূপ উপায়ই আমি প্রশস্ত জ্ঞানে, তাহার কথা বর্ণনা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রেতমূর্ত্তি বলিল—"আমার মৃত্যুর পর কাহারা যেন আমায় কোথায় উধাও করিয়া লইয়া গেল—তাহারা এক প্রকার প্রাণীবিশেষ বলিয়াই বোধ হইল। যে যে স্থানের মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া যায় তাহার বর্ণনা করিয়া মানুষকে বুঝান আমার অসাধ্য। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে কোন কোন স্থানে যাইতে যাইতে এত অধিক মাত্রায় উত্তাপ পাইয়াছিলাম যে তাহা সহ্য করা মানবের পক্ষে সাধ্যাতীত। বলা

বাহুল্য আমি তখন দেহী নহি। আবার এমন শীতসমাচ্ছন্ন প্রদেশ দিয়া লইয়া গেল, যে তাহাও গুরুতর অসহ্য। ক্রমে আমি যে স্থানে উপনীত হইলাম, তাহা একটা বিচারালয় বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। তাঁহাদের সঙ্কেত বা ভাষা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহারা যে শান্তদর্শন ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি যেন অপরাধীর ন্যায় তথায় দণ্ডায়মান ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা যেন আমার প্রতি কি এক আদেশ করিলেন। আমি পরে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে আমার নাস্তিকতার জন্যই আমি দণ্ড প্রাপ্ত হইলাম; তবে সে দণ্ডের একটা সীমা নির্দ্ধারিত আছে বলিয়া বোধ হইল। এখন জানি না কবে সেই দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইব। আমি এক্ষণে যে অবস্থাগ্রস্ত, এরূপ অবস্থাপন্ন প্রাণীও অনেক আছে। আমার এক্ষণে বিশ্বাস হইয়াছে যে শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়া সাধনে আমার মুক্তি লাভ হইতে পারে। আপনার নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যে আপনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া আমার পরিত্রাণ করুন। আমি আর এখানে স্থির থাকিতে পারিতেছি না। দাদা, আমার বড় কষ্ট, বড় কষ্ট,—

তীব্র স্বরে এই শেষ কথা বলিতে বলিতে সেই মূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল। বুদ্‌বুদ যেমন জলে মিলাইয়া যায়, তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যরূপে দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি বায়ুতে মিশাইয়া গেল। আমি তখনও বসিয়া রহিলাম। আমার এত দিনকার মানসিক দৃঢ়তা যেন শিথিল হইয়া আসিল। হৃদয় মধ্যে একটা গুরুতর আন্দোলন স্রোত বহিতে লাগিল। তখন অনুবাদ কার্য্য স্থগিত রাখিয়া আমি মানসিক বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া, হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। আমার সাহস, তখনও আমাকে প্রবল ভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল বটে

কিন্তু পূর্ব্বেকার মত আশ্বস্ত করিতে পারে নাই। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া উঠিলাম; উঠিয়া আলো লইয়া বাহিরে আসিলাম। তখন মনের অবস্থা বড় চঞ্চল। এমন সময়ে বাড়ীর সকলে কালীঘাট হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আমি দ্বার খুলিয়া দিলাম। সকলেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তখন আমি কাহারও নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিলাম না।

কিন্তু সে রাত্রি আমার ঐ চিন্তাতেই কাটিয়া গেল। আমার মনে ধর্ম্মভাব যেন ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিল; আমার শুষ্ক হৃদয় যেন কিয়ৎ পরিমাণে আর্দ্র হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা এতই সামান্য যে সে সময় কিছুমাত্র আমার উপলব্ধি হয় নাই। আমি তখনও মনে মনে নাস্তিকতারই পোষণ করিয়াছিলাম। এবং কাহারও নিকটে এ ঘটনা প্রকাশ করিব না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম।

যতবার আমি উক্ত ঘটনা প্রকাশ করিব না এবং উহার প্রার্থনা মত কার্য্যাদি করিব না বলিয়া মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম ততবারই প্রেত মূর্ত্তির সেই দৃশ্য—কৃপানাথের কাতর প্রার্থনা আমার মানস চক্ষে উদিত হইয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই পিতার নিকট সমস্ত না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবং আমারই উদ্যোগে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থায়, প্রেতাত্মার মুক্তি সাধনোদ্দেশে ক্রিয়াকলাপ সাধিত হইল।

এইরূপে তখন হইতেই আমি ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমি তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হইয়াছি। এবং আমার মনে এখন নিয়তই এই কথা উদয় হয় যে—যে, যেরূপ প্রকৃতির লোক ভগবানের কৃপা তাহাকে সেইরূপই শিক্ষা দিয়া থাকে। তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা আমার মত নাস্তিকের উদ্ধার-পথ নাই বলিয়াই

এই প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। কারণ আমি যেমন প্রেতাত্মাদিসম্বন্ধে দারুণ অবিশ্বাসী হইয়া, পরে নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তেমনি আমারই কালপ্রাপ্ত সহোদর যে আমাকেই অনুকরণ করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিতেছিল, ভগবানের অসীম দয়া, অভাবনীয় ঘটনাচক্রে ফেলিয়া, তাহার ও আমার উদ্ধারের পথ বোধ করি এক দিনেই মুক্ত করিয়া দিলেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পর অদ্যাবধি আমার সেই সহোদরের প্রেতাত্মার পুনঃ সাক্ষাৎ লাভের জন্য, তাহার বিষয় লইয়া অনেক চিন্তা করিয়াছি কিন্তু তাঁহার দেখা আর পাই নাই বলিয়াই আমার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে।

শ্রীরসময় লাহা।

আসিতে বলনা তায়।

১

দূরে সে রয়েছে কেন? আসিতে বলনা তায়,
অতৃপ্ত আঁখির জল, ধীরে যে মিশায়ে যায়,
দূরে শুধু তমোরাশি,
বিরহের ক্ষীণ হাসি,
নিকটে যে মৃদু মৃদু বহিছে মলয় বায়,—
দূরে সে রয়েছ কেন? আসিতে বলনা তায়!
দূরে দেখি অনিবার,
গরজিছে পারাবার,
হেথা বহে মন্দাকিনী সুখ-পারিজাত-ছায়,—
দূরে সে রয়েছে কেন? আসিতে বলনা তায়।

২

দূরে সে রয়েছে কেন ? আসিতে বলনা তায়,
অতৃপ্ত আঁখির জল ধীরে যে মিশায়ে যায়,
দূরে যে শুধুই ব্যথা,
বিষাদ-যাতনা গাথা,
হেথা যে মাধুরী রাশি ফুটে উঠে পূর্ণিমায়,—
দূরে সে রয়েছে কেন ? আসিতে বলনা তায়।
দূরে যে নাহিক কূল,
সেথায় ফোটেনা ফুল,
হেথা যে সকলি হেরি নিশিদিন মধুময়,—
দূরে সে রয়েছে কেন ? আসিতে বলনা তায়।

৩

দূরে সে রয়েছে কেন ? আসিতে বলনা তায়,
অতৃপ্ত আঁখির জল ধীরে যে মিশায়ে যায়,
দূরে নাহি শশী, তারা,
সকলি আপনা হারা,
হেথা দেখি চারিদিক পূর্ণ তার মহিমায়,—
দূরে সে রয়েছে কেন ? আসিতে বলনা তায়।
দূরে সে যে শুধু একা,
কারো সনে নাহি দেখা,
হেথা যে আকুল প্রাণ তারি তরে জেগে রয়,
কেন সে রয়েছে দূরে ? বারেক শুধাও তায়।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

প্রেমিকের পত্র।

একদিন মনে হইয়াছিল তোমায় নিকট গিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইব, তোমার রূপ কেমন—কিন্তু ভয় হইল তুমি বিদ্যুল্লতা—"রমে আঁখি মরে নর তাহার পরশে"—তাই দূরে থাকিয়া খেদ মিটাইয়া তোমায় দেখি। যখনই অবসর পাই একদৃষ্টে তোমার পানে চাহিয়া রূপসুধা পান করিতে থাকি। শুনিয়াছি চকোর শশধরের সুধাপান করিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তি করে, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা অতৃপ্ত রহিয়াছে কেন? যাই তুমি আমার পানে চাও অমনি আমি অপরাধীর ন্যায় চক্ষু ফিরাইয়া লই। আমি কি অপরাধী? রূপসীর রূপ দেখিলে কি লোকে অপরাধী হয়? রূপত দেখাইবার জন্যই। কত অপ্সরা কোন নিবিড় কাননে বা তপোবনের বিরল কুটীরে থাকিতে পারে, কে তাহাদের সন্ধান লয়? শকুন্তলার রূপ দুষ্মন্তের গোচর না হইলে কে আজ শকুন্তলাকে রূপসী বলিয়া চিনিত? শ্যাম-নিকষে কষিত রাধার রূপইত তপ্তকাঞ্চনাভ। শ্যাম যদি রাধাকে না দেখিত, তবে গোপীবৃন্দ হইতে রাধার এরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ; রাইকিশোরীর রূপ অলক্ষিতেই লয় পাইত। তাই বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বা শ্যামসুন্দর রাধাকে দেখিয়া কি অপরাধী? সমাজের কথা ছাড়িয়া দাও—সমাজ হৃদয়হীন। অপর কেহ সেই অবস্থায় পড়িলে কি ঠিক্ সেইরূপই করিত না? তুমি শুধু আমায় দোষী সাব্যস্থ কর কেন? শুধু কি আমিই তোমার রূপের পক্ষপাতী—আমিই কি একলা রূপোন্মত্ত? যখন তুমি বাগানে প্রভাত সমীর সেবন কর তখন মধুকরগণ মকরন্দ লোভে তোমার প্রস্ফুটিত গোলাপলাঞ্ছিত সুকোমল কপোল সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়

কেন? বিহঙ্গমকুল কলধ্বনি করিয়া তোমায় প্রীতি সম্পাদন করে কেন, আবার কেহ কেহবা কুলায় ত্যাগ করিয়া সুপক্ক বিম্বভ্রমে তোমার ওষ্ঠের নিকট উড়িয়া আসে কেন? মরালকুল তোমার অলক্তক রঞ্জিত চরণযুগল কমলযুগল ভ্রমে বেষ্টন করিয়া রহে কেন? নৈশ-গগণে শারদচন্দ্রমা তোমার অকলঙ্ক মুখশশী দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া মেঘান্তরাল হইতে মুখ বাড়ায় কেন? অথবা উহারা সকলেই রূপের পক্ষপাতী। তোমার রূপ আছে তাই তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি, এবং না দেখিলে কি যেন কি একটা অভাব বোধ করি। লোকে বলে তুমি সুন্দরী; শুনিয়া আমার কষ্ট হয়, মনে হয় সৌন্দর্য্যই ত যত ক্ষোভের মূল, যত অসুখের কারণ। কে কবে সুন্দরীর সুখের কাহিনী শুনিয়াছে? রাধিকা সুন্দরী, কিন্তু তার বিরহ গাথা আজও আমাদের মর্ম্মে গাঁথিয়া আছে। হেলেনার সৌন্দর্য্যই দেশব্যাপী মহাযুদ্ধের কারণ। রাজ্ঞী জোসেফাইন, মেরি ষ্টুয়ার্ট, ক্লিওপেট্রা সকলেই সুন্দরী; কুন্দ, রেবেকা, রোহিণী, সূর্য্যমুখী, শকুন্তলা সকলেই সুন্দরী, কিন্তু কেহ কি সুখী ছিলেন? বরং তাহাদের পরিণাম চিন্তা করিলে তোমার সৌন্দর্য্যে বিষাদের ছায়া পড়ে।

তবে কি আমি তোমার গুণের এত পক্ষপাতী। কমলমণির রূপ অপেক্ষা গুণে আমরা আকৃষ্ট হই বটে। বল বল কি গুণে আমায় মুগ্ধ করিয়াছ? ছেলে বেলা আমরা এক সঙ্গে খেলা করিতাম বটে, কিন্তু তখন কি তোমার গুণের প্রতি লক্ষ করিতাম? কই মনে পড়ে না ত। একদিন আমি একটী পক্ষীশাবক ধরিয়াছিলাম, তুমি কত সাধ্যসাধনা করিয়া উচ্চ গৃহচূড়ে তাহার বাসায় তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলে। আর একদিন আমি বাল্যস্বভাবসুলভচপলতা বশতঃ তোমায় ফেলিয়া দিয়াছিলাম। বিশেষ আঘাত লাগিলেও এবং

তোমার গুরুজনেরা বার বার তোমার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও তুমি পুনঃ পুনঃ 'কিছু হয় নাই' বলিয়া তাঁহাদিগকে ভুলাইয়াছিলে। আরও কত কি ঘটনা কিছুই মনে হয় না কিন্তু তাহাতেই কি মুগ্ধ হইয়াছি? সে ত বহু দিবসের কথা। তারপর কতদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তোমায় আমায় কতদূর ব্যবধান ছিল। প্রথম তোমার নিকট হইতে অন্তর হইয়া মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছিল বটে কিন্তু কালে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম। না না একেবারে ত ভুলি নাই। যখন বিদেশে গভীর নিশীথে হঠাৎ কি-জানি-কেন ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতাম বাহ্য জগৎ ঘুমাইতেছে, প্রকৃতি পূর্ণচন্দ্রের কিরণ মাখিয়া হাসিতেছে আর কখনওবা দূরাগত অস্ফুট বীণাধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে। তখন সেই আলোকময়ী মাধুরীমালায় হৃদয় পূর্ণ হইত, আর কবে তুমি নিশীথ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আমায় সুমধুর গান শুনাইয়াছিলে তাহার নীরব তান প্রতি শিরায় শিরায় ঝঙ্কার করিত। আর এক জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা নিশীথে তুমি বলিয়াছিলে যে চাঁদের পানে আমরা উভয়েই চাহিয়া থাকিলে, যেখানেই থাকি না কেন আমাদের পরস্পর দেখা হইবে। কই, কতদিন চাঁদের পানে চাহিয়া তোমার সেই বালিকাসুলভ কথা স্মরণ করিয়া চাঁদে তোমার মুখ দেখিবার প্রয়াস করিয়াছি। কিন্তু হায়, উজ্জ্বল হইলেও চাঁদ ত আর দর্পণ নয়—শীত জোৎস্নার দীপ্ত উৎস মাত্র। যাক্ বহু দিন পরে হঠাৎ একদিন তোমায় দেখিলাম। যেখানে দেখিলাম সেখানে তোমার স্বপ্নেও আসা সম্ভব মনে করি নাই। কিন্তু তোমায় দেখিয়া চকিতের ন্যায় কি এক ভাব মনোমধ্যে উদয় হইল। পূর্ব্বের স্মৃতি পরম্পরা জাগিয়া উঠিল, মনে করিলাম ছুটিয়া গিয়া তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু চরণ চলিল না। চরণ চলিলেও বচন স্ফুটিত কিনা

সন্দেহ। তোমার মুখের দিকে তাকাইতে সাহস হইল না—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড পানে কে চাহিতে পারে? কি জ্যোতিঃ—কি মধুরে প্রাখর্য্য। আর সে আনতনয়ন ভূন্যস্ত দৃষ্টি নাই। আর সে কিশোরীর তরুণ অরুণ কান্তি নাই। এখন বাক্যের চপলতা ও অঙ্গের চাঞ্চল্য অপেক্ষা তোমার আঁখির কুটিলতায় ভয় হয়। ঐ আঁখিই ত যত অনিষ্টের মূল; ঐত "মরমে কেটেছে সিঁধ, নয়নের কেড়েছে নিদ"। এখন এই ভগ্ন হৃদয়ের তুমি একটা প্রতিবিধান করিতে পার কি?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

কাগজের ফুল।

তুচ্ছ এক কাগজের ফুল
নিয়ে বাছা কত কি খেলাস্!
ফুলটিরে বুকেতে ধরিয়ে
শতবার আসিস্ ধাইয়ে
শতবার আমারে দেখাস্।
কি সুষমা অবাক্ নয়নে
'দেখিস্ যে আপনার মনে
কিছুতে মেটে না যেন আশ্।
কত কথা কস্ আধস্বরে
হাসি ফোটে গোলাপী অধরে
মৃদুহেসে মুখ পানে চাস্।

কি শোভা আছে রে ওই ফুলে
যা' দেখে গেছিস্ তুই ভুলে
　　হৃদয়েতে আনন্দ উচ্ছ্বাস্।
যে সুষমা জাগিছে অন্তরে
কি করে যে বুঝাবি আমারে
　　যেন তুই ভাবিয়া না পাস্।
তাই যেন আকুলি বিকুলি
সুকুমার হাত খানি তুলি
　　বুঝাবারে করিস্ প্রয়াস।
আমি যেন বুঝিতে পারিলে
ফুলটীর সৌন্দর্য্যে ভুলিলে
　　তুই যেন আরো সুখ পাস্।
তোরে ফেলে তোর ফুলটীরে
ভালবাসি নিমেষের তরে
　　এই যেন মনো অভিলাষ্।
ফুলটীতে পড়ে আছে প্রাণ
জগতের সৌন্দর্য্য মহান্
　　ওই ফুলে জাগ্রত বিকাশ্।
ছুঁইব না ফুলটীরে তোর
দেখে শুধু হইব বিভোর
　　দেখে শুধু পাইব উল্লাস্।
এই তোর মনের বাসনা
বুঝাইতে কতই ছলনা
　　কত কথা হৃদয়ে জাগাস্।

কি অসীম সুষমা যে তোর ওই ফুলে রাজে
যা' হেরি নিমেষ-হারা চটুল নয়ন ;
করেছিস্ হৃদয়েরে প্রতিহাসি ব্যবহারে
তোর ওই প্রতিভাবে পুলকে মগন।
আছে কি তা সুরপুরে তোর আধ আধ সুরে
যে অমিয় ধারা বহে জুড়ায় জীবন,
তোর হাসি তোর ভাষা নয়নে ভাবের নেশা
খুলে দিয়ে কবিতার সুধা প্রস্রবণ।
সুকুমার ওষ্ঠাধরে উজলিতে হাসিটীরে
তোরি কপোলেতে জাগে সস্নেহ চুম্বন,
স্নেহাশ্রু নয়নে ফুটে অজস্র ধারায় ছুটে
শিরোপরে আশীর্ব্বাদ করে বরিষণ।
সমস্ত জগৎ ভুলে কাগজের তুচ্ছ ফুলে
মুগ্ধ হয়ে রয়েছিস্ তুইরে যেমন,
তোরে নিয়ে বুকে তুলে আমিও সর্ব্বস্ব ভুলে
তোর ওই ভাব হেরি মানস মোহন।
লাবণ্য ঝরিয়া গেলে তোর পরশনে
জানি ফুল দিবিরে ফেলিয়া ;
দু'দণ্ডের পরে ওরে ছিন্ন ভিন্ন করি
নাচিবিরে চরণে দলিয়া।
তোর এ মুহূর্ত্ত যেন অনন্ত হইয়া
শোভা সার রয়েছে মগন
তাই তোর চন্দ্রানন হয়েছে উজ্জ্বল
স্তিমিত ও নক্ষত্র নয়ন।

এ মুহূর্ত্তে তোর ফুলটীরে, যদি কেহ এসে কেড়ে লয়;
সমস্ত জগতে যেন তোর, ঘটিবেক মহান্ প্রলয়।
গ্রহতারা যাইবে খসিয়া, রবি শশী পাইবে বিনাশ;
চূর্ণ হয়ে পড়িবে ভাঙ্গিয়া, ধরাতলে অসীম আকাশ।
হাসি হবে বিষাদ বিলীন, ঠোঁট দুটী উঠিবে ফুলিয়া;
বারিধারা ছুটিবে নয়নে, হাহাকার হৃদয় ভেদিয়া।
এই বেলা ফুলটীরে তোর, কেড়ে নিলে ফেটে যাবে বুক;
দুদণ্ডের পরে কিন্তু তুই, চরণে দলিয়া পাবি সুখ।
তুচ্ছ এক ফুল গুচ্ছ লয়ে, বাছা তুই কত কি খেলাস্;
তোর ওই প্রতিহাবভাবে, কত ভাব হৃদয়ে জাগাস্।

শ্রীরসময় লাহা।

স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার।

প্যারিচরণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার কোনও উপায় নাই। তাঁহার কাহিনী সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত গ্রন্থাদি দৃষ্ট হয় না; আর পূজ্যপাদ মাতামহ মহাশয়ও আত্মজীবনবৃত্তান্ত কিছুই রাখিয়া যান নাই। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

প্যারিচরণের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া গ্রামে। তথা হইতে ইংরাজী ১৭৯১ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতামহ শিবরাম সরকার কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়েন। তিনি চোরবাগানে একখানি বাটী ক্রয় করিয়া বাস করিতেন। শিবরামের দুইটী পুত্র, তারিণিচরণ এবং ভৈরবচন্দ্র। প্যারিচরণ, ভৈরবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র।

ইংরাজী ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ২৩এ জানুয়ারী কলিকাতা নগরে

প্যারিচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যখন শিক্ষাপযোগী বয়স হয় তখন হেয়ার প্রমুখ মহাত্মাগণ বঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। তিনি হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ প্রতিভা-বলে সকলের, বিশেষতঃ হেয়ার সাহেবের, দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। পরিশ্রম ও স্মরণশক্তির প্রভাবে তিনি প্রত্যেক শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্য স্থান অধিকার করিতেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন— 'The child is father of the man.'

এখনকার স্থায় তৎকালে বিএ, এম, এ পরীক্ষা ছিলনা। তখন মুখস্থ বিদ্যার আদর ছিলনা। সেই সময় প্রতিভা ও জ্ঞান দেখিয়া বিদ্যার পরিমাণ করা হইত। সেই কারণেই তৎকালীন মহাত্মাগণ বিশুদ্ধ বিদ্যালাভ করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আর আজকাল কে কত কণ্ঠস্থ করিতে পারে সেই বুঝিয়া প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাণ করা হয়।

তখন 'সিনিয়র' ও 'জুনিয়র' নামক দুইটী পরীক্ষা প্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল। তাহা আধুনিক সকল পরীক্ষা অপেক্ষাই সর্ব্বাংশে কঠিনতর ছিল। অতি অল্প ব্যক্তিই ঐ দুইটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া ধীমান প্যারিচরণ সেই সিনিয়র পরীক্ষা দেন ও স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে তাহাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

তৎকালে লাইব্রেরী পরীক্ষা নামে সিনিয়র পরীক্ষাপেক্ষাও কঠিনতর একটী পরীক্ষা ছিল। সেই পরীক্ষা দিতে হইলে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতে হইত। তাহাতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতেন তাঁহাদিগকে 'লাইব্রেরী স্কলার' নামে অভিহিত করা হইত। বঙ্গ

দেশে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত তিন জন মাত্র ঐ লাইব্রেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ; প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও প্যারিচরণ সরকার।

পাঠ শেষ করিয়া তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সর্ব্বপ্রথম তিনি হুগলি শাখা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্থলে নিযুক্ত হইয়া উক্ত স্থানে গমন করেন। তাঁহারাই শিক্ষকতা গুণে বারাসত বিদ্যালয় বঙ্গের একটী প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারই যত্নে বারাসাতে একটী ছাত্রনিবাস ও একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা, ও দাক্ষিণ্যগুণে বারাসাতের আবালবৃদ্ধবনিতা এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে তিনি যখন বারাসত পরিত্যাগ করিয়া আসেন, তখন সকলে ব্যথিত হইয়া রোদন করিয়াছিল। তৎপরে তিনি হেয়ারস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়া বারাসত হইতে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার যত্নেই হেয়ার স্কুল, বঙ্গের যাবতীয় বিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করে। হেয়ারস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যাধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। জনসাধারণ এতদিনে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। প্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছেন 'It was a sight to see him explain the most difficult passages in prose and poetry, illustrated by classic allusions and anecdotes. গ্রন্থাদি হইতে গল্পাদি উদ্ধৃত করিয়া তৎসাহায্যে তাঁহার শিক্ষা প্রদান দিবার প্রণালী এতসুন্দর ছিল যে ছাত্রগণ তাঁহার প্রত্যেক বাক্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত।

ছাত্রদিগকে তিনি বন্ধুর চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার স্নেহগুণে অতি কর্কশ প্রকৃতিও কোমল হইয়া যাইত। যে একবার মাত্র তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত সে তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তিনি ছাত্রদিগকে যেমন স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, ছাত্ররা আবার তাঁহাকে তেমনই ভালবাসিত।

কেবল বিদ্যালয়ের কার্য্যকেই তিনি তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। বিদ্যালয়ের মধ্যে যেরূপ, বাহিরেও তিনি ছাত্রদিগকে সেইরূপ দৃষ্টিতে রাখিতেন। তিনি বঙ্গদেশে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অনেক দরিদ্র বালককে সরকারী বিদ্যালয়ের ব্যয় সংগ্রহে অসমর্থ দেখিয়া তিনি তাঁহার আবাস বাটীর সান্নিধ্যে একটী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ব্যতীত স্ত্রীশিক্ষা মানসে তিনি চোরবাগানে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বহু দরিদ্র বালককে তিনি অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রদানে সাহায্য করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মাতামহ মহাশয়ের প্রথম হইতেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষয়কীর্ত্তি বিধবা-বিবাহ-প্রচারের ইনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যাসাগরপ্রমুখ অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সর্ব্বদাই ইঁহার বাটীতে আসিয়া বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। একদিন সুকুমারমতি শিশুদিগের বিদ্যালাভের বিষয় প্রশ্ন উঠিলে স্থির হয় যে প্যারিচরণ সরকার মহাশয় ইংরাজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের প্রথম পাঠ্য কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক রচনা করিবেন; আর বিদ্যা-সাগর মহাশয় বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের উপযোগী কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিবেন। এই সদ্যুক্তিপূর্ণ

মহৎ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়া, বর্ণপরিচয়াদি ও ফার্ষ্টবুক্ প্রভৃতি রচিত হইয়া, বঙ্গবাসীর যে অশেষ উপকার সাধন করিতেছে তাহা বঙ্গবাসীর শোণিতে শোণিতে চিরকাল গ্রথিত থাকিবে।

আর এক ক্ষেত্রে প্যারিচরণ যে মহৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। যখন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে, অনুকরণপ্রিয় বঙ্গীয় যুবকগণ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া সুরাপানে উন্মত্ত হইতে লাগিল তখন প্যারিচরণই সেই ভীষণ অনুকরণ-স্রোতঃ ফিরাইবার মানসে বঙ্গীয় মাদকনিবারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালীন দেশ-মুখোজ্জ্বলকারী অনেক প্রসিদ্ধ সন্তানগণ ও সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ইয়ুরোপীয়-গণ কায়মনে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সভা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎপ্রতি এক্ষণে দেশের বড় লোকগণ বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন না। ঐ মাদক-নিবারিণী সভায় যথেষ্ট উপকারও সাধিত হইয়াছিল। তখন নব্যযুবকদিগের মধ্যে সুরাপান যত প্রচলিত ছিল, এখন আর তত নাই। ঐ সভা হইতে তিনি 'Well-Wisher' নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা ও 'হিত-সাধক' নামক একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন।

প্যারিচরণ অসাধারণ দাতা ছিলেন। তিনি বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থ ও বস্ত্রাদি দানে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ বঙ্গে শ্মশানের অভিনয় করিয়াছিল সেই মন্বন্তরের সময় যতদিন সামর্থ্য ছিল ততদিন কত লোককে যে তিনি গ্রাসাচ্ছাদন দিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে স্বকীয় আবাস বাটী ব্যতীত তাঁহার সমুদয়ই গিয়াছিল।

আমরা এ ক্ষেত্রে প্যারিচরণের সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্তের একটী দৃষ্টান্ত দিব। যখন তিনি 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক ছিলেন,

সেই সময়ে একবার পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলওয়েতে ১২৬৮ খৃঃ অব্দে শ্যামনগর ষ্টেশনের নিকট রেল-সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। সরকারী বিবরণীতে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যল্পমাত্র বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। প্যারিচরণ কিন্তু স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যথাযথ মৃত ব্যক্তিগণের সংখ্যা দেন। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর প্যারিচরণকে উক্ত লেখা পরিহার করিতে অনুরোধ করেন। দৃঢ়সত্য প্যারিচরণ সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিন শত টাকা বেতনের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন !!

প্যারিচরণ মাতৃভক্ত ও পুত্রবৎসল ছিলেন। তিনি যখন রোগশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্যারিচরণ সেই পুত্রের ফটোগ্রাফ বক্ষে ধারণ করিয়া এবং অশীতি বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা জীবিতা মাতার কথা স্মরণ করিয়া, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন।

ইংরাজী ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ৩০ এ সেপ্টেম্বর পরিবারবর্গ ও বঙ্গবাসীকে কাঁদাইয়া, পূজ্যপাদ মাতামহ মহাশয় লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশব্যাপী হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে অনুভব করিল যেন তাহাদের কোনও প্রিয় পরিজন অনন্তকালের জন্য তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে!

তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ শ্রবণ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ টনি সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত কলেজ, হিন্দু ও হেয়ার স্কুল বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার স্মরণচিহ্ন স্থাপনের জন্য অর্থসংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু সকল চাঁদার ন্যায়, তাহা অল্প দিনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমরা প্রকৃত গুণের আদর জানি না। তাহা যদি জানিতাম

তাহা হইলে কি আজ আমরা বিদ্যাসাগর, প্যারিচরণ, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিম প্রভৃতির তুচ্ছ আলেখ্য করিয়াই নিরস্ত থাকিতাম? ইঁহারা যে গৌরব রাখিয়া গিয়াছেন সত্য বটে তাহা অনন্ত। স্মৃতি-চিহ্নে উঁহাদের গৌরব বর্দ্ধিত হইত না—হইত বঙ্গবাসীর। জগৎ দেখিত বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নহে।

যেমন বিদ্যা ও দয়ার জন্য সেইরূপ বিশুদ্ধ নৈতিক উৎকর্ষের জন্য প্যারিচরণের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার সরল প্রকৃতি নম্রতা এবং মধুর চরিত্র গুণে জনসাধারণ মুগ্ধ হইত। স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন "He was one of the best fruits of English Education and those who are in the habit of denouncing the so-called godless system of state Education will do well to study the moral of the life of this excellent Bengali.

দাদা মহাশয়ের মৃত্যুর পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতুল শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সরকারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম ;—

My dear Bhooban Mohan,

I regret exceedingly that in the present state of my health, of which you are aware, I am unable to attend this evening's meeting of the Bengal Temperance Society. None knows better than yourself the profound grief with which the lamented death of my beloved friend Babu Peary Churn Sircar has filled

We knew each other from early youth and we were so closely attached that in him I have lost a dear and affectionate brother. To the public the loss cannot be easily replaced. His great ability, high character and single-minded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, while his devotedness to the cause of temperance which was manifested in the foundation of the Bengal Temperance Society, in the publication of my many valuable tracts in English and Bengali and in other acts, will doubtless be long cherished in grateful remembrance by all lovers and promoters of temperance in this country.

মৌখিক আলাপ।

(বন্ধনী অন্তর্গত চরণগুলি আন্তরিক ভাব।)

১

কি সৌভাগ্য আজ, সই দেখা দিতে,
এসেছ যে কত দিনের পরে;
আমিও পারিনি সমাচার নিতে,
(এল পেট ঠেসে খাবার তরে।)

২

আহা কি সুন্দরী, মেয়েরা তোমার
তুলি দিয়ে আঁকা ছবির প্রায় ;
কোলে নেবে ? নাও খোকারে আমার
(ঘেয়ো হাত দিলে বাছার গায়।)

৩

ছেলেরা তোমার গেছে বুঝি বাড়ী
বিদ্যাসাগরের ইস্কুল থেকে ;
আনিলে না কেন হেথা সঙ্গে করি ?
(মুটো মুটো পান্ পূরিছে মুখে।)

৪

কোলের মেয়েটী রেখে এলে ঘরে
কেন ছি, তোমার অন্যায় সবি ;
কত যে আদর করিতাম তারে
(সেতো শুধু এক মাংসের ঢিবি।)

৫

সয়া ভাল আছে বল বিনোদিনী,
এবার পূজায় তুমি কি নিলে ?
কাহারো বাড়ীতে খান্ নাক তিনি
(পান্‌টীও বেঁচে যেত সে এলে।)

৬

এস সই বস বল গো আমায়
হেমার বিয়ের কি গোল হল ?
আজ যেতে সখি দিব না তোমায়,
(বাঁচা গেল বুঝি পাল্‌কী এল।)

৭

সে কি সই সে কি এখনই যাবে,
এবার আসিয়ে থাকিবে বল ;
চল পাল্‌কীতে রেখে আসি তবে
(বাঁচা গেল পাপ বিদায় হল।)

৮

বিদায় বিদায় আসিয়ে এবার
মাথা খাও হেথা খেয়ে যেও সই।
(ওরে রামি, সই যেদিন আবার
আসিবে বলিস্ গিন্নি বাড়ী নাই।)

নেপোলিয়নের গল্প।

ফরাশিশ সম্রাট বীরবর নেপোলিয়ন বোনোপার্ট একদিন সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, দেখিলেন পথের ধারে একটী সুন্দরী রমণী একটী বালকের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। বালকটীর বয়স অনুমান পাঁচ বৎসর। সম্রাট ঘোড়া থামাইয়া স্ত্রীলোকটীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটী থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল কিন্তু কোন উত্তর দিল না, বালকটী বলিল, "মহাশয় বাবা মারিয়াছেন বলিয়া আমার মা অত কাঁদিতেছেন"। সুতরাং নেপোলিয়ন বালকটীকে তাহার পিতা কে এবং এখন কোথায় আছেন ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে তিনি সৈনিক, নিকটেই সম্রাটের মালপত্র পাহারা দিতেছেন।

নেপোলিয়ন পুনশ্চ স্ত্রীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া তাহার স্বামীর নাম জানিতে চাহিলেন কিন্তু সে বলিল না, ভাবিল আগন্তুক অশ্বারোহী নিশ্চয়ই সৈন্যাধ্যক্ষ, হয়ত আমার স্বামীকে শাস্তি দিবে। নেপোলিয়ন বলিলেন "দেখ, তোমার স্বামী তোমায় প্রহার করে এবং তুমি কাঁদিতেছ তবুও তাহার নাম বলিবে না, পাছে তাহার কোন অনিষ্ট হয়। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে তুমি নিজেও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী নও।

স্ত্রীলোকটী আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "হায় সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় আমার স্বামী সহস্র গুণের আধার কিন্তু দোষের মধ্যে তিনি বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত। যখন তাঁহার রাগ হয় তিনি কিছুতেই তাহা দমন করিতে পারেন না। তিনি আমার স্বামী, আমি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করি এবং এইটীই আমাদের পুত্র" এই বলিয়া সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে সস্নেহে বালকের মুখ চুম্বন করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ন এই সামান্য সাংসারিক অভিনয়ে বিশেষ ব্যথিতচিত্ত হইলেন। সাম্রাজ্যের সহস্র চিন্তাভার বহন করিলেও তিনি ক্ষণিকের তরে সে কষ্ট বিস্মৃত হইয়া এই সৈনিক সিমন্তিনীর নেত্রবারি ঘুচাইতে পারেন, তাই সদয় হৃদয়ে পুনশ্চ রমণীকে বলিলেন, শুভে তোমাদের উভয়ের ভালবাসা থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি যে তাহার মার খাইবে ইহা আমার অভিপ্রেত নয়, অতএব তোমার স্বামীর নামটী আমায় বল, আমি সম্রাটের নিকট এ ঘটনার উল্লেখ করিব এই কথা শুনিয়া রমণীর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল, সে দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল "ও কথা কি বলিতেছেন, আপনি নিজে সম্রাট হইলেও আমি বলিব না কারণ আমি জানি যে তাহা হইলে তাঁহার সাজা হইবে।"

নেপোলিয়ন শেষে বলিলেন "স্ত্রীলোক তুমি বড়ই নির্ব্বোধ, আমি স্বধু তোমার স্বামীকে তোমার প্রতি ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার এবং যত্ন করিতে শিক্ষা দিতে চাই"। অতঃপর তিনি নারীজাতির অবাধ্যতার বিষয় দুই একটী কথা বলিতে বলিতে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। স্বস্থানে ফিরিয়াই নেপোলিয়ন সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক, তাহার স্বামী ও বালকটীর বিষয় অনুসন্ধানে জানিলেন যে তাহার স্বামী একজন পদাতিক, সাহসী এবং সৎস্বভাব বিশিষ্ট কিন্তু বিনা কারণে স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধ। স্ত্রীর আদর্শনির্ম্মল চরিত্র।

নেপোলিয়ন সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন "আচ্ছা সে আমাকে কখনও দেখিয়াছে কিনা সন্ধান লও এবং যদি কখনও না দেখিয়া থাকে তাহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস"।

সৈনিকের বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর মাত্র দেখিতে অতি সুপুরুষ। নূতন সৈন্যভুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে সম্রাটকে কখনও দেখে নাই।

যথা সময়ে নেপোলিয়নের সম্মুখে আনীত হইলে, তিনি পরিচিতের

ন্যায় সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্ত্রীকে প্রহার কর কেন, সে অতি সুশীলা এবং সুশ্রী এমন কি তুমি তাহার স্বামী হইবার অযোগ্য। এরূপ স্বভাব বাস্তবিক ফরাশিশ গৃণেডিয়ারের পক্ষে বড়ই নিন্দনীয়।"

গৃণেডিয়ার প্রশ্ন কর্ত্তাকে সৈনিকদের অন্যতম অধিনায়ক মনে করিয়াছিল, এবং প্রশ্ন শুনিয়া স্থির করিল তাহার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় ইহার গোচরে আসিয়াছে, তাই আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে উত্তর করিল "স্ত্রীলোকের কথায় যদি প্রত্যয় করিতে হয় তবে তাহাদের নিজেদের দোষ কিছুতেই থাকে না। অপরের সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার স্ত্রীকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছি কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমার সঙ্গীদের কাহারও না কাহারও সহিত অনবরত গল্প করিতে দেখি"। "ঐটীই তোমার ভুল" নেপোলিয়ন বলিলেন "স্ত্রীলোকের মুখ বন্ধ করিতে চাও ঐটীই তোমার ভুল, তুমি নদীর গতি ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছ। আমার পরামর্শ শুন ওরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে চলিবে না, তোমার স্ত্রীকে কথা কহিয়া প্রফুল্ল থাকিতে দাও। যদি তাহার অভিপ্রায় মন্দ হইত তবে তাহার চিত্ত অত প্রফুল্ল না হইয়া বরং বিমর্ষ হইত সন্দেহ নাই। আমি ইচ্ছা করি যে তুমি স্ত্রীকে আর প্রহার করিবে না, যদি ইহার ব্যতিক্রম হয় তবে একথা সম্রাটের কানে উঠিবে। মনে কর স্বয়ং সম্রাট যদি তোমায় ভৎসনা করেন তুমি তাহা হইলে কি বলিবে?"

সৈনিক দেখিল তাহার স্ত্রী বড় কড়াচাল চালিয়াছে, যাহা হউক তাহার বৈবাহিক সম্বন্ধে এত কঠিন আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল "সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়, স্ত্রী আমার, এবং তাহাকে প্রহার করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। সম্রাট জিজ্ঞাসা

করিলে আমি বলিতাম যে আপনি শত্রুর প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আমার স্ত্রীকে শাসন করিবার ভার আমার"।

নেপোলিয়ন গ্রেণেডিয়ারের নির্ভীকতায় একটু হাসিয়া বলিলেন "পুরুষবর তুমি এখন স্বয়ং সম্রাটের সহিতই কথা কহিতেছ"।

কথাগুলি ইন্দ্রজালের ন্যায় সৈনিকের মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সে অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় হেঁট করিল, এবং ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল "সে কথা স্বতন্ত্র, স্বয়ং সম্রাট যখন আজ্ঞা করিতেছেন দাস পালন করিতে বাধ্য।"

সম্রাট উত্তর করিলেন "বেশ হইয়াছে, আমি তোমার স্ত্রীর সচ্চরিত্রতার বিষয় অবগত আছি, সকলেই তাহার প্রশংসা করে, সে বরং আমার ক্রোধভাজন হইয়াও তোমায় বিপদে ফেলিতে চাহে নাই, তাহাকে সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখিও। আমি তোমার পদোন্নতি করিলাম। কোষাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে তুমি পাঁচশত মুদ্রা পাইবে, ইহাতে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমার ছেলেটীও বেশ ভবিষ্যতে তাহারও কর্ম্ম হইবে, কিন্তু সাবধান স্ত্রীকে মারিও না, যদি মার তবে দেখিবে আমার মার আবার কিরূপ"।

তদবধি সৈনিক দম্পতী সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

আমি।

"আমি সকলের অগ্রে, কারণ মূর্খ, দরিদ্র, পাজি, জুয়াচোর হইলেও আমি First person বা উত্তম পুরুষ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম না থাকিলেও আমি পুরুষোত্তম। আর তুমি ধনী, জ্ঞানী, মানী এবং সৎ হইলেও মধ্যম পুরুষ বা Second person, অতএব আমার পরে। আর

"তিনি" ? তিনি ত আমাদের কাছে কল্কেই পান না, কারণ উপস্থিত নাই। তিনি মহারাজাধিরাজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সসাগরা ধরার অধিপতি হইলেও "third person" (ইংরাজি হিসাবে একেবারে অপদার্থ বরং বাঙ্গালা হিসাবে অপেক্ষাকৃত গৌরবান্বিত প্রথম পুরুষ শব্দবাচ্য)। আমার প্রাধান্য যে কেবল ব্যকরণ শাস্ত্রে এরূপ নহে। সমস্ত জগৎই "আমিময়"। শুধু তাই নয় আমার যাহা কিছু আছে সবতেই ভাল ; এই ধর চেহারা ; মৃগনয়ন, খঞ্জন নয়নের পরিবর্ত্তে মূষিক নয়ন হইলেও আমি সাক্ষাৎ পদ্মলোচন, চিনবাসীদিগের মত নাসিকার বহর হইলেও আমার বোধ হইবে ঈশ্বর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে আমাকে একটি বংশীইবা প্রদান করিয়াছেন (বংশীভ্রম হইবার কারণও আছে, যেহেতু নিদ্রাভিভূত হইলেই আমার নাসিকা হইতে মধুর ধ্বনি নির্গত হইতে থাকে, কোনও অতি বিশ্বস্ত লোকের মুখে এরূপ শুনা গিয়াছে)। আমি ঘামিলে পি, এম, বাগচির কালি হার মানিলেও আমার বোধ হইবে যে আমি এমনই বা কি কাল, গৌরবর্ণ না হইলেও, না হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কি মন্দ ? শ্যাম নাম ছিল বলিয়াই ত বাঙ্গালা কবিতার সৃষ্টি হইল, কালবামরূপী বাঁকা শ্যাম ভাগ্যে যমুনার জলে স্নান করিতেন তাইত উহার জল কাল হইয়া আজও কবির মনে ভাবের তরঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে। সে কালে শ্যামের জন্য যখন গোপীকুল আকুল হইয়া দুকুল হারাইয়া গোকুলে ছুটাছুটি করিত, তখন এহেন নবজলধর শ্যামকলেবর, সমতল নাশা, কোটর নয়নের কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া এখনকার সুন্দরী রমণীকুল লাঙ্গুলবিহীন সিকিতে ঘুড়ির ন্যায় কেন না লাট খাইবে ? (কি আপদ, "রমণীকুল লাঙ্গুল-বিহীন" পড়িল কে ?)। ম্যালভোলিও কেবল সেক্স্পীয়ারের কল্পিত জীব নহে, সংসারে ম্যালভোলিও প্রকৃতির লোক এমত অনেক দৃষ্ট

হইয়া প্রাপ্তে, যাঁহাদের প্রতি কোনও রমণী কৌতুক পরবশ হইয়া দুএকবার চাহিলেই, অথবা দয়াপরবশ হইয়া স্ত্রীজাতিসুলভ একটু যত্ন করিলেই, অমনি তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে ঐ রমণী তাঁহাদের প্রতি একান্ত আসক্তা। ক্ষুদ্র শিশু লজিক্ না পড়িলেও মহা তার্কিকের ন্যায় বুঝাইতে চেষ্টা করিবে "আমা পুতু, আমা জামা ভাল, তোল ভাল না" ইত্যাদি। ক্ষুদ্র শিশুর বয়স্ক পিতা মাতার ধারণা তাঁহাদের পুত্রের ন্যায় বুদ্ধিমান্ রূপবান্ এবং গুণবান্ পুত্র আর কাহারও জন্মে নাই, জন্মিবেও না। শিশু যদি বাটীর অন্য কোনও বালককে পড়িতে শুনিয়া স্বাভাবিক অনুকরণ শক্তি দ্বারা কবর্গ উচ্চারণ করিতে বা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণনা করিতে শিখিল, অমনি তাহার পিতা ঈষৎ গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ সহকারে পাড়ার সমস্ত লোককে অন্ততঃ একশত বার বলিবেন "আমার ছেলেটা ভারি চালাক, এত অল্প বয়সে এত সেয়ানা ছেলে প্রায় দেখা যায় না"। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহার পুত্র আছে তিনিও উত্তম পুরুষের বংশধরের প্রশংসা করিতে ছাড়িবেন না, বলিবেন "আমার ছেলেটাও ঐ রকম, এত কথা জানে আশ্চর্য্য"। আবার যদি কোনও উত্তম পুরুষের পুত্র বাক্‌পটু না হইয়া অল্প ভাষী হয় (অর্থাৎ যেরূপ হইলে অপরের পুত্রকে লোকে "বোকা" শব্দে অভিহিত করে) তাহা হইলেও উহার পিতা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে এত অল্প বয়সে যখন এত গম্ভীর ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ না হইয়া যায় না। আমি যে শুধু রূপে কার্ত্তিক এরূপ নহে, কার্ত্তিক ত বটেই, তবে সভ্য রকমের, যেহেতু ময়ুর চড়িলে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার হয় এই ভাবিয়া, এবং পাছে উহাকে কেহ কোনও বৃহৎ জাতীয় বিলাতী মোরগ বিশেষ ভাবিয়া খাইয়া ফেলে এই ভয়ে আমি দ্বিপদ ময়ূরের বদলে বাইসিকল্ বা দ্বিচক্র যানকে বাহন

করিয়াছি। আমি শুধু রূপে কার্ত্তিক নহি, বলে ও সাহসে সাক্ষাৎ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, (সার্ জন্ ফল্‌স্‌টাফ্ বলিলেই ভাল হইত)। কি বলিব ইংরাজরাজ আমাকে ভলন্টিয়ার করে না, নতুবা দেখাইতাম ভুজবলে হিমাচল এবং সীমান্ত প্রদেশস্থ পার্ব্বত্য আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিকে কিরূপে রসাতলে প্রেরণ করা যায়। আমি চক্ষু মুদিয়া কেবল মাত্র চারি হস্ত পরিমিত পাঁকাটি দ্বারা চীনে পটকার বাণ্ডিলে অগ্নিসংযোগ করিয়া মোটে দশ হস্ত পিছাইয়া নির্ভয়চিত্তে দণ্ডায়মান থাকি। আমি দিনের বেলা ভূতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া ঘোরতর তর্কবিতর্ক করি, আর রাত্রিতে অন্ধকার হইলেই একটু গা ছম্ ছম্ করে বটে কিন্তু সে ভয়ে নহে, মহাকবি সেক্ষপীয়ের এই কথা স্মরণ করিয়া "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy! আমাদের দর্শন বিজ্ঞান যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে না এরূপ অনেক জিনিষ এই বিশ্বে থাকিতে পারে, এ অবস্থায় ঘোর অমাবস্যা রাত্রিতে বৃক্ষের ছায়া বা বিড়াল দেখিলে, অথবা বিকট "বল হরি হরিবোল" রব শ্রবণ করিলে কোন্ বীর-হৃদয় না ঈষৎ বিচলিত হয়? আমি কেঁচো মারিয়া লোককে বলি অতি বৃহৎ এক কেউটে সাপ জুতার আঘাতে হত করিয়াছি, বিদেশ হইতে বাটী ফিরিবার সময় ব্যাঘ্রচর্ম্ম ক্রয় করিয়া আনিয়া বাটিতে বলি, ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছি এবং কিরূপে উহা শিকার করিলাম তাহার কলেবর-কণ্টকিত-কারী কাল্পনিক বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে স্তম্ভিত করি। তাই বলিতেছিলাম আমি অতিরঞ্জিত আত্মবিক্রম প্রকাশে সাক্ষাৎ সার্ জন্ ফল্‌স্‌টাফ্।

আমার রূপ গুণ সৌর্য্যবীর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেন। আত্ম-প্রশংসা নিন্দনীয়, অথচ অল্পাধিক আত্মপ্রশংসা করেন না এমন লোক

সংসারে নাই বলিলেই হয়। জুলিয়স্ সিজার বলিতেন তিনি তোষামোদ ভালবাসেন না, অথচ অপর কোনও ব্যক্তি যখন তাঁহাকে বলিত "আপনি তোষামোদ ঘৃণা করেন" তখন তিনি সন্তুষ্ট হইতেন এবং বুঝিতেন না যে ঐ কথা বলাতেই তাঁহার তোষামোদ করা হইত। জগৎই যখন "আমিময়" তখন আমার দোষ কি? তবে কি তুমি কেহ নও? বলিয়াছি ত তুমি মধ্যম পুরুষ অতএব আমার পরে, আমার সুখ স্বচ্ছন্দ সর্ব্বাগ্রে তাহার পর তোমার, ইহাই সংসারের নিয়ম। মাঝে মাঝে কবি অথবা প্রেমিকের মুখে নিস্বার্থ ও আমিত্বশূন্য ভালবাসার কথা শুনা যায় বটে কিন্তু মধুর কল্পনা রাজ্যে ও কঠোর সত্য রাজ্যে অনেক প্রভেদ। কবি গাহিলেন—

"একটি চেতনা শুধু জাগি রবে অনিবার,
সে চেতনা 'তুমিময়' ওই মিষ্ট হাসিময়।"

এই আমিময় সংসারে "তুমিময় চেতনা" অতি মধুর, অতি স্বর্গীয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতেও আত্মসুখ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। "ওই মিষ্ট হাসিময়" চেতনায় আমার সুখ, তাই আমি সমস্ত ভুলিয়া তোমার ঐ হাসিময় মুখখানি অবিরত ধ্যান করিতে প্রস্তুত। ঐ মিষ্ট হাসিময় সুন্দর মুখ খানির পরিবর্ত্তে কুৎসিৎ ক্লেশপীড়িত দুঃখাশ্রুপূর্ণ মলিন মুখময় চেতনা কয়জনের হৃদয়ে অনিবার জাগিয়া থাকে? সুন্দর বস্তুকে ভালবাসা কিছু শক্ত ব্যাপার নহে, অনেকে টেবিলের উপর কাচপাত্রে লাল মাছ রাখিয়া থাকেন, কিন্তু লাল মাছের পরিবর্ত্তে কোলা ব্যাং কেহ রাখেন কি? রূপসী তিলোত্তমাকে দেখিয়া জগৎ-সিংহ মোহিত হইলেন, তিলোত্তমাও সুপুরুষ জগৎসিংহকে দেখিয়া চিত্ত হারাইলেন। যাবতীয় নাটক বা উপন্যাস তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেও কুরূপা নায়িকাতে রূপবান্ নায়ক অথবা কুৎসিৎ নায়কে

স্বরূপা নায়িকা মজিয়াছেন এরূপ দেখা যাইবে না, নায়িকা যদি একে-বারে "আহা মরি" গোছের না হইয়া শ্যামাঙ্গী হয় তথাপি তাহার মুখশ্রী যে অতীব সুন্দর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবে কি নিস্বার্থ তুমিময় চেতনা সুধু কবির কল্পনা? কেহ হয় ত বলিবেন মাতৃস্নেহের মত নিস্বার্থ তুমিময় চেতনা আর কিছুই নাই। মাতার স্নেহ অতি পবিত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু মাতা নিজের সন্তানকে যেরূপ চক্ষে দেখেন অন্যের সন্তানকে সেরূপ ভাবে দেখিতে পারেন কি? চারি পাঁচটি শিশু একত্রে খেলা করিতে করিতে যদি একটু বিবাদ বা সামান্য হাতাহাতি হয় মাতা নিজ পুত্রের দোষ দেখিয়াও দেখিতে পান না বলেন "বোসেদের ছেলেটা কি বজ্জাত আমার যাদু-মণিকে মারিল"। বোসেদের ছেলের কোনও দোষ না থাকিলেও সে "ছেলেটা বজ্জাত" আর নিজের ছেলের শত অপরাধ সত্বেও সে "যাদুমণি" "সোণার চাঁদ"। কিন্তু তাই বলিয়া কবির ঐ কল্পনা কখনই মিথ্যা নহে, মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাপুরুষ তুমিময় চেতনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান। ঐরূপ একটি মহাপুরুষের নাম—শাক্যসিংহ। রাজার পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্যসুখের অধিপতি পরের দুঃখে কাতর হইয়া অনায়াসে সমুদয় ত্যাগ করিলেন, জগতে "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" প্রচার হইল, ইহাতে আমিত্বের লেশ মাত্র নাই সমস্তই তুমিময়। পরের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, সুধু মনুষ্য নয়, পশু পক্ষী ক্ষুদ্র কীটাণুকীটের প্রতি হিংসা যিনি দেখিতে পারেন না তিনি যদি না দেবতা হন তবে কেহই দেবতাপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাই শাক্যসিংহের নাম বুদ্ধদেব। এই সার্ব্বজনীন প্রেমের নাম "তুমিময় চেতনা।" এই নশ্বর মানবজীবনে ইহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য আর নাই। এই বিশ্বপ্রেমে যিনি গলিয়া-ছেন কালস্রোত তাঁহার ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভাসাইয়া লইয়া গেলেও তাঁহার

অবিনশ্বর কীর্ত্তি লোপ করিতে সক্ষম হয় না। বুদ্ধদেব কত শত বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে প্রেম রাখিয়া গিয়াছেন এখনও জগতের লক্ষ লক্ষ লোক সেই সুধা পান করিয়া শান্তিলাভ করিতেছে, কালস্রোত যেমন অনন্ত সেই প্রেমস্রোতও সেইরূপ অনন্ত। এই অক্ষয় এবং মহৎ বিশ্বপ্রেমের মহিমা জানিয়া শুনিয়াও আমাদের স্বার্থ কলুষিত হৃদয়ে উহা রোপিত করিতে পারি না কেন? নিমেষের জন্য অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই কোথা হইতে আমিত্ব আসিয়া অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া দেয়, প্রবল স্বার্থ আসিয়া দুর্ব্বল হৃদয় অধিকার করে, আত্মোৎকর্ষে বাধা দেয়, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, সুধু আমার আমার করিয়াই অমূল্য মানব জীবন কাটিয়া যায়।

বুদ্ধদেবের এই পরহিত-ব্রত এক প্রকার তুমিময় চেতনা, স্বার্থই ইহার অন্তরায়। আর এক প্রকার তুমিময় চেতনা আছে, দারুণ বিষয় বাসনাই তাহার অন্তরায়। হে প্রভো, অনাদি অনন্তরূপে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত করিয়া রাখিলেও তোমার ওই বিশ্বব্যাপী রূপের চেতনা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে না কেন? প্রবল বিষয় বাসনা, অলস রসনাকে কেন বলিতে দেয় না।

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণ-
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ"॥

হে অনন্তরূপ! তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান, এবং জ্ঞাতা জ্ঞাতব্য ও পরমধাম, তুমি এই বিশ্বব্যাপিয়া আছ, তবে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় কি বিশ্ব বহির্ভূত? সেথায় তোমায় দেখি না কেন? আমি যাহাদের জন্য তোমায় ভুলিয়া থাকি কই তাহারাও দুঃখের সময় আমার মুখ পানে একবার চাহিয়া

দেখে না, স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে অনেকে আমার দুঃখে দু একটী কপট নিশ্বাস ফেলে বটে, কিন্তু সে সম্ভাবনা না থাকিলে, যাহারা এক সময়ে উপকার পাইয়াছে এরূপ পরমাত্মীয়েরাও অকৃতজ্ঞ হইয়া একে একে সরিয়া দাঁড়ায়। তখনই সুধু তোমাকে মনে পড়ে কিন্তু সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সকল সময়ে কেন বলিতে পারি না।

"একটি চেতনা সুধু জাগিবেরে অনিবার
সে চেতনা তুমিময় এই বিশ্বপ্রেমময়"

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নব লাট। ইংরাজি নববর্ষে এবার আমরা নবরাজপ্রতিনিধি পাইলাম। নূতন লাট বয়সে নবীন হইলেও তাঁহার কথাগুলি আশ্বাস-প্রদ। তিনি ডারবিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে "সাহস ও সহানুভূতি"—হিন্দু, মুসলমান ও পারশি প্রভৃতি সকল জাতির প্রতি সমান সহানুভূতি—এই দুইটি গুণ, ভারত-সুশাসনরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে একান্ত আবশ্যকীয়। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার নিজের কথা স্মরণ করিয়া চলিলে ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন। আমরাও আমাদের নবীন লাটের আমল হইতে নবীন লেখক লইয়া ইংরাজি নূতন বর্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে "সাহস" করিলাম, আশা করি "সহানুভূতি" হইতে বঞ্চিত হইব না।

উল্কা।—বিলাতের Royal Astronomical Societyর সভাপতি স্যার রবার্ট বল (Sir Robert Ball) সম্প্রতি উল্কাপাত সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহার মর্ম্মার্থ লিখিত হইল।

ইংরাজী ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পৃথিবীতে উল্কাবৃষ্টি হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর তারিখে একেবারে অনেক উল্কাপাত বা উল্কাবৃষ্টি হয়। সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া এইরূপ উল্কাবৃষ্টি ন্যূনাধিক ৩৩ বৎসর অন্তর হইয়া আসিতেছে। সচরাচর যে সকল উল্কা তারকামণ্ডিত নভস্তল ভেদ করিয়া ঔজ্জ্বল্য সহকারে আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহারা কোনও বিশেষ বৃহৎ পদার্থ নহে। উল্কাপিণ্ড, আকারে, চন্দ্র, ক্ষুদ্র পর্ব্বত কিম্বা গির্জ্জার মত হওয়া দূরে থাকুক ক্ষুদ্র কুটীরাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। বলিতে কি, কোন কোন উল্কাপিণ্ড গোল আলু কিম্বা গাজরের মতও ভারী নয়; আবার অনেক উজ্জ্বল কিরণময় উল্কাপিণ্ড একটী সামান্য কলাইয়ের অপেক্ষাও বৃহত্তর নহে। উল্কা বৃষ্টির সময় অনেক উল্কাপিণ্ডই সাগর বেলায় সামান্য বালুকার ন্যায় ক্ষুদ্র ও লঘু। এই সকল উল্কাকণা লক্ষাধিক বর্ষ যাবৎ বিদ্যুৎ বেগে আকাশ পথে ছুটিতেছে। পার্থিব কোন বস্তুই ইহাদের আপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগামী নহে। পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্ত্তে কোটী কোটী উল্কা, বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতেছে। যদিও ইহারা অতীব ক্ষুদ্র তথাপি ইহাদের ধ্বংশকর ক্ষমতা আছে। পূর্ব্বোক্ত নভেম্বরের বর্ষণের ন্যায় এই উল্কামণ্ডলী অনেক সময়ে আমাদের উপরে গোলাবর্ষণের উদ্যোগ করে। কিন্তু এত দুর্দ্দমনীয় বেগে এই সকল স্বর্গীয় অস্ত্র আমাদিগের দিকে আসে যে তাহাদের দ্রুতগতিই আমাদের একমাত্র মুক্তির কারণ হইয়া থাকে, কেন না এই প্রকার দ্রুতগতিতে আকাশপথে আসিতে২ তাহারা বায়ুর এবং পরস্পরের সঘর্ষে উত্তপ্ত, ঘূর্ণিত, ও

ভস্মীভূত হয় ও আমাদের অনিষ্ট সংকল্পে আসিয়াও নভোমণ্ডলে সুন্দর আলোকমালা বিস্তার করিয়া কেবল মাত্র আমাদের নয়নরঞ্জন করে। অতি ন্যূন সংখ্যায় প্রত্যহ প্রায় সহস্রেক মণ উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়। মহারাণীর সিংহাসনারোহণের (অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের) পর হইতে পৃথিবী অন্যূন পাঁচ লক্ষ টন আকাশজাত পদার্থ লাভ করিয়াছে। আল্পস্ পর্ব্বতের যে চিরতুষারাবৃত তুঙ্গ শৃঙ্গ আমাদের চুল্লীনিঃসৃত ধূমরাশি দ্বারা কখনও মলিন হয় নাই সেই সকল শৃঙ্গস্থ তুষারে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায় সেই সকল কণায়, প্রবলতাপে তাহাদের ভস্মীভূত হইবার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কণা উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ডের ভগ্নাবশেষ মাত্র। আটলাণ্টিক মহাসাগরের গর্ভে অনেক উল্কাখণ্ড পাওয়া গিয়াছে যাহারা কেবল মাত্র তাহাদের অবস্থিতি স্থান আকাশের উচ্চতম অংশ হইতে সাগরের নিম্নতম দেশে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। সূর্য্য কিরণে যে সকল অতীব ক্ষুদ্র অনু অত্যন্ত সুন্দর দেখায় তাহাদের মধ্যেও উল্কাকণার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কৃষকের লাঙ্গল কর্ষিত মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে এরূপ পদার্থ থাকিতে পারে যাহা যুগযুগান্তর পূর্ব্বে অতি প্রকাণ্ড ধূমকেতুর পুচ্ছ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। সামান্য শস্যকণার ভিতর এমন কি আমাদের দৈনিক খাদ্যে এমন দ্রব্য আছে যাহা কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া ও কোটী কোটী যোজন আকাশ মার্গ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। এইরূপে আমাদিগের দেহের যথার্থ উপাদান দিবার নিমিত্ত আকাশের দূরবর্ত্তী রাজ্যও সাহায্য করিতেছে।

*
* *

শৃঙ্গ বিশিষ্ট মানব মানবী।—শৃঙ্গ বিশিষ্ট মানব মানবী শুনিতে আকাশ কুসুমের ন্যায়, কিন্তু এরূপ দৃশ্য না হইলেও বিরল নহে।

Mr. Villeneuve নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার রচিত একখানি পুস্তকে ৭২ জন এইরূপ মানব মানবীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ভিতর শতকরা ৫০ জন পুরুষ। ইহাদের সকলের শৃঙ্গই পশুদের ন্যায় কপালের উপর অবস্থিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের শৃঙ্গ পুরুষের শৃঙ্গ অপেক্ষায় দীর্ঘতর। বিলাতের মিউজিয়মে (British Museum) যে মনুষ্য শৃঙ্গের নমুনা আছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইহার দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি এবং উহা জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের মস্তক শোভিত করিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিষ্টারশায়ারের "এলেন" (Mrs. Allén) নাম্নী কোন ইংরাজ মহিলার দুইটি শৃঙ্গ ছিল। লজ্জিত হওয়া, দূরে থাকুক তিনি সভা সমিতিতে সেই শৃঙ্গ যুগল সজ্জিত করিয়া যাইতেন। কথিত আছে ইহাতে তাঁহার অনেক প্রশংসাকারী জুটিয়া ছিল। ওই প্রদেশের মে ডেভিস্ (May Davis) নাম্নী আর একজন মহিলারও দুইটি শৃঙ্গ ছিল। শুনা যায় ইহা তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিত। তিনি চারি বার ঐ শৃঙ্গ কর্ত্তন করিয়াছিলেন কিন্তু উহা চারিবারই আবার বাহির হইয়াছিল। ঐ কর্ত্তিত শৃঙ্গ একবার ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরিকে উপহার প্রদত্ত করিয়াছিলেন। M. Lamprey এবং অন্যান্য ভ্রমণকারীরা পশ্চিম আফ্রিকার কোনও কোনও প্রদেশে বহুল শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। M. Lamprey বলেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার গানিম (Ganim) প্রদেশে কতিপয় শৃঙ্গযুক্ত নরনারী দেখিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একটি নিগ্রোর নাসিকার দুইদিক হইতে ২টি শৃঙ্গ বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন। Rodriguez নামক কোন মেক্সিকোবাসীর মস্তকের এক দিকে একটি শৃঙ্গ ছিল, উহা ৭ ইঞ্চি লম্বা এবং হরিণের শৃঙ্গের

ন্যায় তিনটি শাখাযুক্ত। ইহারা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বংশধর কিনা জানিবার জন্য আমাদের কৌতুহল হয়।

শৃঙ্গ পুরুষানুক্রমিক কিনা সে বিষয়ে যে সকল চিকিৎসক যত্নপূর্ব্বক মনুষ্য শৃঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন উহা কখনও কখনও পুরুষানুক্রমিক বটে কিন্তু সাধারণতঃ নহে। M. Dublane, Journal de Pharmacie for 1830তে বলিয়াছেন যে চিকিৎসক সমিতি তাঁহাকে পরীক্ষার্থ তিনটি মনুষ্য শৃঙ্গ প্রদান করেন, তন্মধ্যে দুইটি এক ব্যক্তির এবং অপরটি সেই ব্যক্তিরই পিতামহের। মনুষ্যের ন্যায় কুকুর, অশ্ব, এবং শশকের শৃঙ্গ বিষয়ে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ আছে, এবং কোনও বিশ্বাস যোগ্য চিকিৎসক একটি বিড়ালের শৃঙ্গের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। Malpighi নামক কোন বিশেষতত্ত্ববিদ্ বলেন, শৃঙ্গ মাংসের স্নায়বিক দীর্ঘতা মাত্র (nervous prolongation of the skin) Bieschex নামক আর একজন বিশ্বাসযোগ্য পণ্ডিত বলেন, এক প্রকার দূষিত তরল নির্গমণের জন্য শৃঙ্গ জন্মিয়া থাকে (due to a morbid secretion) যাহা হউক সকলেই স্বীকার করেন মনুষ্য শৃঙ্গ, পশু শৃঙ্গ, মনুষ্য ও পশুদিগের নখ সমস্ত একই পদার্থ। উহা যাহাই হউক না কেন শৃঙ্গ স্বাস্থ্য বা প্রাণহানিকর নহে।

* *

তিলতর্পণের বিধি—ভট্টাচার্য্য মহাশয় টোলে বসিয়া নস্য-সেবন করিতেছেন আর মাতাল মহাশয় রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ মুণ্ডিতমস্তক ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া মাতালের মনে পড়িল কি যেন একটা ব্যবস্থা জানিয়া আসিবার নিমিত্ত বাড়ীর লোকে কয়েকবার তাগাদা করিয়াছিল; কিন্তু সেটা যে কি ঠিক মনে হইল না, অথচ সম্মুখে

ভট্টাচার্য্য, এ সুযোগ ত্যাগ করাও যায় না। অগত্যা প্রণাম করিয়াই ভট্টাচার্য্যকে প্রশ্ন করিল—

তিলেঽপি তৈলং সর্ষ্যাপি তৈলং,
তিল সর্ষ্যা দয়াশ্রয়ং।
তর্পণে তিল দরকারং,
সর্ষ্যাং নাস্তি কি কারণং ?

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক্। কি যে কারণ তাহা নিরাকরণ করিবেন, কি প্রশ্নের ভাষা স্থির করিবেন ঠিক পাইতেছেন না। অথচ সম্মুখে রক্তনেত্র মূর্ত্তিমান নেসা ঘাড় বাঁকাইয়া "কি কারণং" ইহার উত্তরের প্রতীক্ষায় হাঁ করিয়া রহিয়াছে। উপস্থিত, তাহার দ্রংষ্ট্রা-করাল হইতে রক্ষা পাইবার আশায় চলিত প্রাকৃতেই বলিলেন।

"ভো, ভো, এ আর জান না !
ঢাকোঽপি বাদ্যং ঢোলোঽপি বাদ্যং
ঢাক ঢোল দয়াশ্রয়ং।
গাজনে ঢাক দরকারং,
ঢোলং নাস্তি যে কারণং ॥

মাতাল তিলের পক্ষে এরূপ গুরুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল।

***

অন্যমনস্ক কবি।—আরে রেধো, বেরালটাকে ঘর থেকে নিয়ে যা না, আমি যে লিখ্‌তে পারছিনে ? কেথা থেকে ডাকৃছে দ্যাখ্‌ না ?

রেধো—বা বা, তুমি যে বেরালের উপর বসে রয়েছ তাইত অত ডাকৃছে।

***

প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯ সাল। দ্বিতীয় সংখ্যা।

সাহিত্যোন্নতির সমবেত প্রয়াস।

উন্নত হইবার প্রধান উপায় বিদ্যাশিক্ষা। বিদ্যাশিক্ষা বিস্তারই দেশের ধন, যশঃ, সুখ, সচ্ছন্দ ও স্বাস্থ্যোন্নতির প্রকৃষ্ট পথ। এসিয়া ও ইউরোপ তুলনা করিয়া দেখ, ইউরোপের প্রাধান্য-মূলে বিদ্যাশিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। বাস্তবিক আমরা যে কোন জাতিরই ইতিহাস পাঠ করি না কেন আমরা দেখিতে পাইব যে, যখন যে জাতি উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছে তখন সেই জাতি বিদ্যার্চ্চনা বিষয়েরও শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। বিদ্যাবলের সহিত জাতীয় বলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বিদ্যাবলের সহিত জাতীয় বলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন ভারতের উন্নতি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির প্রধান সহায় ছিল বিদ্যাবল। কালের বশে আমরা সেই যথার্থ বল হারাইয়াছিলাম। এখন আমরা আবার সেই বিদ্যাবলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি। আমাদের রক্ষক—রাজা সেই বলের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে সেই বল পুনঃ প্রদান করিবার জন্য বহু আয়াস করিয়াছেন, এখনও সে বিষয়ে তাঁহার ত্রুটী নাই। আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।

কিন্তু আমাদের একটী আন্তরিক দুঃখ রহিয়াছে। আমরা যে বিদ্যালাভ করিতেছি তাহা কি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত? আমরা যে বিদ্যাই অভ্যাস করি না কেন তাহা বিদেশীয় ভাষায় অভ্যস্ত হয়; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে জাতীয় ভাষায় চর্চ্চা না হইলে কোন বিদ্যারই স্বাধীন অনুশীলন হয় না; সুতরাং আমাদের শিক্ষার ভিত্তি যে বালুকার উপর গ্রথিত তাহা নিঃসন্দেহ। তন্নিমিত্ত আমাদের আন্তরিক দুঃখ থাকিবারই কথা এবং প্রত্যেক সহৃদয় স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিরই দুঃখিত হইবার কথা।

এই দুঃখমোচন ক্ষমতা আমাদের রাজার হস্তে থাকিলেও তিনি বুঝিতে অক্ষম, কিম্বা আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে অক্ষম; রাজা আমাদের যথেষ্ট করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে বিদ্যোন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর করাইয়াছেন। তিনি যেরূপ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা অন্য কোন বিদেশী রাজার নিকট, প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, আশা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত।

আমরা রাজানুগ্রহে ও তাঁহার চেষ্টায় বিদ্যোন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি যে মনে করিলে আমরাই আমাদের দুঃখ মোচন করিতে পারি। এরূপ অভাব বিমোচন একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না এবং একজন কখনও এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এরূপ কার্য্যে অনেকের সাহায্য আবশ্যক। সামান্য বারিবিন্দুপাতে কখনও অতি উর্ব্বর ক্ষেত্র শস্যশালী হইতে পারে না।

দেশমধ্যে দেশীয়ভাষায় শিক্ষাবিস্তার পক্ষে বহুলোকের সাহায্য যেমন আবশ্যক, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এতদ্বিষয়ে সহানুভূতিরও তেমনি প্রয়োজন।

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে উজ্জ্বল তারকার অভাব নাই।

বঙ্গ-গগন আলোকিত করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ দীপ্ত-তারকা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এত উচ্চে রহিয়াছেন যে তাঁহাদের আলোক বঙ্গভূমিকে স্পর্শ করিতে পারে না—বঙ্গভূমি যে তিমিরে ছিল প্রায় সেই তিমিরেই আছে।

বঙ্গভূমির কৃতী সন্তানের অভাব নাই। সাহিত্যজ্ঞ, ইতিহাসজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ, দর্শনবিৎ, সংস্কৃতজ্ঞ বহুগুণী ব্যক্তি বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের বিদ্যানুরাগও যথেষ্ট, কিন্তু প্রায় অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের বিদ্যানুশীলনের ফল, তাঁহাদের পাঠ্যগৃহে, বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে, পরীক্ষাগৃহে, বিজ্ঞান-মন্দিরে, (laboratory) প্রশ্ন-পত্রে ও তাঁহাদের উর্ব্বর মানসক্ষেত্রেই আবদ্ধ রহিয়াছে, কদাচিৎ বঙ্গভাষার সুকৃতিক্রমে, বঙ্গভাষায় আলোচিত হইতে দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় গণিত, বিজ্ঞান ইতিহাসাদি সম্বন্ধে যেরূপ পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল এখনও প্রায় তদ্রূপ আছে। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সম্প্রতি বিজ্ঞান বা ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কথঞ্চিত আলোচনা হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ বটে ; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটী অতি দুর্লক্ষণও দেখা দিতেছে। আমরা শিক্ষা প্রভাবে কিছু বাচাল হইয়া পড়িয়াছি। কোন বিষয়ের সম্যক্ অনুশীলন হইতে না হইতে আমরা তাহার সমালোচনা করিতে প্রস্তুত হই। অগ্রে সম্যক্ অনুশীলন হউক পরে সম্যক্ সমালোচনা হইবে এই নিয়মই ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান গণিতাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচক্ষণ ব্যক্তির অভাব আমাদের নাই। কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমাদের দীনা বঙ্গভাষা কি কিছুই প্রত্যাশা

করিতে পারে না? হয়ত এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে যখন বঙ্গভাষায় যথাযথ ভাব ব্যক্ত করিবার শব্দের সদ্ভাব নাই তখন কিরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রাদি আলোচিত হইতে পারে? উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দের সদ্ভাব বা অসদ্ভাব হওয়া আমাদের হস্তেই রহিয়াছে। আবশ্যক হইলে আমরা উপযুক্ত শব্দ আবিষ্কার করিতে পারি এবং ঐ শব্দ কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা জ্যামিতির সংজ্ঞাদির ন্যায় পরিস্ফুট করিতে পারি। প্রয়োজন হইলে শিক্ষিতমণ্ডলী নিয়মিতরূপে সমবেত হইয়া উপযুক্ত শব্দাদি প্রয়োগ, বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত করিতে পারেন।

সৌভাগ্য বশতঃ শিক্ষিতমণ্ডলী দ্বারা আহূত নিয়মিত সভাও আমাদের মধ্যে আছে। সাহিত্য-পরিষৎ সভা আধুনিক উজ্জ্বলতম, উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বল রত্নসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সভার আলোচ্য বিষয়-গুলি অতীব আবশ্যকীয়; এক কথায় সভায় যেরূপ বিদ্বন্মণ্ডলী আছেন উদ্দেশ্যও তদ্রূপ হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কার্য্য গতিকে প্রাচীন পুস্তকালোচনাই ইঁহাদের পরিচালিত পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্য বটে প্রচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেশের পূর্ব্বতন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয় প্রকৃতি ও স্বভাব অবগত হওয়া যায় ও তাহা উন্নত চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন, গণিতাদি শাস্ত্র সমূহের চর্চ্চাও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে ও সাহিত্য পরিষদের নিতান্ত পরিত্যজ্য নহে। বর্ত্তমান সময়কে অনেকে বৈজ্ঞানিক যুগ (Scientific age) বলিয়া থাকেন; বিজ্ঞান বলেই আধুনিক ইউরোপ উন্নত—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মনি প্রভৃতি যাবতীয় ইউরোপীয়

দেশ উন্নত। নব আমেরিকাও কেবল বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা কত অদ্ভুত বস্তু আবিষ্কার করিতেছে, অতি অল্প সময়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র যথাযথ আলোচনা করিতে হইলে গণিত শাস্ত্রালোচনার আবশ্যক, গণিত শাস্ত্রই বিজ্ঞানের মূল। সুতরাং বিজ্ঞান ও গণিত এই উভয় শাস্ত্রই আমাদের স্বাধীনভাবে আলোচ্য বিষয়; সাহিত্য, সমাজকে সজীব রাখে, মানসিক ভাব উন্নত করিয়া দেয়; তন্নিমিত্ত, ইহাও আমাদের উপেক্ষার বিষয় নহে। ইতিহাস প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ দেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি, অধ্যবসায়, ত্যাগস্বীকারাদি ও সংযম আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখে সুতরাং ইহাও পরিত্যজ্য হইতে পারে না। দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মচিন্তা, তজ্জন্য ইহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সুতরাং সাহিত্য-পরিষৎ যে কেন শুধু প্রাচীন পুঁথি লইয়া ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিজ্ঞান গণিতাদি শাস্ত্রের প্রচার জন্য পারিভাষিক শব্দ নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সাহিত্য-পরিষৎ সভার আলোচ্য বিষয় হইয়াও ইহা কেন তাঁহাদের অনাস্থাপন্ন রহিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আশা করি উক্ত সভা এতদ্বিষয়ে শীঘ্র মনোনিবেশ করিবেন, কারণ আমরা উক্ত সভা হইতে ন্যায়তঃ বিস্তর আশা করি ও করিতে পারি।

দেশ মধ্যে দেশীয় ভাষায় অবাধ শিক্ষা প্রচলন যেরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য, দেশের ধনিগণেরও এতদ্বিষয়ে আন্তরিক ও আর্থিক সাহায্যও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেরূপ মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা দেশীয় ভাষায় অবাধ শিক্ষা প্রচলন করিতে পারেন ধনিগণ ও অর্থ সাহায্যে তাঁহাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে সমর্থ। এইরূপে এতদুভয়ের সংমিশ্রণ না হইলে দেশের

প্রকৃত উপকার কখনই সাধিত হইবে না। এবং ইহাই আমাদের প্রধান অভাব।

আধুনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞান-শিল্পাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সংবাদ পত্রে সামান্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ ব্যতীত শিক্ষাপ্রদ বিষয় অতি অল্পই থাকে। সংবাদ পত্র পরিচালনা যে একরূপ ব্যবসায়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। সংবাদপত্র যে দেশের জ্ঞান বিস্তারের প্রশস্ত পথ তাহা সংবাদপত্র পরিচালকেরা অনেক সময়ে মনে রাখেন না। সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ অসংবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ ঘটনাবলী বা উপন্যাস অথবা ব্যক্তি বিশেষের তোষামোদ বা অযথা নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া যদি বিজ্ঞান, শিল্প, উন্নত উপায়ে কৃষি প্রভৃতির উৎকর্ষ বিষয়ক, অত্যাবশ্যকীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে লোকের কুসংস্কারও দূর হইবে।

মাসিক পত্রও সংবাদ পত্রের ন্যায় শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে মাসিক পত্র অন্নগত-প্রাণ কলিযুগের মানবের মত সম্পাদক-গত-প্রাণ। অধিকাংশ মাসিক পত্র অল্পকাল স্থায়ী। কেন না প্রায় সকল স্থলেই সম্পাদক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া স্বীয় ব্যয়ে মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। যতদিন তাঁহার এই ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকে ততদিনই তাঁহার পত্র স্থায়ী হয়। তাঁহার সাধ মিটিলে বা ব্যয়াধিক্য হইলে তৎসম্পাদিত মাসিক-পত্র নিঃশেষিতায়ুঃ হয়। শুদ্ধ যে নিম্ন শ্রেণীর মাসিক পত্র এই নিয়মাধীন তাহা নহে। দুঃখের বিষয় 'বঙ্গ দর্শন' প্রভৃতির মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রকেও এই নিয়মের বশীভূত হইতে দেখা গিয়াছে।

যাহাতে প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র সমূহ অকালে কালগ্রাসে পতিত না হয় তজ্জন্য সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত। সুচারু রূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া মাসিক পত্র পরিচালনা করা একজনের দ্বারা অসম্ভব। উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র দ্বারা ধীরে ধীরে, স্থায়ীভাবে, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রেরই উন্নতি, প্রচার, অনুশীলন, যেমন সংসাধিত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব এরূপ সুবিধা সংরক্ষণার্থ শিক্ষিতগণের পরিশ্রম ও ধনিগণের সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পরাণে পরাণে।

১

করিয়াছি কত খেলা, অরুণ প্রভাত বেলা,
প্রেমধারা-প্লাবিত হৃদি-পুলিনে;
আকুল সোহাগ রাশি, প্রাণভরা সুধা হাসি,
মিশাইয়া গেছে যবে সুখ স্বপনে,
প্রেমধারা-প্লাবিত হৃদি-পুলিনে।

২

করিয়াছি কত খেলা বসি দু'জনে,
কহিয়াছি কত কথা কবে কে জানে,
কে জানে কেমন ক'রে কোন স্বপনের ঘোরে,
গাহিয়াছি কত গান মধুর স্বনে,
প্রেমধারা-প্লাবিত হৃদি-পুলিনে।

৩

ভাসিয়াছে সারা হিয়া খর পবনে,
বাহিয়াছি ভাঙ্গা তরী প্রেম তুফানে,
কূলে একা বসে বসে, কে গিয়াছে হেসে হেসে,
সারাদিন, সারানিশি, আকুল প্রাণে,
প্রেমধারা-প্লাবিত হৃদি-পুলিনে।

৪

কাঁদিয়াছি কবে বসি শ্যাম বিজনে,
তুলিয়াছি কত তান আপন মনে,
শুধু ক্ষীণ ছায়া তার, জাগিতেছে অনিবার,
কূলে কূলে প্রবাহিত বিষাদ বাণে,
প্রেমধারা-প্লাবিত হৃদি-পুলিনে।

৫

সুষমায় বিকশিত নব নলিনে,
শরতের আলোকিত শশী-কিরণে,
দেখিয়াছি কত লীলা, গাঁথিয়াছি কত মালা,
ঘুমায়েছি সুকোমল সুখশয়নে,
প্রেমধারা-প্লাবিত হৃদি-পুলিনে।

৬

ফুলভারে নিরাকুল বকুল বনে,
শুনিয়াছি দূর বাঁশী ধীর শ্রবণে,
যুগল হৃদয় যবে, থির তটিনীর রবে,
বাঁধাছিল সোহাগের মধু বাঁধনে,
প্রেমধারা-প্লাবিত হৃদি-পুলিনে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদ প্রকৃতপক্ষে কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কেহ বলেন তিনি ১৬৪০ শকে, কেহ বলেন ১৬৪৪ শকে, আবার কেহ কেহবা বলেন ১৬৪৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বাধীন অনুসন্ধানে নিরূপিত হইয়াছে যে তিনি ১৬৪০-৪৫ শকের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন 'Ram Prosad Sen was born probably about 1720' অর্থাৎ অনুমান ১৭২০ খৃঃ অব্দে রামপ্রসাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জেলার হালিসহর পরগণার অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রাম। এই গ্রামের নাম কুমারহট্ট কেন হইল তৎসম্বন্ধে প্রসাদ প্রসঙ্গকার একটী সুন্দর গল্প বলিয়াছেন। গল্পটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"একদা এই স্থান অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী গুণীর বাসস্থান ছিল। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে এখানকার পণ্ডিতগণের সমকক্ষতা নিবন্ধন প্রায় তর্ক বিতর্ক এবং বিচার চলিত। এক সময়ে নবদ্বীপের কয়েকজন পণ্ডিত এখানে বিচারে আসিয়াছিলেন। কুমারহট্টের পণ্ডিতগণ চক্রান্ত করিয়া, একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুচতুর কুম্ভকারকে তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেন।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শজিনা ফলে দাল রন্ধন করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন। শজিনা ফলের এক এক খণ্ড একাধিকবার মুখে দিতে দেখিয়া সেই কুম্ভকার বলিল, ছিছি আপনারা ব্রাহ্মণ হইয়া উচ্ছিষ্ট

ভোজন করেন। আপনাদের সঙ্গে আবার পণ্ডিতগণ কি বিচার করিবেন ? এই সূত্র ধরিয়া সেই কুম্ভকারই তাঁহাদিগকে নিতান্ত অপদস্থ করে। এইরূপে কুম্ভকার হইতে পণ্ডিতগণ হটিয়া গেলেন বলিয়া স্থানের নাম কুমারহট্ট হইয়াছে।” আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বে বহু সংখ্যক কুম্ভকার ঐ স্থানে বাস করিত বলিয়া উক্ত গ্রামের নাম কুমারহট্ট হইয়াছে।

রামপ্রসাদের পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন ও জনকের নাম রাম রাম সেন। এ কথা প্রসাদ স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন, যথা ;—

“—অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবী পুত্র সরল হৃদয় ॥
তদঙ্গজ রাম রাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া ॥”

রামপ্রসাদ স্বীয় পিতাকে ‘মহাকবি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কৃত গ্রন্থাদি এ পর্য্যন্ত আমাদের গোচরে আদৌ আইসে নাই।

রামপ্রসাদের রামদুলাল এবং রামমোহন নামক দুইটি পুত্র, এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুইটী কন্যা ছিল। রামমোহনের নাম রামপ্রসাদকৃত বিদ্যাসুন্দরে উল্লেখ না থাকিবার কারণ এই যে ঐ পুস্তক রচিত হইবার পরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন রামপ্রসাদ সংস্কৃত, ও হিন্দিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

রামপ্রসাদের বাল্য কাহিনীর বিষয় কেহই কিছু বলিতে পারেন না। তাঁহার চাক্রীতে প্রবেশ করিবার পর হইতেই আমরা তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই।

রামপ্রসাদের মন এক প্রবল ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হিসাবের খাতার মধ্যে দেবতাদিগের নাম এবং শ্যামাবিষয়ক সুললিত পদাবলী লিখিয়া রাখিতেন। অবশেষে একদিন তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ইহা অবগত হইয়া প্রভুর নিকটে রামপ্রসাদের কার্য্য-শৈথিল্যের কথা প্রকাশ করিলেন এবং নিদর্শন স্বরূপ রামপ্রসাদের লিখিত পদাবলী তাঁহাকে দেখাইলেন। রামপ্রসাদের প্রভু, 'আমায় দাও মা তবিলদারী' এই গানটী পাঠ করিয়া উহার ভাব মাধুরীতে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি রামপ্রসাদকে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রামপ্রসাদও প্রভুর উপদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

'কবি-চরিত'কার যথার্থই বলিয়াছেন 'যে মহাত্মার গুণগ্রাহিতা গুণে রামপ্রসাদের কবিত্বকীর্ত্তি বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করা কাব্য-প্রিয় সহৃদয় সমাজের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য'।

এই সময় হইতে কেবল মাত্র পারমার্থিক চিন্তায় ও শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীত রচনা নৈপুণ্যে এই সময়ে তাঁহার কিছু আয়ও হইতে লাগিল। কারণ তৎকালীন বহুলোক রামপ্রসাদের দ্বারা কীর্ত্তনাদির জন্য গীত রচনা করাইয়া লইত এবং প্রণামী স্বরূপ রামপ্রসাদকে কিছু দিয়া যাইত।

রামপ্রসাদের যশঃ ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে কৃষ্ণনগরের অধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের গুণবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও চতুর্দ্দশ বিঘা নিষ্কর জমি দান

করেন। রামপ্রসাদ এই উপাধি ও জমি প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন। রামপ্রাদের মৃত্যুর যথাযথ সময় নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে। সম্ভবতঃ তিনি ১৬৮০।৮৪ শকে পরলোক প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাসুন্দর ভিন্ন কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিবসংকীর্ত্তন, নামে কবিরঞ্জনের তিন খানি কাব্য ছিল। শিবসংকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের অতি অল্প ভাগই আমাদের গোচরে আসিয়াছে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। 'কবিচরিত'কার বলেন "গুণাকর যে চণ্ডীকাব্য, প্রাণরামের কালিকামঙ্গল ও কবিরঞ্জনকে আদর্শ করিয়া বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় তত্তৎগ্রন্থপাঠে বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। অনুকৃতি অপেক্ষা অনুকারীর উৎকর্ষ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কেহ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রথম বলিয়া আপত্তি করেন তাঁহার হৃদ্বোধ জন্য ইহাই যথেষ্ট, যে স্বর্ণালঙ্কার বর্ত্তমানে রৌপ্যালঙ্কার আদৃত হইবার আশা কে করিতে পারে? রায়গুণাকরের তাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে দেখিলে কোন্ কবি নীরস করিয়া সেই বিষয়ে অভিনব গ্রন্থ প্রচলিত করিতে সাহস করিতেন? ফলতঃ দুইখানি বিদ্যাসুন্দর পর্য্যালোচনা করিলে নানা লক্ষণ দ্বারা কবিরঞ্জন কৃত বিদ্যাসুন্দরের প্রাথম্য বিলক্ষণ সপ্রমাণ হয়। গুণাকরের উপাখ্যান ভাগ অতি সরল ও অলঙ্কার নাতি ভূষিত। বর্ণনা বিষয়েও যে যে স্থানে গুণাকরের পারিপাট্য ও চাকচিক্য সেই সেই স্থানেই ইহার হীনতা দেখা যায়। তাঁহার পূর্ব্বে না হইলে কবিরঞ্জনের রচনায় কেন এত বৈলক্ষণ্য জন্মিবে? কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বিদ্যা-

সুন্দর রচনা করিয়া রাজাকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখান, যদি ঐ বিষয়ের উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ মহারাজের সভাসদ্‌ ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক পূর্ব্বে রচিত হইত তাহা হইলে রামপ্রসাদ কখনই উহা রাজাকে দেখাইতে সাহসী হইতেন না এবং রাজাও কখনও ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাদৃশী প্রীতি লাভ করিতে পারিতেন না"। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অনেকে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরকেই বঙ্গভাষায় প্রথম বিদ্যা-সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করেন। অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যে কবিরঞ্জনের পরে রচিত হইয়াছিল এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে।

এক্ষণে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল, রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন বিদ্যা-সুন্দর, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল এই চারি খানি বিদ্যাসুন্দর বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীদিগের গোচরে আসিয়াছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত খানির মধ্যে একস্থলে এ[illegible] আছে :—

'বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমৃতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥' প্রাণরাম।

ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হইবে, প্রথমে কৃষ্ণরাম, পরে রামপ্রসাদ ও তৎপরে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ণ করেন। ইহা ভিন্ন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন 'অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের রচনা অপেক্ষা অনেক

মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট। অতএব তাহা বর্ত্তমান দেখিয়াও কবিরঞ্জন রচনা করা প্রবহমান নদী সন্নিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিধেয় কার্য্য হয়।'

যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা রামপ্রসাদের গ্রন্থ ভারত-চন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতেছেন, সে যুক্তি কোন ক্রমেই সম্মত নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তি পরে চেষ্টা করিলেই যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। আর পরবর্ত্তী কাব্য অপকৃষ্ট হইলেই যে বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার প্রচারে বিরত হইয়া থাকেন এ কথাতেও নির্ভর করা যায় না।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাব্যবিশারদ মহাশয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য-রচনা করিবার মানসে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বামদেত্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন 'রামপ্রসাদ দুর্বোধ শব্দাদি বিন্যাসে অধিকতর পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয় বিবেচনা করিতেন। অতএব এই মানসে যে তিনি কাব্যরচনা করেন নাই তাহাই বা কে বলিল?' অনেকে বলেন দুই খানিই এক সময়ে প্রণীত হয়। এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সুসঙ্গত।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর গুণাকরের কাব্য হইতে নিকৃষ্ট হইবার কারণও কাব্যবিশারদ মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "কবির হৃদয় অনুরোধ, অনুমতি বা অনুগ্রহের পন্থানুসরণ করে না। রামপ্রসাদ ভক্তকবি—নিজের ধর্ম্মানুরাগেই 'আপনাহারা' হইতেন। এইরূপ উপঢৌকনের কাব্য রচনা করিতে গেলে তাঁহার হৃদয়ের কবিত্ব যে প্রকাশ পাইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। কাজেই তাঁহার কাব্য পরবর্ত্তী হইয়াও নিকৃষ্ট হইয়াছে।'

রামপ্রসাদের সহিত প্রসঙ্গক্রমে আজু গোস্বামীর নাম না করিলে

তাঁহার জীবনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। আজু গোস্বামীর বিষয় আমরা এইমাত্র জানি যে তিনি রামপ্রসাদের স্বগ্রামনিবাসী ছিলেন, এবং তাঁহার অত্যুচ্চ কবিত্ব-প্রভাব থাকিলেও তিনি ক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের অনেক গানের প্রত্যুত্তরে তিনি ব্যঙ্গ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র আমরা অবগত হইয়াছি। আজু গোস্বামীর সমগ্র সঙ্গীত সংগ্রহ করিবার অদ্যাবধি কেহই প্রয়াস করেন নাই।

'কালাকীর্ত্তনের' একস্থলে রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

'গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ,
'কসিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস
'সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু
'পাতাল হইতে উঠে শুনে মায়ের বেণু॥

আজু গোঁসাই ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

না জানে পরমতত্ত্ব
কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে ;
তা যদি হইত
যশোদা যাইত
গোপালে কি পাঠায় রে॥

যশোদার ন্যায় পুত্রবৎসলা স্ত্রীলোক জগতে বিরল। অতএব স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ধেনুচারণ করিবার প্রথা থাকিলে গোপালকে না পাঠাইয়া নিশ্চয়ই যশোদা স্বয়ং যাইতেন।

রামপ্রসাদের একটী গান এইরূপ ;—

"ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন ; দু চার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝেরে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি কর কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন নিলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥

আজু গোঁসাই ইহার উত্তরে বলেন ;—

'ডুবিস্‌ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম্‌ আট্‌কে যাবে তাড়াতাড়ি ॥
একে তোমার কফো নাড়ী ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বর জাড়ী মন যেতে হবে যমের বাড়ী ॥
অতি লোভে তাতি নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি।
ও তুই ভাবিস্‌ নে মন ধর্‌গে ভেসে শ্যাম দে শ্যামার চরণতরি ॥"

কবিরঞ্জন গাহিয়াছেন ;—

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ড যোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে যাব ॥
হাতে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আস্‌বে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥

যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব।

গোস্বামী উত্তরে গাহিয়াছিলেন—

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি॥
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভূষোকালী মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা নিজে যে কলা দেখিবি॥

কবিরঞ্জনের কোন গানে আছে—

—'কাজ কি আমার কাশী,
কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি'

গোঁসাই প্রত্যুত্তরে গাহিয়াছিলেন—

'পেসাদে তোর যেতেই হবে কাশী,
ওরে তথা গিয়ে দেখ্‌বি রে তোর মেসো আর মাসী' ইত্যাদি

অনেকে বলেন 'মা আমায় ঘুরাবি কত' এই গানটী রামপ্রসাদের সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব সেইটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
একবার খুলে দেমা চোখের ঠুলি হেরি মা তোর অভয় পদ॥

বাহুল্যভয়ে আর অধিক বলিলাম না। উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন গোস্বামী কিরূপ উচ্চ দরের ভাবুক ও কবিত্বশক্তি সমন্বিত ছিলেন। আর রামপ্রসাদের গানের বিষয়ে টীকা নিষ্প্রয়োজন।

কতকগুলি প্রসাদী সঙ্গীতে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই 'দ্বিজ রাম প্রসাদ' কে ইহা লইয়া অনেক তর্ক চলিয়াছিল। 'প্রসাদ প্রসঙ্গ'কার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' নামক একজন লোক ছিল। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় বলেন 'তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার' নহেন, কলিকাতারই অধিবাসী। তিনি আরও বলেন যে রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামে একজন কবিও কয়েকটী প্রসাদী গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা 'নীলু ঠাকুরের' একটী যাত্রার দল ছিল। অতএব উভয়ের সঙ্গীত মিশ্রিত হওয়া কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। যে সকল প্রসাদী সঙ্গীতে 'ডিক্রী ডিস্‌মিস্' ইত্যাদিরূপ ইংরাজী কথা আছে কাব্য-বিশারদ মহাশয় সেই গুলি চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদের রচিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলেন 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে সেই সকল ইংরাজী কথা বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া তত সম্ভবপর নহে।' যাহা হউক কবিরঞ্জনের গানের সহিত যে আরও অনেক নিকৃষ্ট কবির সঙ্গীত মিশ্রিত হইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রামপ্রসাদ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। 'প্রসাদ প্রসঙ্গ'কার স্বয়ং নিরাকারবাদী ছিলেন বলিয়া রামপ্রসাদকেও উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিয়া বলিয়াছেন যে প্রথমে তিনি 'জড়োপাসক' ছিলেন কিন্তু পরে তাঁহার মতান্তর ঘটিয়াছিল। রামপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহতি পূর্ব্বে যে গানগুলি গীত হইয়াছিল সেইগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। 'সাধক-সঙ্গীত' প্রচারক কৈলাশচন্দ্র সিংহ বলেন 'রাম প্রসাদ পৌত্তলিক ছিলেন না, দ্বৈতবাদীও ছিলেন না।' বলা বাহুল্য মাত্র যে এই মত

অতীব অসম্ভব। ফলতঃ প্রসাদ যে শক্তিসেবক ছিলেন ইহা প্রত্যেক সদ্বিবেচক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

'লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া' রামপ্রসাদের এই উক্তি দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে তিনি এক লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

আমাদের বক্তব্য প্রায় শেষ হইল। রামপ্রসাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে 'আর্য্য-দর্শন' যাহা বলিয়াছিলেন কেবল মাত্র তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"পৃথিবীর সাহিত্যসংসারে পারমার্থিক কবিতায় রামপ্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া গণণীয় করিতে হইবে। কোন জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে সেরূপ রত্নরাজি বিরাজিত নাই। ডেবিডের ধর্ম্মগীতের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না, কারণ ডেবিডের ধর্ম্মগীত সরল অন্তর হইতে সরল স্রোতে উৎসারিত হইয়াছে। হাফিজের পদাবলী, এনাক্রিয়নের পদাবলীর ন্যায় বাহ্যবিলাসিতায় পরিপূর্ণ দেখায়। তাহাদিগের দ্বিভাব উদ্ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ম্যারাট, হোরেসের পদাবলী অনুকরণ করিয়া যে গীতমালা রচনা করিয়াছেন তাহা তত গম্ভীর বোধ হয় না।.........আমাদিগের বৈদিক গীত সমূহ অতি গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ, ও পৃথিবীর আদিকালীন সরলতার নিদর্শন স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার পারমার্থিক সঙ্গীত প্রসাদ-পদাবলীর সহিত তুলনায় নহে।.........রামপ্রসাদের কল্পনা এক অপূর্ব্ব পথে বিচরণ করিয়াছে।......সে কল্পনার অপূর্ব্বতায় যে কেবল নবীনত্ব আছে এমন নহে, সেই নবীনত্বের সহিত এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যও দৃষ্ট হয়। নবীন অথচ মনোহরা　*　*

* * * * রামপ্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতেই যে কেবল আপন হৃদয়ের সাত্বিক ভাব আরোপিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহাকে প্রধানতম কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।... ......যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাত্বিক ভাবের কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রজতময়ী পার্থিব পৃথিবীকে তিনি কনকভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। দুঃখময়ী পার্থিব জগতীকে তিনি সুখময় অমৃতনিকেতনরূপে প্রতীয়মান করিয়াছিলেন। কঠিন মৃত্তিকাময় জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীতধ্বনির অমৃতবর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল; বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় সামান্য পার্থিব পদার্থকে ধর্ম্মগীত সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্য পদার্থের নিকট উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইতে থাকি।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

জীবন-গাথা।

যাহা কিছু জমি-জমা ছিল চাষ বাস
আমি জন্মাবার আগে কে করিল নাশ
ভাবী বংশধরের যত ঘুচাইয়ে আশ,
ঠাকুরদ্দাদা যে আমার।

"মা জানে না ছেলের যত্ন করে শুধু হেলা"
বলে দরদ করে কেবা ঔষধ দিয়ে মেলা,
রোগী ক'রে তুলে ছিল আমায় ছেলে বেলা,
ঠাকুরমা যে আমার।

কে গে'ছিল সাত বছরের আমায় ফেলে ঘরে
যেন আমার দুঃখিণী মার বুক জুড়াবার তরে,
কাকার হাতে সঁপে দিয়ে দূর দেশান্তরে,
বাবা যে আমার।

আমার খাবার পয়সা হ'তে দোক্তা খেত কে,
না খা'ইয়ে অস্থিসার করে আমাকে
বল্‌ত আবার "কিযে ছিরি" দেখ্‌লে স্বমুখে,
কাকী যে আমার।

"কসাইদের হাতে পড়ে বাছা গেল মারা"
এই বলে কে নিয়ে গিয়ে খাটিয়ে কল্লে সারা
খেতে দিত আধ পেটা ভাত, তেঁতুল এক ছড়া,
মামী যে আমার।

কে বলিত "এ দুনিয়ায়" আপন বুক ঠুকে
"পরের ছেলে দেখতে আমি পারিনি দুচোকে",
শুনিয়ে দিত কত কথা আমায় কাছে ডেকে,
মামা যে আমার।

দুষ্টুমি আর মন্দ কাজ করে আপনি
আমার ঘাড়ে দোষ চাপায়ে যখন তখনি,
শুধু শুধু খাওয়াত কে শতেক বকুনি,
মামাত ভাই যে আমার।

মরণ হ'লে মায়ের আমার কেবা সোহাগ ভরে,
নিয়ে গেল বাপের কাছে রাখবে বলে ঘরে,
দৌড় করাত দুপুর রোদে দিছে হুকুম করে,
বিমাতা আমার।

মনের সুখে খেল্তাম্ যবে কে ঘুচাতে খেলা
চেঁচিয়ে উঠে বলে দিত "গোল কচ্ছে মেলা,"
ছেলেদের দোষ দেখেই থাকে মেয়েরা দুবেলা,
দিদি যে আমার।

আমার ভাগে ভাগ নিত কে সকল সময়,
ইচ্ছে কল্লে সবটা নিতে ছিল না কার ভয়
কারণ আমি আট বছরের তার বয়স যে নয়,
দাদা যে আমার।

"দাদা এস" বলে কেবা কোলে নিয়ে তুলে
পয়সা দিত আদর করে ট্যাঁক্ হ'তে খুলে
দোকানিতে ফিরিয়ে দিত যাহা অচল বলে,
দাদা মশাই যে আমার।

পায়ের ধুলা মাথায় দিয়ে "লক্ষ্মীবাবা" বলে
'অনর্থের মূল অর্থ,' শিক্ষা দিত এলে,
সিকিটিও নিতে কিন্তু যেত না কে ভুলে,
ঠাকুর মশাই যে আমার।

বিনা পয়সায় আমার সঙ্গে খেত কাছে বসে,
দুঃখের বেলা খুঁজে কারে মিল্‌ত নাক দেশে,
দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত শেষে,
বন্ধু যে আমার।

কার আবদার রাখ্‌তে রাখ্‌তে ওষ্ঠাগত প্রাণ,
একটু ক্রুটি হ'লে পরে কথায় কথায় মান,
ডব্‌ ডবিয়ে ফোঁশ্‌ ফোঁশিয়ে বাপের বাড়ী যান,
　　　　　গিন্নি যে আমার।

সবার চেয়ে রহস্যময় এ দুনিয়ার থেকে,
কে সতত দুঃখী হত আমায় দুঃখী দেখে
সুখ সাগরে ভাস্‌ত আবার হেরে শান্তি সুখে
　　　　　আমি যে আমার।

শ্রীরসময় লাহা।

কৃষ্ণকান্তের উইল—অনুশীলন।

বিষবৃক্ষ অনুশীলনে আমরা বঙ্কিম বাবুর সমস্ত উপন্যাস গুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি, প্রথম Romantic বা অলৌকিক এবং দ্বিতীয় Realistic বা প্রাকৃতিক। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলকে প্রাকৃতিকের অন্তর্গত করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় গুলিকে অলৌকিক শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছি। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের মূল ঘটনায় কিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেক পাঠকের সুবিধার্থ এ স্থলে সংক্ষেপে উহার পুনরবতারণা করা গেল। এক অল্প বয়স্কা সুন্দরী বিধবার জন্য রূপজ মোহই উভয় পুস্তকের অনিষ্টের মূল। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল উভয়েরই চরিত্র প্রথমে অতি নির্ম্মল ছিল, উভয়েই আপনাপন স্ত্রীকে ভাল বাসিতেন এবং অতুল ঐশ্বর্য্য-সুখের অধিপতি ছিলেন। রূপজ মোহের বশীভূত হইয়া উভয়েই কিছু দিনের জন্য বিষময় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের

পতিব্রতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীদিগকেও দারুণ মর্ম্ম বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। উভয়েই দয়া পরবশ হইয়া এক সুন্দরী অনাথাকে মৃত্যু মুখ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া শেষে রূপোন্মত্ত হইয়া অশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। বিষবৃক্ষে হীরা, কৃষ্ণকান্তের উইলে ক্ষীরি, নায়ক নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার মূল। কিন্তু মূল ঘটনায় এরূপ সাদৃশ্য থাকিলেও ব্যক্তিগত চরিত্রে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। প্রথমে গোবিন্দলালে ও নগেন্দ্রে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কিন্তু বঙ্কিমবাবু, সেক্স্পিয়ারের ন্যায়, কোন দুইটি চরিত্রই একভাবে অঙ্কিত করেন নাই; গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্র-চরিত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্য ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে। মূল ঘটনা প্রায় একরূপ হইলেও বিষবৃক্ষে চরিত্রবৈচিত্র্য-অধিক থাকায় আমরা ঐ পুস্তককেই শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছি। বিষবৃক্ষ পাঠে, নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, দেবেন্দ্র, হীরা, শ্রীশচন্দ্র, কমলমণি এমন কি কমলের "সতুবাবু" ও হীরার আই পর্য্যন্ত, সকলেই হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। কৃষ্ণকান্তের উইল পাঠে কেবল গোবিন্দ লাল, রোহিণী ও ভ্রমরের কথাই হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল উভয় পুস্তকই করুণরসাত্মক, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলে কমলমণির ন্যায় শান্তি ও প্রীতিপ্রদায়িনী কেহ না থাকায়, উহাতে বৃষ্টির পর রৌদ্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবলই মেঘ, কেবলই বৃষ্টি। রচনা বিষয়েও বিষবৃক্ষে যে পরিমাণে করুণরস ও হাস্যরসের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণকান্তের উইলে সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া 'কৃষ্ণকান্তের' রচনা কোনও ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে।

বিষবৃক্ষ অনুশীলনে আমরা আরও দেখিয়াছি প্রথম হইতেই কিরূপে ঐ পুস্তকের মূল ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণ-

কান্তের উইলে ঐরূপ আভাসের পরিবর্ত্তে এক ভ্রান্তিমূলক ধারণা জন্মায়। হরলালকেই প্রথমে পুস্তকের নায়ক বলিয়া অনুমান হয় কিন্তু কিয়ৎ পরেই ঐ ভ্রম দূর হয়, এবং সমুদয় পুস্তকে হরলালের অস্তিত্বও আর দেখিতে পাই না। হরলাল ইংরাজি নাটকের prologue স্বরূপ। আর রোহিণী? রোহিণী উপনায়িকা স্বরূপা হইলেও কার্য্যতঃ প্রকৃত নায়িকা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা প্রথমে রোহিণীর সাক্ষাৎ পাই; গ্রন্থকার স্বয়ংই বলিয়াছেন "রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ"। তাহার উপর সে বালবিধবা, অথচ "সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" রোহিণীর এরূপ পরিচয় পাইয়া, প্রথম হইতেই যেন আমাদের মনে হয় যে সে প্রবল যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধ করিতে না পারিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিবে। রোহিণী চরিত্র বুঝিতে হইলে হরলালের সহিত তাহার কথোপকথন মনে রাখিতে হইবে।

হরলাল একদিন রোহিণীর প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছিল। সে ঋণ পরিশোধের জন্য রোহিণী মরিতেও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু হরলালের কথায় উইল চুরি করিতে সম্মত হইল না। সে শিহরিল—বলিল "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও পারিব না।" হাজার টাকার লোভেও ঐ হেয় কায করিতে সে সম্মত হয় নাই। কিন্তু যখন ঐ চতুর প্রবঞ্চক হরলাল বিধবা বিবাহের লোভ দেখাইল তখন রোহিণী সম্মত হইল। কিন্তু সে ঐ পাপের পুরস্কার পাইল লাঞ্ছনা, যার জন্য সে চুরি করিল সেই তাহাকে বলিল "যে চুরি করিয়াছে তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" ইহাতে রোহিণীর প্রাণে আঘাত লাগিবারই কথা, সরলা স্ত্রীলোককে যে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রবঞ্চনাবাক্যে প্রতারিত করে তার মুখে ওরূপ সাধুতার ভাণ শোভা পায় না, সেরূপ

মিথ্যাবাদী শঠ মনুষ্যপদবাচ্য হইবার যোগ্য নহে। এরূপে লাঞ্ছিতা ও প্রতারিতা হইয়া রোহিণীর চক্ষে জল আসিয়াছিল। অভাগিনী রোহিণী!

অতঃপর সেই বারুণী পুষ্করিণী। এইখানেই আখ্যায়িকার প্রকৃত সূচনা ও শেষ হয়। এইখানেই আমরা গোবিন্দলালের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ পাই। কৃষ্ণকান্তের উইলে এই বারুণী পুষ্করিণীই প্রধান ঘটনাস্থল, এবং তথাঘটিত ব্যাপারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ঐ বারুণী পুষ্করিণী ও তথায় রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের প্রথম সাক্ষাৎ, তিনটি জীবনের গতি একেবারে ফিরাইয়া দিবে। প্রথম সাক্ষাতে রোরুদ্যমানা রোহিণীর প্রতি দয়া পরবশ হইয়া গোবিন্দলাল বলিয়াছিলেন "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক আমাকে জানাইও। নিজে না পার, তবে আমাদের বাড়ির স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা জানাইও।" রোহিণীও বলিয়াছিল "একদিন বলিব, আজ নহে, একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" রোহিণীর কিসের দুঃখ গোবিন্দলাল তখন ঘুণাক্ষরেও তাহা জানেন না, জানিলেও সে দুঃখ মোচনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। রোহিণী ভাবিত কোন্ অপরাধে তাহার এরূপ অবস্থা ঘটিল, কোন্ অপরাধে যৌবনের প্রথম অবস্থাতেই সে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা? সমাজ কি নির্দ্দয় ও অন্ধ; শাস্ত্র, যুক্তি ও মনুষ্যত্বের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, চক্ষু আরক্তিম করিয়া নিরপরাধিনী অভাগিনী বালবিধবাদিগকে কত কষ্ট প্রদান করে। এবং তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে শাসনে রাখিতে চাহে, কিন্তু হায়! সমাজ একবারও ভাবে না, যে তাহার প্রভাব অপেক্ষা প্রকৃতির প্রভাব সহস্র গুণে প্রবল। সে প্রভাব রোধ করিবার ক্ষমতা অনেকেরই

নাই, পূর্ণযৌবনসম্পন্না রোহিণীরও যে সে ক্ষমতা থাকিবে না ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তখন পর্য্যন্ত রোহিণী কলুষিতা হয় নাই ও আমাদের সহানুভূতিও হারায় নাই, পূর্ণযৌবনের অতৃপ্ত বাসনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নীরবে সে আপন অদৃষ্টের নিন্দা করিত এবং বোধ হয় সমাজকেও গালি দিত। কিন্তু কুক্ষণে হরলাল তাহাকে বৃথা বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কুক্ষণে সে সেই প্রলোভনে পড়িয়া গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সে যাহার জন্য নিরপরাধী গোবিন্দলালের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা ও লাঞ্ছিতা হইল, তখন স্বভাবতঃ তাহার অনুতাপ হইল ও গোবিন্দলালের দেবমূর্ত্তি ক্রমে তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে লাগিল। নিরপরাধী ব্যক্তির উপর কোনও অন্যায় বা অত্যাচার হইলে, মনুষ্যের, বিশেষতঃ কোমলপ্রাণা স্ত্রীলোকের স্বতঃই তাহার প্রতি সহানুভূতি হইয়া থাকে, বিনাদোষে গোবিন্দলালের অনিষ্ট করিতে গিয়া রোহিণীর প্রথমে তাঁহার প্রতি সহানুভূতির উদয় হইল, পরে সেই সহানুভূতি ক্রমে গাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল। গোবিন্দলালকে সে বালককাল হইতে দেখিতেছিল, কিন্তু কখনও তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই; হঠাৎ তাহার এরূপ ভাবান্তর হইল কেন? ইহার কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।—বিনাপরাধে গোবিন্দলালের প্রতি অন্যায়াচরণ। কিন্তু গোবিন্দলালকে স্বামীস্বরূপে পাওয়া অসম্ভব। বিশুদ্ধচিত্ত গোবিন্দলাল তাহার প্রণয়ের কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না ইহাও রোহিণী জানিত। এ অবস্থায় মৃত্যু ভিন্ন রোহিণীর ন্যায় হতভাগিনীর উপায়ান্তর নাই। সে মৃত্যুকামনা করিল কিন্তু মৃত্যু ডাকিলে আসে না। রোহিণী চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইলে পরদুঃখকাতর

গোবিন্দলাল তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া রোহিণীর মনের কথা জানিতে পারিলেন। তাঁহার আহ্লাদ হইল না, রাগও হইল না দয়া হইল। ইহাতে গোবিন্দলালের উন্নত হৃদয় ও নির্ম্মলচরিত্রের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অযাচিতভাবে কোনও সুন্দরী যুবতীর প্রেমলাভ করিয়াও যিনি উদ্বেলিত হন না, ধন্য তাঁহার সংযমশক্তি! গোবিন্দলাল ভাবিয়াছিলেন চোখের আড়াল হইলে রোহিণী তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে, এই জন্য রোহিণীকে দেশত্যাগে সম্মত করাইয়াছিলেন। "এইরূপে কলঙ্ক, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল।" কিন্তু রোহিণীর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না—সেখানে যাইলে সে গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইবে না। তবে মৃত্যু ভিন্ন রোহিণীর আর গত্যন্তর কোথা? বালিকাস্বভাবা ভ্রমরও ক্ষীরি ঝি দ্বারা রোহিণীকে বারুণী পুকুরে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল। সত্য সত্যই রোহিণী ডুবিল, কলঙ্কের পঙ্কিল জলে ডুবিবার সূচনা হইল। হতভাগিনী যদি সেই সময়ে মরিত তাহা হইলে তাহার, গোবিন্দলালের ও ভ্রমরের তিন জনের পক্ষেই ভাল হইত। অথবা যদি গোবিন্দলাল ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি তাহাকে বাঁচাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিত না। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খণ্ডন করে কাহার সাধ্য। দয়াপরবশ হইয়া গোবিন্দলাল যে জলমগ্না রোহিণীকে বাঁচাইল, কে জানিত গোবিন্দলাল স্বহস্তে সেই রোহিণীকে নিধন করিবে, কে জানিত সাধের বারুণী পুষ্করিণীই গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর কালস্বরূপ হইবে! গোবিন্দলাল দেখিয়াছিলেন স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে, অন্ধকার জলতল আলো করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সেই স্থানেই যে তাঁহার, ভ্রমরের ও রোহিণীর অদৃষ্টলিপি অদৃশ্যভাবে লিখিত ছিল, তখন তিনি তাহা পাঠ

করিতে পারেন নাই। গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুবিয়া রোহিণীকে তুলিলেন ও শুশ্রূষার জন্য মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদ গৃহে লইয়া গেলেন। "জীবনে হউক, মরণে হউক রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন অপর কোনও স্ত্রীলোক কমল সে উদ্যান গৃহে প্রবেশ করে নাই।" কিন্তু প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিলেও তখনও রোহিণী গোবিন্দলালের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহারও আর বিলম্ব নাই। রোহিণীর উদ্ধার বৃত্তান্তই কৃষ্ণকান্তের উইলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অংশ বলিয়া বোধ হয়, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও মহৎচরিত্রের কিরূপ ক্রমশঃ অধঃপতন হইতে পারে ইহা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গোবিন্দলাল মালীকে রোহিণীর মুখে ফুঁ দিতে বলিল সে ঘামিতে আরম্ভ করিল, স্পষ্ট বলিল "মু সে পারিবি না অবধড়" সে দেবদুর্ল্লভ অধরে মালীর ফুঁ দিতে কি কখনও সাহস হয় ? অগত্যা গোবিন্দলাল তখন 'সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর যুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর যুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন। সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া ভ্রমরেরই কপালে লাগিল"। কবির কি নৈপুণ্য ও অসাধারণ মনুষ্যচরিত্র জ্ঞান! যখন রোহিণীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গোবিন্দলালের প্রমোদ গৃহে আনা হইয়াছিল তখনও ভ্রমরের কপালে লাঠি লাগে নাই কারণ তখনও গোবিন্দলালের চিত্ত বিচলিত হয় নাই, কিন্তু যখন গোবিন্দলাল "ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর যুগলে, ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর যুগল" স্থাপিত করিলেন তখনই তাঁহার পরাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই, তখনই তাঁহার শরীরের ভিতর কি এক তাড়িৎ প্রবাহ

বহিয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই, যে স্মৃতি গোবিন্দলাল কখনও ভুলিতে পারিলেন না বলিয়াই ঠিক ঐ সময়ে ভ্রমরের কপালে লাঠি লাগিয়াছিল।

রোহিণী বাঁচিল কিন্তু বাঁচিয়া তার সুখ কি? তাই সে গোবিন্দলালকে বলিল "কেন আমাকে বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী"?

গো। তুমি মরিবে কেন?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেলা কি হইবে? আমি মরিব। এবার না হয় তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন, বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে?"

"চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।"

দারুণ মনের দুঃখে রোহিণী আজ এত মুখরা। এই বিষয়ে বিষবৃক্ষের সহিত একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ প্রথমে কুন্দনন্দিনীর নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করেন, কুন্দনন্দিনীর হৃদয় অপরিমিত প্রেমে পূর্ণ থাকিলেও মুখে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীই প্রথমে প্রণয় জ্ঞাপন করে, আর গোবিন্দলাল নগেন্দ্রের ন্যায়, কখন রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হন নাই। কিন্তু

রোহিণীর ফুল্ল অধরে অধর স্থাপনের পর ও তাহার ঐ পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি শুনিয়াই গোবিন্দলালের চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সংযম চেষ্টাও বিলক্ষণ করিয়াছিলেন। এই সংযম চেষ্টায়ও নগেন্দ্রে ও গোবিন্দলালে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, নগেন্দ্র রূপমোহের বশীভূত হইয়া সুরার আশ্রয় লইয়াছিলেন, গোবিন্দলাল নগেন্দ্র অপেক্ষা শতগুণ কঠিন পরীক্ষায় পড়িলেও সুরার আশ্রয় না লইয়া, ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া দরবিগলিত লোচনে ডাকিয়াছিলেন "হা নাথ, হা নাথ, তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব, ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব"। গোবিন্দলালের পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গ তুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর কালো, ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। গোবিন্দলাল মনে মনে শপথ করিলেন মরিতে হয় মরিব কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না"। এইরূপ স্থির করিয়া আত্ম-জয়ের জন্য তিনি বিদেশ যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায় হিতে বিপরীত হইলে, চোখের আড়াল হইলে ক্ষীরি চাকরাণী ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইলেও ক্ষণিক ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া রোহিণী ও গোবিন্দলাল সম্বন্ধে কুৎসা রটাইল, ক্রমে উহা রাষ্ট্র হইয়া ভ্রমরের কাণে গেল। কিন্তু স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে নাই, কমলমণি একথা সূর্য্যমুখীকে বুঝাইয়াছিলেন, ভ্রমরও প্রথমে স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু কমলমণি সূর্য্যমুখীর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভ্রমরের নাই, ভ্রমর বালিকা, গোবিন্দলাল কাছে নাই যে তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। রোহিণীরও কাণে এ মিথ্যা অপবাদ পৌছিল, এইবার সে ভ্রমরের সর্ব্বনাশে

প্রবৃত্ত হইল এবং আপনার পাপের পথও পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইল। এই স্থান হইতে রোহিণী আমাদের সহানুভূতি হারাইল, এই স্থান হইতে দুইটি নির্ম্মল চরিত্রের অধঃপতনের পথ পরিষ্কার হইল এবং বালিকা ভ্রমরেরও স্বামীর প্রতি অমূলক সন্দেহে সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল। একটি সামান্য ভ্রমে, অমূলক সন্দেহ প্রণোদিত একখানি তীব্র পত্রে ভ্রমরের চিরজীবন বিষময় হইল। ইহাতে ভ্রমরেরই দোষ বলিতে হইবে, স্বামীর প্রতি এত অবিশ্বাস, না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া স্বামীকে ত্যাগ ? ইহাতে গোবিন্দলালের অভিমান ও ক্রোধ হইবারই কথা। সেই অভিমান ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দলাল রূপতৃষ্ণা মিটাইতে অগ্রসর হইলেন, নগেন্দ্র যেরূপ কুন্দকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়াছিলেন, গোবিন্দলাল যদি রোহিণীকে সেইরূপ বিবাহ করিতেন তাহা হইলে আমাদের সহানুভূতি হারাইতেন না কিন্তু তাহা না করিয়া রক্ষিতা ভাবে রোহিণীকে রাখায় আমাদের সহানু-ভূতি হইতে বঞ্চিত হইলেন, এবং সেই পাপের ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত ও হইয়াছিল। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাপে মগ্ন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে জন্মের মত হারাইলেন।

প্রথমে রোহিণীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন সে পাপের পথে অগ্রসর হইল তখন তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইল এইরূপে কত শত বালবিধবা নিষ্ঠুর সমাজের কঠোর শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া যৌবনের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি গুলি দমন করিতে না পারিয়া রোহিণীর ন্যায় পাপস্রোতে গা ঢালিয়া দেয়! তবু সমাজের চৈতন্য হয় না।০ যে সব বৃক্ষে সুধাময় ফল ফলিত সে সকল বৃক্ষে বিষময় ফল ফলিতেছে, রোহিণী পুনরায় স্বামী লাভ করিতে পাইলে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিত ও স্বামীর শান্তি ও প্রীতিবর্দ্ধন

করিতে পারিত সন্দেহ নাই, কারণ রোহিণী রূপসীও বটে গৃহ কার্য্যেও অতিশয় নিপুণা! কিন্তু তাহা হইল না, পাপস্রোতে রোহিণী গা ঢালিয়া দিল, যদি সুধু গোবিন্দলালকে পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলেও তাহার প্রতি আমাদের কতক সহানুভূতি থাকিত। কিন্তু পাপের পথে একবার অগ্রসর হইলে পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, পাপ প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাই রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া বলিয়াছিল, "দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না তা নয়। গোবিন্দলালের রং ফরশা কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ--আ মরি! কি চোখ!" পাপিয়সী রোহিণীর এখন আর কেবল গোবিন্দলালে পরিতৃপ্তি হয় না, সুন্দর মুখ ও চোখ দেখিলে তাহার পাপ হৃদয়ে নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। সে যে গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইবে এমন ইচ্ছা তাহার ছিল না, তবে সে "মনে করিয়াছিল অনবধান মৃগ পাইলে কোন ব্যাধ, ব্যাধ ব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে শর বিদ্ধ না করিবে?" ভাবিয়াছিল নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গরু মারে, সকল গরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে কেবল জয় পতাকা উড়াইবার জন্য"। কিন্তু তাহার সংকল্প যাহাই থাক তাহার মত চরিত্রের লোক সুযোগ পাইলে যে গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাস-ঘাতিনী হইত না, ইহা সম্ভব নয়। মিসেস্ জেমিশন ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, রোহিণী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে "She is a brilliant antithesis, a compound of contradictions, of all we most hate, with what we most admire." যে রোহিণী একবার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল, আজ তার মরিতে সাহস হইল না। যে গোবিন্দলাল জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া

প্রাণদান করিয়াছিলেন, আজ সেই গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রাণহরণে উদ্যত। রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনি যাইতেছি, আমায় মারিও না। গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তারপর বড় শব্দ তারপর বড় অন্ধকার! গোবিন্দলাল, কি করিলে? তুমিই না জলমগ্না রোহিণীকে দেখিয়া বলিয়াছিলে "মরি মরি কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" রোহিণীর শত অপরাধ থাকিলেও তাহার ঈদৃশ পরিণাম পাঠ করিয়া, অজ্ঞাতসারে নয়ন অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া যায়, হৃদয় ব্যথিত হয়।

রোহিণী মরিল, ভ্রমরও মরিল। ভ্রমর পতিব্রতা সাধ্বী হইলেও কখনও আদর্শ হিন্দু স্ত্রী হইতে পারে না। ভ্রমর বালিকা ও অভিমানিনী, সূর্য্যমুখী বা কমলমণির ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহার নাই, সূর্য্যমুখীর ন্যায় স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিও বুঝি বা ভ্রমরের নাই। একই অবস্থাপন্ন ভ্রমর ও সূর্য্যমুখীর কার্য্যকলাপ কত ভিন্ন। স্বামীকে বিপথগামী দেখিয়া সূর্য্যমুখী স্বয়ং নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীর সুখ সম্পাদনে যত্নবতী হইয়াছিলেন, এবং স্বামীকে কটু কথা বলেন নাই, আর ভ্রমর অন্যায় অপবাদে বিশ্বাস করিয়া, গোবিন্দলালকে একবার কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে লিখিল "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমরাও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাস ও নাই। তোমায় দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ি আসিবে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও আমি কাঁদিয়া

কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।” কি নিষ্ঠুর কথা, আদর্শ হিন্দু স্ত্রী কখনই স্বামীর প্রতি ভক্তি হারাইতে পারেন না, স্বামী যদিও বিপথগামী হয় তথাপি হিন্দু স্ত্রীর পরিত্যাজ্য নহে পাশ্চাত্য Divorce বা পতিত্যাগ হিন্দু স্ত্রী স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন ভ্রমর অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা তাই, স্বামী অপেক্ষা ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিত। আমরা কিন্তু এ যুক্তির পক্ষপাতী নহি। স্বামী অপেক্ষা হিন্দু স্ত্রীর আবার কি ধর্ম্ম হইতে পারে, পতিদেবতা হিন্দু স্ত্রীর নিকট স্বামী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কি থাকিতে পারে? “যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি” একথা সকলে বলিতে পারে, কিন্তু যদি কোন স্বামী যথার্থই কোনও পাপ কার্য্য করিয়া থাকে, হিন্দু স্ত্রীর কি তাহাকে ত্যাগ করা উচিত, না স্বামাকে সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা উচিত? তাহা যদি না পারিল তবে হিন্দুস্ত্রীর সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা কোথায়? ভ্রমর পতিব্রতা হইলেও বালিকা-সুলভ অভিমান বশতঃ নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিল! ধরিতে গেলে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করে নাই ভ্রমরই গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়াছিল। ভ্রমরের সেই সাত দিনের শিশুর জন্য বিলাপ অতি স্বাভাবিক ও মর্ম্মভেদী, উহা পড়িলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়,

আমার ননীর পুতলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা, কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস না, মরিলে কি আর দেখা দেয় না”—উঃ কি মর্ম্মান্তিক।

গোবিন্দলালেরও যে অভিমান ছিল না এরূপ নহে, যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলিয়াই এরূপ ঘটিল, রূপমোহ ও অভিমান এই দুইটিই কৃষ্ণকান্তের উইলে সকল অনিষ্টের মূল। নূতন সংস্করণে গ্রন্থকার

গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় পুরাতন সংস্করণে গোবিন্দলালের আত্মহত্যাই স্বাভাবিক হইয়াছিল ? যে হত্যাকারী, যাহাকে সাধ্বী ভ্রমর ইহ জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে, তাহার মত লোক কি লইয়া সংসার রূপ মহাশশ্মানে বাস করিবে, কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, কে তাহার আঁখিজল মুছাইবে, যে গোবিন্দলাল পরের দুঃখ দেখিলে কাঁদিত, আজ তাহার জন্য কাঁদিবার কেহ নাই ! দারুণ অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, এমন সময়ে উন্মাদগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিল, রোহিণী বলিতেছে "এইখানে, এমন সময়ে, আমি ডুবিয়াছিলাম, তুমি আইস, ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে তাহার পূণ্য বলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর, মর।" গোবিন্দলাল দারুণ হৃদয়বহ্নি নিবাইবার জন্য স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে সেই বারুণী পুকুরে ডুব দিলেন। সব ফুরাইল !

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

চাটুকারের আত্মপরিচয়।

হ্যাঁগা তোমরা কি কেহ আমায় চিনিতে পার ? সেই যে দিন আমি নিশ্চিন্দপুরের নবাবের দক্ষিণ পার্শ্ব আলো করিয়া গঙ্গারধার দিয়া কুচ্‌কুচে কালো রঙের চৌঘুড়ী হাঁকাইয়া বেড়াইতেছিলাম। আর তোমরা তখন পদব্রজে আমাদের সম্পদে হিংসা করিতে করিতে যাইতেছিলে আর মনে মনে ভাবিতেছিলে, যে পরমেশ্বর ক্ষমতা সত্ত্বেও

সকল লোককে টাকা কড়ি জুড়ীগাড়ী দেখনা তিনি কখনও সর্ব্বশক্তি-মান নহেন। হাঁ, আরও কি বলিয়াছিলাম আমি নবাবের দক্ষিণ পার্শ্ব উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে নবাব মনে করিয়াছিলে কারণ পরিচ্ছদে আমাপেক্ষা লক্ষগুণে পরিপাটী দেখাই-লেও নবাব ত আর রূপে আমার কাছে কল্কে পান না। আবার আমি সুরূপ বলিয়াই একটী সামান্য পাঞ্জাবি গায়ে থাকিলেও আমাকে বড়লোকের মত দেখাইতেছিল কারণ বড়লোক মাত্রেরই আজ কাল সাধা সিধা পোষাকেই বাহার দেওয়াটা একটু সকের মধ্যে দাঁড়াই-য়াছে। আর বড়লোকের পার্শ্ববর্ত্তী চোগা চাপকান শাল আবৃত সেই আসল কাশ্মিরী নবাববাহাদুরকে অবশ্যই আমার কোন লক্ষ্ণৌয়া কালোয়াত মনে করিয়া থাকিবে। ওসব কথা যাক্ আমরা যে অন্ততঃ তেরবার সেই রাস্তাটীতে এদিক ওদিক জুড়ী ফিরাইলাম কিন্তু একটীও পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল না কেন। যে রাস্তায় রাজা রাজড়া সাহেব বিবি এবং গণ্য মান্য ভদ্রলোক গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বায়ু সেবন করে সে রাস্তা দিয়া কেন অনবরত তাহাদের পরিচিত লোক সকল এদিক ওদিক পায়ে হাঁটিয়া বেড়ায় না? সেটা যে দেখিয়াও সুখ আছে। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব যত বার আমি গাড়ী চড়িয়া যাই দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একটীও পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না। আমার বোধ হয় এটা পরিচিত লোকদের দুষ্টামি। যাক্ আমি বেশ জানি তোমরা সেদিন আমাকে উক্ত অবস্থায় দেখিয়াছ, তবুও কেহ এখনও চিনিতে পারিতেছ না?

যদি সে দিনের কথা মনে না থাকে তবে আর এক দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সেই যে দিন তোমরা থিয়েটার দেখিতে গিয়া নীচের গ্যালারীতে বসিয়াছিলে আর আমি তোমাদের চোখের

উপরে একটি বক্সে বসিয়া, আমার পার্শ্বস্থিত একটী লোকের সহিত অনর্বরত হাস্যালাপ করিতে ছিলাম, রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছিলাম, শীত করিলেও পাখার বাতাস খাইতেছিলাম, আর খাইতেছিলাম প্রতি দশমিনিটে একটী চক্‌চকে ডিবা হইতে পান। আমার একচক্ষু তোমাদের উপর ছিল আর এক চক্ষু সাম্‌নের চিকঢাকা একটী বক্সের দিকে। বাস্তবিক চসমা থাকার কি মজা! তোমরা মনে করিতেছিলে আমি একদৃষ্টে থিয়েটার দেখিতেছি, অহো, তোমরা কি বোকা!!

তবুও আমাকে চিনিলে না? আচ্ছা বড়লোকের বাড়ী সমারোহে কোনও কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে কর্ম্ম করা হইতে ঠিক ভোজনের শেষ পর্য্যন্ত কি আমায় দেখিতে পাও না? কর্ম্ম করিবার সময় আমি পরামর্শ দিই, লোক সমাগমে আমি পর পর দশজন মাত্র চাকরের নাম তার স্বরে উচ্চারণ করিয়া তামাক দেওয়াই। সকলে আহারে বসিলে পাছে কোনও জিনিস দেওয়া ভুল হয় এইজন্য আমিও তাহাদের সহিত আহারে বসি। আর আহারান্তে কাল আবার পরিশ্রম করিতে হইবে এই ভাবিয়া একটু গড়াইয়া লই। পরদিন যথাসময়ে অর্থাৎ বাবুরা নিদ্রাভঙ্গে বাহিরে চা খাইতে আসিলে আবার হাজির হই। চা খাইবার সময়ে একটু খপর না খাইলে বাবুদের ঘুমঘোর কাটে না এবং মধ্যাহ্নভোজনের উপযোগী ক্ষুধার উদ্রেক হয় না তাই দুই একটা সহরের সংবাদ দিই, কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না যে আমি দিন রাত্রি এমন কি তিন চারি দিন যাবৎ বাড়ির বাহির না হইয়া কিরূপে পূর্ব্বদিবসের টালিগঞ্জের সংবাদ বা সেইমুহূর্ত্তে ছোটলাট সেক্রেটারির সহিত আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ কথোপকথন করিতেছেন কেমন করিয়া জানিতে পারিলাম। আমার

একটু দূরদৃষ্টি আছে। এইবার বোধ করি আমায় চেন চেন করিতেছ কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলিয়া উঠিতে পারিতেছ না। তোমাদের চক্ষুলজ্জা একটা বিষম দোষ এমন কি ঐ দোষই তোমাদের উন্নতি না হইবার বিশেষ কারণ। যদিবল আমার কি চক্ষু বা লজ্জা নাই কেন থাকিবে না কিন্তু তফাতের মধ্যে তোমাদের উটী একটী দোষ আর আমার পক্ষে গুণ। এই মনে কর তোমার মনিব তোমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজা খেতাবটা কোনও কাজের নয়, না? কেবল অন্তঃসার শূন্য" আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি তুমি উত্তর করিতে "আজ্ঞা না, বড় লোকই মহারাজ হয়; বিস্তর টাকা থাকা চাই তাহার উপর মান মর্য্যাদা ও দেশের প্রভূত উপকার করিয়াই লোকে ঐ দেব দুর্ল্লভ খেতাবে বিভূষিত হয়"। আমায় জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম "মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যত অপদার্থ লোকেই মহারাজ হয়। আপনার রায়বাহাদুর খেতাবটী খোদ (?) মহারাণী আপনার জন্য জাহাজে করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই মনে করুণ সাহেব সুবরাই আপনাকে রায় বাহাদুর বলিয়া সম্মান করে, যে সে লোকের তো বলিবার যো নাই। আর মহারাজ না হইলেও ভোজপুরের দরোয়ানেরা যাকে তাকে মহারাজ বলিয়া উপহাস করে।" ফলে এইরূপ যুক্তি পূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়াই প্রভু স্পষ্টবক্তা বলিয়া যারপরনাই আমার প্রশংসা করিবেন, আর তুমি? তুমিত বিরাগভাজন হইবার জন্যই জন্মিয়াছ।

কি আপদ্ এখনও তুমি আমায় চিনিলে না। সাধে কি তোমায় বোকা ইত্যভিহিত করিলাম? আর একবার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাই;—তুমি পিতৃদায়ে কন্যাদায়ে অথবা উদরান্নের দায়ে যখন কোনও নামজাদা বড়লোকের কাছে দুঃখ জ্ঞাপন ওরফে যৎকিঞ্চিৎ

সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় আসিয়া দ্বারবানের তাড়া এবং চাকরদের রুষ্টভাব পার হইয়া বাবুর সম্মুখীন হইয়াও কাহার নিমিত্ত তোমার দুঃখ কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর করাইতে পার নাই? বাবু কি কালা? তাহা নহে। তাঁহার কর্ণকুহরে কর্ণেজপরা অনবরত মধু সিঞ্চন করিতেছে এমন সময়ে কি তোমার দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে স্থান পায়?

কি বলিলে? আমার নাম 'খোসামুদে'? আচ্ছা একটু মিষ্ট কথায় চাটুকার অথবা অত স্পষ্ট না বলিয়া 'সখা' বা 'বয়স্য' বলিলেই পারিতে। অথবা তোমার নিজের তোষামোদ করা আসে না তুমি কেমন করিয়াই বা বলিবে? তোমার একেবারে যে তোষামোদ করা আসে না তাহা আমি স্বীকার করি না। তুমি কোনও ক্রমে একটী পনর টাকা মাহিনার চাকরী যোগাড় করিয়াই বন্ধুবর্গকে বলিলে আমি অমুক সাহেবের নিকট বরাবর যাইয়া আমার নামধাম উপাধি সম্বলিত কার্ড পাঠাইয়া দিলাম। সাহেব আমার পরিচয়াদি পাইয়াই এবং সার্টিফিকেটে আমার গুণগ্রাম দেখিয়াই উপস্থিত বেশী মাহিয়ানার চাকরী খালি নাই বলিয়া আপাততঃ পনের টাকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আসল কথা কিন্তু চাকরীটা এত সহজ লভ্য না হইতেও পারে। খুব সম্ভব তুমি একের নম্বর সাহেবের চাপরাশীকে একটী তোষামোদ মাখান দুয়াণি দিয়া কার্ড পাঠাইয়াছ। দ্বিতীয়তঃ সাহেবের নিকট চাকরীটি পাইলে তোমার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পুরুষগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন ইত্যাদিরূপ এক শিশি তৈল খরচ করিয়াছ। তারপর ২৫ টাকা বেতনের পদটী ১৫ টাকায় লইতে স্বীকৃত হইয়া আপিসের তপোবিঘ্নকারী দৈত্যগণের অর্থাৎ ২০০৲ টাকা দামের বড় বাবু হইতে সাড়ে পনর টাকা বেতনের

কেরাণী বাবুর মনস্তুষ্টি বা খোসামোদ করিয়াছ, করিতেছ এবং ভরশা করি খোস তবিয়দে হোস্ বাহালে স্বইচ্ছায় করিতে থাকিবে। এর উপর শয়নে স্বপনে জুজুরূপী অপরার্দ্ধ দেবীর মনরক্ষা করিয়া থাক, এই মন রক্ষার মধ্যে ৮০/১৫ খাঁটি তোষামোদ বিরাজমান নহে কি? তাই বলি আমি যেরূপ তোষামোদজীবি তুমিও তদ্রূপ। তবে বেশী আর কম, পৃথিবীতে কেবা তোষামোদ না করিয়া থাকে এবং কেই বা তোষামোদে তুষ্ট বই রুষ্ট হয়। কান্ পাত্লা স্কুলের বালক হইতে ছাল পুরু ব্যবহার জীবের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখ। আর অতকথার দরকার কি স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বা দেবাদিদেব মহাদেব কি খোসামোদের কম করিয়াছেন? অপর খুচ্‌রা দেবগণের কথা আর কি বলিব তাঁহাদের একটা "তথাস্তু" পাইবার জন্য কতই না তপস্যা করিতে হয় আবার সময়ে সময়ে ঘৃতনৈবেদ্য হইতে ছাগাদি পশু পর্য্যন্তও ঘুষ দিতে হয় নচেৎ দুর্ভাগ্য নরকুলের দরখাস্ত কর্ণে পৌঁছায় না।

যাক্ এত করিয়া আমার এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার যবনিকা অন্তরালে একটু আভাষ পাওয়া গেল।

শ্রী অঃ।

রূপোন্মাদ।

(গল্প)।

ললিতমোহন বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মফঃস্বল হইতে আসিয়া আইন অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায়

এক খানি ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করেন। ললিত মোহনের চরিত্র অতি বিশুদ্ধ, তাঁহার স্ত্রী, লবঙ্গলতা রূপে তিলোত্তমা না হইলেও গুণে আদর্শ হিন্দুপত্নী। স্বামী কলিকাতায় একাকী থাকিলে সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে, এই জন্য তিনি স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাসায় একজন দ্বারবান্ একজন পরিচারিকা ও একজন পাচিকা ব্যতীত আর কেহই থাকে না। ললিত মোহনের পিতা ও মাতা উভয়েই দুই তিন বর্ষ পূর্ব্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না, দেশে সামান্য জমিদারী থাকাতে চাকরি না করিয়াও বেশ সঙ্গতি ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ললিতমোহন পিতার এক মাত্র পুত্র ও বিষয়ের অধিকারী।

কলিকাতায় ললিতমোহনের কয়েকজন বন্ধু জুটিল, তাহাদের মধ্যে দুই একজন অতিশয় চরিত্রহীন, তাহারা ললিত মোহনকে কুপথে লইয়া যাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মফঃস্বলবাসী নূতন কলিকাতায় আসিলে নানারূপ প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা, এজন্য ললিতমোহন বড় একটা বাটীর বাহিরে যাইতেন না। তাঁহার বন্ধুরা এজন্য তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিদ্রুপ করিত। তাহাদের অনেক অনুরোধ ও বিদ্রুপের পর একদিন ললিতমোহন থিয়েটারে যাইতে সম্মত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি থিয়েটার কখনও দেখেন নাই। ললিত মোহন আর তিন জন বন্ধু সহ উপরের একটি বক্সে গিয়া বসিলেন। সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, হৃদয়গ্রাহী অভিনয় শুনিয়া প্রীত ও মুগ্ধ হইলেন, অভিনেত্রীগণের নৃত্যগীত ও বিলোল কটাক্ষে ললিতের হৃদয় বিচলিত হইল। পরে যখন কোনও বিখ্যাতা

অভিনেত্রী পরিসাজে সজ্জিত হইয়া কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠে সুমধুর গান আরম্ভ করিল, তখন ললিতমোহনের মস্তক ঘুরিয়া গেল। এই সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু ঐ অভিনেত্রীর প্রতি একটি সুন্দর গোলাপের তোড়া নিক্ষেপ করিল, সেও ঈশৎ হাস্য মুখে ললিত প্রভৃতির দিকে ২।৩ বার বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অভিবাদন সহকারে সাদরে ঐ তোড়াটি তুলিয়া লইল। সে কটাক্ষ ললিতের হৃদয় বিদ্ধ করিল। কিন্তু তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার ভাবান্তর কিছুই বুঝিতে পারিল না। অভিনয় সমাপনান্তে ললিতমোহন গৃহে ফিরিলেন এবং তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার ভাবান্তর বুঝিতে না পারিলেও পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বামীর মর্ম্মস্থল ভেদ করিল, সস্নেহে লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রাণাধিক, আজ এত অন্যমনস্ক ও মলিন দেখিতেছি কেন, অসুখ হইয়াছে কি" ? ললিতমোহন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন "কিছুইত হয় নাই, তুমি এখনও জাগিয়া রহিয়াছ" ?

"আমি শুইয়াছিলাম, কিন্তু ঘুম হইল না" এই বলিয়া লবঙ্গ স্বামীর আহারের জন্য আসন প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ললিতমোহন বলিলেন, আমি আজ আর কিছু খাইব না, ভাল ক্ষুধা নাই, সুধু একটু জল দাও." জল ও পান আনিয়া দিলে সস্নেহে স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিলেন, কিন্তু তখনই সেই অভিনেত্রীর ফুল্লকুসুম কান্তি মুখখানি মনে পড়িল, সেই মধুর কণ্ঠস্বর ও বিলোল কটাক্ষ মনে পড়িল, প্রাণের ভিতর দিয়া যেন প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল, লক্ষ্মী স্বরূপিনী স্ত্রীতে সে তীব্র রূপজ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন না, সে রাত্রি ললিতমোহনের ভাল নিদ্রা হইল না। পর শনিবার বন্ধুরা কোনও নূতন অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, ললিত

মোহন প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু রূপ তৃষ্ণা প্রবল হইল, যাইতে সম্মত হইলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় সে দিনও একটী বক্স ভাড়া হইল, কিন্তু যতক্ষণ না পূর্ব্বোক্ত অভিনেত্রী দেখা দিয়াছিল ততক্ষণ ললিতমোহনের অন্যের অভিনয় ভাল লাগে নাই, উৎসুকচিত্তে কেবল তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিরহিনী বেশে ঐ অভিনেত্রী দেখা দিল। তাহার তৎকালীন কাতর মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়ে অনেকেরই হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, ললিতমোহন অশ্রুসংম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার এতাদৃশ দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুরা হাস্য ও বিদ্রূপ করিয়াছিল কিন্তু যখন ঐ অভিনেত্রী অতি করুণ স্বরে এক মর্ম্মভেদী গান আরম্ভ করিল, তখন ললিতমোহনের আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিল না, একেবারে আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ভুয়োভুয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য ললিতমোহনের ঈদৃশ ব্যবহারে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষিত হইয়াছিল, ঐ অভিনেত্রীও সেই অবধি যতবার আসিয়াছিল ললিত মোহনের দিকে করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল। উহা ললিতের হৃদয়ে বিদ্ধ রহিল। তাহার সহিত আলাপ করিবার বাসনা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী হইল।

অবশেষে একদিন বন্ধুদের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলেন, তাহারা ললিতমোহনের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। একজন বলিল "কেমন ভায়া? That's like a good boy. বলি আমাদেরও ত স্ত্রী আছে কিন্তু তাই বলিয়া কি লক্ষ্মণের মত ব্রত করিতে হইবে নাকি, অন্য মেয়ে মানুষের মুখ দেখিবার যো নাই"? আর একজন বলিল "বাহিরে যত সুখ ঘরের স্ত্রীতে কখনও সেইরূপ সুখ হইতে পারে না। যদি তুমি একদিন নীরদার বাড়ী যাও, তবে আর

ঘরে ফিরিতে তোমার ইচ্ছা হইবে না। যেমন চেহারা, তেমনি গলা, তেমনি আদর ও যত্ন, বিবাহিতা স্ত্রীও সেরূপ যত্ন করিতে জানে না।” তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, “আরে বিবাহিতা স্ত্রীর কথা আর বল না, বাবা টাকার লোভে একটা জন্তু জুটাইয়া দিয়াছেন, আঁহা স্ত্রীত নয় সাক্ষাৎ পেত্নী, রূপে যেন বার্ণিস জুতা, গুণের ঘাট নাই, বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া অহঙ্কারে মটিতে পা পড়ে না। ঘরে সুখ হইল না বলিয়াইত বাহিরে যাইতে শিখিয়াছি ; এতে আমার দোষ কি, বাবার দোষ ?” উহাদের ঐরূপ কথা শুনিয়া ললিত ভাবিল “আমারওত ঘরে রূপ তৃষ্ণা মিটাইবার উপায় নাই, আমার স্ত্রী পরম গুণবতী হইলেও প্রাণ উন্মাদকারী রূপ কোথায় ? কিন্তু স্নেহময়ী স্ত্রীর গুণের কথা স্মরণ হওয়াতে ললিতের চক্ষে জল আসিল, যে পথে যাইতেছেন সে পথ হইতে নিবৃত্তি হইবেন কিনা তখনও ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন বন্ধু বলিলেন “তবে আর দেরি করে কাজ কি ; সন্ধ্যার সময়ই যাওয়া ভাল নটার পরে আবার তার বাবু আসিবে। ললিতমোহনের সেই মুখ মনে পড়িল, পাপের পথে অগ্রসর হইলেন।

যোড়াসাঁকোর একখানি দ্বিতল গৃহের মুক্ত বাতায়ন হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি নির্গত হইতেছে। রাস্তায় কতকগুলি লোক সেই জানালার দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে। রাস্তা হইতে ঐ গৃহের বহু মূল্য কতকগুলি আশ্‌বাব্‌ ব্যতীত কিছুই দেখা যাইতেছে না। ঘরটি বেশ সুসজ্জিত, ললিত মোহনের একজন বন্ধু বাঁয়া ও তবলা বাজাইতেছে, একজন বেহালা ও আর একজন হারমোনিয়ম ধরিয়াছে, আর সেই পূর্ব্বোক্ত অভিনেত্রী সোফায় উপবিষ্ট জ্ঞানশূন্য ললিতের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া সকরুণ স্বরে গাহিতেছে “চরণ তলে বিকানু পরাণ, দেখো যেন

শেষে ঠেলোনা পায়"। ললিত আত্মহারা হইয়া গায়িকার গোলাপী অধরে চুম্বন করিলেন, তাল কাটিয়া গেল; ললিতের বন্ধুরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ললিতের উহা সহ্য হইল না, তিনিও তাহাদের দুএকটা রূঢ় কথা বলিলেন। তাহারাও রাগ করিয়া উঠিয়া গেল এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল "আমরা থাকিলে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিত না, কিন্তু এখন একটু সাম্‌লে চ'ল"। ললিতমোহন শ্লেষ সহকারে বলিলেন "Thank you for your gratuitous advice." তখন ললিতমোহন অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়ে কত কথা বলিতে লাগিলেন, অভিনেত্রীর করপল্লব হৃদয়ে ধারণ করিয়া কখনও বা অনিমেষ নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; সেই কুহকিনীও মনে মনে হাসিতে লাগিল, কিন্তু মুখে কত প্রেম জানাইল কত সোহাগ করিল, ললিত মোহন তাহাতে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। অভিনেত্রী বলিল "বল তুমি প্রত্যহ আসিবে, আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর, না হইলে তোমার আঙ্গটি খুলিয়া লইব, আর তোমার স্ত্রী তোমার হাতে আঙ্গটী না দেখিয়া তোমার উপর রাগ করিবে।" "আমার স্ত্রী আমার উপর কখনও রাগ করে না, সে বড় ভাল।" "তুমি এখানে আসিয়াছ শুনিলেও রাগ করিবে না"? "জানি না, তুমি আর একটি গান গাও" এই বলিয়া ললিতমোহন অভিনেত্রীর চম্পক অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। স্ত্রীর কথা মনে উদয় হওয়াতে অন্যমনস্ক হইবার জন্যই বলিল "আর একটি গান গাও" অভিনেত্রীও বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয় পাইয়া ললিতমোহনের গলা জড়াইয়া সোহাগে গলিয়া অতি মধুর এক গান আরম্ভ করিল। সেই সময়ে সিঁড়িতে কার পদধ্বনি হইল সে শব্দ কাহারও কাণে গেল না, নয়টা বাজিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও

জ্ঞান ছিল না, কিন্তু যখন নেপথ্য হইতে "বাঃ বাঃ কেয়াবাত বাইজি" ধ্বনি হইল তখন দুজনের চমক ভাঙ্গিল, গান একেবারে বন্ধ হইল, অভিনেত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "সর্ব্বনাশ, আর কোনও উপায় নাই, তুমি থিয়েটারের সহকারী ম্যানেজার সাজিয়া বসি যেন কোনও বিশেষ প্রয়োজনে"—কথা শেষ হইতে না হইতেই একটি প্রৌঢ় বয়স্ক সৌখিন বাবু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ললিতমোহনকে দেখিয়া অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "এ অবার কে, এখানে কি মনে করে,"' অভিনেত্রী ললিতের দিকে ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, উদ্দেশ্য, ললিত যেন সহকারী ম্যানেজার বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ললিত মোহন ঠিক বুঝিতে পারিল না, অথবা পারিলেও উহা সাজিতে একেবারে অক্ষম। উভয়কে নীরব দেখিয়া বাবুটি ললিতকে অতিরূঢ় ভাবে বাহির হইয়া যাইতে বলিল, তাদৃশ রূঢ় আচরণ ললিতের অসহ্য হইল, বলিল "ভদ্রলোককে একটু মুখ সাম্‌লে বলিবেন"। বাবুটি ছড়ি দেখাইয়া বলিল "চোপরাও—"। ললিতমোহনের গায়ে বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, তৎক্ষণাৎ ছড়ি কাড়িয়া লইয়া বাবুকে উত্তম মধ্যম প্রদান করিল, বাবুও মার খাইয়া গালাগালি আরম্ভ করিল ও লাথি মারিতে উদ্যত হইল, ললিত তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। অভিনেত্রী চাৎকার করিয়া উঠিল ও দ্বারবান্ চৌবেজীকে ডাকিল। চৌবেজী দেড় হস্ত পরিমিত এক মোটা নিমডাল লইয়া সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, গোলমাল ও ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঐ ডাল হাতে করিয়া "ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া" করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুনিবের বাবুকে ভূতলশায়ী ও ললিতমোহন কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতে দেখিয়া ঐ নিম ডালের দ্বারা সজোরে ললিতের মস্তকে আঘাত করিল; সে ভীম আঘাতে ললিতের মস্তক কাটিয়া রক্তস্রোত বহিতে লাগিল, ললিত

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বিপদ আশঙ্কা করিয়া তিন জনেই সাতিশয় চিন্তিত হইল, ললিতের ঠিকানা বা নাম ধাম কেহই জানে না জামার পকেট অন্বেষণ করিতে করিতে একখানি চিঠি পাইল, উহাতে ললিতমোহনের শিরোনামা ও ঠিকানা পাইয়া তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া সেইবাবু ও দ্বারবান ললিতকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিল ; ঐ চতুর বাবু ললিতমোহনের দ্বারবানকে বলিল "ইনি একাকী আসিতেছিলেন, পথে কোন গুণ্ডা কর্ত্তৃক আহত হন, ভাগ্যে আমরা সেই সময়ে ঐ পথ দিয়া আসিতেছিলাম তাই আমার দ্বারবানের সাহায্যে উঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম"। সরল হৃদয় দ্বারবান্ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অজ্ঞান অবস্থাপন্ন প্রভুকে বাটির ভিতর লইয়া গেল। বাবুও অভিনেত্রীর দ্বারবান তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হইল।

রাত্রি এগারটা, শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ডাক্তার ললিতমোহনের নাড়ী দেখিতেছেন ও চিন্তিত হইতেছেন, দুই দিন ললিতমোহনের চৈতন্য হয় নাই, সাহেব ডাক্তার তৃতীয় দিবসে বলিয়াছিলেন আজ রাত্রে যদি জ্বর না কমে তাহা হইলে ললিতের জীবনের আশা নাই, কিন্তু রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত জ্বর কমে নাই। লবঙ্গলতা তিন দিন প্রায় অনাহারে আছেন ; প্রথমে তিনি ডাক্তারবাবুর সহিত কথা কহেন নাই, পরিচারিকা দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইতেন, আজ আর তাঁহার লজ্জা সরম নাই, আকুল নয়নে বার বার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দেখিতেছেন" ? ডাক্তার বাবু লবঙ্গলতার স্বামীসেবা দেখিয়া আসিতেছেন, তাঁহার মলিন মুখে স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া তাঁহার মনে ভক্তির উদয় হইল, বিশেষ আশা না থাকিলেও আশ্বাস দিয়া বলিলেন "ভয় কি মা, আপনার স্বামী ভাল হইবেন, আমি আজ রাত্রে এই

খানেই থাকিব” লবঙ্গলতা বলিলেন “কেন আজ কি অবস্থা অত্যন্ত *খারাপ দেখিতেছেন” ? ডাক্তার বাবু মিথ্যা বলিতে সাহস করিলেন* না, বলিলেন “হাঁ একটু খারাপ বটে” বলিয়া আবার নাড়ী দেখিলেন, লবঙ্গলতা স্বামী-পদতলে মাথা রাখিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু কত লোককে মরিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু এদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল ; এবং প্রভুভক্ত দ্বারবান ও পরিচারিকা উভয়েই নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে বারটা, একটা করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল ভোর হইল, ডাক্তার বাবু একখানি ইজি চেয়ারে শুইয়াই রাত্রি কাটাইলেন, লবঙ্গলতা সারারাত স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া স্বামীর পায়ে ও গায়ে হাত বুলাইতেছিলেন, এক এক বার ইচ্ছা হইতেছিল স্বামীর মস্তক কোলে রাখেন, কিন্তু তাহার যো নাই মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে, নাড়িলে ক্ষতি হইতে পারে। ভোরের সময় ডাক্তার বাবু নাড়ী দেখিয়া একটু প্রফুল্ল হইলেন, বুঝি বা ভগবান এ যাত্রা রক্ষা করিলেন। লবঙ্গলতার আনন্দে কথা নির্গত হইল না, অশ্রুপরিপূর্ণলোচনে শুধু ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন ও কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, ক্ষণপরে গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন “আপনার ঋণ শোধ করিতে পারিব না, ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখুন”। “মা আপনি সাবিত্রী আপনার পুণ্যবলে অবশ্যই আপনার স্বামী রক্ষা পাইবেন, আমি এই ঔষধ দিয়া যাইতেছি ৭টার সময় খাওয়াইবেন, আমি আবার আহারাদি করিয়া আসিব, আপনার আর ভয় নাই”।

ললিতমোহন ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল বটে, মস্তকের আঘাত ও কতকটা শুখাইল, কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইলেন, কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। ডাক্তার বাবু দুবেলা যাতায়াত করিতে লাগিলেন,

একদিন তিনি আসিয়া দেখিলেন ললিতমোহন নিদ্রা যাইতেছেন। লবঙ্গলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনও সেইরূপ প্রলাপ বকেন কি" ? লবঙ্গলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হাঁ, আপনি আমার স্বামীর প্রাণদান দিয়াছেন, সংজ্ঞা দান করুণ, তিনি যে আমায় কিছুতেই চিনিতে পারেন না।" "মস্তকের আঘাত একেবারে শুথাইয়া গেলেও আপনার সেবায় তাঁহার জ্ঞান হইবে, তজ্জন্য কোনও চিন্তা নাই"। এমন সময়ে ললিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ডাক্তার বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন "কে ও ম্যানেজার মহাশয় আসিয়াছেন, বেশ বেশ আপনার সহিত আমার কথা আছে। আচ্ছা আপনি ছাই ভস্ম বই অভিনয় না করিয়া, ভাল বয়ের অভিনয় করেন না কেন ? আমি একখানা ভাল বই লিখিয়াছি, আমি ঐ পুস্তকের নায়ক সাজিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এক নায়িকা চাই, খুব মিষ্ট গলা হইবে, খুব সুন্দর চেহারা হইবে। লবঙ্গলতাকে দেখিয়া বলিলেন "তুমিই কি সেদিন সেই গান গাহিয়াছিলে, না না তুমি ত সে নও, সে যে স্বর্গের অপ্সরা, কিন্তু সে বড় নিষ্ঠুর, ম্যানেজার মহাশয় সে কোথায় গেল ?" ডাক্তার বাবু দেখিলেন পাগলের সহিত তর্ক করিলে ক্ষতি বই লাভ হইবে না, বলিলেন, "সে আছে, আপনার কি বলিবার বলুন না" ? প্রভুভক্ত দ্বারবান সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করিল "বাবুজি, আজ তবিয়দ জেরা আচ্ছা মালুম হোতা" ? "কে তুমি দূত না দস্যু" ? "মায় আপ্‌কা নোকর তেওয়ারী"। "আচ্ছা তেওয়ারী তুমি না সে দিন জগৎসিংহ সাজিয়াছিলে, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া আমি প্রস্তুত হইতে না হইতেই আমার মস্তকে আঘাত করিলে কিরূপে? ছিঃ এই তোমার বীরত্ব, আর আয়েশাই বা কি নিষ্ঠুর, সে আমাকে মারিবার জন্য জগৎ-সিংহকে ডাকিল, কিন্তু জগৎসিংহ, মনে রাখিও ওস্‌মান থাকিতে তুমি

আয়েশাকে পাইবে না,হয় তুমি মরিবে নয় আমি মরিব,এস যুদ্ধ করি” এই বলিয়া যেমন উঠিতে যাইবেন অমনি মূর্চ্ছিত হইলেন, ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গত হইল, ডাক্তার বাবু উহা ধৌত করিয়া ঔষধ লাগাইয়া দিলেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে ললিত মোহনের প্রলাপ উক্তি শুনিয়াই বুঝিয়াছিলেন কোনও রমণীর প্রেমে পড়িয়াই এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল;একটু যত্ন ও সেবা করিলেই প্রকৃতিস্থ হইবেন। এখন তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব সন্তাপহারিণী নিদ্রাই একমাত্র ঔষধ, এই জন্য যাহাতে নিদ্রা হয় এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াদিলেন। একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ললিতমোহন শিয়রে উপবিষ্টা লবঙ্গলতার ম্লান মুখ খানি দেখিতে পাইলেন। কখন রমণীর রূপ সর্ব্বাপেক্ষা মধুর? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলিবেন; যৌবনে, অনেকে বলিবেন, যে বয়সে রমণী বালিকাও নয়, যুবতীও নয়, অথচ দুইয়ের মাঝামাঝি, কিন্তু বোধ হয় রোগীর শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষাকারিণী রমণীর যেরূপ স্বর্গীয় মাধুরী দৃষ্ট হয়, সেরূপ আর কোন সময়ে দেখা যায় না। কোনও দিন বা অনাহারে, কোন দিন বা অর্দ্ধাহারে থাকিয়া লবঙ্গলতার শরীর জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাত্রি জাগরণ ও চিন্তাবশতঃ মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল, স্নিগ্ধ বিশাল চক্ষু দুটি কোটরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সে মুখ তখন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। ললিত সস্নেহে বলিল “আয়েশা তুমি এখানে, এত দিনে কি ওস্মানের প্রতি দয়া হইল, আমি বড় দুর্ব্বল, আমার মুখের কাছে মুখ লইয়া আইস, আমি চুম্বন করিয়া প্রাণ শীতল করি।” লবঙ্গলতা অতি কোমল ও প্রেমপরিপুর্ণ স্বরে বলিলেন “নাথ, ভাল করিয়া দেখ আমি আয়েশা নহি, তোমারই সেবিকা লবঙ্গ”। লবঙ্গনাম ললিতমোহনের কাণে পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, ক্রমে স্নেহময়ী লবঙ্গ-

লতার গুণের কথা একে একে মনে হইতে লাগিল, পরে পূর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনেক অনুতাপ করিলেন ও স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন, লবঙ্গ উত্তর করিলেন "প্রাণাধিক, দাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কেন, স্বামীর শত অপরাধ থাকিলেও স্ত্রীর পরমারাধ্য দেবতা"। ছিঃ ছিঃ তোমার মত স্ত্রী পাইয়াও আমি কুপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে মৃত্যুমুখ ও পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিলে আর কখনও তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতী হইব না, তোমার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না"।

ফুলের সাজি।

মিলন।

মিলনের সে মাহেন্দ্রক্ষণে
মুখে মোর ফুটিল না ভাষা
কত কথা ছিল বলিবার
কিছুই হল না বলে আসা।

যবে ঐ মধু ছবি খানি
হেরিলাম নয়নে নয়নে
জীবনের যত প্রাণ আসি
প্রবেশিল নয়নে শ্রবণে।

ভগ্ন গীত গাহিল কোকিল
হিয়া মোর হ'ল আঁকুলিত
আঁখি পরে খেলিল বিজুলী
প্রাণ মোর হ'ল দ্রবীভূত।

দুটী প্রাণ বাজিল অমনি
মরি কোন মন্দাকিনী তানে
দুটী প্রাণ বুঝি এক হয়ে
বাঁধা র'ল কোন প্রেম গানে।

শত দিন আশা পথ বাহি
আছিলাম পথ পানে চেয়ে
যবে বীণা বাজিল আবার
ডুবিল স্বপন স্রোতে হিয়ে।

সখি, সখি, সে কি লো স্বপন
সে কি হায় ভ্রম দরশন?
জীবনের সেই মধু বেলা!
তাই কিবা ঘটিল এমন!

শ্রীনরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, বি,এ,

বসন্ত-বর্ণন।

১

আহা মরি দেখ কিবা প্রকৃতি-সঙ্গিনী
বসন্ত, কুসুমসাজে সাজিয়া মোহিনী,
সখীরে বিবশা হেরে
এসেছে ধরণী'পরে
গোলাপী সুবাস মাখি' সহাস বদনে
সাজাতে সোহাগে তারে ফুল আভরণে

২

সুকোমল মনোরম কুসুমনিকর
হিম ঋতু আগমনে হইয়ে কাতর,
ভয়েতে লুকায়ে ছিল
হাসিমুখে বিকসিল
বসন্ত সখীরে সবে উদিত হেরিয়ে।
সুষুপ্ত বরষে যেন উঠিল জাগিয়ে॥

৩

তরুশাখে ডাকে পিক্ কুহু কুহু স্বরে
সুধার সুধারা ঢালি শ্রবণ-বিবরে
ঈর্ষাযুক্ত কুহু তানে
স্বরূপ উত্তর দানে
ওই শোন বুল্‌বুল্‌ ডাকিছে মধুরে।
আমরি কি শোভা এবে ভুবন মাঝারে॥

৪

বহিছে মলয়ানিল মধুর হিল্লোলে
কাঁপায়ে রক্তিম-প্রভা কিশলয় দলে
প্রসূন সুবাস হরি
নাচি' রঙ্গে ধীরি ধীরি
সুদূর গগনে উঠি' দিল ছড়াইয়া।
অমনি হাসিল ফুল হেলিয়া দুলিয়া॥

৫

প্রফুল্ল কুসুমদামে হেরি বিকশিত
গুণ গুণ রবে অলি কত পুলকিত ;
প্রাণ ভরে মধু লুটে
উড়িয়া বেড়ায় ছুটে
ধাইছে আবাসে পুনঃ কত কুতুহলে।
বসন্ত কি সুখ কাল এ মহীমণ্ডলে।

শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যৌবনে।

নিবিড় কুন্তল পাশ
শোভে যথা নীলাকাশ
মুখশশী তাহাতে উদয় ;

ইন্দিবর আঁখিদ্বয়
অপরূপ শোভা পায়
কৃষ্ণ তারা ভ্রমর ভ্রময়।

উজ্জ্বল দশন পাঁতি
যেন তারকার জ্যোতিঃ
ওষ্ঠাধর অমিয় সরস ;

ভাবের তরঙ্গময়
নীলাম্বর ঢেকে রয়
ক্ষীণ কটি উন্নত উরস।

অরুণ চরণ দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি
প্রতি পদ বিক্ষেপে মধুর;

উছলি উছলি তায়
চৌদিকে ছড়ায়ে যায়
রূপ রস ভাব সুমধুর।

সরল হৃদয় পটে
কি সুন্দর ছবি ফোটে
সুকুমার মরম মাঝার

প্লাবিত করিয়া প্রাণ—
উঠে প্রেমময় তান—
সুকোমল অস্ফুট ঝঙ্কার।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা বসু।

নারীর লজ্জা।

ভঙ্গোনাক' ওই সাধের স্বপন
জীবনের সাথে প্রিয় আভরণ
ভেঙ্গোনা ভেঙ্গোনা ছলে;

অনন্ত সৌন্দর্য্যে রয়েছে ফুটিয়া
তুলনাক' হেরে মোহেতে ভুলিয়া
তুলনা তুলনা বলে।

লতিকার দেহে উহাই সুষমা
ও ফুলের হেথা নাহিক উপমা,
এ নহে গোলাপ যূথী;

একটী তুলিলে ফুটিবে অপর
তরুরে সাজাবে করে মনোহর,
কাননে বিলাবে প্রীতি।

সকলের সার ওই ফুলটীরে
ছিঁড়োনাক' কেহ নিঠুর অন্তরে
দিওনাক ব্যথা মনে;

ওই ফুলভরে হয়ে অবনত
সহাস আনন করিয়া আনত
কি হাসি ফুটায় বনে।

সুবাসের লোভে দুদিনের তরে
তুলিবে কুসুম পরম আদরে
গাঁথিয়ে ফুলের মালা;

গলে দুলাইলে ফুরাইবে বাস
ফেলিয়া হৃদয়ে মৃদু মৃদু শ্বাস
শুকাবে ফুরাবে খেলা।

ঢল ঢল সেই যেন ঘুমঘোরে
লুকাইছে মুখ পাতার মাঝারে
মুদিত নয়ন দুটি।

বিনত দেহটি সমীরণ ভরে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া সহাস অন্তরে
শাখাতে পড়িছে লুটি।

মানবের কর পরশন ভয়ে
সুকোমল দেহ ফেলিছে লুকায়ে
বদনে জড়িত ভাষা।

চিরদিন থাক আপনার স্থানে
তুলনাক হায় নিরদয় প্রাণে
করিয়া সুখের আশা।

শুকাইলে যবে, দূরে দিবে ফেলে
অতুল সৌন্দর্য্য ডুবিয়ে অতলে
কেহ দেখিবে না আর।

হৃদয়ের ফুল ফুটুক হৃদয়ে
দূর হতে শুধু দেখ সখে চেয়ে
ছুঁয়োনাক দেহ তার।

শ্রীমতী সরসীবালা দাসী।

পরিচিত।

যেন তোমায় কোথা দেখিছি!

কুসুম তুলিতে শারদ প্রভাতে
আধখানি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে
সহসা ভুলিয়ে মুখটি তুলিয়ে
ওই মুখ পানে চেয়েছি। ১

নিদাঘ-প্রভাতে বসিয়ে ছায়াতে
কোথাকার কথা ভাবিতে ভাবিতে
বিহগের তানে যেন আনমনে
ওই মুখ খানি ভেবেছি॥ ২

প্রকৃতির ছায় সাঁঝের বেলায়
তটিনীর কূলে বসি নিরালয়,
জ্যোৎস্না হাসিতে লহরী দেখিতে
ওই মুখ মনে পড়েছে। ৩

বসি নীরবেতে চাহিতে চাহিতে
আপনার মনে দূর গগণেতে,
শ্যামল ছায়ায় মরম পাতায়
ওই মুখ খানি জেগেছে॥ ৪

পূরণিমা রেতে জানালার পথে
প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে,
পাপিয়ার গানে, মলয়ের তানে,
ওই মুখ মনে উঠেছে। ৫

বাঁশরীর স্বরে বীণার ঝঙ্কারে,
আবেশ মগন হৃদয় মাঝারে
কি যেন স্বপনে সহসা কিমনে
ওই রূপ প্রাণে ফুটেছে॥ ৬

মেঘের কোলেতে, বিজলী রাশিতে,
তোমারে দেখেছি মাধুরী মালাতে
দেখিয়া আমারে নিমেষের তরে
তখনি মু'খানি ঢাকিতে॥ ৭

বরিষা শ্রাবনে গুরু গরজনে
প্রেম-বারি-ধারা ঢালিতে ভুবনে,
চকিতের মত করুণা ভাসিত
মুখ খানি তুলে চাহিতে॥ ৮

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

দুনিয়া।

দুনিয়া তোমার আমি সাধে ভালবাসি।
কত রূপধর তুমি কেমনে প্রকাশি॥
এই দেখি একভাব পুনঃ ভাবান্তর।
রূপান্তর নিরন্তর লীলা বোঝা ভার॥
কোথা শুধু মরুময় নীরব প্রান্তর।
উত্তপ্ত সিকতা রাশি রাজিত অন্তর॥
অগ্নিকণা সম তথা প্রভাকর কর।
মরুমাঝে জীব কোথা, তরু বাঁচা ভার॥
কোথা দেখি তরুদল দুস্তর কান্তারে।
ফুলপরি ফলধরি দুলে বায়ুভরে॥
কথনো পশেনা সেথা ভানুর কিরণ।
হাসে না জোৎস্না কভু প্রিয় দরশন॥
পাষাণে গঠিত কোথা উন্নত হৃদয়।
অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ হেরি ভয়॥
নিতম্বে মেখলা সম দোলে মেঘদল।
অর্দ্ধরথে আবরিয়া গগণ মণ্ডল।
পয়ঃ ধারা নির্ঝরিণী ঝরে অনিবার।
রজত রঞ্জিত স্রোত নদীর আকার॥
দুকুল ভাঙ্গিয়া বেগে কোথা জল রাশি।
কুল কুল রব কার ধাইছে উল্লসি॥
ভাঙ্গে এক গড়ে আর গতি বোঝা ভার
স্থল জল, জলস্থল হয় একাকার॥
নবদুর্ব্বাদল কোথা শ্যামল উজ্জ্বল।
শোভিতেছে আচ্ছাদিয়া ভূমি সমতল॥
ভারে নত প্রভাত শিশির ধরি শিরে।
মুকুতার জাল যেন ঢাকিয়াছে ধীরে॥
কোথা হেরি জলময় অকুল পাথার।
নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে ভীম পারাবার॥
মুহূর্ত্তেকে দেখি স্থির দর্পণ সমান।
পরক্ষণে গর্জ্জে ভীম কাঁপায় পরাণ॥
কতই মাধুরী তব ধরে অম্বুরাশি।
সাধে কি দুনিয়া তোরে এত ভালবাসি॥
লেখনীর কিবা সাধ্য বর্ণে রূপ তব।
আছে কত কব কত নিত্য হেরি নব॥
সাগরে স্বাধীন ভাব পর্ব্বতে গরিমা।
শ্যাম সমতলে লজ্জা নারীর মহিমা॥
কান্তারে গম্ভীর ভাব, বিষাদের গাথা
নদী রবে শুনি তব পাই বড় ব্যথা॥
নির্ঝরিণী দিবারাত্র ফেলে আঁখি জল;
নারীর কি আর কিছু আছে গো সম্বল?
মরুভূমে হেরি তব প্রশান্ত হৃদয়
বিশ্বপ্রেম বিনা হেথা সব পায় লয়
দুনিয়া তোমার আমি সাধে ভালবাসি
নারীরূপ দেখি তাই কহিনু প্রকাশি॥

শ্রীরসগুণাকর মিত্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সহানুভূতি প্রকাশ। সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে বড়-লাট বাহাদূরের নিকট একখানি অভিনন্দন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি সমিতির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যাহাতে সমিতির "প্রয়াস" উত্তরোত্তর সফল হইতে পারে সেই কামনা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্বদেশগৌরব, ধার্ম্মিকপ্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও "প্রয়াসের" মঙ্গল কামনা ও তজ্জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া সাহিত্য-সেবক-সমিতিকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

***

জলাতঙ্কে ধুতুরা—ডাক্তার ওয়াট্‌স্ কৃত Dictionary of Economic products of India নামক গ্রন্থে জলাতঙ্ক রোগের (Hydrophobia) আরোগ্য সম্বন্ধে ধুতুরার আশ্চর্য্য উপকারিতা দেখা যায়। ইহার ব্যবহার নিম্নলিখিতরূপে করিতে হইবে। পঞ্চদশ দিবসের প্রাতে রোগীকে এক চামচ চা-কাষ্ঠের (Tea-wood) অঙ্গারচূর্ণ খাইতে দিবে। ইহাতে ধুস্তুরের বিষ আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগীকে এক আউন্স কৃষ্ণ ধুস্তুর পত্রের রস খাইতে দিবে ; এবং পরক্ষণেই বমন নিবারণার্থ তালরস কিম্বা বমন নিবারক ঔষধাদি খাইতে দিবে। তৎপরে রোগীকে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন অবধি ৪।৫ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিতে হইবে। বন্ধন করিলে আর রোগীদ্বারা দংশিত হইবার ভয় থাকিবে না। পরে রোগী ক্ষিপ্ত

হইয়া ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিবে। এইরূপ হইলেই আরোগ্য লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বুঝা যাইবে। অপরাহ্ণ চারিটা কিম্বা পাঁচটার সময় রোগীর মস্তকে বহুল পরিমাণ শীতল জল ঢালিবে ও তৎপরে রোগীকে খাইতে দিবে।

***

হাস্যোৎপাদিকা লতা—"মন্‌ট্রিল ফার্‌মাসিউটিক্যাল্ জার্‌ন্যাল"এ এক প্রকার হাস্যোৎপাদিকা লতার কথা বর্ণিত আছে। ঐ লতা আরব দেশে জন্মিয়া থাকে। উহার আকার ক্ষুদ্র, উহাতে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের ফুল এবং মখমল সদৃশ কোমল সিমের মত এক প্রকার সুঁটি জন্মায়, এবং প্রত্যেক সুঁটির ভিতর দুই তিনটী বীজ থাকে। ঐ দেশের অধিবাসীরা ঐ বীজ শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া রাখে। ঐ চূর্ণ কিয়ৎ পরিমাণে খাইলে, laughing gas বা হাস্যোৎপাদিকা গ্যাস্ সেবনে যে ফল হয় ঠিক সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোকও ঐ চূর্ণ খাইলে, আনন্দে চীৎকার, হাস্য ও নৃত্য করিতে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টাকাল উন্মত্তের ন্যায় নানারূপ নৃত্য গীত ও ভাবভঙ্গী করিবার পর ক্লেশ বশতঃ নিদ্রার আবেগ আসিবে, এবং কয়েক ঘণ্টা নিদ্রার পর যখন ঐ ব্যক্তি জাগিবে তখন আর তাহার পূর্ব্ব আচরণের কথা কিছুই মনে থাকিবে না। লোয়ার ক্যালিফোরনিয়ার মরুভূমিতে লোকো উইড্ (loco weed) নামক এক প্রকার লতা জন্মিয়া থাকে, অশ্বকে উহা খাইতে দিলে ঠিক উপরোক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে।

***

স্ত্রী—সত্য কি তুমি আমায় ভালবাস এবং সর্ব্বদা আমায় মনে কর?

স্বামী—তাতেও কি আবার সন্দেহ ? যখনই আমি অপর কোনও স্ত্রীলোককে চুম্বন করি আমি তোমাকেই চুম্বন করিতেছি মনে করিয়া লই।

***

স্বামী—স্ত্রীকে শুনাইয়া পড়িতে লাগিলেন "বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ অর্দ্ধেক মনুষ্য মাত্র"——স্ত্রী হাসিতে হাসিতে সোহাগ ভরে বলিলেন, কেমন প্রিয়তম, বড় যে বিবাহ করিতে চাও নাই ?" স্বামী উত্তর না দিয়া পুনরায় পড়িতে লাগিলেন "কিন্তু বিবাহের পর পুরুষের সেই অর্দ্ধেক মনুষ্যত্বও লোপ পায়।"

***

দ্বিমস্তক বিশিষ্টা মানবী—দ্বিমস্তকবিশিষ্টা রমণী এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ষ্টেট্‌স্‌ম্যান (Statesman) হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল। উত্তর কেরোলিনা প্রদেশে একটি দ্বিমস্তক মানবী বাস করিতেছে। উক্ত স্ত্রীলোক মেলা বা বৈজ্ঞানিক সভা সমিতিতে যাইয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ রমণীর আবার চারিটী হস্ত ও চারিটী পদ আছে। জনরব এই যে ঐ স্ত্রীলোকটি দিন কয়েক একটি হোটেলে বাস করিতেছিল। এক সপ্তাহের পর সেই হোটেলের বিল পাইয়া ঐ স্ত্রীলোক অবগত হইল যে তাহার নিকট হইতে দুই জনের আহারাদির মূল্য দাবি করা হইয়াছে। ঐ স্ত্রীলোক সেই মূল্য দিতে অস্বীকার করিল। সে বলিল যে যদিও সে প্রকৃতির ব্যতিক্রমে দুইটি মাথা, চারিটী পদ ও চারিটী হস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি তাহার শরীর একটি মাত্র। হোটেলের অধ্যক্ষ ইহাতে বিরক্ত হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত রমণীর অনুমান যে, মোকদ্দমায়

তাহারই জয়লাভের সম্ভাবনা; কারণ রেলওয়ে কোম্পানি পূর্ব্বে তাহার নিকট হইতে দুই জনের টিকিটের মূল্য আদায় করিবার জন্য আদালতে নালিশ করিয়াছিল, কিন্তু সে মোকদ্দমায় ঐ রমণীরই জয় হয়। অতএব এ মোকদ্দমায়ও তাহার জয়লাভ একরূপ নিশ্চয়।

***

মিষ্টমুখ—বৈঠকখানায় পাঁচটী খোস গল্পের মধ্যে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে কতদরের সন্দেস খাইয়াছেন? একব্যক্তি বলিলেন আমি ২৲ টাকা সেরের খাইয়াছি, অপরে ৩৲ টাকা ক্রমে ১০৲ টাকা সেরের খেও খোদ্দের ও বাহির হইল। তখন প্রশ্ন কর্ত্তা একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, ভাই আজকাল কি আর সন্দেস জন্মায়? অথবা সে প্রকার সন্দেস কখনো খাও নাই, বোধ হয় চক্ষেও কখনো দেখো নাই; বলিলে যদি প্রত্যয় করো, তবে শোন:— একদিবস আমি একটী নামজাদা সন্দেসের দোকানে যাইয়া একটী টাকা তাহাকে ফেলিয়া দিয়া একটাকার উত্তম সন্দেস চাহিলাম, ময়রা বলিল "উত্তম সন্দেস চাহিতেছেন অথচ একটী মাত্র টাকা দিলেন" সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া উৎকৃষ্ট সন্দেসের আল্মারির কপাট খুলিয়া সন্দেস দেখাইল ও তৎসঙ্গে দাঁড়িপাল্লাটী হস্তে তুলিয়া আমাকে দেখাইয়া বিদায় দিল, ভাই এক্ষণে হিসাব কর দেখি যে, যে সন্দেসের শুদ্ধ দর্শনী একটাকা লাগে তাহার সের কত করিয়া পড়তা পড়িল, তাই বলিতেছিলাম, সে রকম সন্দেস এখন আর জন্মায় না। তখনো খাইতে পাই নাই এখন তো পাওয়াই যাইবে না।

বৈটকখানায়, কোন বিষয়ের কথা উথপিত হইলে সে বিষয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের যাহাকিছু জানা থাকে তাহা বলা চাই। এক্ষেত্রেও ঘরের অপর প্রান্ত হইতে একজন রোগা ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল ওরকম

উৎকৃষ্ট সন্দেস আজকাল অনেক জন্মে কিন্তু উৎকৃষ্ট রসগোল্লা তোমরা কেহ চক্ষেই দেখ নাই। যাহাহউক, মিষ্টান্নের কথা যখন উঠিল তখন রসগোল্লার বিষয়টা বলিতে হইল :—

জংবাহাদুরের পিতার শ্রাদ্ধে আমার আহ্বান হইয়াছিল। আহারের সময় দেখি, পাতে একটা বড় তরমুজের ন্যায় রসগোল্লা দিয়াছে, যাহার সাক্ষাতেই পরিতোষ, তার আর খাব কি ; যাহাহউক তাহাকে আহার করিবার ইচ্ছায় দুই হস্তে জাপটাইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক আকর্ণ দন্ত-পংক্তি বাহির করিয়া কামড় দিলাম। এক ইঞ্চি মাত্র দাঁত বসিল, শুদ্ধ পেস্তা, এইরূপ এক ইঞ্চি পরিমাণে চতুর্দ্দিকস্থ পেস্তাসেবা করিলাম। দ্বিতীয় উদ্যমে এক ইঞ্চিমাত্র দাঁত বসিল—চতুর্দ্দিকে শুদ্ধ কিস্‌মিস্। তৃতীয়বারের কামড়ে আখ্‌রোট্। এইরূপ সাতবারের যত্নে চতুর্দ্দিকস্থ সাত রকম মেওয়ার দ্রব্য উদরসাৎ করিয়া অবশেষে একটা বাতাবী লেবুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট গোলাকার রহিল, তাহাতে কিছুতেই দন্তস্ফুট হইতেছে না, কাজেই তাহার চতুর্দ্দিক টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিলাম হঠাৎ কুড়ুং করিয়া শব্দ হইয়া তাহা সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেলে তাহার ভিতব হইতে গোলাপজলের সৌরভে নাসিকা মাতিয়া উঠিল, এবং একটি ক্ষীরের পুত্তলিকা দেখিতে পাইলাম। ওরূপ রসগোল্লা কি আর আজকাল জন্মায় ? না, লোকের ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি আছে ?

***

নারীদস্যু—বার্‌বারা তেন্‌লিয়া নাম্নী ককেসাস্ প্রদেশস্থ কোনও গৃহস্থ কন্যা দস্যুতা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। সে ক্ষীণাঙ্গী ও সুন্দরী। শৈশব হইতেই ভয় কাহাকে বলে জানিত না। একদিন সে পিতৃগৃহ হইতে অন্তর্ধান হইল, এবং পরে সংবাদ পাওয়া গেল, সে কোনও দস্যুদলে মিশিয়া তাহাদিগের নেত্রী হইয়াছে, এবং তাহাদের

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্তকে অনায়াসে দমনে রাখিয়াছে। সাধারণ দস্যু হইতে ইহার আচরণ অনেক ভিন্ন। মিষ্টালাপ ও সহৃদয়তার জন্য সে বিখ্যাত। যখন উপায়ান্তর নাই তথায় সে বলপ্রয়োগ করে। পথিকের সর্ব্বস্ব কখনও সে অপহরণ করে না, তাহার পাথেয়র জন্য কিছু অর্থ রাখিয়া দেয় এবং তাহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে আহারাদিও প্রদান করে, পরে জন কতক প্রহরীর নিকটে তাহাকে রাখিয়া সদলে প্রস্থান করে, এবং ঘণ্টাখানেক পর যখন তাহাদের অনুসরণ করিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বোধ হয় তখন প্রহরীরা তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। বারবারা অনেকবার ধৃত হইয়াছিল, প্রথমবারে জেলের প্রহরী তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার পলায়নের জন্য কারাগৃহের দ্বার মুক্ত রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় বারেও অন্য এক প্রহরী তাহার রূপে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে সে উহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, এবং এক্ষণে তাহার দলভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় বারে, জজসাহেব প্রমাণাভাবে অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। বার্‌বারা বন্দুক ছুঁড়িতে এত নিপুণা, যে কুড়ি পঁচিশ হস্ত দূরস্থ কোন মুদ্রার শেষভাগও তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করিতে পারে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে এরিস্‌টক্‌ নামক একজন পুলিস্‌ ইন্‌স্‌পেক্টর একদল সৈন্য লইয়া বার্‌বারাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সদলে নিহত হয়।

ওক্‌লাহোমা প্রদেশেমিস্‌ ভোরা কক্স নাম্নী আর একজন নারী দস্যু আছে, ইহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। চক্ষুনীল ও কেশদাম সুবর্ণের ন্যায়, কিন্তু এই অল্প বয়সে ফৌজদারী আদালতের কাগজাদি হইতে তাহার অসাধারণ অবনতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে কেবল পথিকের নিকট হইতে যে অর্থ কাড়িয়া লয় এরূপ নহে, অশ্ব চুরী ও ব্যাঙ্কে

ডাকাতিও করিয়া থাকে। ডোরা অনেক বার ধৃত হইয়াছিল, এবং অনেকবার পলাইয়াছিল। নিজের দলের লোক পীড়িত হইলে বা আহত হইলে সে যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে, এই জন্য উহারা তাহাকে দেবীর ন্যায় জ্ঞান করে, কিন্তু যে তাহার শত্রুতাচরণ করিবে তাহার আর রক্ষা নাই।

***

অদ্ভুত ডিম্ব—পাইওনিয়ার পত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি সিমলা শৈলে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। তথাকার সমস্ত মুরগী যুক্তি করিয়া কেরোসিন তৈল গন্ধ যুক্ত ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি হোটেল কি গৃহস্থের বাটীতে, যে প্রকারেই রন্ধন করা হউক না কেন ডিম্ব হইতে ঐ তীব্র গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। রন্ধনশালা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইয়াছে, খানসামাদের জরিমানা করা হইয়াছে, মুরগীর খাদ্যও বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও ফল ফলে নাই। হোটেল রক্ষক প্রভৃতির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, কিন্তু মুরগীর ধর্ম্মঘট এখনও বন্ধ হয় নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী—আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটে কুম্ভীরজাতীয় একপ্রকার জানোয়ারের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমিত হয়, ইহা আদিম মনুষ্যের মত বহুযুগ পূর্ব্বে পৃথিবীতে বাস করিত। দৈর্ঘ্যে ইহা ১৩০ ফুট বা কিঞ্চিদধিক ৮৬ হস্ত, ও ওজনে ১২০,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় পনেরশত মণ! ওয়াইয়োমিং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডব্লিউ, এইচ, রিডার উহার আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ জানোয়ার চলিলে পৃথিবী কাঁপিত, একজন মনুষ্য উহার একখানি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অস্থি উঠাইতে অক্ষম। ইহার যে কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহার ওজন ৫০০ মণ। চল্লিশ জন

ব্যক্তি ইহার পাঁজ্‌রার ভিতরে সচ্ছন্দে বসিতে পারে। এখনকার হস্তী ঐ জানোয়ারের নিকট মুষিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

⁂

প্রশ্নোত্তর—চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষক—"ক্লোরফরম্‌ ব্যতীত কিসে অচেতন করা যাইতে পারে?

ছাত্র—লাঠিতে।

⁂

আলস্য বিষয়ক আদর্শ রচনা—বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদিগকে "আলস্য" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে বলেন, একজন ছাত্র উত্তর স্বরূপ একখানি সাদা কাগজ শিক্ষক মহাশয়কে প্রদান করে।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা।

আলোচনা—দ্বিতীয় বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩০৫। অষ্টম সংখ্যা। আলোচনার কলেবর প্রধানতঃ পদ্য-আলোচনায় পরিপূর্ণ। গদ্য প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প, ও তন্মধ্যে "মুকুল মুঞ্জরার" সমালোচনা উল্লেখ যোগ্য।

মুকুল—৪র্থ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। মাঘ। ১৩০৫। "মুকুল" বালক বালিকাদিগের শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ।

এতদ্‌ব্যতীত "বসুমতী ও "The Behar News" এই দুই খানি সাপ্তাহিক পত্র পাইতেছি এবং "কোহিনুর" ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা কার্ত্তিক, "কোকিল" ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা মাঘ, এই দুই খানি মাসিক পত্র পাইয়াছি।

প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। মার্চ্চ, ১৮৯৯ সাল। তৃতীয় সংখ্যা।

বিশ্লেষিত সূর্য্য কিরণে কৃষ্ণরেখা।

যদি কোনও সম্পূর্ণ অন্ধকারময় গৃহমধ্যে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ক্ষীণ সূর্য্যালোক আসিতে দেওয়া হয় ও যদি ঐ ক্ষীণ সূর্য্যালোক লম্বভাবে (normally) শুভ্র প্রাচীর বা তিরস্করিণীর (screen) উপর পতিত হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের গোলাকার শুভ্র প্রতিবিম্ব ঐ প্রাচীর বা তিরস্করিণীর উপর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ রবি কিরণের পথে একখণ্ড তিনটী পলযুক্ত কাচ বা ঝাড়ের কলম (prism) রাখিলে ঐ আলোক ঐ কাচ খণ্ড হইতে বহির্গমনকালে পূর্ব্ব পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভিন্নদিকে গমন পূর্ব্বক যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল ও ভায়লেট এই সাত বর্ণের কিরণে বিশ্লিষ্ট বা বিভক্ত হয়। এই জন্য প্রাচীর বা তিরস্করিণীর উপর শুভ্র গোলাকার সূর্য্যবিম্বের একটী ক্ষুদ্রায়তন সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র বিশিষ্ট ছায়া (image of a many coloured band) দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ছায়ায় (spectrum) ঐ সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সকল যথাক্রমে পরস্পরের উপর আংশিক ভাবে পতিত হয় সুতরাং তাহাদিগকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র (spectroscope) সাহায্যে আমরা সূর্য্যালোকের বিশ্লেষিত ছায়ায় (solar spectrum) লোহিতাদি সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সকল যে কেবল মাত্র সুস্পষ্ট দেখিতে পাই তাহা নহে, ঐ ক্ষেত্র সমূহে বহু সংখ্যক কৃষ্ণ রেখা (darklines) এবং কতকগুলি উজ্জ্বল রেখাও আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সকল কৃষ্ণ রেখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেন যে আমরা বিশ্লেষিত রবি কিরণের ছায়ায় ঐ সকল রেখা দেখিতে পাই তাহার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা কেহই করিতে পারেন নাই। ঐ সকল রেখা সম্বন্ধে যে কোনও সঙ্গত নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে, ইহাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক সম্ভবপর বিবেচনা করিতেন না।

পূর্ব্বোক্ত খৃষ্টাব্দে কার্কফ (Kirchoff) সর্ব্ব প্রথম বিশ্লেষিত রবি কিরণের ছায়ায় (solar spectrum) কৃষ্ণ রেখা সমূহের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে সমর্থ হন। তিনি কিরূপে ও কেন ঐ সকল কৃষ্ণ রেখা, বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকে পরিলক্ষিত হয় তাহা পরীক্ষা (expriment) দ্বারা স্থিরীকৃত করেন।

কার্কফ পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে বায়ুরাশি (atmosphere) সূর্য্য মণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া আছে সেই বায়ু-রাশিস্থ মৌলিক পদার্থের বাষ্প (Vapour) বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকের ছায়ায় কৃষ্ণ রেখা সকল দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং ঐ ছায়ায় পরিলক্ষিত কৃষ্ণ রেখা সকলের অবস্থিতি স্থান সমূহ হইতে ঐ সকল মৌলিক পদার্থ নির্ণীত হইতে পারে।

এই সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইবার পর হইতে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অনেকানেক অভিনব ও অজ্ঞাত বিষয় সহজেই স্থিরীকৃত হইতেছে।

নিউটনের আকর্ষণ নিয়ম (Law of Gravitation) দ্বারা যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদির কক্ষ, পরিমাণ, ও গুরুত্বাদির নিরূপণ আমাদের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে, তদ্রূপ কার্কফের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা নক্ষত্রাদির উপাদান এবং গ্রহ সকল স্বয়ং তেজোময় কিনা ও তাহাদের প্রকৃতি বিষয়ক অনেক তথ্য সহজেই আমাদের বোধগম্য হইতেছে।

সূর্য্য মণ্ডল বেষ্টনকারী বায়ুরাশিতে যে মৌলিক পদার্থের বাষ্প বিদ্যমান আছে তাহা বিশ্লেষিত সূর্য্য কিরণ ছায়ায় (solar spectrum) পরিলক্ষিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্রস্থিত কৃষ্ণ রেখা সকল হইতে কিরূপে স্থিরীকৃত করিতে পারা যায়। এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব। কিন্তু বোধ সৌকার্য্যার্থ অগ্রে মৌলিক পদার্থের দীপ্ত বাষ্প (incandes cent vapour) হইতে বিনির্গত আলোক বিশ্লেষিত করিলে যে মূল কিরণের ছায়া (spectrum) দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ লিখিত হইল।

সাধারণ দীপালোক (যেমন বাতি বা স্পিরিটল্যাম্পের আলোক), গ্যাসালোক কিম্বা বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর অঙ্গারমুখদ্বয় জাত (emitting from the carbon terminals of an electric battery) তাড়িতালোক বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষিত করিয়া দেখিলে যে ছায়া দেখিতে পাই সেই ছায়ায় ব্যবধান রহিত (continuous) লোহিতাদি সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র বর্ত্তমান থাকে। এই সাতটি ক্ষেত্রে কোনও কৃষ্ণ রেখা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যদি একটী সিতকাঞ্চন তারের (platinum wire) এক মুখ বাঁকাইয়া গ্রন্থির (loophole) মত করা যায় এবং সহজে বাষ্প হইতে পারে এরূপ কোন ধাতুর হরিতজলবণ (chloride) ঐ সিতকাঞ্চনতারের গ্রন্থি মধ্যে রাখিয়া স্পিরিটল্যাম্পের শিখায় বা গ্যাসালোকে যদি দগ্ধ করা যায় তাহা

হইলে এই আলোকের বিশ্লেষিত ছায়ার ক্ষেত্র বিশেষে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই উজ্জ্বল রেখা সকল আলোকস্থ ঐ ধাতুর দীপ্ত বাষ্প নিঃসৃত রশ্মি হইতে সমুৎপন্ন হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর দীপ্ত বাষ্প নিঃসৃত রশ্মি বিশ্লেষিত ছায়ায় ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বল রেখা উৎপাদন করে।

আমরা সচরাচর যে লবণ ব্যবহার করি তাহাতে লবণক (sodium) আছে। এই লবণ স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় দগ্ধ করিলে শিখাস্থ দীপ্ত লবণক বাষ্প (incandescent sodium vapour) হইতে নিঃসৃত রশ্মি বিশ্লেষিত ছায়ায় পীত ক্ষেত্রে দুইটী অতি সন্নিকট উজ্জ্বল পীত রেখা সমুৎপাদন করে। এইরূপ দীপ্ত ক্ষারক বাষ্প (incandescent potassium vapour) লোহিত ও ভায়লেট ক্ষেত্রদ্বয়ে কতিপয় উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে। লিথিয়ম (lithium) থ্যালিয়ম (thalium), ইণ্ডিয়ম্ (indium), সিজিয়ম (cæsium) রুবিডিয়ম্ (rubidium), ষ্ট্রন্সিয়ম (strontium), চূর্ণক (calcium) এবং বেরিয়ম্ (barium) এই সকল ধাতুর বাষ্প বিনির্গত রশ্মি পূর্ব্বোক্ত প্রাণালীতে বিশ্লেষণ হইয়া থাকে।*

যে ধাতু স্পিরিট ল্যাম্পের বা গ্যাসের আলোকের তাপে বাষ্প হয় না সেই ধাতুর দীপ্ত বাষ্পালোক নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষিত করিতে পারা যায়। ঐ ধাতুর হরিতজ লবণ (chloide) জলে দ্রব করিয়া দুই খণ্ড অঙ্গার ঐ জলে সংসিক্ত করিলে অঙ্গার খণ্ডদ্বয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উক্ত লবণ সঞ্চিত হইবে। এখন এই দুই খণ্ড অঙ্গার ব্যাটারীর

* এই ধাতু সকলের মধ্যে লিথিয়ম, থ্যালিয়ম, ও ইণ্ডিয়ম্ ধাতুর দীপ্ত বাষ্প লবণক বা সোডিয়মের দীপ্ত বাষ্পের মত বিশ্লেষিত ছায়ার ক্ষেত্র বিশেষে রেখাদ্বয় প্রদান করে। অপর গুলি বেশী রেখা প্রদান করে।

মুখদ্বয়ে (terminals) সংযোজিত করিলে যে তাড়িতালোক ঐ মুখদ্বয় হইতে নির্গত হইবে তাহাতে উক্ত ধাতুর দীপ্ত বাষ্প বিদ্যমান থাকিবে সুতরাং ঐ তাড়িতালোক বিশ্লেষণ করিলে বিশ্লেষিত ছায়ায় (spectrum) মূলকিরণের ক্ষেত্রে দীপ্ত বাষ্পোদ্ভূত উজ্জ্বল রেখা সকল দেখিতে পাওয়া যাইবে। লৌহাদি কতিপয় ধাতু সাধারণ তাপে বাষ্পীভূত হয় না, সুতরাং তাহাদের দীপ্ত বাষ্প নির্গত রশ্মি এইরূপে বিশ্লেষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যদি এই সকল ধাতুর মধ্যে কোন ধাতুর দুই খণ্ড তার অঙ্গারের পরিবর্ত্তে ব্যাটারীর মুখদ্বয়ে (terminals) সংযুক্ত করা যায় তাহা হইলে বিশ্লেষিত ছায়ায় ব্যবধান রহিত (continuous) মূল কিরণের ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ ক্ষেত্রে ঐ উজ্জ্বল রেখা সমূহ দৃষ্ট হয়।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ায় (solar spectrum) সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক কৃষ্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং দীপালোক, গ্যাসালোক কিম্বা তাড়িতালোকস্থ যে কোন দীপ্ত ধাতুর বাষ্প নির্গত রশ্মি বিশ্লেষিত ছায়ায় মূল কিরণের ক্ষেত্র বিশেষে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা সমুৎপাদন করে। এক্ষণে এই সকল উজ্জ্বল রেখার অনুযায়ী কৃষ্ণরেখা সূর্য্যালোক ছায়ায় সপ্ত মূলকিরণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত বহুসংখ্যক কৃষ্ণরেখার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

যেমন স্পিরিট ল্যাম্পের শিখাস্থ দীপ্ত লবণক বাষ্প (incandescent sodium vapour) বিশ্লেষিত ছায়ার পীত ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রেখাদ্বয় সমুৎপাদন করে তাহার অনুযায়ী কৃষ্ণরেখাদ্বয় বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ায় পীত ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে লৌহ (iron), বেরিয়ম (barium), চূর্ণক (calcium),

ম্যাগনিসিয়ম (magnesium), স্ফটিক (aluminum), ম্যাঙ্গানিস (manganese), ক্রোমিয়ম (chromium), কোবাল্ট, (cobal't) নিকেল (nickel), দস্তা (Zinc), তাম্র (copper), এবং টিটেনিয়ম্ (titanium) এই সকল ধাতুর মধ্যে প্রত্যেক ধাতুর দীপ্ত-বাষ্প-জাত-রশ্মি বিশ্লেষণে, বিশ্লেষিত ছায়ার যে যে মূল কিরণের ক্ষেত্রে যে সকল উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া যায় তদনুযায়ী কৃষ্ণ রেখা সকল বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ার সেই সেই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান দেখা যায়। এই সৌসাদৃশ্য দেখিয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে যে সূর্য্য বেষ্টিত বায়ুরাশিতে (atmosphere) এই সকল ধাতুর দীপ্তবাষ্প বিদ্যমান্ আছে, ও কোনও কারণ বশতঃ বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকচ্ছায়ায় উজ্জ্বল রেখার পরিবর্ত্তে আমরা কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাই।

কেন যে উজ্জ্বল রেখার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিনিময় নিয়ম (theory of exchenge) দ্বারা বুঝাইতে ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায়। বিনিময় নিয়মানুসারে যে পদার্থ যে সকল মূল কিরণ বিশিষ্ট রশ্মি প্রদান করিতে পারে সেই পদার্থ কেবল মাত্র সেই সকল মূল কিরণ আদান বা গ্রহণ করিতে পারে; এবং যদি ঐ পদার্থের তাপ (temperature) আদান এবং প্রদান উভয় কালে সমান থাকে তাহা হইলে ইহার যে কোন মূল কিরণ আদান প্রদান করিবার ক্ষমতা এক হইয়া থাকে।*

উপরোক্ত নিয়মানুসারে বিশ্লেষিত ছায়ায় (Spectrum) ব্যবধান

---

* Theory of Exchange :—Every substance which emits certain kinds of rays to the exclusive of others, absorbs the same kind which it emits and when its temperature is the same in the two cases compared, its emissive and absorbin g powers are precisely equal for any one elementary ray.—Deschanel's natural Philosophy p. 1074.

রহিত (continuous) লোহিতাদি সপ্ত মূলকিরণের ক্ষেত্র প্রদানকারী কোন আলোকের সম্মুখে কতিপয় মূলকিরণ প্রদানকারী দীপ্ত বাষ্প রাখিলে ঐ দীপ্ত বাষ্প ঐ আলোক নিঃসৃত সপ্তমূল কিরণের মধ্যে কেবল মাত্র সেই মূল কিরণ সকল গ্রহণ করিবে যাহা ইহা প্রদান করিতে পারে।

এখন যদি একটী আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র এরূপ ভাবে স্থাপিত করা যায় যে ঐ আলোক এবং ঐ দীপ্ত বাষ্প নির্গত রশ্মি এককালে ঐ যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষিত হইতে পারে তাহা হইলে নিম্নলিখিত ফলত্রয়ের মধ্যে একটী দেখিতে পাইব।—

১। বিশ্লেষিত ছায়ায় (Spectrum) অবচ্ছেদ রহিত (continuous) সপ্তমূল কিরণের ক্ষেত্র—(যদি আলোকের ও দীপ্ত বাষ্পের উজ্জ্বলতা সমান হয় কারণ এস্থলে দীপ্ত বাষ্প আলোক হইতে যেরূপ উজ্জ্বল যে সকল মূল কিরণ গ্রহণ করিতেছে সেইরূপ উজ্জ্বল সেই সকল মূল কিরণ প্রদান করিতেছে।)

২। বিশ্লেষিত ছায়ার মূল কিরণ ক্ষেত্র বিশেষে কতিপয় উজ্জ্বল রেখা—(যদি আলোকাপেক্ষা দীপ্ত বাষ্পের ঔজ্জ্বল্য অধিক হয়, কারণ এস্থলে দীপ্ত বাষ্প যেরূপ উজ্জ্বল যে সকল মূলরশ্মি গ্রহণ করিতেছে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর মূল কিরণ বিতরণ করিতেছে।)

৩। বিশ্লেষিত ছায়ার মূল কিরণ ক্ষেত্র বিশেষে কতিপয় কৃষ্ণ-রেখা—(যদি আলোক দীপ্ত বাষ্পাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হয় কারণ এস্থলে দীপ্ত বাষ্প যে সকল উজ্জ্বল যে সকল মূল রশ্মি আলোক হইতে লইতেছে তদপেক্ষা হীনপ্রভ সেই সকল মূলরশ্মি বিতরণ করিতেছে)।

এই তৃতীয় ফল হইতেই বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকের ছায়ায় পরিলক্ষিত কৃষ্ণরেখা সকলের কারণ বুঝাইতে পারা যায় সুতরাং ইহার পরীক্ষা প্রণালী নিম্নে প্রকটিত হইল।

যদি ব্যাটারীর অঙ্গার মুখদ্বয় জাত তাড়িতালোক ও আলোক

বিশ্লেষণ যন্ত্রের ছিদ্র (narrow slit) এই উভয়ের মধ্যে একটি স্পিরিট ল্যাম্পের আলোক এরূপভাবে রাখা যায় যে এই উভয় আলোক উক্ত যন্ত্র দ্বারা এককালে বিশ্লেষিত হইতে পারে তাহা হইলে আমরা ব্যবধান রহিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র বিশিষ্ট ছায়া দেখিতে পাইব। এখন যদি স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় লবণ দগ্ধ করা যায় তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বলক্ষিত অবচ্ছেদ রহিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সমূহ মধ্যে পীত ক্ষেত্রে অতি সন্নিকট কৃষ্ণ রেখাদ্বয় দেখিতে পাইব। কিন্তু এখন তাড়িতালোক নির্ব্বাণ করিলে অবচ্ছেদ রহিত সপ্ত মূল কিরণের ক্ষেত্র সমূহ মধ্যে পীত ক্ষেত্রে কৃষ্ণ রেখাদ্বয় পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল পীত রেখাদ্বয় দেখিতে পাইব। আবার ঐ তাড়িতালোক জ্বালাইলে পীতক্ষেত্রে পুনরায় কৃষ্ণ রেখাদ্বয় দৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ এই, স্পিরিট ল্যাম্পের শিখাস্থ দীপ্ত লবণক বাষ্প (incadescent sodium vapour) সপ্ত মূল কিরণের মধ্যে কেবল মাত্র পীত রশ্মি প্রদান ও গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহাপেক্ষা তাড়িতালোক উজ্জ্বলতর বলিয়া ইহা তাড়িতালোক হইতে যেরূপ উজ্জ্বল পীত কিরণ গ্রহণ করিতেছে তদপেক্ষা হীনপ্রভ পীত রশ্মি প্রদান করিতেছে সুতরাং তাড়িতালোকের বিশ্লেষিত ছায়ার পীতক্ষেত্রে ইহা কৃষ্ণ রেখাদ্বয় প্রদান করিতেছে। অন্যান্য ধাতব বাষ্প সম্বন্ধেও এইরূপ পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

এই সকল পরীক্ষাদি হইতে আমরা সূর্য্য কিরণ সম্বন্ধে বক্ষ্যমান সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সূর্য্যালোক প্রধানতঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ স্তর হইতে উদ্ভূত হয়। এই স্তর বেষ্টন করিয়া যদি বাষ্প মণ্ডল না থাকিত তাহা হইলে এই স্তরোদ্ভূত কিরণ বিশ্লেষিত ছায়ায় কেবল মাত্র ব্যবধান রহিত সপ্তমৌলিককিরণক্ষেত্র উৎপাদন করিত।

কিন্তু সূর্য্য বেষ্টিত বায়ুমণ্ডলে যে সকল মৌলিক পদার্থের বাষ্প আছে তাহারা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত স্তর নির্গত আলোক হইতে বিশেষ বিশেষ মৌলিক কিরণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের তাপ ঐ স্তরাপেক্ষা কম বলিয়া তাহারা যেরূপ উজ্জ্বল যে যে মূল কিরণ গ্রহণ করে তদপেক্ষা হীনপ্রভ সেই সেই মূল কিরণ প্রদান করে। সুতরাং বিশ্লেষিত ছায়ার সপ্ত ক্ষেত্রে কৃষ্ণরেখা সকলের উৎপত্তি হয়।

মা।

এমন সুধাসিক্ত সঞ্জীবনী-শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজনসম্মানিত মা শব্দ এই পাপতাপময় সংসারে কে আনিল! এমন শ্রবণসুখকর প্রাণমন স্নিগ্ধকারক অপার্থিব শব্দ এই আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল সংসার বক্ষে কে সৃজন করিল? এরূপ দুঃখাপহারক সন্তোষবিধায়ক শান্তিদায়ক স্বর্গীয় পীযূষ এই ক্রন্দন-কোলাহল-রোগ-শোক-সমন্বিত কঠোর সংসারের নিদারুণ বক্ষে কে প্রবাহিত করিল? মরি! মরি! এমন শ্রুতিসুখদায়ক প্রাণভরা হৃদয়ভরা শব্দ সংসারে কি আর আছে!

মধুর মা শব্দ একবার মাত্র শ্রুতিপথে পতিত হইলে শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইতে থাকে, হৃদয় এক অপার্থিব অনির্ব্বচনীয় পবিত্রভাবে বিভোর হইয়া উঠে, প্রাণ কি এক অভিনব বিমল আনন্দে উৎফুল্ল হয়! মন, যেন পাপ তাপ বিষাদ বিসম্বাদ মর্ম্মবেদনা বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া, শব্দ-সম্পদশীর্ষ মা শব্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে। এই মা শব্দই সংসারের সার, জীবনের একমাত্র অবলম্বন। মা

আনন্দের নিত্যনিকেতন, ধর্ম্মের মহৎ মরকত মন্দির, স্নেহের অচিন্ত-নীয় লীলাস্থল, ভালবাসার অপার বারিধি, শান্তির উন্মুক্ত উৎস।

শোক-তাপ-জর্জ্জরিত, জীবন্মৃত, বিপদ-বিড়ম্বনায়-উৎপীড়িত, নিরানন্দের নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন জীবনকে বিড়ম্বনাময় বোধ করিয়া শত শত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকি তখন কাহাকে মনে পড়ে? যখন ভয় ভাবনার বিভীষিকাময়ী পৈশাচিকী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতে সন্ত্রাস্ত হইয়া অতীব অত্যাচারের মর্ম্মপীড়ায় দিবানিশি উষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকি, তখন কাহার পবিত্রোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত মহৎ নাম উচ্চারণ করিয়া শান্তিলাভে সক্ষম হই? যখন আশার স্থল নিরাশা কর্তৃক অধিকৃত হয়, সুখের অম্লান জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তে দারুণ দুঃখের ঘোর অমানিশার গাঢ়তম অন্ধকার আসিয়া প্রাণ মন অধিকার করে, যখন সম্পদ্ সাম্রাজ্য দীনতায় পর্য্যবসিত হইয়া মানবকে ভিক্ষুকে পরিণত করে, তখন কাহার করুণাবিমণ্ডিত নিরানন্দবিরহিত কল্যাণপ্রদ সুধার আধার পবিত্র নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়? "মা! মা!! মা!!!

মা শব্দ সংসারে আছে বলিয়া এখনও সংসার "সংসার" অভিধায় অভিহিত হইতেছে; এই মা শব্দের গুণে এখনও মর্ত্ত্যধাম প্রেত-পুরীতে পরিণত হয় নাই; কেবল মাত্র মা শব্দের বলে এখনও আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হই নাই। মা এই মহাশব্দ এখনও পূর্ণরূপে প্রকটিত বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। মা শব্দের অন্তস্তলে নাই কি? প্রেম আছে, প্রীতি আছে, দয়া আছে, মায়া আছে, আনন্দ আহ্লাদ সুখ সম্পদ মানবের যাহা চির বাঞ্ছনীয়, মানবের যাহা চির প্রার্থনীয়, সে সমস্তই এই মা শব্দের অন্তস্তলে নিহিত দুর্দ্দম নিরাশার দুর্জ্জয় আধিপত্যে এই মধুর মা শব্দই আমাদিগকে

সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, অজেয় বাসনার দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে করিতে যখন ভগ্নমনোরথ হইয়া হতাশের গাঢ়তম অন্ধকারে ডুবিয়া যাই তখন মা এই বাক্যই আমাদিগকে আশার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক প্রদান করে। ধন্য তিনি যিনি এই মা শব্দের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন! ধন্য তিনি যিনি এই মা শব্দের অনন্ত মহিমা বুঝিয়া কৃতার্থ হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, আর তিনিই ধন্য তাঁহারই জন্ম জীবন সার্থক যে পুরুষপুঙ্গব মা শব্দের অনির্ব্বচনীয় অর্থ অবগত হইয়া ভাববিহ্বলচিত্তে "মা" "মা" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে নরাকারে দেবত্ব লাভ করিয়া ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনের চরমোৎকর্ষে উপনীত হইয়াছেন!

অজ্ঞানান্ধকারসমাচ্ছন্ন শূন্যগর্ভগর্ব্বোন্মত্ত অহংজ্ঞানবিভোর হিতাহিত-বিবেচনা-বিবর্জ্জিত দুর্নীতি-পরায়ণ আমরা জানিনা মা শব্দের অর্থ কি, মা শব্দের মাহাত্ম্য কিরূপ, মা শব্দ কত মূল্যবান! হৃদয়ে বল নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই, সদিচ্ছারও একান্ত অভাব নিবন্ধন বুঝিতে পারিনা অমূল্য মা শব্দকে হৃদয়ের কোন্ নিভৃত নিকেতনে স্থান দান করিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়। মায়ের সন্তান হইয়া মাকে চিনিতে পারিনা, মায়ের স্নেহসিক্ত অমৃতময় ক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়া মাকে চিনিতে পারি না, মায়ের অপার্থিব করুণাবলে মানব নামে অভিহিত হইয়া মাকে চিনিবার ক্ষমতার অভাব ইহা কি কম বিড়ম্বনা, কম দুর্ভাগ্য, কম পশুত্ব পরিচায়ক? মূর্খ আমরা কেমন করিয়া প্রত্যক্ষদেবী মায়ের মাহাত্ম্য ধ্যান ধারণায় আনয়ন করিব? অজ্ঞান আমরা মাকে কেমন করিয়া প্রাণপণে পূজা করিতে হয় কিরূপে বুঝিব? মোহমুগ্ধ-বিষয়বিকারভ্রান্ত, ভ্রান্তিজাল-বিজড়িত পাপপ্রপঞ্চে প্রপতিত,

অধর্ম্মের ক্রীতদাস যাহারা, মায়ের মহিমাদীপ্ত মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি কেমন করিয়া তাহারা মোহমলিনতাময় হৃদয়ে স্থান দান করিবে?

মা—তোমার মা, আমার মা, বালকের মা, বৃদ্ধের মা, স্ত্রীলোকের মা, পুরুষের মা, পাপীর মা, পুণ্যাত্মার মা, জ্ঞানীর মা, অজ্ঞানের মা, ধনীর মা, নির্দ্ধনের মা, হিন্দুর মা, অহিন্দুর মা—মা সকলের মা! জগতের মঙ্গলময়ী মা—প্রাণিপুঞ্জের অশিবনাশিনী শক্তিবিধায়িনী মা! মানবকুলে জন্মলাভ করিয়া যদি এমন মাকে চিনিতে না পারিলাম তবে জীবনে করিলাম কি? জগতে আসিয়া যদি মাকে ভুলিয়া রহিলাম তবে ছার জীবনে করিলাম কি? দুই দিনের জন্য ক্ষণবিদ্ধংসী বিন্মূত্রপ্রপূরিত পাপভার নিপীড়িত সেই ভার বহন করিবার জন্যই যদি জগতে আসিয়া থাকি, তবে এই অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারণেরই বা প্রয়োজন কি? তাই বলি মাগো! শক্তি দাও, সামর্থ্যসম্পন্ন কর, বিদ্যা বুদ্ধি বিবেক দানে কৃতার্থ করিয়া পাপী তাপী নরকের কীট আমাদের তোমার জগজ্জননী বিশ্বমাতা রূপে সন্দর্শন করিবার অধিকার দাও মা! দীন, হীন, অবোধ, শোক-প্রপীড়িত, হতভাগ্য, সন্তানগণকে তোমার চিরানন্দময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা দাও মা! যাহাতে তোমার সন্তানগণ তোমারই সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারিয়া "মা" "মা" রবে জগৎ মাতাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দাও মা! বিষয়াসক্ত বিমূঢ় আমরা যাহাতে "মা" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া মায়ের সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারি তাহার উপায় বিধান কর মা! ওমা দুরিতাপহে! তোমার অধম অকৃতজ্ঞ পামর সন্তানগণ শত শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমারই পুত্র সুতরাং তুমি দয়া না করিলে তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে তুমি অভয় না দিলে আর কোথায় কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে?

কাহার অমৃতোপম অভয় বাণী আমাদিগকে কৃতার্থ করিবে? আমরা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমারই রক্ষণীয়, তোমারই পালনীয়, তোমারই বিপদতারিণী নামের মাহাত্ম্য-প্রভায় প্রভান্বিত হইবার অধিকারী, কেননা পুত্র "কু" হইতে পারে কিন্তু মাকে "কু" হইতে কে কোথায় কবে শুনিয়াছে? তাই বলি মা! শক্তি সম্পন্ন কর যেন তোমারই নামের গুণে তোমারই মাহাত্ম্য-প্রভায় তোমারই করুণা বলে আমরা তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি।

দীন-জননি মাগো! তুমিই আদ্যাশক্তি, রক্ষাকর্ত্রী ও সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী! তোমারই শুভ দৃষ্টিতে জগতে অমৃত বর্ষিত হয় তোমারই অশুভ দৃষ্টিতে সংসার রসাতলে লীন হয়! তোমার ইচ্ছায় না হয় কি মা? এই যে ভীষণ ভূ-কম্পন প্রলয়কর মহামারী, দুর্ব্বিসহ দুর্ভিক্ষ একি তোমার ইচ্ছায় নহে? এই যে অভাবের ভীষণ অবসাদে একান্ত অবসন্ন আমরা দিন দিন দীনতায় উপনীত হইয়া অকালে কালকবলিত হইতেছি এ কাহার ইচ্ছায় মা! এই যে দিগন্ত-ব্যাপী প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে জীব জগত সন্ত্রাস্ত ব্যতিব্যস্ত মর্ম্মাহত কাহার ইচ্ছায় মা! এই যে ভীষণ ভীতিসঞ্চারক প্রবল প্লাবনে তোমার শত শত সন্তান সর্ব্বস্বান্ত, পুত্রকলত্রবিয়োগবিধুর কাহার ইচ্ছায় মা! বিশ্বজননি, ঐ দেখ তোমারই অব্যর্থ আদেশে পাপপিশাচিনী কি বিভীষণভাবে অট্টহাস্যে বিকট তাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ। ঐ দেখ মা! তোমারই দুর্ব্বোধ লীলাবশে কর্ম্মদোষে একজন পথের ভিক্ষুক আবার কর্ম্মগুণে একজন সহায়-সম্পদ-সমন্বিত হইয়া ধর্ম্মের বক্ষে পদাঘাত পূর্ব্বক পাপের পদে স্বেচ্ছাবিক্রীত হইয়া নরাকারে পশুত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কল্যাণদায়িনি মা! তুমিই জগতের সুখদা শুভদা মোক্ষদা! তুমিই মা সংসারের নিয়ন্ত্রী! জ্ঞান নাই কেমন করিয়া মায়াময়ার মায়ার খেলা বুঝিতে পারিব? শক্তি নাই কেমন করিয়া আদ্যাশক্তির শক্তিমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিব? কলুষ-কলঙ্কিত কামানলে অনুদগ্ধ ভ্রান্ত মানব আমরা কোন্ গুণে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে জগজ্জননী মহামায়ার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থতা লাভেও ধন্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব? জননি! তোমার ঐ শুভ দৃষ্টিতে মানব অমৃত-পারাবারে দিবানিশি ভাসিতে পারে; আবার তোমারই অশুভ ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে মানব দারুণ দুঃখের দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে পারে। মা তুমি কাহাকে হাসাও কাহারও উষ্ণ অশ্রু দিবানিশি ঝরাও, কাহাকে দুরারোহ দুরবলোক্য সৌধশিরে বিলাস-মন্দিরে শয়ান রাখিয়া পঞ্চমকার পরিসেবন তৎপর করাও। তোমার লীলার কি ইয়ত্তা আছে মা? কাহার সাধ্য মা তোমার লীলা বুঝিতে পারে?

পতিতপাবনি পতিতোদ্ধারিণি গতিমুক্তিবিধায়িনি জননি! যদি অধম পতিতগণের পরিত্রাণের পথ বলিয়া না দেও তবে কোথায় তাহারা দাঁড়াইবে? মাগো! তাহারা যে মায়ের সন্তান তাহারা যে বিশ্বমাতা নিস্তারিণীর সন্তান; তাহারা ত মা মাতৃহীন নহে, মাতৃকরুণায় বঞ্চিত নহে, বিশ্বেশ্বরী মা যে তাহাদের বিপদে সম্পদে রোগে শোকে অভাব-অত্যাচারে অভয় হস্তে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিতেছেন; করুণাময়ী মায়ের স্নেহ-সুধাই যে তাহাদিগকে পদে পদে প্রতিক্ষণ সঞ্জীবিত করিতেছে! ভাগ্যহীন হিতাহিত বিবেচনা রহিত আমরা এমন মাকে চিনিতে পারি না এমন মায়ের পূজা করিয়া অমূল্য মানবজীবন সার্থক করিতে পারিলাম না! তাই আজ কর যোড়ে কাতর কণ্ঠে বলি মাগো! ভক্তি

দাও শুভাশীস্ প্রদান কর, যেন এই অকৃতজ্ঞ আমরা তোমাকে চিনিবার অধিকারী হইয়া প্রাণ ভরিয়া একবার মা মা বলিয়া প্রাণের প্রবল আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমন পূর্ব্বক ক্ষণবিধ্বংসী জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধন করতঃ ভয় ভাবনা সঙ্কুল ভীতিক্ষুব্ধ সংসারের মায়া উল্লঙ্ঘন পুরঃসর তোমারই চরণোপান্তে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

চিত্রকর বেশী রাজা।

(টেনিসন কৃত "লর্ড বার্লে" অবলম্বনে লিখিত।)

কহিল যুবক যুবতীর কাণে
পুলক পুরিত মৃদুল স্বরে—
"তোমার ভঙ্গিমা হেরি হয় মনে
ভালবাস তুমি নিয়ত মোরে।"
"এমন কেহই নাহিক এভবে
যা'রে ভালবাসি তোমার সম"
কহিলা যুবতী আরো মৃদুরবে—
"তুমিই জীবন-সর্ব্বস্ব মম।"

যুবা, প্রকৃতির দৃশ্য চিত্রকর;
যুবতী, গ্রামের সরলা নারী।
অবাধে যুবক রাখিল অধর
প্রণয়-স্ফুরিত অধরে তা'রি।
গ্রামের মন্দিরে হইল বিবাহ
ছাড়িলা যুবতী পিতার ঘর,
ধায় প্রণয়িণী প্রণয়ীর সহ,
অনুরাগে বাঁধি করেতে কর।

"নারিনু বিবাহে দিতে উপহার
কোথা সে সৌভাগ্য প্রিয়ার তরে;
শুধু ভালবাসা কুটীর দোঁহার
আনন্দে রাখিবে নিয়ত ভোরে।
প্রাণাধিক ভালবাসি যে তোমায়—"
চলিতে চলিতে কহিলা যুবা;
ছাড়িয়া উদ্যান-মণ্ডপনিচয়
হেরিলা কতই প্রাসাদ শোভা।

নিদাঘ কানন, যাহারে ব্যাপিয়া,
বাতাসে মুখর পল্লব দোলে;
গভীর ভাবনা হইতে জাগিয়া
যুবক আবার প্রিয়ারে বলে—
"বড় ভালবাসি তোমায় প্রেয়সি,
হের এ সুন্দর প্রাসাদ শত;
ইহারই মাঝে, আনন্দে বিরাজে
অভিজাত ধনি-সন্তান যত।"

শুনিতে শুনিতে সে প্রেমবচন,
চলিলা রমণী পতীর সাথে ;
গৌরব মণ্ডিত যা'কিছু মোহন
পতি গেছে যেতে হেরিলা পথে।
আরাম-শোভিত তরুচ্ছায়াময়
ভূস্বামীর সৌধ প্রাচীনাগার ;
বিলাস-সম্পদ-সম্ভোগ-আশয়
হয়েছিল ভিত্তি গঠিত যার।

যুবক প্রিয়ায় যতই দেখায়
তত প্রিয় হয় প্রিয়ার পাশে ;
যুবতীর মন হয় ক্ষণে ক্ষণে
সে কুটীরখানি নিকটে আসে—
আসিয়া যেখানে যাপিবে দুজনে
জীবন বিমল প্রণয় ভরে,
শান্তি সুখে ভোরে রাখিবে যাহারে
সাজাবে মনের মতন ক'রে।

সরলা এমনি উল্লাস অন্তরে
আয়ুধ শোভিত তোরণ পথে ;
পতির সহিত পশিলা সুধীরে
উন্নত প্রাসাদে অপর হতে।
হেরিয়া যুবারে দাঁড়া'ল দুয়ারে
ফুল্ল বীর্য্যবান প্রহরী যত ;
বিনয় বচনে কথোপকথনে,
সসম্ভ্রমে শির করিয়া নত।

বিস্মিতা প্রমদা ; যুবক আস্ফালি
প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠে ফিরে,
কহিলা যা কিছু হেরিছ সকলি
প্রেয়সি, তোমার আমার তরে।
স্বাধীন হৃদয়ে হেথায় বিরাজে
যুবক বিপুল গৌরব সহ ;
তাঁহার সমান এ প্রদেশ মাঝে
প্রধান ভূস্বামী নাহিক কেহ।

সহসা রঞ্জিত হ'ল সুন্দরীর
ললাট, চিবুক, বদন-ভার ;
যেন গো সরমে মরমে অধীর
বিবর্ত্তিত হ'ল পরাণ তাঁ'র।
দেখিতে দেখিতে সে চারু আনন
প্রাতঃশশী সম হইল ম্লান ;
প্রেমাশ্লেষে বাঁধি যুবক তখন
সরসিল সুখে প্রিয়ার প্রাণ।

দিন দিন বালা পাইলা প্রয়াস
মনোদুর্ব্বলতা করিতে ক্ষীণ ;
সময়ে সময়ে যদিও মানস
হইত তাঁহার উৎসাহ হীন।
রমণী-সুলভা কোমলতা সহ
রহিত সম্ভ্রমে কর্ত্তব্য কাযে ;
সুধীর স্বামীরে লয়ে অহরহ
প্রশান্ত অন্তরে সংসার মাঝে।

সরল ব্যাভারে যত অনুচর
ছিল অনুগত বাসিত ভাল,
কেবল একটী ভাবনা তাঁহার
নিভাইতেছিল প্রাণের আলো।
করিত বিহ্বল দিবা বিভাবরী
অযাচিত পরমর্য্যাদা তাঁরে ;
লয়ে যে সম্মান লভেনি সুন্দরী
জনম আপন পিতার ঘরে।

ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ হ'ল তনু খানি
ললিত লাবণ্য পড়িল ঝ'রে ;
ভাবিত সরলা যখনি তখনি
কহিত কখন করুণস্বরে—

পতি প্রকৃতির দৃশ্য চিত্রকর
হইলে জীবন কি সুখময়
হইত যে মম ;—গ্রাম্যললনার
যে বেশে হৃদয় করিলা জয়।

এমতি করিয়া সুধীরে শুকা'ল
পতিপ্রেমে বাঁধা সে হেমলতা ;
তিনটী সন্তান রাখিয়া ত্যজিল
অকালে জীবন জুড়াল ব্যথা।

শ্রীরসময় লাহা।

কালিদাস প্রসঙ্গ।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে জীবনী লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল না। লোকে কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতির আলোচনা করিত। জীবনী লেখা অথবা জীবনী পাঠ করা যে একটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য ইহা আদৌ কেহ মনে করিত না। যে মহাকবিদের জীবন চরিত আমরা ভূয়োভূয়ঃ জানিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাদের বিষয় জানিবার কোনওরূপ সম্ভাবনাই নাই। সে সকল কবিরা গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কাব্য আছে। সেই কাব্যের জন্যই তাঁহাদের নাম আজিও জগতে বিরাজমান। ঐ সকল কাব্যে যে সকল আত্মবিবরণাদি (যদি কিছু পাওয়া যায়), ও কবিগণের বিষয়ে যে সকল পরম্পরাশ্রুত বিবরণাদি পাওয়া

যায় তাহাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত জীবনীর অভাবে জীবনী স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। যে মহাকবি কালিদাস ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বর্ণনার চাতুর্য্য ও রচনার মাধুর্য্য বিষয়ে যে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, যাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শ স্বরূপ রহিয়াছে, যাঁহার প্রতিভা কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই পূজিত, এবং যাঁহার কাব্যরসাস্বাদ পাইয়া জগৎ মুগ্ধ সেই মহাকবি কালিদাসের কোন জীবনী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা তাঁহার বিষয় যাহা জানি এবং লোক পরম্পরায় যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী লোক ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে শক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম সংবৎ—এখন সংবতের ১৯৫৫ চলিতেছে। সুতরাং মহাকবি কালিদাস যে উনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী নগরীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উজ্জয়িনী গুজরাটদেশের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। কলনাদিনী পূতসলিলা সিপ্রানদী এই উজ্জয়িনী নগরীর পাদদেশ নিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। এই সিপ্রানদী উজ্জয়িনী নগরীর যে কিরূপ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল তাহা মহাকবি কালিদাস স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

"অনেন যূনা সহ পার্থিবেন
রম্ভোরু কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে
সিপ্রাতরঙ্গানিল কম্পিতাসু
বিহর্তুমুদ্যান পরম্পরাসু॥"

'হে রম্ভোরু, সিপ্রানদীর তরঙ্গ সংস্পর্শে সুশীতল বায়ুভরে কম্পিত উদ্যান সমূহে এই যৌবনসম্পন্ন রাজার সহিত বিহার করিতে যদি অভিরুচি হয়, তবে ইঁহাকেই বরণ কর।'

অতঃপর মেঘদূতে কালিদাস পুনশ্চ উজ্জয়িনী নগরীর সৌন্দর্য্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। যক্ষ উত্তর মেঘকে বলিতেছেন।

"বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।"

"যদিও উত্তরদিকে প্রস্থান করাতে, উজ্জয়িনীর পথ তোমার বক্র হইবে তথাপি, সেই উজ্জয়িনীর সৌধ সকলের উপরিভাগে অবস্থিতি করিয়া তাহার সহিত পরিচয় করিতে পরাঙ্মুখ হইও না।" আবার বলিতেছেন 'যদি উজ্জয়িনীর শোভা না দেখ তাহা হইলে তোমার জন্ম বিফল হইবে।"

আবার,　"স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাংগতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং॥"

"ঐ পুরী অবলোকন করিলে বোধ হয়, পুণ্যফলের খর্ব্বভাব হওয়াতে, স্বর্গবাসীরা পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে আপনাদের অবশিষ্ট পুণ্য সহায়ে স্বর্গেরই পরমকান্তিবিশিষ্ট এক খণ্ড যেন সঙ্গে করিয়া আনয়ন করিয়াছেন।"

এমন সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যশালিনী উজ্জয়িনী কালিদাসের আবাস-ভূমি ছিল। এরূপ স্থানে বাস করিলে ও নিয়ত স্বভাবের শোভা দর্শন করিলে কবিত্বশূন্য ব্যক্তিরও হৃদয়ে স্বতঃ কবিত্বের আভাস প্রকাশ পায়, কবি কালিদাসের হৃদয়ে যে অনুপম কবিত্বপূর্ণ ভাব উদয় হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র কি? তিনি সেই সকল ভাব মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়া জগতের মধ্যে অতুলনীয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত নাটকগুলি উজ্জয়িনী নগরীর অন্তর্গত মহাকাল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত তন্নামপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের নাটমন্দিরে অভিনীত হইত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভাসদবর্গ ও পণ্ডিত মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ সকল নাটকের গুণাগুণ বিচার করিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কেই বা নবরত্নের কথা না জানেন!

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণ কোহমরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

এই নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের সভায় বিরাজ করিতেন এবং নবরত্নের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। ধন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমিই মহাকবি কালিদাসের—সরস্বতীর বরপুত্রের নিকট সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার প্রথমে শুনিয়াছ! ধন্য কালিদাস! তুমি অশেষগুণসম্পন্ন বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ও প্রিয় বয়স্য ছিলে! আর ধন্য উজ্জয়িনী নগরি! তোমার বক্ষে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও মহাকবি কালিদাস পদব্রজে বিচরণ করিয়াছিলেন এবং তোমারই মধ্যস্থিত রঙ্গভূমিতে মহাকবি কালিদাসের নাটকাদি অভিনীত হইয়াছিল! মহাকাল ভৈরব! তোমার সমক্ষে কালিদাস জীবিত অবস্থায় কাব্যপ্রণয়ন করিয়াছেন, তোমার বন্দনা করিয়া কালিদাসের গ্রন্থাদি অভিনীত হইয়াছে এবং তোমারই প্রসাদে এই মরজগতে কালিদাস অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আজ ঊনবিংশতি শত বৎসর পরেও কালিদাসের নাম উজ্জ্বল রহিয়াছে।

কালিদাস ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বটে

তথাপি তিনি অনেকের নিকট যেন আধুনিক লোক বলিয়া বিবেচিত হন। আমরা অনেক শ্লোক শুনিয়াছি তাহাতে "কহেন কবি কালিদাস" এইরূপ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে*। সংস্কৃত ভাষায়ও উদ্ভট শ্লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শ্লোকের প্রকৃত প্রণেতা যে কোনব্যক্তি তাহা না জানিতে পারায় লোকে ঐ গুলির সমাদর বর্দ্ধনার্থ কালিদাস প্রণীত বলিয়া থাকে। কতক গুলি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক হইতে কালিদাসের জীবন চরিতেরও কিছু কিছু বিবরণ জানিতে পারা যায়।

প্রবাদ এইরূপ যে কালিদাস বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করেন নাই। অনেক বয়স পর্য্যন্ত মূর্খ ছিলেন। পরে দেবী সরস্বতীর বরে অদ্বিতীয় বিদ্বান্ হন। কালিদাসের বিষয়ে এমনও বর্ণিত আছে যে একদা কালিদাস বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়াছিলেন ঐ শাখা কুঠারিদ্বারা ছেদন করায় ভূতলে পতিত ও অচেতন অবস্থায় গৃহে নীত হন। আরও এরূপ কথিত আছে যে তিনি বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বালক ছিলেন এবং সর্ব্বদা ছোট ছোট বালকদিগকে প্রহার করিতেন ও বয়োজ্যেষ্ঠগণকে গালি দিতেন। তিনি অত্যন্ত অসভ্য ছিলেন। এই সকল নিন্দাবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে। এবং উত্তমরূপ প্রমান দ্বারাও ইহার যাথার্থ নির্ণয় করা যায় না। আরও এক কথা এই যে যাঁহার ভাষার মাধুর্য্যগুণে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে তিনি যে জীবনের প্রারম্ভে মধুরতার দিক দিয়া যাইতেন না ইহা কিরূপ সম্ভবে? যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র সমভাবে পূজিত, জীবনের মধুময় প্রাতঃকালে সেই প্রতিভার যে ঈষৎ আভাসও পাওয়া

* এই সকল হইতে সংস্কৃত ভাসানভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেকে মনে করিতে পারেন যে কালিদাস বঙ্গভাষার প্রাদুর্ভাবের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাহা নহে।

যায় নাই ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বরং অপর পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে বাল্যকাল হইতে প্রতিভার ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। তবে কেন যে নিন্দাবাদ হইল উহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। বড়লোক হইলেই নিন্দা হইয়া থাকে। কালিদাস বড়লোক হইয়াছিলেন, এই জন্তই তাঁহার অপযশঃ। কেন যে অপযশঃ হয় ইহার কারণ এই যে যখন কোনও লেখকের কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন লোকে এই বিচার করে যে 'অমুক লেখক আমাদের অপেক্ষা কিসে বড়'—'আমরা কি এরূপ লিখিতে পারি না?' আত্মাভিমান অমনি উত্তর দেয় "হাঁ পারি বৈকি।" সুতরাং অমনি তাঁহারা গ্রন্থকারের দোষ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হন। যদি দোষ মিলিল তবে ভালই হইল উহা লইয়াই আন্দোলন চলিল। যদি দোষ না মিলিল তবে গ্রন্থকারের অন্য কোনও বিষয়—বাল্যজীবন, পারিবারিক অবস্থা, দারিদ্র্য বা অপর কিছু লইয়া উহা হইতে ছিদ্রানুসরণের চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং কোনও ছিদ্র পাইলেই উহা লইয়া আন্দোলন ও গভীর গবেষণা আরম্ভ হইয়া থাকে। এরূপ ছিদ্রও পাওয়া দুর্ঘট নহে। দুরাত্মাদের ছলের অসদ্ভাব নাই। ব্যাঘ্র যেরূপ তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে মেষশাবক ঝরণার নীচে জলপান করিয়াও উপরের জল কর্দ্দমাক্ত করিয়াছে উহারাও সেইরূপ তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে উক্ত গ্রন্থকার প্রকৃত প্রস্তাবে দোষী না হইলেও নিশ্চয় দোষী। এই ত গেল নিন্দাবাদের কথা। এই জন্তই কালিদাসের নিন্দাবাদ এবং এই জন্তই আমরা বলি যে কালিদাসের বিষয় যত কথা শুনা যায় সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিপিন বিহারী সেন গুপ্ত।

কলঙ্কিনী।

নিকুঞ্জবালার কথা।

তোমরা কেহ বলিতে পার চোকের চাহনিটা কি জিনিষ? অবশ্য যে সে চোক নয়—ভাসা ভাসা টানা ডাগর চোক—যুবা বয়সের সেই কাল চোকের মধুর চাহনি। আমি ত আজিও কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; কিন্তু ঐ রকম এক জোড়া চোকের তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ এক দিন আমার মরমে প্রবেশ করিয়া জাত কুল সব ভাসাইয়া দিয়াছে। সে যখন আমাকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া দেয়, সে সময় আমি তাহার মধুর চাহনি দেখিয়া এমনিতর মোহিত হইয়াছিলাম, যে আমার কুলের বাঁধন আমাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; তবে লোকলজ্জা আর সামাজিক ভয় এই দুইটা মিলিয়া সেই বাঁধনে কিছু যোগ দিয়াছিল বলিয়াই আমি তখন কুলত্যাগিনী হইতে পারি নাই চোরাগোপ্তা বাণের মত এক রকম প্রেমে তখন হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনের হৃদয় গোপনে রঞ্জন করিতে লাগিল। ভয়, সুখ, আকাঙ্ক্ষা, নব যৌবনের বিকাশ, আর সেই মনচোরার বিরহ মিলন যে কি মধুর—কি মদিরাময়, তাহা আর কেমন করিয়া বলিব।

কিন্তু তখন যে কায করিয়াছি—পাপের সেই আপাত মধুর পথে প্রাণ ঢালিয়া যে পথে আসিয়াছি, এখন তাহার পরিণাম কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তাই তোমাদের কাছে আমার জীবনের কথা কতক কতক বলিয়া প্রাণের সন্তাপ দূর করিতে বসিয়াছি। আমি একজন কুলবধূ ছিলাম। আমার বয়স যখন দশ বৎসর তখন আমার বিবাহ হয়। আমার স্বামী বড় ধার্ম্মিক,

সত্যপরায়ণ-উন্নতহৃদয়-চরিত্রবান ব্যক্তি। তিনি এখন কোথায় আমি জানি না, তবে এই দুঃখের দিনে তাঁহাকে মনে পড়িতেছে। সাংসারিক অনটনের জন্য তিনি বিদেশে কাজ করিতেন। প্রায় তিন মাস অন্তর বাটী আসিতেন। আমার বয়স যখন তের কি চৌদ্দ বৎসর, তখন আমার স্বশ্রূঠাকুরাণীর কাল হয়। আমার মাথার উপর বড় কেহ শাসন করিবার ছিল না; তখন বাড়ীতে একজন ঝি থাকিত মাত্র; সেও বুড়ী, অনেক দিনের পুরাতন লোক। অগত্যা আমাকে গৃহিণীর আসনে অধিরূঢ়া হইতে হইল। বৎসর দুই কাটিলও ভাল। আমার স্বামী আমারই অনুরোধে আমারই সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত অতি কষ্টে মাসে মাসে ছুটী লইয়া বাটী আসিতেন। আমি নানা যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার হৃদয় গ্রাহিণী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু যাহার কপাল মন্দ, তাহার এ সুখ—এ বিমল স্বর্গীয় আনন্দ সহিবে কেন? কাযের প্রসারে পড়িয়া স্বামীর সেই ঘন ঘন বাড়ী আসা ঘুচিয়া গেল। আবার যে তিন মাস সেই তিন মাসই রহিল। বরং সময়ে সময়ে আরও বেশী। এই সময়ে আমার কপাল পুড়িল। কেমন করিয়া যে পুড়িল তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি—তবে আবার সেই পাপ কথার আলোচনায় প্রয়োজন কি?

গুপ্ত প্রণয় চিরদিন চাপা থাকে না। জানি না কেমন করিয়া প্রতিবেশী মণ্ডলীর নিকট ধরা পড়িলাম। স্পষ্ট কেহ কিছুই বলিত না বটে কিন্তু কাণাঘুসা খুব চলিতে লাগিল। উপযুক্ত সময়ে স্বামীও বাটী আসিতেন। তখন আমার আন্তরিক ভাল না লাগিলেও বাহ্যিক যে রূপ যত্ন শ্রদ্ধাদি করিতাম, তাহাতে আমার উপর সন্দেহ হওয়া দূরে থাকুক আমার অতিভক্তিও তিনি অকপট ভাবেই গ্রহণ করিতেন। আমার সেই আলুলায়িত কেশদাম, যাহা অলক্তক রঞ্জিত চরণ যুগল

চুম্বনের প্রয়াস পাইত, তাহাই গুচ্ছবদ্ধ করিয়া সযত্নে স্বামীর চরণ মুছাইয়া দিতাম। আহার বিহার ও যত্নে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতাম। সেই জন্য তাঁহার সরল হৃদয়ে একটিও অবিশ্বাসের রেখাপাত হয় নাই। বরং তিনি আমাকে গুণবতী সহধর্ম্মিণী বলিয়াই হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু লোকাপবাদ তাঁহার কর্ণ কলুষিত করিল; দুই একখানা নামহীন চিঠি পত্রও তাঁহার কর্ম্ম স্থানে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি কথঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি হঠাৎ কর্ম্মস্থান হইতে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলেন। আমাকে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার ভাব দেখাইয়া, এক সপ্তাহ কাল বাড়ীতে রহিলেন। কিন্তু এই কলঙ্কিনীর কৌশলজাল এমনই বিচিত্র, যে এই ধর্ম্মনিষ্ঠ যুবক আমার উপর সন্দেহের কোন কারণই উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইল না।

কিন্তু পাপের পথ চিরকাল মুক্ত হইলেও গুপ্ত থাকে না। এইবার তিনি যখন আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন মনে হইল যেন তিনি কিছু বিষাদাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন; অথচ তাঁহাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক স্বামী রওনা হইলেই সেই দীর্ঘ সপ্ত দিবসের পর মনচোরাকে পাইবার জন্য আমার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। স্বামী-বিদায় সংবাদ ত্বরায় তাহাকে প্রদান করিয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রসগুণাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে কিছু মাংস ও একটা মদের বোতল। আমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"মরি, মরি, সুন্দরী আমার"। তখন আমার রূপ উথলিয়া পড়িতেছিল। আর বলিতে লজ্জা কি—আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই চুম্বনের প্রতিদান

না দিয়া থাকিতে পারি নাই। এইরূপে সন্ধ্যাতিক্রমে আমাদের সে-দিনকার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

মনোচোরা বলিল—"আজ ভাল করিয়া, এই মাংসটুকু রন্ধন কর—অনেক দিন তোমার হাতে খাই নাই। আমি ততক্ষণ এই বোতলটা শেষ করি। তুমি কি একটু খাবে না সুন্দরি! না খাও আমায় একটু ঢেলে দিয়ে যাও; তোমার হাতে ঢালা মদও আমায় মাতাইয়া তোলে।"

আমি তখনও সুরাপান করিতে শিখি নাই কিন্তু তাহার সংসর্গে থাকিয়া, সুরা স্পর্শ করিতে বড় ঘৃণা হইত না। অগত্যা আমি মদ ঢালিয়া দিয়া রাঁধিতে গেলাম। তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। গুণমণি গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে লাগিল, আর আমি উনুন ধরাইয়া রাঁধিতে বসিলাম। ক্রমে ক্রমে গুণমণির গলা মন্দীভূত হইয়া আসিল। আমার বোধ হয় তখন তাহার বোতলটী নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল এবং সেই জন্যই তাঁহাকে নেশার ঘোরে তন্দ্রাভিভূত হইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক সেদিকে আমার বড় মন ছিল না। কারণ মাংসটা ভাল করিয়া রাঁধিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া সুখী করিবার বাসনাটাই প্রবল হইয়াছিল। যখন মাংস রান্না শেষ হইল তখন সেই শয্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, যে শয্যোপরি শয়ান সেই মদ্যপের হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়া, একখানি ছোরা গ্রথিত—দেহ রুধিরাক্ত ও প্রাণবায়ু বিনির্গত।

আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। বাটীর প্রবেশ দ্বার অবধি ভাল করিয়া একবার আলো লইয়া দেখিয়া আসিলাম। সমস্তই যেমন রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি তেমনই রুদ্ধ

রহিয়াছে। তখন ধীরে ধীরে আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। এখন আমার অবস্থা কেমন বল দেখি! এ বিপদ কাহাকেও বলিবার নয়; আর একাই বা কি করি তাই ভাবিতে লাগিলাম। কে হত্যা করিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শেষে এই স্থির করিলাম যে হয়ত সে আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু কি দুঃখে? ধীরে ধীরে তাহার বক্ষঃ হইতে ছোরাখানা খুলিয়া লইলাম। তখনও ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ছোরাখানা আমার স্বামীর এবং দেওয়ালে ঝুলান থাকিত। স্বামী সখ করিয়া উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধের ছোরা আমার সাধের প্রেমিকের প্রাণ নাশ করিল! এই কুহকিনী গোপনে তাঁহার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ছোরাখানা বোধ হয় বিশ্বাস হারাইতে পারে নাই। সে উপ-যুক্ত কাযই করিয়াছিল এবং প্রাণ-হীন হইলেও প্রভুভক্তের পরিচয় দিয়াছিল। এখনও সেই ছোরাখানা আমার কাছে আছে, সে কি একদিন আমারও প্রায়শ্চিত্তের পথ দেখাইয়া দিবে না?

অবশেষে আমি সেই মৃতদেহ উত্তমরূপে বাঁধিয়া নিকটস্থ নদী গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া আসিলাম। একাকিনী সেই অসমসাহসিক কার্য্য অতি কষ্টে সমাধা করিয়া বাটী ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়া গৃহদ্বার প্রভৃতি বেশ করিয়া ধৌত করিলাম। অতি সন্তর্পণেই এই সকল কার্য্য রাত্র মধ্যেই সমাধা করিয়াছিলাম।

তাহার পর প্রায় চারি মাসকাল গত হইল স্বামীর আর সংবাদ পাইলাম না। তাঁহার কর্ম্মস্থানে অনুসন্ধান করিয়া শেষে জানা গেল যে তিনি প্রায় চারিমাস হইল আর সেখানে কায করেন না। কোথায় গিয়াছেন তাহাও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন না। তখন আমরাও নানা সন্ধান করিলাম কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

এই খান হইতেই আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, আমি সেই দিন হইতেই স্বামী লাভ লালসা পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগিনী হইলাম। এবং সেই ভরা যৌবনে প্রকাশ্যে পাপের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনের সহিত সংমিশ্রণে সুরাপানও অভ্যস্ত হইল। ইহাতে কেবল যে মানসিক পতন সাধিত হইল তাহা নহে, আজ যে এই বিকৃত মুখ মণ্ডল ও একটী দৃষ্টি হীন বহিরোন্মুখ অক্ষিগোলক দেখিয়া তোমরা মনে করিতেছ—এ আবার সুন্দরী ছিল কেমন করিয়া? ইহাও সেই সুরাপান ঘটিত বাহ্যিক পতনের ফল। ইহার ফল এখনও শেষ হয় নাই। পতনের সেই গুরুতর আঘাত মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে; তাই সেই চরণ চুম্বিত চিকুরদামকেও শিরশ্চ্যুত করিতে হইয়াছে। ডাক্তারের মতে সামান্য উত্তেজনা বা অত্যাচার প্রভাবে হয়ত আবার পাগল হইতে পারি।

তাই এখন অনুতাপে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছে; আর আজ দশ বৎসর পরে মনে হইতেছে যে যদি একবার স্বামীকে পাই, তবে তাঁহার চরণ তলে এ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। কিন্তু তাঁহার যে স্বভাব তাহাতে তিনি যে আর এই পাপ সঙ্কুল লোকালয়ে আছেন সে বিশ্বাস আমার হয় না। তাই একবার সাধ হইয়াছে যে তাঁহার সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ফিরি।

কিন্তু এ মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া বাহির হইব? তোমরা ইহার একটা উপায় বলিয়া দিবে কি? যাক্ সে আমার কায আমি করিব আজ আমি সেই শুভ্ চরণ দর্শন আশয়ে শুভ যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। তোমাদের নিকট হইতে তাই আজ বিদায় হইলাম হয়ত এই শেষ দেখা। ভগবান কি আমার এই অন্তিম আশা পূর্ণ করিবেন না?

ব্রজলালের কথা।

সেই একদিন আর এই একদিন। আজ সেই দিনের কথা মনে পড়িতেছে। যে দিন পাঁচ বৎসরের শিশু আমাকে রাখিয়া পিতা অকালে পরলোক যাত্রা করেন, আর আমি আমার দুঃখিনী মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে থাকিয়া, দুঃখের সংসারেও একপ্রকার স্বচ্ছন্দে মানুষ হইয়া উঠিলাম। মায়ের যত্ন আশীর্ব্বাদ ও মধুর শাসন আমাকে যে সত্য এবং শান্তিময় পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, তাহা আজও আমাকে ধর্ম্ম ও নীতি পথ হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। যত দিন সংসারে মা ছিলেন, ততদিন আমাদের সেই দুঃখের সংসারেও কত সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলাম। মা কষ্ট করিয়াও লেখা পড়া শিখাইলেন; পাছে কোন প্রলোভনে পতিত হই, তাই কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়া আমাকে সংসারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। আবার আমার যে অর্দ্ধাঙ্গিনী হইল, সেও মায়ের শিক্ষায় দিন দিন আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তাহাকে কতই না ভাল বাসিতাম, কতই না বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু কে জানিত যে বৃদ্ধ মাতার স্বর্গলাভের তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতে সেই কুহকিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় আমাকে সংসার ত্যাগ করিয়া, এই জনমানবহীন স্থানে জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। চিরকোমলপ্রকৃতি মানুষের চিত্তও কেন যে মুহূর্ত্তের মধ্যে কঠিন হইয়া উঠে, আজিও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। জীবনের ঘটনাচক্রে পড়িয়া যে কায করিয়া ফেলিয়াছি, আজ প্রায় বার বৎসর গত হইল তথাপি তাহার স্মৃতিলোপ হইল না। স্মৃতি লোপ হওয়া দূরে থাকুক, আজি তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হয়; বুঝিতে পারি না কেন এমন হয়!

পাঁচজনের মুখে যেদিন শুনিয়াছিলাম যে আমার স্ত্রী চরিত্রহীনা,

তখন মনে করিয়াছিলাম দুষ্ট লোকে মন্দ কথায় আমাদের দাম্পত্য মিলনের বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য হিংসা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু যেদিন স্ত্রীর নিকট হইতে কর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য বিদায় লইয়া গোপনে অবাসস্থিত বহুবিস্তৃত তমালতরুর পল্লব মধ্যে লুকাইয়া আমার পত্নীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে লাগিলাম, তখন আমার হৃদয় শোণিত যে কিরূপ বেগে বহিতে লাগিল বলিতে পারি না। আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া বৃক্ষ হইতে ছাদে নামিলাম। রাত্রি তখন প্রায় দশটা। অতি সন্তর্পণে ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমারই শয়ন গৃহে আমারই শয্যোপরি আমার স্ত্রীর প্রণয়ীকে নেশান্ধ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। গৃহস্থিত ছোরা লইয়া, তাহার মুখ কাপড় দিয়া বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া ছোরাখানা তাহার বুকে আমূল বসাইয়া দিলাম। খুলিয়া লইবার আর সাহস হইল না। আমার স্ত্রীকেও খুন করিবার ইচ্ছা তখন বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু শরীর থর থর করিয়া এতই কাঁপিতে ছিল যে আমি আর অপেক্ষা না করিয়া আবার ছাদে আসিলাম এবং পুনরায় বৃক্ষারোহণ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি পাপীয়সী সেই মৃতদেহ উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া মাথায় লইয়া বাটীর বাহির হইল। আমিও সেই অবসরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই মুক্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া একেবারে দেশত্যাগী হইলাম। মানুষের মুখ আর ইহজন্মে দেখিব না বলিয়াই এই পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানে আসিয়া বাস করিতেছি। কিন্তু বিধাতার মনে যাহা আছে মানুষের ইচ্ছায় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন ?

উষার আলোক যখন ভাল করিয়া ফুটে নাই, তখন আমি অবগাহনের জন্য পার্ব্বতীয় নদীতীরে যেমন প্রত্যহ গমন করিয়া থাকি,

তেমনই যাইতে লাগিলাম। আজ বার বৎসর পরে একটী অস্পষ্ট মানব মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি কৌতূহল বশতঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। ক্ষীণালোকে দেখিলাম বিকৃত মুখমণ্ডল বিশীর্ণ দেহ—মানব নামের কলঙ্ক স্বরূপ একজন মনুষ্য বসিয়া রহিয়াছে। মাথায় একটা কাপড়ের পাগ্ড়ী এবং দেহও বস্ত্রাবৃত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে?

সে করুণ দৃষ্টে আমার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া মনে হইল যে ইহার বাহ্যিক আকৃতির বিকৃতি ঘটিলেও প্রকৃতি সরল হইবে। উত্তর না পাওয়ায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ?

সে উত্তর করিল আমি পথিক—দুই বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে আজ দুই দিন হইল এখানে আসিয়াছি।

আমি। তোমাকে বড় ক্লান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে—আমার কথায় বাধা দিয়া পথিক বলিল—ক্লান্ত? হাঁ ক্লান্ত বটে, অনেক ক্লান্তি সহিয়াছি; সংসারে বড় জ্বালা, তাই প্রভু, এখানে জুড়াইতে আসিয়াছি।

আমি। আজ বার বৎসর এখানে আসিয়াছি কৈ সকল জ্বালা ত জুড়াইতে পারি নাই। তুমি জুড়াইবে কেমন করিয়া?

পথিক তখন আমার পায়ের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—ঐ চরণে।

আমি। তুমি ভুল বুঝিয়াছ।

পথিক। অনেক দিন হইল একবার ভুল হইয়াছিল তাহার জন্য আজিও দারুণ জ্বালা ভোগ করিতেছি তাই আজ সেই ভুল ভাঙ্গিয়া সকল জ্বালা নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

কথা গুলি ভাল হৃদয়ঙ্গম হইল না—অসম্বন্ধ বলিয়া মনে হইল। তথাপি বলিলাম—তুমি কে, তোমার জ্বালাই বা কি ?

পথিক। "দুটো চোকের তীব্র চাহনি আমার হৃদয় ভেদ করিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু যার চোক সে অনেক দিনই নাই। একখানা ছোরা তাহার প্রাণ হরণ করিয়াছে। কিন্তু সেই চাহনি আমার বুকের ভিতর যতটা পশিয়া আছে, ততটাই আমার জ্বালা। কতটা পশিয়াছে আপনি দেখিলে আমার সে জ্বালা জুড়াইবে। আপনি একবার দেখিবেন কি" ?

এবার তাহাকে পাগল বলিয়াই আমার ধারণা হইল। আমি কৌতুহল পরবশ হইয়া বলিলাম—"আচ্ছা দেখাও দেখি কতদূর।"

সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একখানা ছোরা বাহির করিয়া আপন হৃদয়ে আমূল বসাইয়া দিয়া বলিল "এই এতদূর।"

আমি "কি করিলে কি করিলে বলিয়া" অগত্যা ছোরাখানা টানিয়া লইলাম। ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। রক্ত বন্ধ করিবার আশয়ে তাহার গাত্রাবরণ ছিঁড়িয়া দেখি যে সে পুরুষের বেশে একজন রমণী। আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলাম—একি তুমি স্ত্রীলোক যে।

সে তখন অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—হাঁ তোমারই বিশ্বাস—ঘাতিনী—নি—কু—ঞ্জ—

কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছেন ; প্রভাতের সেই প্রথম অরুণালোকে রক্তময় ছোরাখানা ঝক ঝক করিয়া উঠিয়া যেন আমাকে জানাইয়া দিল যে আমি তোমার সেই সাধের ছোরা তোমার সাহায্যে আজ বার বৎসর হইল সেই লম্পটের প্রাণ সংহার

করিয়াছিলাম, আর আজ তোমারই চরণ তলে এই কুলটার উদ্ধার পথ দেখাইয়া দিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ অতল সলিলে ছোরাখানা নিক্ষেপ করিলাম ; আর আজ বার বৎসর হইল আমার স্ত্রী সেই পাপিয়সী নিকুঞ্জবালার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিণাম দেখিয়া চক্ষে জল আসিল। ভগবানকে স্মরণপূর্ব্বক অবিলম্বে শবদেহের সংকার করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলাম।

বসন্তের প্রতি।

কেন গো বসন্ত আজি দুয়ারে আমার ;
কে বলিল কবি আমি ?
জানেন অন্তরযামী
দু'বেলা উদর জ্বলে লভিতে আহার :
মলয় ফুলের গন্ধ
কখনো করেনা অন্ধ,
ফলের সৌরভে বটে সন্তোষ অপার
লভি—যবে তৃপ্ত করি স্বাদ রসনার।

আমি জানি ভালরূপ তোমার আচার ;
কি কুহক মন্ত্র বলে
মুগ্ধকরি' কবিদলে
আপনার যশ কর ভুবনে প্রচার :
তাঁহাদেরি মুখে শুনি
তোমার কোকিল-ধ্বনি
বিরহিণী হৃদিতল করে তোলপাড় ;
জ্বেলে দাও মনাগুণ যত অবলার।

সত্য মিথ্যা নাহি জানি কিন্তু জানি সার,
তোমার হৃদয় মাঝে
যে বিষ গোপন আছে
তাহার প্রভাবে দেশ যায় ছারখাঁর ;
বসন্ত, বিকার, জ্বর,
ওলাউঠা ঘোরতর,
দারুণ শ্লেষ্মার কোপে প্রাণে বাঁচা ভার ;
তাহার উপরে "প্লেগ" ভীষণ ব্যাপার।

তোমার মহিমা ভাল করিছে প্রচার,
কদাকার কাল পাখী
রক্তবর্ণ দুই আঁখি
কুরূপ হ'লে কি হবে গুণ চমৎকার ;
কেমন সরল ভাষে
সদা সত্য পরকাশে
তোমার সকলি "কু—" বলে বার বার ;
শুনেও শিখেনা কেহ রহস্য অপার !

তোমার কুহক ধন্য ধন্য ব্যবহার;
ধরিয়ে বিবিধ মূর্ত্তি
নানাভাবে পাও স্ফূর্ত্তি
কখনো গরম বড় শীতল আবার:
ওইত তোমার রোগ
দেখায়ে সুখের ভোগ
ঢেলে দাও রোগ শোক দুঃখ অনিবার:
কিগুণে কবিরা মজে প্রেমেতে তোমার।

একান্ত দরিদ্র আমি নিতান্ত অসার;
আমি নহি তব ভক্ত
কিসে হব অনুরক্ত?
মলয় ফুলের গন্ধ কথা মাত্র সার:
ধূলা উড়ে করে অন্ধ
হয়ে যায় শ্বাস বন্ধ
প্রাণান্ত করিয়া তোলে বাতাস তোমার;
যদি গো দাঁড়াই গিয়ে পথে একবার।

হেথা হ'তে ফিরে যাও দুয়ারে তাঁহার
হৃষ্ট পুষ্ট কবি যথা
ল'য়ে বিরহিণী ব্যথা
নিত্য ভোগ সুখে থাকি করে হাহাকার;
তোমারে পুজিবে ব'লে
নানা তোষামোদ ছলে
রেখেছে যতন ক'রে ষোড়শোপচার;
ঘোষিছে কোকিল কণ্ঠে সুযশ তোমার।

শ্রীভাগবদ্ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১॥ ২ অ॥ ৬॥

যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পরম পুরুষ ভগবানে, অহৈতুকী অর্থাৎ উদ্দেশ্য হীনা, ফলানুসন্ধানরহিতা, ও অপ্রতিহতা, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্না ভক্তি জন্মে এবং যাহা দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হন সেই ধর্ম্মই পুরুষের পরম ধর্ম্ম। এবং ইহারই নামান্তর ভাগবদ্ধর্ম্ম। স্বয়ং ভগবানই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ইহাই বিশেষ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলে ফলকামনা-শূন্য হইয়া কেবল শ্রীভগবৎ প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধ হয় এবং তৎপরে ভক্তির অঙ্গ স্বরূপ শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, এবং ধ্যানাদিতে চিত্ত সমাসক্ত হয়।

শ্রীধর স্বামীর মতে ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ও নিবৃত্তি-লক্ষণাক্রান্ত। তন্মধ্যে যাহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্ভোগাদি ফলের অভিসন্ধি থাকে তাহাই প্রবৃত্তি লক্ষণ বিশিষ্ট অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; আর যে ধর্ম্ম হইতে শ্রীভগবানে শ্রবণাদি লক্ষণ যুক্ত ভক্তি জন্মে তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নিবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে কোন ফলানুসন্ধান থাকে না এবং অন্যান্য অপকৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় বিঘ্ন বাহুল্য দ্বারা এই ধর্ম্ম পরিভূত হয় না। নিষ্কাম পবিত্র ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে কি মহৎ তাহা সহৃদয় পাঠকগণ কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিলেই বুঝিবেন। কেবল অনাত্ম দৈহিক সুখ ভোগের নিমিত্ত আমরা এই দেব দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করি নাই। কেন না ইন্দ্রিয় সুখ পরতন্ত্র বিড়ভোজী শূকরাদি হইতে, পীযূষ সেবী দেবতাদির বিশেষ কি? যেহেতু ভোজন জনিত ক্ষুন্নিবৃত্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি এই ত্রিবিধ ফলে উভয়েরই তুল্যতা অনুভূত হইতেছে। আর রসাস্বাদনেই বা উভয়েরই ইতর বিশেষ কি? দেববৃন্দের পীযূষ প্রাশনে যেরূপ রসাস্বাদ, শূকরের পুরীষ ভোজনেও তদ্রূপ স্বাদুতা। বৈষয়িক সুখের মধ্যে রসন এবং রমণই প্রধান। দেবেন্দ্র হইতে কীটানু পর্য্যন্ত জীব মাত্রেরই ভোজন রমণাদিতে তুল্য সুখানুভব হয়। কিন্তু ভোজন রমণাদি জনিত সুখ সম্ভোগ সর্ব্বত্র তুল্য হইলেও মনুষ্যাদি উন্নত জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট তীর্য্যকাদিতে অপ্রযত্ন সুলভ। কেন না ইহাদিগের ঐহিক সুখ সম্ভোগাদিতে অভাব বা প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু জীবের

উন্নতির সহিত ইন্দ্রিয়বিষয়ক সুখ সম্ভোগে অভাব বা প্রতিবন্ধকের উত্তরোত্তর আধিক্য হইয়া চরম উন্নতিতে অত্যন্তাভাব ঘটিয়া থাকে, ইহাই ঐহিকামুষ্মিক ভোগবিরতি রূপ পূর্ণ বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যই শ্রীভাগবদ্ধর্ম্মের সহচর।

ধর্ম্ম শব্দ স্বভাব বা শক্তি পর্য্যায়ক। 'ধৃঙ্' অবস্থানে বা 'ধৃঞ্' ধারণে, উনাদি 'ম' প্রত্যয় যোগে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, জলের শৈত্যই জলের ধর্ম্ম, তদ্রূপ জীবের স্বরূপাবস্থান অর্থাৎ জড়বর্গের অতীত বিশুদ্ধ চিদ্রূপ সংস্থানাত্মক ভগবৎ দাসত্ব, অথবা তদ্রূপ আত্মগত ভগবৎ নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণাদি ক্রিয়া গুলিরই নাম বিশুদ্ধ জীব ধর্ম্ম বা ভাগবদ্ধর্ম্ম।

ইহা নিম্নলিখিত রূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। এই সংসারে জীবগণ ভগবৎ বিষয়ক চিন্তা ব্যতীত যাহাতই আসক্ত হউক না কেন তাহাতে তাহারা বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। এই সকল বিষয় হইতে তাহারা যে আনন্দ উপভোগ করে তাহা অবিশুদ্ধ কারণ তাহা ভয়-বিজড়িত। সুতরাং যাহাতে জীবগণ নিঃশঙ্কচিত্তে বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ঈশ্বরোপাসনাই কেবল মাত্র নির্ম্মল আনন্দ আমাদিগকে প্রদান করে, আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করে ও আমাদিগকে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখে। সুতরাং ঈশ্বরোপাসনাই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে মায়া-শক্তি-জনিত ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পরমেশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিবে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদী শাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ২ অ। ১১।

শ্রীমদ্ভাগবত।

"ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার মায়া বশতঃ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না; তাহা হইতে, ('দেহ আত্মা') এই (বুদ্ধি) বিপর্য্যয় ঘটে; সেই দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; অতএব পণ্ডিত গুরুকে ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ দর্শন করতঃ অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্যক্ রূপে ভজনা করিবেন।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অনাদি অজ্ঞান কল্পিত যে ভয়, কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাহার নাশ হইয়া থাকে, অতএব পরমেশ্বরের ভজনে প্রয়োজন কি? এই আপত্তি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, যথা;—ঈশ্বরবহির্মুখ জীবের উপরেই মায়ার আধিপত্য। মায়াই জীবের আত্ম স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটাইয়া দেয়। জীবের স্বরূপ বিস্মৃতি হইতেই আত্ম বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মে, এই আত্মবুদ্ধিই দ্বৈত্যাভিনিবেশের অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্যত্র আসক্তির মূল; সুতরাং দেহেতে আত্মবুদ্ধি হইলেই ভয় জন্মে। অতএব মায়াই আমাদের সংসার ভয়ের আদি কারণ। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক, প্রকৃত চর্ম্মখণ্ড দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের নয়নে সর্প ভ্রম ঘটাইয়া তাহাদের চিত্তে নানা ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ মায়া অগ্রে-চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া পরিশেষে আমাদের চিত্তে অশেষ ভীতি সঞ্চার করে। সুতরাং যাহাতে এই মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় তাহাই শ্রেয়স্কল্প। এই মায়া সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন——

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব য প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অস্যার্থ—"সত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণময়ী ও দৈবী অর্থাৎ সংসার-চক্রে ক্রীড়াকারিণী আমার বহিরঙ্গা শক্তি এই মায়া অতি দুরতি-

ক্রমণীয়া। আমাকেই যাহারা ভজনা করে, তাহারাই এই মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা, ও গুরু দেবেতে ঈশ্বর ও পরম প্রিয়তম জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরকে ভজনা করিবেন।

শ্রীবসন্তলাল মিত্র।

ঘুঘু।

প্রলয় পয়োধিজলে ভগবান্ শ্রীহরি বেদ ধারণ করিয়াছিলেন। বাইবেল লিখিত জলপ্লাবনের পর ঘুঘুই সর্ব্ব প্রথম সুসমাচার আনিয়াছিল; ইহাতে শ্রীহরির সহিত ঘুঘুর কোনও সম্পর্ক আছে কি না প্রত্ন তত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন। তবে শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীহরির কৃপায় অনেক বংশে ঘুঘু চরিয়াছিল, উদাহরণ কৌরব বংশ ও যদু বংশ। সে যাহা হউক, ঘুঘু ইংরেজদিগের অতি প্রিয় বস্তু, কারণ বাইবেলে ও ইংরাজি কবিতায় ঐ পক্ষী বিশেষের প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পতিসোহাগিনী ইংরাজ রমণীরা নাকি প্রিয় পতিকে " ঘুঘু " বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন; অবশ্য, সেটা সাদর সম্ভাষণ। আমাদের জগদম্বারূপিণী গৃহিনীদিগের "মুখপোড়া" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণের মত নহে। (অন্বয়টা কিছু অন্যায় রকমের হইল, কেহ যেন "গৃহিনীদিগের মুখপোড়া" এরূপ বেয়াইনি ও বেয়াদবি পাঠ করিয়া না বসেন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!) এতদ্দ্বারা ঘুঘু যে ইংরাজদিগের অতি প্রিয় এ কথা প্রমাণ হইলেও, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঘুঘু আমাদের দেশে বড় আদরের জিনিস নহে। ইহাতে অবশ্য ঘুঘুর কোনও দোষ নাই। আমাদের ও আমাদের দেশের

দোষ কারণ আমাদের সুসভ্য বিলাতি প্রভুরা যাহা ভাল বলেন আমরা কেন না উহা ভাল বলিব! আরও বলি এ বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হয়, কাল কোকিল যখনই ডাকিল "কুহু" অমনি কবিকুল ও বিরহিণীকুল আকুল; কবি মোহিত হইল, বিরহিণী ক্ষেপিলেন! কোকিলের ডাকে বিলাতের কবিরাও মুগ্ধ হন বটে, তবে বিলাতি বিরহিণীরা ক্ষেপেন না; ইহার কারণ বোধ হয় বিলাতি কোকিল "কুহু" ডাকিয়া "উহু প্রাণ হুহু" জ্বালাইতে জানে না, উহার পরিবর্ত্তে বিশ্ব নিন্দুকের ন্যায় কেবল "কু-কু" ডাকিয়া থাকে; (বিলাতি কোকিল Grimm's Law পড়িয়া থাকিবে নচেৎ কুহু স্থানে কুকু শিখিল কোথা হইতে? 'হ'র স্থানে 'ক'র নজীর—হৃদয়, cordis, heart.) আচ্ছা কোন গুণে কোকিল এত প্রিয় হইল আর আর কোন দোষেই বা ঘুঘু আমাদের এত অপ্রিয় হইল? ঘুঘুরও ত অনেক গুণ আছে, উহার প্রেম বিখ্যাত, এবং কবিরা উহার ডানা পাইবার জন্য লালাইত প্রমাণ "oh had I the wings of a dove." ঘুঘুর এত গুণ থাকিতেও যে কেন আমাদের নিকট এত অপ্রিয় হইল, এ গুঢ়তত্ত্ব মীমাংসায় গভীর গবেষণা আবশ্যক, আশা করি কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শীঘ্রই ইহার নির্ণয় করিতে পারিবেন।

ঘুঘুর অনেক মূর্ত্তি আছে, এক মূর্ত্তি কুসংসর্গ। মানুষ কিছু পাপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না, নির্ম্মল শৈশব স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ, পাপ চিন্তা কখনও সরল শিশুর পবিত্র অন্তঃকরণ কলুষিত করিতে পারে না। কিন্তু কুসংসর্গ ঘুঘুর এমনি অনুকম্পা যে পাছে সরল সুকুমার-মতি শিশু, শয়তানের প্রশস্ত ও অনায়াসসাধ্য পথে না আসিয়া বহু কণ্টক সংকুল সংকীর্ণ ধর্ম্ম পথে যাইয়া পড়ে, সেই জন্য ঐ শিশুকে

আপনার আশ্রয়ে রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করে। শিশু পাঠাভ্যাসের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। শিবভক্ত কুসংসর্গ ঘুঘু দেখিল উহাকে মোক্ষপ্রদ গঞ্জিকা সেবন করাইতে না পারিলে তাহার আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু একেবারে ঐ শৈব-নেশা যুক্তি সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া আপাততঃ নেশা পরিচয়ের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করাইল। অষ্টম বর্ষীয় শিশু "দুধ খাইলে কি তামাক খাইতে নাই" শ্রীমান্ গদাধর চন্দ্রের এই অকাট্য যুক্তি স্মরণ করিয়া, বার্ডসাই ও তামাক আয়ত্ত করিল, এমন কি উহাতে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল যে দুই চারি বৎসর পরে ঘুঘু ভাবিল, যখন শিব অপেক্ষা শক্তিরই প্রভাব প্রবল তখন আর শৈব নেশার প্রয়োজন কি? পরম উপকারী পরম ভক্ত শক্তি উপাসক ঘুঘু বালককে শাক্ত নেশা শিখাইতে লাগিল, নেশা পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হইল। সর্ব্ব কার্য্যে কুশল প্রদায়িনী সিদ্ধির আরাধনা চলিতে লাগিল, কিন্তু যেমন বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে গেলে প্রথম ভাগের 'ক' 'খ' কেহ কখনও ভোলে না, বালকও বার্ডসাই, চুরুট, তামাক ভুলিল না। ঘুঘুও আশ্রিতের জ্ঞান পিপাসা ওরফে নেশা পিপাসা দেখিয়ে অতি আহ্লাদিত হইল এবং সিদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ হইলে অনতিবিলম্বে সুরা আরম্ভ করাইল। বালক তৃতীয় ভাগ না পড়িয়াই একেবারে বোধোদয়ে পদার্পণ করিল এবং উহাতে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল যে এ জন্মে আর তাহা ভুলিতে পারিল না।

এই কুসংসর্গ ঘুঘুর কৃপা যে কেবল সুকুমার মতি বালকের উপর এরূপ নহে, ইহার সর্ব্বজীবে সম দয়া,—যুবা, প্রৌঢ় এমন কি পলিত কেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত উহার কৃপায় বঞ্চিত নহে। লেখা পড়া করিতে গেলে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হয়, সহৃদয় ঘুঘু মানবের সে কষ্ট দেখিতে পারে না। তাই যাহাতে তাহাদের সেই আয়াস মধ্যে লেখা পড়া

করিতে না হয় এই মঙ্গল কামনায় অবিরত সচেষ্ট। কত শত বুদ্ধিমান বালক ও যুবক এই ঘুঘুর কৃপায় যে কঠোর এবং কষ্টকর লেখা পড়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদিন ঘুঘু উহাদের উপর সদয় হয় নাই ততদিন মুটে মজুরের মত বৃথা খাটিয়া মরিত এবং মজুরিস্বরূপ অকিঞ্চিৎকর পুরস্কার বা বৃত্তি বা শিক্ষকের নিকট প্রশংসা লাভ করিত। কিন্তু কাচকে কাঞ্চন ভ্রমে যে বৃথা আকিঞ্চন করিয়াছিল, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারিল এবং সরস্বতীর নিকট অচিরে বিদায় লইল। হিতৈষী ঘুঘু যে কেবল ভক্তবৃন্দকে নেশা শিখাইয়া এবং লেখা পড়া বিসর্জ্জন দেওয়াইয়া ক্ষান্ত হইলেন এরূপ নহে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে গৃহ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী লইয়া সন্তুষ্ট থাকা একান্ত মূর্খের কার্য্য। কাযেই ভক্তবৃন্দ "উপ" যুক্ত পত্নীতে মজিলেন, (উপযুক্ত নহে, উপসর্গ যুক্ত)।

উপরে ঘুঘুর এক মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, আর দুই মূর্ত্তির আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এক্ষণে একটু সবিস্তারে ঐ দুই মূর্ত্তির আলোচনা করা যাউক। ঘুঘুর দ্বিতীয় মূর্ত্তি—সুরা। ইহা প্রথমের ভেদান্তর মাত্র, কিন্তু উহার প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই ঘুঘু আবার ডিম্ব প্রসবে তৎপর, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই ঘুঘুর পরিবার এত বৃদ্ধি হয় যে মানব-দেহরূপ বাসা তাহাদের স্থান যোগাইতে পারে না। অগত্যা ঐ বাসাকে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয়।

আমরা এস্থলে এই সুরাঘুঘু পরিবারের কিছু পরিচয় দিতেছি, সুরা-ঘুঘুর চারি পুত্র। প্রথম—পাশবিক বৃত্তি সমূহের উত্তেজনা। ইহারও আবার অনেক গুলি সন্তান আছে, যথা কলহ প্রিয়তা, কাম, ক্রোধ, প্রতিহিংসা ডাকাতি, হত্যা, পশুত্ব, বলাৎকার, অপঘাত মৃত্যু ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পুত্রের নাম—নৈতিক ও মানসিক অবনতি। ইহারও অনেক গুলি সন্তান আছে যথা—বুদ্ধির হ্রাস, আলস্য, মূর্খতা, কর্ত্তব্যে অবহেলা, উপদেশে অগ্রাহ্য, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা, মিথ্যা প্রিয়তা, ধর্ম্মহীনতা, আত্মহত্যা ইত্যাদি।

তৃতীয় পুত্রের নাম—রোগ প্রশ্রয়দাতা। ইহার বংশাবলি যথা—মাথাধরা, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ উদরী, বিসূচিকা, বহুমূত্র, এপোপ্লেক্‌সি, উন্মত্ততা, লিভারএব্‌সেস্, হঠাৎ মৃত্যু ইত্যাদি।

চতুর্থ পুত্র—দারিদ্র্য। ইহার বংশাবলি যথা—কষ্ট, অন্যের উপর নির্ভরতা, দুঃখ, অপমান, ভিক্ষা, চৌর্য্য, লোকের নিকট হেয়তা, ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয় ("ঘুঘুর" পাঠক কেহ আছেন কি না সন্দেহ) বলুন দেখি এতগুলি ব্যক্তির অনুগ্রহ একটি লোকের উপর হইলে সে বেচারা দাঁড়ায় কোথা! ঘুঘুর এই বহুসংখ্যক পরিবার একান্নবর্ত্তী! ঘুঘুর প্রভাব যে কেবল তাহার আশ্রিতেরাই ভোগ করিয়া থাকে এরূপ নহে, আশ্রিতদিগের আত্মীয় কুটুম্বেরাও ঐ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত নহে। কত শত নির্দ্দোষ বালক অনাথ হইতেছে, কত শত পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী নীরবে মর্ম্ম যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কত শত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে, কিন্তু ঘুঘুর বিনাশ নাই—বিনাশের চেষ্টাও নাই। রাজা ঘুঘুকে প্রশ্রয় দিতেছেন কারণ ঘুঘু হইতে রাজার অনেক আয়! সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন এই ঘুঘুর পৃষ্ঠপোষক তখন যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা স্বর্ণ প্রসবিনী ভারতভূমি আক্ষেপ অশ্রুপাত পরিপূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হে ইংরাজ রাজ, কঠোর দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছ, জগতে অবিনশ্বর যশঃ সঞ্চয় করিয়াছ, সুরার দাসত্ব

হইতে ভারতবাসীকে বাঁচাইয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দাও। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ পাইবে, মঙ্গলময় জগদীশ তোমার মঙ্গল করিবেন।

অতঃপর তৃতীয় ঘুঘু—নারী। এই নারী হরণ জন্য সোণার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল; এই নারীর অপমানের জন্য কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল; এই নারীর জন্য ট্রয় ধ্বংস হইয়াছিল, কেন না হইবে, পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করিলে কেন না ভিটায় ঘুঘু চরিবে? সকল নারীকে ঘুঘু বলিতেছি না। অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপিণী, মরুময় সংসারে অমৃত সিঞ্চন কারিণী নারীদের কথা বলিতেছি না, তাঁহারা আছেন বলিয়াই সংসার আছে নতুবা সংসার রসাতলে যাইত। এক্ষণে সংসার কাননে বিষবৃক্ষ স্বরূপিণী ও কলঙ্কিনী রাক্ষসিদিগের কথাই বলিতেছি। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত প্রমদা ও হীরা, দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত রোহিণী। মায়াবিনীদিগের ক্ষমতা কি ভয়ঙ্করী! শোনা যায় কামরূপ যাইলে পুরুষকে গাড়ল করিয়া রাখে, কিন্তু গাড়ল হইতে গেলে অতদূরে যাইবার প্রয়োজন কি, গাড়লকারিণীরা ত সর্ব্বত্রই বিদ্যমানা! গাড়লরা আবার প্রায় অন্ধ ও উন্মত্ত হইয়া থাকে, ঘরে পরমা সুন্দরী সতী সাধ্বী সেবিকা স্ত্রীর রূপগুণ কিছুই দেখিতে পায় না, কিন্তু অনেক সময়ে সেওড়াবৃক্ষেষু পেত্নীরূপেন সংস্থিতা গণিকার মাধুরী দেখিয়া একেবারে মোহিত, গলিত, তাপিত, পীড়িত! ঘরে পতিব্রতা সতী নবনীত হস্তে ক্ষীর সর নবনী সাজাইয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, পতি আহার না করিলে আহার করিতে পারিতেছেন না, গুণবান পতির সে সমস্ত ভাল লাগিবে কেন? সে তখন বারবিলাসিনীর লাথি, ঝাঁটা সুখে আহার করিতেছে। ধন্য ঘুঘু, তোমারি কি প্রতাপ! তুমি না থাকিলে সংসার নন্দনকাননের তুল্য হইত, দেব প্রকৃতি

মানব পশু প্রকৃতি পাইতনা। সাধ্বী রমণীর নীরব অশ্রুপাতে ধরাতল সিক্ত হইত না, নিষ্পাপ শিশু সন্তানেরা পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া পাপ শিখিত না! ঘুঘু, তুমি ধন্য, তুমি জ্ঞানীকে অজ্ঞান, বিদ্বানকে মূর্খ, জিতেন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের দাস, সকলই করিতে পার। তোমার কুহক সকলেই অবগত আছে, তবু তোমার মায়া বহ্নিতে মানব পতঙ্গ স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরে, নিজে মরে এবং পরিবার বর্গকে জ্বালাইয়া যায়।

আর এক ঘুঘুর কথা বলিলেই এই ঘুঘুতত্ত্ব শেষ হইবে। ইহার নাম সামাজিক কুপ্রথা, যথা বিবাহ ব্যয়। চল্লিশ টাকা বেতনের গৃহস্থ ভদ্র লোকের যদি চারিটি কন্যা হয় তাহা হইলে তাঁহার 'ভিটাস্থ ঘুঘুস্থ' কেন না হইবে? আজ কাল পাশ করা ছেলের খুব কাট্‌তি কাযেই বাজারও খুঁব গরম; পাত্র অজ্ঞাতকুলশীল হউক ক্ষতি নাই যদি দুই চারিটা পাশ করিল অমনি নিলাম আরম্ভ হইল। পাত্রের পিতা বা অভিভাবক লাটত্ব পাইলেন। কন্যার অভাগা পিতা বলিল "মহাশয়, আমি গরিব লোক, আমার আরও দু তিনটি কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, তা আপনি একটু বিবেচনা করুন, আমার কন্যাটিও পরমা সুন্দরী আমি দুই হাজারের বেশী দিতে পারিব না। আর এক জনের কন্যা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাহার পিতা চারি হাজার দিতে প্রস্তুত হইল। অপর এক জনের কন্যা ঘটক বর্ণিত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ অর্থাৎ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু পিতা ধনী, কন্যাকে সোণায় মুড়িয়া দিতে সম্মত হইল, তাহার উপর দশ হাজার টাকা! কাযেই বরকর্ত্তা সম্মত হইলেন, Highest bidder sale এ বর বিক্রয় হইল! বরের অর্থলোভী পিতা পুত্রের ভাবী সুখের কথা একবারও ভাবিলেন না, সাক্ষাৎ শ্যামারূপিণী পুত্রবধূকে ঘরে আনিলেন, কিন্তু একবারও ভাবিলেন

না যে সেই শ্যামার কন্যাকে ভবিষ্যতে স্থদ সমেত পার করিতে হইবে। পাশ করা পুত্র, সেক্সপীর, বায়রণ, স্কট্ প্রভৃতি পড়িয়া আশা করিয়াছিল, Portia, Helena কিম্বা Desdemona লাভ করিবে, অথবা শকুন্তলা না হয় অভাব পক্ষে প্রিয়ম্বদা বা অনুসূয়াকে পাইবে, না হয় কমলমণি বা সূর্য্যমুখী ত পাইবেই কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একেবারে কবিতাশূন্য ঘোর গদ্যরূপিণী জগদম্বা পত্নী লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, মনের আক্ষেপ মনে রহিয়া গেল। কিন্তু তাহার পিতার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহাতে অনিষ্ট হইল পুত্রের। আবার একজন গৃহস্থের পরমাসুন্দরী পরমগুণবতী কন্যাকে অর্থের অভাবে নির্গুণ কদাকার (নাম হয়ত কন্দর্পকুমার বা রতিকান্ত) পাত্রে প্রদান করিতে হইল; বালিকাকে এক বৎসর বয়স হইতেই পিতা মাতা যে "রাঙা টুক্‌টুকে' বরের লোভ দেখাইয়াছিল এবং বালিকাও যে কল্পিত রাঙা টুক্‌টুকে বরের ছবি অনেক দিন হইতে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছিল, সেই বরের পরিবর্ত্তে চারিচক্ষু মিলনের সময় যখন সে বিকট ঘটোৎকচ মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিল, বল দেখি তখন কোমল প্রাণ ভয়ে ও নিরাশায় শিহরিয়া উঠিল কি না, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল কি না? ইহাতে অনিষ্ট হইল কন্যার। আবার যদি কোন পিতা স্বীয় দুহিতাকে এরূপে বিসর্জ্জন করিতে না পারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সৎপাত্রে দান করিল, তাহাতে অনিষ্ট হইল কন্যার পিতার। আবার বিবাহে পাঁচ জন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইল, ইহাতে ক্ষতি হইল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের কারণ কুড়ি টাকা বেতনের গৃহস্থ একমাসে যদি পাঁচ ছয়টি আইবুড়োভাতের নিমন্ত্রণ পায়, অমনি তারপর দিন Insolvency list এ তাঁহার নাম উঠিবে সন্দেহ নাই। আবার কন্যার

পিতা মাতা, (এটা যদিও উভয় পক্ষেরই ঘটিয়া থাকে) যে বিবাহ দিয়াই ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি পান এরূপ নহে। আবার তত্ত্বের হাঙ্গাম আছে, উহা বড় সামান্য ব্যাপার নহে। মোট কথা গৃহস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কত কষ্টকর তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এই এক বিবাহ ব্যয়ই অনেক সংসারে ঘুঘুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ঘুঘুর নাশের জন্য অনেক সভাসমিতিরূপ ফাঁদ পাতা হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঘুঘুর ত বিনাশ দেখা গেল না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার এই প্রবন্ধ পড়িয়া কেহ যেন রাগ না করেন, কারণ অপরাধের মধ্যে আমি এই ঘুঘুর বিষয় লিখিয়াছি মাত্র কাহারও ভিটায় ত আর উহা এ পর্য্যন্ত চরাই নাই। ভগবান্ করুন যেন চরাইতে না হয়। অধিকন্তু আমি ব্রাহ্মণও নহি যে দক্ষিণা না পাইলেই যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করিয়া অভিসম্পাত করিব "তোর ভিটেই ঘুঘু চরুক'। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল ব্রহ্মশাপে আর বড় একটা ঘুঘু চরে না। তাহা হইলে আফ্রিদি সমরে ইংরেজের এত কষ্ট করিতে হইত না, দু চারিজন ব্রহ্মাণ নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের দ্বারা অভিসম্পাত করাইলেই চলিত।

ফুলের সাজি।

আবাহন।

১

পড়েছে কি মনে আজিকে তোমার
বিপুল বরষ পরে
দুখশোকময় মলিন ধরার
মরত মানবীনরে?—
আসিয়াছ ঋতুরাজ,
মোহন ফুলের সাজ
তরু লতিকার সুরভী কোমল
নব রূপ-উপচার
যুবজন প্রীতি, স্নেহের সন্তাষ
ধরণীর সুখ সার।

২

নির্ম্মল নব ইন্দু-উজ্জল
শান্ত নিশায় মধু!
যৌবন-সুরা প্রকৃতি অধরে
মাতাও কোকিল বধূ।
ঋতু-মঙ্গল বেশ
ভব-মৃত্যুর ক্লেশ
দারুণ, দেব, বিরহ-সন্তাপ
অভাব-দীর্ঘশ্বাস
নর-অন্তরে মিলন-মদিরা
অমরশর্ম্মভাস্।

৩

এই মরণ-বিয়োগ-দুঃখ-ত্রিতাপ-
তিমিরঅন্ধকূপে
রাখ উজ্জ্বল করি' ফুল্ল তোমার
মিহির-দীপ্ত রূপে।
এস, সুন্দর মনোরঞ্জন!
এস, মন্মথ-শর-বন্ধন!
লহ ছন্দশোভিত গন্ধ-পুলক
চূত-মুকুল-পরাগ
লহ অন্তর-পূজা হে অনঙ্গ-সখা,
প্রেম-পীযূষ-রাগ।

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

প্রার্থনা।

কোথা প্রভু দয়াময় শ্রীমধুসূদন
অনাথের নাথ দেব বিপদ ভঞ্জন
এ ভব সমুদ্র মাঝে না পাইয়া কুল
কেমনে তরিব ভাবি হতেছি আকুল
কাতর বচনে তাই ডাকি বার বার
দীনবন্ধু ভবসিন্ধু কর মোরে পার
আমি অতি ক্ষুদ্র মতি ক্ষুদ্র এ লেখনি
দয়াময় তব নাম কেমনে বাখানি
তাইগো তোমারে ডাকি হৃদয় ভরিয়া

দয়াকণা বিতরিয়া তৃপ্ত কর হিয়া
তব ও চরণে মম থাকে যেন মতি
গুণ তব গাহিবারে দেও গো শকতি
তোমার প্রসাদে দেখ জীবন মরণ
তোমার আজ্ঞায় সুখ দুঃখ অগণন
তব কৃপাবলে এই সৃষ্টি রক্ষা হয়
ইচ্ছায় তোমার পুনঃ পলকে প্রলয়
প্রভাত রবির সেই বিমল আলোকে
জীব জন্তু আদি হয় মগন পুলকে
মধ্যাহ্নে আতপ তাপে তাপিত ধরণী
সায়াহ্নে সুন্দর শোভা ধরে গো মেদিনী
সুশীতল সমীরণ ধীরি ধীরি বয়
বিকশিত ফুলদল সুগন্ধ বিলায়
মধুর জোৎস্না শোভে পূর্ণিমা নিশায়
নির্ম্মল সরসী খেলে লহরী মালায়
বৃক্ষ ডালে বসে পাখী তব নাম গায়
সে সুস্বরে প্রাণে মোর আনন্দ ছড়ায়
অপার মহিমা তব ধরাধামে বয়
যে দিকে যখন দেখি নয়ন জুড়ায়।

নয়াবাজার, ভাগলপুর } শ্রীমতী ন—বা—দাসী।

মানসী।

নন্দনের কুসুমিত লতিকা হৃদয়ে
ফুটেছিলে তুমি কিগো মাধুরী অপার?
না হইলে কেন তব মুখ পানে চেয়ে
জুড়াইল পরাণের যাতনার ভার?

মন্দাকিনী তীর হ'তে ধরণী উপরে,
এসেছ কি প্রিয় সখি প্রীতির নির্ঝর?
তাই তুমি পরশিলে সুকোমল করে,
মোহন আবেশে হয় বিহ্বল অন্তর।

জোৎস্নাময়ী রজনীতে যমুনার তীরে
কদম্বের ফুল হয়ে ফুটে কিগো ছিলে?
না হইলে তোমার ও গীতিময় স্বরে
বাঁশরীর স্মৃতি কেন জাগে হৃদি তলে?

সে যা হোক পথ ভুলে মানসে আমার,
আসিয়াছ যদি সখি, দেবলোক দূরে;
স্বর্গের সুষমা তুমি প্রতিমা আশার
যতনেতে হৃদি মাঝে রাখিব তোমারে।

শ্রীমতী গিরিবালা দাসী।

তখন ও এখন।

ঝঞ্চাবাত বয়েছে বিস্তর
উঠেছে তরঙ্গ কত
করি হৃদি উদ্বেলিত
কত বার চাঁদ নিগমন
কত যে এসেছে ঢেউ
সহায় না ছিল কেউ
মুছিতে সে আকুল নয়ন।

কত স্নেহ মমতার
প্রেম তরঙ্গের হার
হৃদে উঠি হৃদয়ে মিলায়
মরম বেদনা যাহা
কেহ না জানিল তাহা
ছল ছল আঁখি সুধু চায়।
নাহি এবে রূপ ছটা
তরুণ অরুণ ঘটা
চিন্তা ছায়া লাবণ্য লুকায়
দেহ এবে ভাব রাশি
ক্ষীণ মেঘে ঢাকা শশী
প্রাণের সে সুষমা ছড়ায়
তখন ফুলের ফাঁশি
অকলঙ্ক রাকা শশী
ক'রে ছিল প্রাণ বিমোহন
এবে হৃদি সরোজিনী
সকল গুণের খনি
শতদলে করেছে বন্ধন
তখন আঁখির ঘায়
তড়িত পশিত কায়
এবে দূর শ্রুত গীত সম
ধীরে ধীরে পশে প্রাণে
মত্ত করে প্রতি তানে
শত গুণে মোহিয়া মরম
তখন চোখেতে ধরা
এমন হৃদয় ভরা
জীবনের সাধন সহায়
তখন আঁখির ধাঁধা
এখন প্রেমেতে বাঁধা
হৃদে বল দেখিলে তাহায়।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা বসু।

বিরহিনীর বিলাপ

মরি কি মধুর মলয় অনিল
ধীরে ধীরে আজি বহিছে
আবেশে বিভোর হইয়া কোকিল
কুহু কুহু রবে ডাকিছে
ফুল সাজে সাজি প্রমোদ কানন
কিবা মৃদু মৃদু হাসিছে
শাখী শাখে বসি পাখীয়া কেমন
সুমধুর গীত গাহিছে
তীরে চক্রবাক্ নীরেতে মরাল
আহা মরি কিবা খেলিছে
গাল ভরা হাসি হাসিছে কমল
শিখি পাখা মেলি নাচিছে
কামিনী রজনী সেঁউতি পারুল
থরে থরে কিবা ফুটেছে
মল্লিকা মালতী গোলাপ বকুল
সৌরভে আকুল করিছে
মধুলোভে অলি হইয়ে ব্যাকুল
ফুলে ফুলে কত সাধিছে

হাসি ফুল কলি কিবা হেলি দুলি
এস বঁধু বলি ডাকিছে।
আমি অভাগিনী শুধু একাকিনী
গুণমনি নাহি আসিছে
মোর বঁধু কেন নিদারুণ হেন
দাসীরে না আসি তুষিছে।

শ্রীদ্বিজপদ দেবশর্ম্মা।

আমি আর কুকুর আমার
(বালক রচিত)

সুবিমল শান্তিময় নিদাঘ প্রভাতে
তেয়াগি সুখের নিদ্রা আসি প্রাঙ্গনেতে
খেলিয়া বেড়াই সুখে মোরা এক সাথে
আমি আর কুকুর আমার।

আবরি' মধ্যাহ্ন রবি বরষা যখন
শতধারে ধরাতল করে সুসিঞ্চন
জানালার পাশে বসি হেরি সে বর্ষণ
আমি আর কুকুর আমার।

আসিলে শারদ সন্ধ্যা দিক উজলিয়া
যবে ডোবে শ্রান্ত রবি অস্তাচলে গিয়া
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমি নাচিয়া খেলিয়া
আমি আর কুকুর আমার।

শীত ঋতু উপনীত যবে এ ধরায়
দুইটিতে এক হয়ে থাকিবে নিশায়
মধুর আবাস পূর্ণ সুখের শয্যায়
আমি আর কুকুর আমার।

সঙ্গী মোরা সদা সুখে দুখে পরস্পর,
আশীষ করুণ দু'য়ে পরম ঈশ্বর,
আজীবন এক সাথে থাকি নিরন্তর
আমি আর কুকুর আমার।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ইয়ুরোপীয় রাজা রাণীর শিক্ষা দীক্ষা—আমাদের দেশে যাঁহারা ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা বশতঃ রাজা বা জমিদার পদ লাভ করিয়াছেন, ভাগ্য অপ্রসন্ন হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু ইয়ুরোপে অনেক রাজা ও রাজ্ঞী আছেন যাঁহারা সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইলেও অন্যান্য গুণের দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

বেল্জিয়মের রাজা লিওপোলড্ অর্থনীতি (finance) বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, এবং ঐ বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি থাকায় অনায়াসে রথস্‌চাইল্ডের ন্যায় ক্রোরপতি হইতে পারেন। নরওয়ে ও সুইডেনের অধীশ্বর দ্বিতীয় অস্কার সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম; তিনি অনেক গুলি মূল কবিতা লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন গেটের "ফাউষ্ট," তাসোর কবিতা প্রভৃতি নিজ মাতৃ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত দ্বাদশ চার্লশের বৃত্তান্ত ইংরাজিতে অনুবাদ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি একজন নাবিক। রোমাণিয়ার রাজ্ঞীও অনেক গুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান রুষ অধিপতির রাজ কার্য্য ব্যতীত আপাততঃ অন্য বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার পিতা তৃতীয় আলেক্জাণ্ডার অসীম ক্ষমতা দেখাইয়া যে কোনও থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট হইতে সপ্তাহে ছয় শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, এক বাহান্ন খানা তাস তিনি অনায়াসে আধ খানা করিয়া ছিঁড়িতে পারিতেন এবং কোনও একটি মুদ্রা অঙ্গুলি মধ্যে ধারণ করিয়া ভাঙ্গিতে পারিতেন। পোর্ত্তুগালের রাজ্ঞী এম্, ডি, পরীক্ষোত্তীর্ণা এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। নরওয়ের রাজকুমার একজন সুদক্ষ চিকিৎসক। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ছাপাখানার কম্পোজিটারের কার্য্যে বিশেষ সুনিপুণ। তাঁহার পত্নী সেলাই কার্য্য ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন তৎসমুদায়ই তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি "ডাক্তার" উপাধি লাভ করিয়াছেন। স্যাক্সনি, উরটেম্‌বার্গ ও বুলগেরিয়ার রাজগণ সৈনিক বিদ্যায় বিশেষ পটু।

প্রিন্সেস্‌লুই চিত্র বিদ্যা ও ভাস্কর বিদ্যায় (Sculpture) বিলক্ষণ নিপুণা। জর্ম্মণ সম্রাট বহুগুণ সম্পন্ন, তিনি চিত্রকর, গায়ক, বাদ্যকর, ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থল ও জলযুদ্ধের সেনা নায়ক।

***

জুতা বদল—আল্‌নার পার্শ্বে দুই জোড়া জুতা ছিল, বাবুর নিকট এক জোড়া আনিবার জন্য চাকরকে বলাতে সে দুই রকমের দুইপাটি লইয়া হাজির করিল। বাবু রাগিয়া বলিলেন "হাঁরে এর নাম কি এক জোড়া জুতা"? চাকর দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উত্তর দিল "অপর জোড়াও ঠিক ঐ রকম।"

***

কৃষকের ব্যুৎপত্তি।—এক কৃষকের পুত্র কএকটী শ্লোক রচনা করিয়াছিল। কৃষক আত্মজের গুণপনার নিদর্শন স্বরূপ সে কয়টী নিজের কাছে রাখিয়া দিত। একদা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নিজ পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া কৃষক সেই শ্লোক গুলি তাঁহাকে দেখিতে দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে গুলি পড়িয়া বলিলেন লেখা মন্দ হয় নাই তবে দুইটী চরণ সমান নয়। কৃষক আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল সে কেবল আপনাদেরই আশীর্ব্বাদে বাঁ পাটি প্রায় আরাম হইয়া আসিয়াছে।

***

স্বামী। আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

স্ত্রী। হাঁ, কিন্তু পড়া হয় নাই, উপরে লেখা ছিল পুড়াইয়া ফেলিও তাই—

স্বা। থাক্ থাক্ বিদ্যা বোঝা গেছে।

***

কার্পেটে তৈল—যদি কার্পেটের উপর তৈল বা চর্ব্বি পড়িয়া যায় তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যথেষ্ট ময়দা ছড়াইয়া দাও, ইহা কএক ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় তৈল টানিয়া লইবে।

***

দুই আর একে চার।—পরিদর্শক মহাশয় একটি ছোট বালককে প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন যে তাহার অঙ্ক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি বড় কম তাই এদিকে তাহার একটু মন আকর্ষণ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তোমার শিক্ষক যদি দুটি খরগোশ দেন আর আমি একটী দিই তবে তোমার কয়টা খরগোশ হইবে"? "চারিটী" কেমন করিয়া? দুই আর একে চার হয়? বালক বলিল "কেন মহাশয় আমার নিজের যে একটী খরগোশের ছানা আছে।"

***

সমস্যা।—নিম্ন বর্ণিত রমণী কেহ দেখিয়াছেন কি?

একটি রমণী করে বসতি নগরে
তাহার কুড়িটী নখ আছে প্রতি করে
পাঁচ আর কুড়ি তার হাতে আর পায়
সত্য কথা জেনো ইহা মিথ্যা কভু নয়।

যদি না দেখিয়া থাকেন তবে দেখুন;—

একটি রমণী করে বসতি নগরে
তাহার কুড়িটী নখ। আছে প্রতিকরে
পাঁচ; আর কুড়ি তার হাতে আর পায়।
সত্য কথা জেনো ইহা মিথ্যা কভু নয়।

***

আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসার বিস্ময়কর ক্রিয়া। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্র চিকিৎসা অতীব বিপজ্জনক বলিয়া

বোধ হইত এক্ষণে সেই সকল অস্ত্র ক্রিয়া যৎসামান্য বিপদপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। এবং যে সকল অস্ত্র চিকিৎসাব্যাপার পূর্ব্বে মনুষ্যের কল্পনা মধ্যেও আইসে নাই তাহাও অধুনা কার্য্য পরিণত হইতেছে।

জীবন নাশের আশঙ্কা ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক শারীরিক. যন্ত্রের যে কোন অংশ তোরোহিত করা এক্ষণে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক করোটি (মাথার খুলি) উদ্ঘাটন করিয়া মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ তিরোহিত করিতে পারেন, প্লাকস্থলীতে অর্বুদ (cancer) উৎপন্ন হইলে তাহা কর্ত্তন করিতে পারেন, এমন কি সম্প্রতি কোন অস্ত্রচিকিৎ-সককে একস্থলে পাকস্থলীকেই তিরোহিত করিতে দেখা গিয়াছে। বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসক প্লীহা ও মূত্রাশয়ের অংশ বিশেষ কর্ত্তন করিয়া বাহির করিতে, স্থান বিশেষে নূতন চর্ম্ম ও অস্থি সংযোজিত করিতে এবং কুঞ্চিত মুখ মণ্ডলে পুনরায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে অস্ত্রচিকিৎসক আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বোধ হয় ছুরিকা সাহায্যে মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারেন।

ইস্পাতের গোলাকার করাত সাহায্যে সম্প্রতি মাথার খুলিতে ফ্লোরিন মুদ্রার (florin) অনুযায়ী একটী ছিদ্র কাটিয়া, পীড়িত অংশ বাহির করাতে একজন মৃগী রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

মস্তিষ্ক মধ্যে সামান্য চাপ বাঁধা রক্ত সঞ্চালিত হইলে মনুষ্য চরিত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যিনি আজ অতীব সদাশয় মহানুভব ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত তিনি হয়ত কল্য নরাকারে রাক্ষসরূপে পরিণত হইতে পারেন। যে কোন অতীব নৃশংস কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্ক হইতে চাপ বাঁধা রক্ত বিন্দু বহিষ্কৃত করিতে পারিলে তিনি পুনরায় স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ফ্রান্সে ব্রুসেদ (Brousaid) হাঁসপাতালে একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে। একটী রজকীর কেশ লৌহ শলাকায় এরূপ ভাবে আবদ্ধ হয় যে তাহার মস্তকের চর্ম্ম ঘাড় হইতে কপাল পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। উক্ত হাঁসপাতালে তাহাকে অনতিবিলম্বে আনয়ন করা হইল; তত্রস্থ চিকিৎসক রজকীর বাটী হইতে মস্তকের ঐ বিচ্ছিন্ন চর্ম্ম আনিতে আদেশ করেন। ঐ চর্ম্ম আনা হইলে প্রথম বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া পরে কীটাণু বর্জ্জিত জলে (antiseptic water) সিক্ত করা হইল এবং তৎপরে রজকীর মস্তকে স্থাপিত হইল। এই রূপে তাহার মস্তক পূর্ব্ববৎ হইল।

টরেণ্টো প্রদেশে চার্লস্ স্মিথ নামক একটী বালকের পৃষ্ঠদেশ, বামদিক ও জঙ্ঘা পুড়িয়া যায়; নূতন চর্ম্ম দগ্ধ স্থানে সংযোজিত করা ব্যতীত তাহার আর জীবনাশা রহিল না। তাহার বার বৎসরের বালিকা ভগিনী ইভা তাহার জীবন রক্ষার্থে নিজ দেহ হইতে চর্ম্ম তুলিয়া লইবার জন্য চিকিৎসকগণকে অনুরোধ করিল; চিকিৎসক বালিকার উভয় উরু হইতে চর্ম্ম তুলিয়া লইলেন; কিন্তু ঐ বালিকা ইহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত লইল না। পরে যথা সময়ে উভয়ই আরোগ্য লাভ করিল।

কোনও একটী সুন্দরী রূপমালিন্য বশতঃ দুঃখিত হওয়াতে এক অত্যাশ্চর্য্যকর অস্ত্রচিকিৎসা আরম্ভ হইল। দীর্ঘকাল ব্যাপী ও অদ্ভুত কৌশল যুক্ত চিকিৎসা সাহায্যে ঐ রমণীর মুখের চর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ রমণী আপনাকে ষোড়শী রূপসী অপেক্ষা অধিক রূপবতী বলিয়া গর্ব্ব করেন।

***

হৃদ্‌পিণ্ডের বিস্ময়কর ক্রিয়া। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বিস্ময়-

ক্ষুদ্র বস্তু আছে, মানব হৃদ্‌পিণ্ড তৎসমুদায়ের আশ্চর্য্যকর। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের ক্ষমতা এত অধিক, যে সত্তর বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট জীবনে ইহার যে শক্তি ব্যয় হয় তদ্দ্বারা প্রায় ছয় হাজার মণ ওজন অনায়াসে ব্ল্যাঙ্ক পর্ব্বতের (Mount Blanc) শিখর দেশে উত্তোলন করা যাইতে পারে, অথবা চারি হাজার সংখ্যা অধিবাসী পরিপূর্ণ কোনও নগরকে ঐ শক্তি দ্বারা শূন্যে তিন মাইল উর্দ্ধে প্রেরণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘণ্টায় ইহার যে শক্তি ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা দেড় শত মণ ওজন এক ফুট উচ্চ অথবা একজন ব্যক্তিকে প্রায় চুয়ান্ন হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করা যায়। একদিনে যত শক্তি ব্যয় হয় তদ্দ্বারা নয় দশ জন ব্যক্তিকে লণ্ডন মনুমেণ্টের উপরিভাগে উত্তলন করা যাইতে পারে। এবং এক বৎসরের ব্যয়িত শক্তি দ্বারা চারিখানি প্রথম শ্রেণীর রণ-পোতকে এক ফুট উচ্চে তোলা যাইতে পারে। একটি হৃদ্‌পিণ্ডের যখন এই ক্ষমতা, তখন কোটি কোটি মানব হৃদ্‌পিণ্ড সমষ্টির ক্ষমতা যে কি ভয়ানক তাহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রত্যেক তিন মিনিটে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ হৃদ্‌পিণ্ড সমুদয় লণ্ডন সহরকে পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি উর্দ্ধে তুলিতে পারে। এক ঘণ্টায় একটি হৃদ্‌পিণ্ড, শোণিত স্রোত সাত মাইল অর্থাৎ একজন মানুষ ঐ সময়ে যত দূর চলিতে সক্ষম তাহার প্রায় দ্বিগুণ দূরে চালিত করে। এক ঘণ্টায় শোণিত প্রবাহ ১৬৮ মাইল দূর পর্য্যন্ত চালিত হয় অত্যন্ত বলশালী ও দ্রুতগামী দুইটি অশ্বও যাহা যাইতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। হৃদ্‌পিণ্ড দ্বারা চালিত রক্ত প্রায় ছয় মাসে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। আশী বর্ষ পরমায়ু বিশিষ্ট জীবনে ঐরূপে ১৯৭ বার ভূপ্রদক্ষিণ করা হয়। অথচ এই অত্যাশ্চর্য্যকর যন্ত্র . কত ক্ষুদ্র! ধন্য ঈশ্বরের মহিমা!

পেঁপের চাষ। বোম্বাই নগরের গষ্টলিং সাহেবের মতে (Mr. D. Gostling F. S. A) নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎকৃষ্ট পেঁপে গাছ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। পেঁপে ফল বার মাসই পাওয়া যায় কিন্তু গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে পেঁপে গাছ প্রকৃত পক্ষে বৎসর কাল স্থায়ী। সুতরাং তেজস্কর গাছের জন্য নূতন বীজ প্রতি বৎসরেই রোপণ করা আবশ্যক। বীজগুলিকে প্রথমতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে, পরে সপ্তাহ কাল অতীত হইলে একটী ভাল মাটী পূর্ণ গামলায় ঐ শুষ্ক বীজগুলি পুঁতিতে হইবে। গামলার মাটীতে কিছু বালি ও দুই বৎসরের পুরাতন সার চূর্ণ মিশ্রিত থাকা আবশ্যক। এই গামলাটীকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিতে হইবে। যখন অঙ্কুর সকল ৩।৪ ইঞ্চি হইবে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক্ আধারে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, এবং গাছগুলি ২।৩ ফিট বড় হইলে যে স্থানে উৎকৃষ্ট মাটী আছে ও যেখানে রৌদ্র ও জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে সেই স্থানে বড় বড় গর্ত্ত কাটিয়া সার ও ভাল মাটীতে পূর্ণ করিয়া গাছগুলি রোপণ করিতে হইবে। বেশ বড় বড় পেঁপে প্রস্তুত করিতে হইলে এককালে কুঁড়ি ও ৫।৬টা পেঁপে ব্যতীত আর কিছুই গাছে রাখা উচিত নয়। সুপক্ক অবস্থায় ভক্ষণ করিলে ইহাতে পাকা আম্রের গন্ধ পাওয়া। কাঁচা কিম্বা ডাঁশা অবস্থায় ইহাকে আপেলের পরিবর্ত্তে রাঁধিতে পারা যায় ইহাতে একটু লেবুর রস ও চিনি দেওয়া আবশ্যক।

প্রণয়ী—সুন্দরি! বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা চুম্বনকে* অতি বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া থাকেন। ইহা কি ঠিক্?

প্রণয়িনী—সত্য বটে ইহাতে মন উতলা হয় আর বুকটাও কেমন ধড়ফড় করে।

***

প্রশ্ন। কোন্ বস্তু মানুষে পাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ পাইলেও ত্যাগ করিতে চাহে না?

উত্তর—টাকযুক্ত মস্তক।

***

প্রশ্ন। স্বামী স্ত্রীর কোন্ অবস্থা কখনও দেখিতে পায় না?

উত্তর—বিধবাবস্থা।

***

ছাত্রের রাজভক্তি—এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলসন সাহেব মহারাণীর অবৈতনিক চিকিৎসকের পদ পাইয়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জ্ঞাতার্থে বোর্ডে লিখিয়া দেন "অধ্যাপক উইলসন আজ হইতে মহারাণীর অবৈতনিক চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন"। অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে একটী ছাত্র তাহার নীচে লিখিয়া দিল "পরমেশ্বর মহারাণীকে রক্ষা করুন"। পরে অধ্যাপক নিজে এইটি দেখিয়া মৃদু হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

***

আয় ব্যয়—"আর বুঝাইলেই বা কি হইবে নারীজাতির ক্রমোন্নতির ভরসা নাই" এই বলিয়া বাড়ীর কর্ত্তা একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। প্রতিবেশী নিকটে বসিয়াছিলেন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মহাশয়, কি হ—" "কি হইয়াছে? উন্নতি আর কিসে হইবে, তাহাদিগকে অর্থনীতির প্রথম সূত্রটী বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। কাল আমি বাড়ী ছিলাম না শুনিলাম যে আমার ছোট মেয়েটী একটা দুয়ানি গিলিয়া ফেলিয়াছিল, আর আমার স্ত্রী কিনা সেই

ডুয়ানিটি পাইবার জন্য একজন ডাক্তার আনাইয়া তাহাকে আট টাকা দিল।"

***

অদ্ভুত ডিম্ব। ভিক্‌টোরিয়া সহর হইতে ডাক্তার মিচেল্‌ গত মাসের ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগ্যাজিনে (Strand Magazine) একটী মজার ডিমের সংবাদ পাঠাইয়াছেন। একটী ছোট মুরগীর ডিম সিদ্ধ করা হয়, এবং ভাঙ্গা হইলে ইহার ভিতর হইতে ৪৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১/৮ ইঞ্চি চৌড়া একগাছি ফিতা পাওয়া যায়। ইহার রং ঘোর হরিদ্রাবর্ণ এবং অনেকটা লম্বা বুটের ফিতা বলিয়া বোধ হয়। ফিতা গাছি ডিমের ভিতর পাকান অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ইহার মধ্যস্থলে একটী শক্ত গ্রন্থি ছিল।

***

দন্ত বেদনা। প্রথম একমুখ গরমজল ও তৎপরেই ঠাণ্ডা জল মুখে পুরিয়া কুল্লি কর। কএকবার গরম হইতে ঠাণ্ডায় শীঘ্র পরিবর্ত্তনে বেদনা দূর হয়।

***

কীটদষ্ট দন্ত। যে দাঁতটী পোকা ধরিয়া ক্ষয়িয়া গিয়াছে তাহা মেরামত করিতে হইলে, জল ফুটাইয়া তাহাতে একটু গটাপার্চ্চা (Guttapercha) ফেলিয়া দাও। গটাপার্চ্চা নরম হইলে একটু আঙ্গুলে করিয়া লইয়া দন্তগহ্বরে চাপিয়া বসাইয়া দাও। তাহার পর শীতল জলে দুই তিনবার কুলকুচা করিলেই ইহা শক্ত হইয়া যাইবে। এরূপ করিলে ভগ্ন দন্ত হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় না এবং দাঁতে ঠাণ্ডা লাগে না।

***

আত্মপ্রসাদ।

প্রশ্ন। আত্মপ্রসাদ কাহাকে বলে ?

উত্তর। নিজের তহবিল মিলাইয়া টাকা বাড়িয়াছে দেখিলে

***

বিচারকের রায় শুনিয়া ব্যারিষ্টার বলিয়া উঠিলেন—উঃ কি অসার ও বে আইনী রায়! বিচারক তখন ব্যারিষ্টারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি বলিতেছেন ? ব্যারিষ্টারপ্রবর উত্তর করিলেন—"হুজুর আমি উচ্চৈঃস্বরে চিন্তা করিতেছি মাত্র।"

***

প্লেগের ঔষধ—গত বৎসর "ঐ বাঘ ঐ বাঘ" চীৎকারের ন্যায় "ঐ প্লেগ ঐ প্লেগ" রবে আমাদের দেশ তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রাখালের যেমন মিথ্যা চীৎকার পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল—সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তেমনি আজ এক বৎসর যাইতে না যাইতে প্লেগ আসিয়া সত্য সত্যই দেশটাকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্লেগ ব্যাধির আক্রমণের মধ্যেও আমাদের বিশেষ সুখ এই যে আমরা রাজার কৃপায় এবার প্লেগের দারুণ বিধি হইতে মুক্ত। যাহা হউক এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ডাক্তার সরকার "ইগ্নেসিয়া" নামক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা ব্যবহারের নিয়ম এই যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক ফোঁটা করিয়া ইগ্নেশিয়া(৩০) সপ্তাহে দুইবার বা একবার করিয়া সেব্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কের প্রতি উহার অর্দ্ধেক মাত্রা ব্যবহার্য্য। ইগ্নেসিয়ার সুঁটি প্রায় কলাই সুঁটির ন্যায়। ঐ সুঁটি দেহে ধারণ

করিলেও প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই সুঁটি ডাক্তারখানা ও বেণের দোকানে বিক্রয় হয়।

***

প্রশ্নযুগলের এক কথায় উত্তর দহন।

জাল দিয়ে জলাশয়ে কেবা মাছ ধরে।
দোষী বা চোরেরা শাস্তি কোথা ভোগ করে?
জেলে।

কোন্ ফুল শুভ্র ক্ষুদ্র পূর্ণ পরিমল।
কাকের ভক্ষণাসাধ্য কোন্ পক্কফল?
বেল।

কার লোভে অলিকুল প্রসূণে বিহরে?
কোন্ ঋতু সমাগমে কোকিল কুহরে?
মধু।

কাচকে কাটিয়া কেবা করে খান খান?
কে নাশিল হিংসা ভরে কুন্দের পরাণ?
হীরা।

রমণীর কোন স্থানে ফুল শোভা পায়?
শরতেতে কোন্ ফুল হেসে মরে যায়?
কেশে।

কোন্ রোগ রাসভের হয় না জীবনে?
শোভে তরু কিশলয়ে কার আগমনে?
বসন্ত।

ভারতের কোন দিকে স্থিত হিমালয়?
কোন নামে পরিচিত বিরাট তনয়?
উত্তর।

বিহরে গগন তলে কারে লয়ে শশী ?
ভ্রমরের মাথা খেলে কোন সর্ব্বনাশী ?

রোহিণী।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

কোকিল—মাঘ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। মাসিক পত্র, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও ছাত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত। ইহার কলেবর প্রায় আত্ম কথাতেই পরিপূর্ণ, তবে "ইতিহাস" প্রবন্ধটী উল্লেখ যোগ্য বসন্তাপগমে 'কোকিল' চিরপ্রসিদ্ধ স্বভাব বশতঃ নীরব হইয়া না যায় এই আমাদের কামনা। "কোকিলের" দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনা করি।

কুসুম—মাসিকপত্র, আকার ডিমাই ১২ পেজী মূল্য বৎসরে তিন আনা মাত্র। ইহাও মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনের কতিপয় ছাত্র দ্বারা পরিচালিত। আমরা কুসুমের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা একত্রে পাইয়াছি। "কুসুম" ক্ষুদ্র হইলেও সৌরভ হীন নহে, ইহাতে অনেক গুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "কুসুম" অকালে না ঝরিয়া যায় এই আমাদের কামনা।

নব্যভারত—১৬শ খণ্ড, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ ১৩০৫। "রাজনীতি ও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র" প্রবন্ধে লেখক শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় দু এক স্থানে অনবধানতা ও অসংযমতার পরিচয় দিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন "এ নেশা (রাজনীতি) নিষ্কর্ম্মায় করে, নির্ব্বোধে করে, নিন্দুকে, নিঃসম্বল ব্যক্তিরা কিছু বেশী রকম করেন।" দাদা ভাই নাওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডব্লু, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, এম্, বসু প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিরা কিছু "বেশী রকম করেন" একথা লেখকের স্মরণ থাকা উচিত ছিল।

আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন "আইন ব্যবসায়ে বিপুল বিদ্যা-বিশারদ ব্যবহারজ্ঞ, বিজ্ঞ ও বিশুদ্ধচিত্ত উকিল ব্যারিষ্টারের ন্যায় যেমন মস্তিষ্ক হীন, মূর্খ ও মিথ্যা উপজীবি মোক্তার" ইত্যাদি। অভাগা মোক্তারদিগের উপর লেখকের এত রাগ কেন? কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম, কি আইন ব্যবসায় সকল বিষয়েই ভাল মন্দ লোক বিদ্যমান, তবে দুএক জনের দোষে কোনও সম্প্রদায় বিশেষকে অথবা গালি দেওয়া অতীব অন্যায়। "বিদায় গাথা" পদ্যটী মন্দ নয়, ভাবব্যঞ্জক। 'স্পেন ও আমেরিকার যুদ্ধ প্রবন্ধটীতে কিউবার প্রাকৃতিক বিবরণ ও প্রাচীন ইতিহাস, স্পেনিয় শাসন, কিউবাবাসীদিগের প্রতি ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের লোকের সহানুভূতি, কিউবা উদ্ধার করিতে ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌সের সঙ্কল্প গল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। 'উদয়ন আচার্য্য' প্রবন্ধে লেখক শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য মিথিলাবাসী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী হইতে পৃথক ব্যক্তি ও এতদ্ সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষ' অভিধানের মত ভ্রমপূর্ণ এই সকল প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; প্রসঙ্গ ক্রমে সংস্কৃত কবি শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে ডাঃ ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিতবর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতির মত ভ্রমপূর্ণ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। লেখকের মত ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য। "ব্রহ্ম ও জগৎ" প্রবন্ধ ধর্ম্মবিষয়ক ইহাতে লেখক স্বাভিলষিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও তদ্‌বিরুদ্ধে স্বকল্পিত আপত্তি গুলি খণ্ডন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। 'খোকার বিলাতের পত্র' কৌতূহলজনক কিন্তু ভাষা সকল স্থলে মার্জ্জিত নহে। 'দিগ্বিজয়ী বীর' কবিতাটি পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব কিন্তু স্থানাভাব। 'শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা ও সমন্বয় ভাষ্য' প্রবন্ধে

পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় কৃত গীতার সমন্বয়ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ সমালোচিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গীতারও সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচনার একস্থলে সমালোচক শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু বলিয়াছেন 'গীতা বুঝিবার জন্য অনেক দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়াছি অনেক জর্ম্মাণ দার্শনিক মূল পুস্তকের অনুবাদ পড়িয়াছি তথাপি গীতা ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই'— আমরা তাঁহার নিরভিমানতার প্রশংসা করি। 'ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্র সমস্যাটীতে সম্পাদক আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন ও হৃদয় হীনতার জলন্ত প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন ও স্বসমাজের দুঃখে কাতর হইয়া ইহার সহিত অজ্ঞাতসারে স্বদেশহিতৈষিতা মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। 'শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা' দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর অমিত্রাক্ষর ছন্দে গীতার বঙ্গানুবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্যাখ্যা ও টীকায় সমন্বিত। স্মৃতি একটী পদ্য—কষ্টকল্পনায় লিখিত বলিয়া বোধ হয়। 'মহাত্মা গোবিন্দ মোহনের বিদ্যাবিনোদ প্রবন্ধ উক্ত মহাত্মার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ পত্র।

মুকুল—চতুর্থ ভাগ ফাল্গুণ ১৩০৫। ১১শ সংখ্যা। এবারকার মুকুলে প্রসিদ্ধ জেমসেটজী তাতার চিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও পড়িবার যোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ। 'পরিধেয়' প্রবন্ধটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল।

দারোগার দপ্তর—রাণী না খুনি, ৮০।৮১ম সংখ্যা। গল্পটী কৌতুহল-প্রদ। ভাষা মন্দ নহে কিন্তু দুই এক স্থলে সামান্য দোষ আছে যথা 'খরিদ করিয়াছিলাম না' 'নষ্ট হইয়াছিল না' ওরূপস্থলে "করি নাই" "হয় নাই" ইত্যাদি প্রয়োগই প্রচলিত।

প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। এপ্রেল, ১৮৯৯ সাল। তৃতীয় সংখ্যা।

বর্ষ-বিদায়ে।

১

কঠোর নিয়তি-রাজ্যে, নিরাদর ভগ্নগৃহে গেল যে বরষ,
কালি, শেষ নিশা তা'র, অলস শিশিরে কাঁপি' চাহিল বিরস ;
যে অশান্তি ল'য়ে বুকে কাটা'নু জীবন দুখে,
দেখিনু তাহারি মুখে সেই মৃত-ছায়া !
নয়নে কম্পিত ভীতি চাহিছে শান্তির প্রীতি,
প্রতি পদক্ষেপে তার ধূলি বদ্ধ-মায়া !
তারকাবনিতাদল, ফেলিল নয়ন জল, কাঁপিল পবন—
কালের অকূল মোহে, মূরছি' বরষ হায়, লভিল মরণ !

২

আজিকে পূরবে হের উজলি' স্বরগ, ধরা, জাগিছে তপন,
হাসিছে সরোজ-বালা চঞ্চল সরসী আলা, সোহাগ মগন ;
গোলাপ বধূর দল নীহারজ-নিরমল
খোলে আঁখি ঢলঢল সুরভি-বিভোর,
প্রকৃতি নবীন বেশে নব বরষেরে হেসে
বরিছে নয়নে ধরি' সোহাগের ডোর।

প্রতি হৃদে নব আশা, নয়নে উৎসাহ ভাষা, বিপুল বিশ্বাস ;
আজিকে মানব-গৃহে, কত না আনন্দ-বিভা, প্রীতির বিকাশ।

৩

কহলো প্রকৃতি মোরে, এমনি সোহাগ ভরা হাসি মুখ খানি,
নিয়ত হেরিবঁ তোর, শুনিব জীবন ভোর, প্রেম সুধা-বাণী ?
বিধির রহস্য মোরা বুঝিব কেমনে হায় !
আজ সুখ হেরি যেথা কাল্‌ত র'বে না সেথা
আশা-ইন্দ্র-ধনু মরি মিলাবে কোথায় !
ওগো আজ যে' বিভোর সুখে দুখ-দৈন্যহীন,
কালিকে, তাহারি হৃদি অশান্তি বিলীন !
জগৎ স্বপন শুধু, মোহ-মেঘ মেলা,
রঙ্গময়ী সুরাঙ্গনা কল্পনারি খেলা !

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

স্বর্গীয়া কবি প্রমীলা নাগ।

না ঘুচিতে ভাল নিশার আঁধার,
না ফুটিতে ভাল আলো চারিধার,
গেয়েছিল সে যে শুধু একবার
মধুর মোহন গান !
আলোকে উজলি'উঠিল গগন,
স্তব্ধ প্রকৃতি তন্দ্রামগন
চকিতে চমকি মেলিল নয়ন
পাইয়া নূতন প্রাণ ;
না ফুটিতে ভাল দিবসের আলো
হ'ল গীত অবসান।"*

আজ আমরা প্রতিভা পূজায় একটী ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিব।

* সাহিত্য ১৩০৩ সালের পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত ,,প্রমীলা নাগ" শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

একটি কবিললনার কথা বলিব,—মূর্ত্তিমতী সরলতা পবিত্রতা ও মধুরিমার একখানি ছবি দেখাইব,—অসময়ে বৃন্তচ্যুত একটী দিব্য কুসুমের জন্য দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিব। একটী হৃদয়বীণার কোমল ঝঙ্কার অল্পদিন হইল বঙ্গ-কবিতা-কাননে অমিয়ধারা ঢালিয়াছিল,—এক অসাধারণ প্রতিভা সম্যক বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্যানুরাগিগণকে পুলকিত ও মোহিত করিয়াছিল। সে বীণা এক্ষণে নীরব,—সে প্রতিভা, সুখস্বপ্নের মত চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতি আছে, সে স্বরগ-বীণার মধুর রাগিণী এখনও আমাদের কর্ণ কুহরে মৃদুল তানে বাজিতেছে এবং যতদিন বঙ্গ-ভাষায় গীতি-কবিতার অস্তিত্ব থাকিবে, আশা করি তত দিনই বাজিবে। অসামান্য প্রতিভাবান্ ইংরাজ কবি কীটস্ এবং চ্যাটারটন্ সদৃশ ইনিও একজন 'পথহারা' 'অতিথি' কবি,—সান্ধ্য তপনের শেষ কনকরশ্মির ন্যায় ক্ষণিকের জন্য বৃক্ষ চূড়ে ঝিকিমিকি করিয়া, অন্য জগৎ বিমোহিত করিতে চলিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজি ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে প্রমীলা কৃষ্ণনগরে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ ৺রামলোচন ঘোষ একজন স্থানীয় কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ও সুনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এবং পূজ্যপাদ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় মনোমোহন ও বাগ্মিপ্রবর লালমোহন ঘোষ মহোদয়গণের জন্মদাতা বলিয়া আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। প্রমীলার মাতৃকুলের প্রতিভা ও গুণগ্রামের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কেবল এই বলিলেই হইবে যে তাঁহার জননী আলোকসামান্য প্রতিভাবান ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বাংশে সুযোগ্যা ভগ্নী। প্রমীলার পিতৃবংশও তেজস্বিতা, সত্যপ্রিয়তা, সরলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি মহৎগুণাবলীর জন্য সুপরিচিত। অতএব যে সকল সদ্‌গুণ মানব চরিত্রকে অলঙ্কৃত

করিতে পারে, ক্রমাভিব্যক্তিবাদ অনুসারে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলা-জীবনে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বিধাতা তাঁহার প্রতি শারীরিক সৌন্দর্য্য বিতরণেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যে দ্বাদশটী রূপবতী কুমারী ভূতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড রিপণ ও তাঁহার পত্নীকে সিয়ালদহ ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নির্ব্বাচিতা হয়েন, প্রমীলা তাঁহাদের অন্যতম।

প্রমীলার শৈশব জীবনে একটী দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তাহার বিষময় ফল তাঁহাকে আজীবন ভোগ করিতে হইয়াছিল; সুতরাং ঐ ঘটনাটী উল্লেখ যোগ্য। দুই বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি হুপিং কাশী পীড়ায় কঠিনরূপে আক্রান্ত হইয়া, বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতে তাঁহার দেহে চিরদিনের জন্য অসুস্থতা ও অশান্তির বীজ রোপিত হইয়া যায়।

প্রমীলার শৈশব ও বাল্যকাল তাঁহার জন্মস্থান কৃষ্ণনগরে এবং তাঁহার মাতামহের আদিবাসস্থান—স্বর্গীয় মনোমোহন বাবুর জন্ম-ভূমি,—ঢাকার সন্নিকটস্থ বয়রাগাদি গ্রামে অতিবাহিত হয়। কৃষ্ণনগরে তাঁহার মাতুলালয়, উদ্যানক্ষেত্রাদি বেষ্টিত অতি রমণীয় স্থলে অবস্থিত। আর বয়রাগাদি গ্রামকে প্রকৃতি আপন হস্তে চিরসুষমায় ভূষিতা করিয়া শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির নিভৃত গ্রাম্য শোভার আদর্শ স্থল করিয়া রাখিয়াছেন। বালিকা মধ্যে মধ্যে অতি অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় আসিতেন এবং ইতিমধ্যে একবার তিনি কিছুদিন খরস্রোত গড়াই নদ বিধৌত পূর্ব্ববঙ্গের কুষ্টিয়া গ্রামে তাঁহার মাতৃষসার নিকট অবস্থান করেন। বালিকাবয়সে পর্ব্বতমালা দর্শনের সুযোগও প্রমীলার একবার ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার মাতুলের সহিত এই সময়ে কিছুদিনের জন্য কার্সিয়ঙ্গ শৈলে গমন করিয়া তুষার

ধবলিত হিমাচলের মহান্ সৌন্দর্য্য রাশি বিস্ময়োৎফুল্ল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লন। বালিকা কবির শিক্ষাক্ষেত্র কেমন উপযোগী হইয়াছিল পাঠক বোধ হয় ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন।

মনোমোহন বাবু প্রমীলাকে নিজ কন্যাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে এবং তত্ত্বাবধানে যেরূপ শিক্ষা আশা করা যাইতে পারে, প্রমীলার তাহা সম্পূর্ণরূপে হইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলা বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই। তাঁহার শিক্ষা মাতৃ অঙ্কে আরম্ভ এবং গৃহেই পরিসমাপ্ত হয়। যে উপদেশ ও শিক্ষা প্রমীলার মানস ক্ষেত্রকে আজীবন সুরভিত ও সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি মাতৃসকাশে কতদূর ঋণী ছিলেন তাহা তাঁহার জননীর উদ্দেশে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটীতে প্রকাশ পায়—

"তোমাতে গঠিত হৃদি, তোমারি যে ছায়া প্রাণ।"

কলেজের শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু এটীকে আমরা প্রমীলার পক্ষে একটি সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া মনে করি। তিনি যে উচ্চ শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্কা রমণী মণ্ডলীর মধ্যে অহরহঃ বিচরণ করিয়াও হিন্দু ললনাগণের লজ্জা, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, ধর্ম্মভাব, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ তাঁহার আদর্শ জীবনে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, আমাদের বিবেচনায় এই গৃহ-শিক্ষাই তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষপাতী স্বজনগণের মধ্যে থাকিয়াও তিনি যে উক্ত সমাজের দেশাচার বিরুদ্ধ দূষণীয় শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, কেবল অনুকরণীয় বিষয়গুলি নিজ জীবনে প্রতিভাত করিয়াছিলেন, কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এ বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন তাহা বলিতে পারি না। বস্তুতঃ

তাঁহার সমস্ত শিক্ষাই স্বতঃসিদ্ধ। জগৎ জননী প্রকৃতি আপনার অব্যক্ত ভাষায় বালিকাটীর নিকট তাঁহার মনের অতি লুকান কথা বলিতেন। আর বালিকাটী ঐ ভাষা বুঝিতে ও বলিতে কত শীঘ্র ও কত সুন্দর রূপে শিখিয়াছিল আমরা তাহার আভাস দিতে প্রয়াস পাইব। একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। প্রমীলা ব্রাহ্মিকা ছিলেন না—তিনি একজন হিন্দুললনা ছিলেন। শৈশব ও বাল্যে দেবদেবী পূজারত বৃদ্ধা মাতামহীর সন্নিকটে থাকিয়া, হিন্দুধর্ম্মভাব বালিকার মজ্জাগত হইয়া যায়। বয়োবৃদ্ধি এবং শিক্ষার সহিত ঐ ধর্ম্মভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রমীলার রচনার মধ্যে অনেকগুলি কবিতাই এই হিন্দুধর্ম্মপ্রবণতার পরিচায়ক। শারদ সপ্তমীর আগমনে বালিকাকবির চিত্ত যেরূপ উৎফুল্ল হইত, সেই পবিত্র প্রেমানন্দ স্রোতে ভাসিয়া যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়! বয়োবৃদ্ধি এবং শিক্ষার সহিত এই ধর্ম্মভাবের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; *প্রমীলা চিরজীবনই হিন্দুধর্ম্মানুরাগে অনুপ্রাণিতা ছিলেন।* মধুপুরে অবস্থান কালে তাঁহার কোন সমবয়স্কা আত্মীয়া, নিকটস্থ বৈদ্যনাথের দেবাদিদেবকে উদ্দেশ করিয়া, তাঁহার সমক্ষে কোন উপহাস বাক্য প্রয়োগ করাতে, তিনি আন্তরিক বিরক্তি সহকারে তাঁহাকে অনুযোগ করেন। ইহা তাঁহার জীবনের শেষ ভাগের ঘটনা।

শিক্ষা এবং প্রতিভাগুণে প্রমীলা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাতেই তাঁহার পরিমার্জ্জিত রুচি এবং স্বতঃসিদ্ধ কার্য্যকারিতা প্রকাশ পাইত। তিনি আলেখ্য লিখনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সুকুমার বিদ্যায় তিনি কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ স্ত্রীশিক্ষাগারে (Loretto convent) শিক্ষিতা হয়েন, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে

স্বভাব চিত্রাঙ্কন ও সুচারু বর্ণ সমাবেশে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। চিত্রকলা, কবিতার সহোদরা। উভয়ই প্রতিভা-সাপেক্ষ এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। যে বালিকার কোমলতম হৃদয়-কন্দরে প্রকৃতির কমনীয় মুখচ্ছবি সতত বিরাজমান থাকিত এবং যাহার স্বপ্নময়ী ভাষা, অনায়াসে তাহা দিব্য বর্ণে প্রতিবিম্বিত, করিত, তাহার তুলিকা যে লেখনীর সহিত তুল্য কার্য্যকারিতা দেখাইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? বালিকা যত্ন, অভ্যাস বা প্রকৃতিগত ক্ষমতায় যে ভবিষ্যতে একজন "র্য্যাফেল" বা "রুবেন্‌স্" হইতে পারিতেন এরূপ আভাস দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশীয় শিল্পিগণ প্রদর্শিত পথে তীব্রবর্ণে চিত্রিত স্বভাবের বিকৃত প্রতিকৃতি অঙ্কনে সময় ও পরিশ্রমের অপব্যবহার না করিয়া, তিনি পাশ্চাত্য চিত্রকরদিগের অনুকরণে আলোক ও ছায়ার এবং উজ্জ্বল কোমল বর্ণরাগের সূক্ষ্মতম তারতম্য উপলব্ধি করিয়া স্বভাব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিতে অভ্যস্তা হইয়াছিলেন।

বালিকার জ্ঞানলিপ্সা এবং সাহিত্যানুরাগ প্রগাঢ় ছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্ত সময়ই যে সাহিত্য সেবায় বা শিল্পরচনায় পর্য্যবসিত হইত তাহা নহে। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, এবং যদিও রন্ধন বা অন্যান্য গৃহকর্ম্ম তাঁহাকে সাধারণতঃ করিতে হইত না, তথাপি প্রয়োজন হইলেই তিনি আগ্রহপূর্ব্বক উক্তকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং আপনার স্বাভাবিক গুণপনায় ঐ সকল কার্য্য অতীব সুচারুরূপে এবং ক্ষিপ্রহস্তে সম্পন্ন করিয়া সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিতেন। বলা বাহুল্য যে যে কার্য্যে পরিমার্জ্জিত রুচির প্রয়োজন, তাহা প্রমীলার দ্বারা অতি উৎকৃষ্টরূপে সমাধা হইত। গৃহসামগ্রী পরিচ্ছন্ন রাখিতে এবং সুসজ্জিত করিতে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন।

বালিকার স্বভাবগুণে সকলেরই স্নেহ তাঁহার প্রতি স্বতঃ আকৃষ্ট হইত। তাঁহার দয়া, ভক্তি, স্নেহ, মমতার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলে হয়ত পাঠক আমাদিগের প্রতি অতিরঞ্জিত বর্ণনার দোষারোপ করিবেন। কিন্তু বস্তুতঃই তাঁহাকে যে দেখিত সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি কখন ক্রোধ পরায়ণা হইয়া কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন বা কাহারও মনঃপীড়া দিয়াছেন, একথা তাঁহার জীবদ্দশাতেও আমরা কখনও শুনি নাই। স্বর্গীয় কবি ঈশানচন্দ্র, প্রমীলার বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক কথাই যথার্থ—"বালিকার সকলই সুন্দর, যাহা কিছু ভাবে যাহা কিছু বলে, যাহা কিছু করে, তাহারই মধ্যে এমন একটু সরলতা, এমন একটু স্নেহ মমতা, এমন একটু নিঃস্বার্থতা, এমন একটু খাঁটি কবিত্ব মাখান থাকে যে হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হন।" প্রমীলার ধর্ম্মজ্ঞান ও শিক্ষার আদর্শ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটীতে প্রকাশ পায়—

সেই সে ধনী এভবে, ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ
এ পাপ জগতে যা'র হৃদয়ে বিকাশে ভাতি।
সেই ধনী,—বিশ্বপ্রেম, জগতের উপকার
জ্ঞানের পবিত্র ছবি অঙ্কিত হৃদয়ে যার!
সরলতা উদারতা স্বর্গীয় অমূল্য ধন
রতন সে হৃদি যাহা করুণার প্রস্রবণ।

এই কথা গুলি প্রমীলার নীতি পুস্তক পাঠ-প্রসূত নিরর্থ শব্দ-বিন্যাস নহে। এশিক্ষা তাঁহার অস্থিমজ্জাজড়িত, হৃদয় শোণিতের অংশীভূত। তিনি বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে পদে পদে ইহার জীবন্ত সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

অনুমান দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রমীলার প্রথম কবিতা 'ভারত বাসী' নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার

কবিতা রচনার উদ্যম আরম্ভ হইয়াছিল। যে বয়সে বালকবালিকারা খেলা ধূলা লইয়া ব্যস্ত থাকে, যখন চিন্তার ছায়াও সাধারণতঃ হৃদয়ে স্পর্শ করেনা, সেই বয়সে এই বালিকার গভীর চিন্তাশীলতার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। বালিকার প্রথম প্রকাশিত কবিতাটীর বিষয় অবগত হইলে পাঠক বিস্মিত হইবেন; ইহার নামকরণ হইয়াছিল "চিরদিন সমান না যায়"। কবিতাটি কিছু সুদীর্ঘ হইয়াছিল এবং উহাতে অল্পবয়স্কা বালিকার প্রথম রচনা সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে তাহা হইতে বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু না থাকাতে রচয়িত্রী কবিতাটিকে পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। ইহার পরে "প্রমীলা বসু" স্বাক্ষরিত কবিতা নব্যভারত, বামাবোধিনী, আর্য্যদর্শন, বিভা, ভারতী, দৈনিক, নববিভাকর-সাধারণী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র সমূহে অবিরতধারে প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং অচিরেই এই অনতিপরিস্ফুট কোরকের সুষমা-সৌরভ বঙ্গ-কবিতা-কাননে অনুভূত হইল, এবং "প্রমীলা বসু" একজন সুলেখিকা বলিয়া সাহিত্য-সমাজে পরিচিতা হইলেন। ঐ সকল কবিতার সহিত কয়েকটী বহুপূর্ব্ব লিখিত অপ্রকাশিত কবিতা সন্নিবেশিত করিয়া সন ১২৯৭ সালের প্রারম্ভ কালে তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক স্বনামে নামকৃত "প্রমীলা" প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক প্রকাশ মাত্র "প্রমীলা" রচয়িত্রীর কবিত্বের খ্যাতি সাময়িক পত্র সমূহে ধ্বনিত হইতে লাগিল। "প্রতিমা" বলিলেন "এমন মধুময় বীণাধ্বনি অনেক দিন আমরা শুনি নাই। বঙ্গের অনেক আধুনিক কবি এই রমণীর চরণে প্রণত হইয়া কবিতা কাহাকে বলে তাহা শিখিতে পারেন।" স্বর্গীয় কবি ঈশানচন্দ্র বলিলেন "বালিকা হৃদয়ে এত গভীরতা এত আবেগ, এত উচ্ছ্বাস, এত কবিত্ব আর পূর্ব্বে কখনও দেখি

নাই, বালিকা হৃদয়ে কেন বলি, অনেক পুরুষের হৃদয়েও এ সকল কষ্টে খুঁজিয়া পাইয়াছি * * * আমি "প্রমীলার' কবিতা গুলি যখনই পড়িয়াছি তখনই মনে হইয়াছে যেন স্বপ্নে কোন বালিকার হৃদয়-রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছি।" বর্ত্তমান কবিকুলতিলক ভক্তিভাজন শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রীত চকিত কণ্ঠে প্রমীলার নববিকশিত কবিত্বের স্তুতিগান করিলেন—"Promila's lute is a splendid one, and its strings fresh from nature's hands." "ভারতী" আশা করিলেন "রচয়িত্রীর পূর্ণ বিকশিত কবিত্ব শক্তি বঙ্গ-সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিবে।" Reis and Rayyet, Englishman, Mirror, Patriot, Daily News, "বামাবোধিনী পত্রিকা," "সহচর" সমস্বরে বালিকার প্রতিভার গুণকীর্ত্তন করিলেন।

অন্য কোন বঙ্গীয় লেখিকার কথা দূরে থাকুক, কোন লেখকের ভাগ্যে এত অল্প বয়সে এত খ্যাতি ঘটিয়াছিল কিনা আমরা অবগত নহি। শুনা যায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শৈশব হইতেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সে কবিত্ব অন্যরূপ এবং তাহার খ্যাতি ও পূর্ণ বিকাশ কবি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হইয়াছিল। কবিবর রবীন্দ্রনাথ এবং উদীয়মান কবি অক্ষয়কুমার বড়াল অল্প বয়সে কবিতা লিখিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু এত অল্প বয়সে এরূপ সর্ব্বজনসম্মত খ্যাতি বোধ হয় তাঁহাদেরও ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রথম উদ্যমে প্রকৃত গুণগ্রাহীদিগের নিকট হইতে এত সুখ্যাতি লাভে অল্প বয়স্কা বালিকা কেন, অনেক প্রবীণ পুরুষেরও মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়া যায় এবং কিছু না কিছু আত্মশ্লাঘা আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু এ বালিকা স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত। আত্মগরিমা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না,—তিনি যশো মুকুট বিনয়াবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

এবং তাঁহার হৃদয় এতই কোমল ছিল যে এরূপ স্তুতিবাদের মধ্যে দুই একটী তীব্র কটাক্ষপাত তাঁহার উপর পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি ম্রিয়মাণা হইয়া নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন —

তোরা　ছেড়েদে আমায়,　তোদের শুনাতে,
আসিনি এ ক্ষীণ তান,
ওগো　তোদের ও পথে,　তোমাদের সনে,
যাব না যশের ধাম !
আমি　দুরাশার লতা　রোপিণি এ বুকে
চাহিনি আকাশ পানে,
দেখ　সুখের উচ্ছ্বাস　বাসনা লহরী
উঠেনা এ ভাঙ্গা প্রাণে !
শুধু　প্রাণের বেদনা　অফুট বিলাপ
আঁধারে চলেছি গেয়ে,
তোরা　ব্যথিত পরাণ　ভাঙ্গিসনে আর
দুরবলে একা পেয়ে ।'

ভাঙ্গা প্রাণ—ব্যথিত হৃদয় ! সুখময় জীবনে প্রভাত অরুণ কিরণের কনক রেখা সবে দেখা দিতেছে এ সময়ে নৈরাশ্যের কাল মেঘ কোথা হইতে আসিল । মাতার অনন্ত স্নেহ, পিতার অশেষ আদর, আত্মীয় গণের আন্তরিক ভালবাসা যাঁহাকে সুখের আবরণে রাখিতে সতত যত্নবান, সাংসারিক ক্লেশ বা অভাবের লেশ মাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহার হৃদয়ে বিষাদের ছায়াপাত কি করিয়া হইল ? এত রূপ, এত গুণ, এত যশের অধিকারিণী হইয়াও বালিকার এ অতৃপ্তি কোথা হইতে আসিল ! কেন বালিকা বারে বারে জিজ্ঞাসা করে—

ধরাময় সুখের তুফান
আমি কেন আকুল পরাণ !

অধিকাংশ সদৃশস্থলে এরূপ প্রশ্নের উত্তর হইত, 'ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, নিরাশা বা দুঃখবাদ (Pessimism) অল্প বয়স্ক

লেখক লেখিকাদিগের ধর্ম্ম। উহা মৌখিক ও অমূলক, হৃদ্গতভাব নহে। বয়ঃপ্রসূত জ্ঞানের সহিত সাধারণতঃ এই অস্বাস্থ্যকর দুঃখবাদ তিরোহিত হয়।' কোন কোন সমালোচক প্রমীলার বিষাদ-*প্রবণতার উক্তরূপ কারণই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রমীলার* পক্ষে ওই উক্তি সম্যক্‌রূপে প্রযুজ্য নহে। প্রমীলার বিষাদের কারণ স্বতন্ত্র—তাঁহার শৈশবে স্বাস্থ্যভঙ্গ। সেই হুপিংকাশি আক্রমণের পর হইতে বালিকাকে সামান্য কারণেই অসুস্থ করিত। যদিও এরূপ অসুস্থতা অনেকেরই হইয়া থাকে কিন্তু বালিকার অশুভ কল্পনা ঐ অসুখকে দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে বিষাদিণী করিত। তাঁহার ভবিষ্যতের কঠিন পীড়ার সূত্রপাত এখনও হয় নাই। কিন্তু এই ভাবীপীড়ার আশঙ্কার জন্যই হউক, অথবা বালিকার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হইবার সম্ভাবনার জন্যই হউক, স্বর্গীয় মনোমোহন বাবু প্রমীলার বিবাহ প্রস্তাবের পক্ষ-পাতী ছিলেন না। যাহা হউক নবযৌবনের উষাকালে প্রমীলার শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। অসুস্থতার চিহ্ন মাত্রও রহিল না এবং ভাবী অশুভ আশঙ্কা সকলেরই মন হইতে তিরোহিত হইল। সুতরাং প্রমীলার জনক জননী আর অধিক বয়স অবধি তাঁহাকে অবিবাহিতা রাখার কোন কারণই দেখিলেন না। অচিরেই একটী মনোমত সৎপাত্র বিধাতা মিলাইয়া দিলেন। ঢাকার সুপরিচিত বারুদি ভূম্যধিকারী বংশীয় শ্রীমান্ গঙ্গাকান্ত নাগের সহিত প্রমীলার শুভ পরিণয় সমারোহের সহিত কলিকাতায় সমাধা হইল। পাত্রটী তখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মনোমোহন বাবু বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নবদম্পতীরে আশীস্ করিলেন। রূপে গুণে মনোমত পতি লাভ করিয়া প্রমীলার হৃদয়ের কি যেন একটা

অভাব দূর হইয়া গেল। স্বামীর নবঅনুরাগ বসন্ত-মলয়-মরুতের ন্যায় তাঁহার অস্ফুটন্ত হৃদয় কুসুমকে বিকশিত করিল। নৈরাশ্যের জলদ রাশি তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে অপসারিত হইল। বিষাদিনী হাস্যময়ী হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

চিত্ত বিকাশ।*

বহিত তড়িৎস্রোত বঙ্গের হিয়ায়,
যাঁহার উৎসাহময় স্বদেশ গাথায়;
আজি সেই কণ্ঠ হ'তে মর্ম্ম বেদনায়
উঠেছে বিষাদ-গীতি পূর্ণ নিরাশায়।
অজ্ঞাতে নিষাদ যদি পশিয়া কাননে,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গমে করে নিপীড়ন,
তা'হ'লে বিহঙ্গ-বর সকরুণ তানে,
প্লাবিয়া কানন করে দিগন্ত মগন।
তেমতি হে কবিবর, সাহিত্য-বিমানে,
ভাসিছে করুণ তব বিলাপ ঝঙ্কার;
হারা'য়ে নয়ন-জ্যোতিঃ দৈব নির্যাতনে,
জুড়া'তে আশ্রয় নিলে পুনঃ কবিতার।
কহিতে হৃদয় ফাটে এ "চিত্ত বিকাশ"—
তীব্র মর্ম্ম যাতনার জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস!

---

* কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "চিত্ত বিকাশ" পাঠে এই কবিতাটি লিখিত হইল। উক্ত পুস্তক কলিকাতা ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

কথার মাত্রা।

রামতারণবাবুর বৈঠকখানায় প্রত্যহ বৈকালে নানা রকম লোকের সমাগম হয়, এবং তাস বা পাশা ও তামাকের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়া থাকে। যে দিন খেলা বন্ধ থাকে সে দিন নানারূপ খোস্ গল্পে সময় অতিবাহিত হয়। সে দিন কার্য্যোপলক্ষে সেথায় গিয়াছিলাম। কথা প্রসঙ্গে নবীন বাবু বলিলেন "দেখুন, আমার মতে মাংসাদি ভক্ষণ অপেক্ষা, নিরামিষ ভোজনেই অধিক উপকার"। অতঃপর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল।

ভৈরব বাবু। তা' যা বলিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা করুন, আমি বিবেচনা করুন, আগে কেবল মাংসপ্রিয় ছিলাম। তাতে বিবেচনা করুন আমার শরীর বড়ই খারাপ হয়, বাহ্যে বিবেচনা করুন ভালরূপ হ'ত না, সেই দরূণ নানা পীড়ার উৎপত্তি হয়; তারপর বিবেচনা করুন, দাঁতের অসুখ—মাংস খাইলেই দাঁতে কুঁচি লাগিয়া কি কম যন্ত্রণা দিত? এই সব নানা কারণে বিবেচনা করুন, আমি এখন মাংস ছাড়িয়া বেশ আছি।

রসিক বাবু। (হাসিয়া)। আপনি দাঁত পড়িয়া যাওয়াতে মাংস ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন "বিবেচনা" হয়।

ভৈরব বাবু। আরে না হে না বিবেচনা কর, আমার ছেলেদেরত আর দাঁত পড়েনি, তাদের বিবেচনা কর আমি মাংস খেতে দিই না।

রসিক বাবু। তা হ'তে পারে, কিন্তু হোটেল অঞ্চলে তাহাদের মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই।

রামতারণ বাবু। রসিক তোমাদের বয়স অল্প সবে মাত্র চল্লিশ, তাই ওর নাম কি, এখনও মাংস ভক্ত, কিন্তু ওর নাম কি, নিরামিষ

ভোজীরা মাংসভোজী অপেক্ষা বলবান্। ওর নাম কি, দেখনা, হিন্দুস্থানীরা ডাল রুটি খায়, কেমন জোয়ান, আর ওর নাম কি মাংসভোজী বাঙ্গালিরা তাহাদের সঙ্গে পারে কি ?

রসিক বাবু। বাঙ্গালিরা ডালরুটি খায় না, আর প্রত্যহ মাংসও খায় না, একটু মাছের ঝোল আর কালে ভদ্রে একটু মাংস খাইলে কি আর গায়ে জোর হয় ? দেখুন ইংরেজ বা পাঠান্‌দের গায়ে কত জোর।

নবদ্বীপ বাবু। জোর বুঝেছেন মাংসাশী অপেক্ষা নিরামিষ ভোজী দিগের অধিক। হাতী, বুঝেছেন, মাংসাশী নহে অথচ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

রসিক বাবু। কখনই নহে আয়তন ধরিয়া বিবেচনা করিলে হাতী অপেক্ষা বাঘ অধিক বলশালী। একটা বাঘ তাহার নিজের শরীর অপেক্ষা বড় একটা গরু বা মহিষকে অনায়াসে বহিয়া লইয়া যায়। আপনি যখন বলিতেছেন হাতী সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ তখন আপনি "বুঝিতেছেন না" হাতী আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

নবদ্বীপ বাবু। তা' বটে, কিন্তু বুঝেছেন, মাংস বুঝেছেন আমাদের দেশের উপযোগী নয়।

নিতাই বাবু। হরিহে দীনবন্ধু, উপযোগী ত একেবারেই নয়, পরন্তু তারপর জীব হিংসা, সকলেইত কৃষ্ণের জীব তবে, পরন্তু, প্রাণীবধে লাভ কি ?

ভৈরব বাবু। ঠিকত এই বিবচনা করুন, অষ্টমীতে কালীঘাটে কত পাঁটা, বিবেচনা করুন, বলি হয়, রক্তের নদী বহিতে থাকে, সে দৃশ্য বিবেচনা করুন কি ভয়ানক।

রামতারণ বাবু। ওর নাম কি, আমি একবার অষ্টমীর দিন কালীঘাটে যাই। ওর নাম কি, কালী দর্শন করিতে গিয়া বলিদান

দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির। প্রাণী বধ করিয়া, ওর নাম কি, পূণ্য কিরূপে হয় আমি বুঝিতে পারি না।

নবদ্বীপ বাবু। পূণ্য বুঝেছেন, জীব হিংসাতে হয় বলিয়া আমারও বোধ হয় না। বলিদানের অর্থ বুঝেছেন প্রাণী বলি নহে, শরীরের মধ্যে বুঝেছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য বলিয়া যে ছয় রিপু আছে বুঝেছেন, ঐ রিপুগণকে বলিদানই বলির যথার্থ উদ্দেশ্য, বুঝেছেন?

রসিক বাবু। আজ্ঞে হাঁ বুঝেছি বৈ কি, আপনি ত আর ফার্‌সিতে কথা কহিতেছেন না যে বুঝিব না। তবে জোরের কথা ছাড়িয়া যদি পূণ্যের কথা ধরেন, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করি প্রাণিবধে পাপ। কিন্তু সে হিসাবে মাছ খাওয়াও অন্যায়।

নিতাই বাবু। হরি হে দীনবন্ধু, কি জানেন মৎস্যে অনেক উপকার, পরন্তু মৎস্য না খাইলে দৃষ্টিশক্তির হানি হয়। পরন্তু মৎস্য বোধ হয় খাইবার জন্যই হইয়াছে। যে হেতু উহাদ্বারা জগতের আর কি উপকার হইতে পারে? হরি হে দীনবন্ধু!

রসিক বাবু। তা' যদি বলেন তবে পাঁঠা বা মুরগি হইতেই বা জগতের কি উপকার সাধিত হয়। উহারাও তাহা হইলে আপনার মতে খাদ্য হইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করে। আর আপনার যুক্তি-বলে, শুধু পাঁঠা বা মুরগি কেন, অনেক মনুষ্যও মারা যান, কারণ সকল মনুষ্যের দ্বারাই জগতের উপকার সাধিত হয় না।

রামতারণ বাবু। জগতে কত জীব জন্তু বৃক্ষলতাদি রহিয়াছে ওর নাম কি কাহার দ্বারা কি উপকার হয় আমরা কি সব জানি? জ্ঞানের ওর নাম কি যত বিকাশ হয় ততই ক্রমে ক্রমে আমরা বুঝিতে পারি। ওর নাম কি সৃষ্টি রহস্য বুঝা কি সহজ ব্যাপার?

ভৈরব বাবু। তা নয় ত কি? এই বিবেচনা করুন, কত বুনো গাছ গাছড়া হইতে ঔষধ তৈয়ারি হইতেছে, এই বিবেচনা করুন ধুতুরা, ইহা হইতে কি কম উপকার, আমাদের মত হাঁপানি রোগীদের বিবেচনা করুন ইহা ছাড়া গতি নাই।

রামতারণ বাবু। ভাল কথা, ওর নাম কি হাঁপানি রোগে ধুতুরা ফল না ফুল সাজিয়া খাইতে হয়, আমাকে সেদিন ওর নাম কি একজন জিজ্ঞাসা করিতেছিল?

ভৈরব বাবু। ফলও নয় ফুলও নয়, পাতা। আমিও আগে জানিতাম না, বিবেচনা করুন মিছা মিছি ইংরাজি ডাক্তারখানা হইতে গ্রিমণ্টের Stramonium বা ধুতুরার চুরুট কিনিতাম। তারপর বিবেচনা করুন, যখন জানিলাম উহাতে ধুতুরার পাতা ও অতি অল্প পরিমাণে সোরা ব্যতীত আর কিছুই নাই তখন বিবেচনা করুন ঐ পাতা শুখাইয়া ঘুড়ির কাগজে পুরিয়া সিগারেট তৈয়ার করিতে লাগিলাম। ঐ সিগারেট বিবেচনা করুন যে দিকে টানিতে হইবে সে দিকে একটু তুলা দেওয়া আবশ্যক, না হ'লে বিবেচনা করুন, সমস্ত গুঁড়া মুখের ভিতর আসিবে।

রামতারণ বাবু। ওর নাম কি সোরা দেবার আবশ্যক কি?

ভৈরব বাবু। সোরা বিবেচনা করুন দিলেও হয়, না দিলেও হয়, সোরা থাকিলে জ্বলে ভাল, তা ছাড়া বিবেচনা করুন সোরার ধুম হাঁপানির পক্ষে উপকারী।

নিতাই বাবু। হরি হে দীন বন্ধু, দেখুন দেখি পরন্ত সামান্য জিনিষ হইতে কত উপকার!

রসিক বাবু। "বলি আজ রাত্রি অধিক হইল, আপনারা বাড়ী যাইবেন কি?" তখন সকলে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন "তাইত

হে অনেক রাত্রি হইয়াছে, চলুন যাওয়া যাক্'। সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। আমিও বাটীতে আসিয়া আহারাদির পর শয়ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আর ঘুম হইল না, কেবল "বুঝেছেন,—বিবেচনা করুন,—ওর নাম কি—পরন্তু,—"প্রভৃতি মনে উদয় হইতে লাগিল। কতক্ষণ ওরূপ ভাবে ছটফট্ করিয়াছিলাম মনে নাই ঘুমের ঘোরে নাকি গৃহিণীকে বলিয়াছিলাম "হরিহে দীনবন্ধু, পরন্তু ওর নাম কি, এক গ্লাস জল, বুঝেছেন, দিলে বিবেচনা করুন ভাল হয়।" গৃহিণীকে শত শত ধন্যবাদ তিনি জল খাইতে না দিয়া মস্তকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাই সে রাত্রে ঘুমাইয়া বাঁচিয়াছিলাম।

শ্রী"ওর নাম কি"?

শিশির কি পড়ে?

এক দিন সুখের বাসন্তী প্রভাতে মৃদু মন্দ মলয় পবন সেবনাশয় সাধের বকুল-কুঞ্জ-তলে গিয়া দাঁড়াইলাম, কোথা হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল বিন্দু পড়িয়া আমার সর্ব্ব শরীর ভিজাইয়া দিল। বৃক্ষের পত্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে টস্ টস্ করিয়া যে বারি বিন্দু পড়িতেছে উহা কি? হয়ত কোন উপমা পটু কবি বলিবেন যে পরদুঃখ কাতর বৃক্ষগণ কোন নায়ক নায়িকার দুঃখে অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু ইহাই কি সত্য? তবে ঐ তরল মুক্তার ন্যায় পদার্থ যাহা প্রস্ফুটিত গোলাপের উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিয়াছে, এবং যাহা তৃণের উপর পতিত হইয়া অরুণ কিরণ সম্পাতে হীরক খণ্ডের ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, উহা কি? প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবামাত্র

খাবার পাইয়া নাচিতে নাচিতে বালক উন্মুক্ত পদে মাঠের উপর দিয়া দৌড়িল, একটু পরেই দুরন্ত বালকের পা দুখানি কে জলসিক্ত করিয়া দিল। আবার যেমন সূর্য্যের তেজ বাড়িল, একে একে তৃণ হইতে এক একটী করিয়া রত্ন খণ্ড অদৃশ্য হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতের সে শোভা, তৃণের সে মুকুট, বৃক্ষের সে অশ্রু কোথায় অদৃশ্য হইল। এ অদ্ভুত পদার্থ কি? ছিল কোথায়? আসিলই বা কোথা হইতে এবং গেলই বা কোথায়?

ইহার নাম শিশির। শিশির অতি আদরের ধন শিশির স্বর্গীয় বস্তু। মোজেস্ যোশেফ্‌কে আশীর্ব্বাদচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বরের প্রিয় ব্যক্তি স্বর্গের অমূল্য পদার্থ শিশির তোমার রাজ্যে সর্ব্বদা নিপতিত হউক।" বুঝিতে পারিলাম শিশির অতি অমূল্য পদার্থ। কিন্তু সত্য কি শিশির স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে? আমাদের জ্ঞান হওয়া অবধি শুনিতেছি "শিশির পড়ে।" জ্ঞানী মূর্খ সকলেই বলিয়া থাকেন "হিম পড়িতেছে।" কিন্তু যথার্থ কি হিম পড়ে ও উপর হইতে শিশির পতিত হয়? অমূলক কথা। শিশির উপর হইতে পড়ে না, পৃথিবীতে ইহাকে যে অবস্থায় দেখিতে পাই, ইহার উপরে ইহা কখনই সে অবস্থায় থাকে না। শিশির পৃথিবীতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পৃথিবী, দিবাভাগে সূর্য্য হইতে যে তাপ গ্রহণ করে রাত্রিকালে তাহার অধিকাংশ ছাড়িয়া দেয় সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। কোন বস্তু রাত্রিকালে বাহিরের বায়ুতে রাখিয়া দিলে তাহার তাপ বিকীর্ণ হইয়া যায় সুতরাং সেই বস্তু শীতল হয়। এই শীতল বস্তুর সহিত বায়ু রাশিস্থ জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শ হইলে বায়ু রাশিস্থ জলীয় বাষ্পে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা রূপে এই

শীতল বস্তুর উপর বিন্যস্ত হয় তাহাই শিশির। বায়ু রাশিস্থ জলীয় বাষ্পের সহিত এই শীতল বস্তুর সংস্পর্শ হইলেই যে জলীয় বাষ্প সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হইয়া যায়, তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? যদি আমরা একটী কাচের গেলাসে এক খণ্ড বরফ ফেলিয়া দিই, একটু পরেই দেখিতে পাইব, গেলাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা দেখা যাইতেছে। এ সকল জলকণা আসিল কোথা হইতে? গেলাসের গাত্র ভেদ করিয়া কিছু আসে নাই। গেলাস, জল ও বরফ সংস্পর্শে, এত দূর ঠাণ্ডা হইয়াছে যে পার্শ্বস্থ বায়ু উহার গায়ে লাগিবা মাত্র বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প জমিয়া জল বিন্দুর আকার ধারণ করিতেছে। সেইরূপ, রাত্রে যখন পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে অনবরত উত্তাপ উদ্গত হইয়া শূন্যে ছড়াইয়া পড়ে, পৃথ্বীতল শীতল হইয়া আসে তখন তাহার পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিস্থিত জলীয়বাষ্প তৎসংলগ্ন হইবামাত্র শৈত্যাধিক্য বশতঃ জমিয়া জল বিন্দুর আকার ধারণ করে। ইহা শিশির।* এই জন্যই বলিতে ছিলাম শিশির উপর হইতে পড়ে না।

শিশির যদি বৃষ্টির ন্যায় উপর হইতে পড়িত, তাহা হইলে বৃষ্টির ন্যায় ঘন ঘটাচ্ছন্ন রাত্রেই ইহার অধিক পরিমাণে পড়িবার সম্ভাবনা

*বায়ুর নিম্নলিখিত ধর্ম্ম বশতঃ শিশিরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ুতে নূনাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প সকল অবস্থাতেই থাকে; যদি বায়ুর চাপ (atmospheric pressure) সমান থাকে, বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করিবার ক্ষমতা তাপ বৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হয় ও তাপ হ্রাসের সহিত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এমন শীতল দ্রব্য সংস্পর্শে যদি বায়ুর তাপ এত কম হইয়া যায় যে ঐ বায়ুতে যে পরিমাণে জলীয় বাষ্প আছে তাহার সমস্ত টুকু ঐ বায়ু তাপ হ্রাস হেতু বাষ্পাকারে ধরিয়া রাখিতে পারে না, তাহা হইলে জলীয় বাষ্পের বেশী অংশ জল বিন্দু রূপে শীতল দ্রব্যোপরি পতিত হয়; যে তাপে (temperature) জলীয় বাষ্প এইরূপে, জল বিন্দু রূপে পরিণত হইতে থাকে তাহাকে 'নীহারাঙ্ক' (dewpoint) বলে। প্রঃ সং।

থাকিত, কিন্তু তাহা না হইয়া নক্ষত্রশোভিত পরিষ্কার রজনীতে শিশির অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির যে প্রধান সহায় মেঘ, সেই মেঘই শিশিরের পরম বিঘ্ন। বহু উর্দ্ধে মেঘ থাকিলেও শিশির হইতে পারে বটে কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগের অতি নিকটে থাকিলে শিশির জন্মে না। পৃথিবী হইতে যে তাপ উপরে উঠিতে যায়, উপর হইতে মেঘ আবার তাহাকে বাধা দিয়া ফিরাইয়া দেয়। সুতরাং তাপ উঠিতে না পারায় পৃথ্বীতল ততদূর শীতল হইতে পারে না। পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল না হইলে শিশির জন্মিবে কোথা হইতে? সেই জন্যই আবার বলিতেছি শিশির উপর হইতে পড়ে না।

শিশির উপর হইতে পড়ে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য পরিষ্কার রজনীতে বায়ুর উপর স্তরে স্তরে কতকগুলি রুমাল টাঙ্গাইয়া দিলে রজনীর শেষ ভাগে দেখা যাইতে পারে যে ঐ সকল রুমালের মধ্যে যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা নীচে অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক উপরি ভাগে বিলম্বিত তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভিজিয়া উঠিয়াছে। যদি শিশির উপর হইতে পড়িত তাহা হইলে উপরকার রুমালগুলিই অধিক পরিমাণে আর্দ্র হইত। অতএব বুঝিতে হইবে শিশির উপর হইতে পড়ে না, ইহা পৃথিবীতেই জন্মিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীকান্ত পাঠক।

কালিদাস প্রসঙ্গ।

কালিদাসের বিবাহের বিবরণ অতি চমৎকার ব্যাপার। বিদ্যোত্তমা নাম্নী কোনও রাজকন্যা নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে "যে আমাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে তাঁহাকে আমি পতিত্বে বরণ করিব।"

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক পণ্ডিত আসিলেন কিন্তু কেহই রাজ কন্যাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে কয়েকজন চতুর পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে "দেখ বিদ্যোত্তমা যেমন আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিল না আমরাও তেমনি উহার ভাগ্যে কৌশলে মূর্খ স্বামী ঘটাইয়া দিব। মূর্খের সহিত বিবাহ হইলেই উহার বিদ্যাভিমান খর্ব্ব হইয়া যাইবে"। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া উহারা একজন মূর্খের অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া উহারা দেখিল যে এক নিভৃত স্থানে একজন লোক বসিয়া আছে। উহারা ঐ ব্যক্তিকে বলিল "যদি তুমি আমাদের সঙ্গে আইস তাহা হইলে তোমাকে আমরা রাজ জামাতা করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি (কালিদাস) সহর্ষে উহাদের সঙ্গে চলিল। পথিমধ্যে উহারা কালিদাসকে এইরূপ বলিতে লাগিল "দেখ তুমি কোনও কথা কহিও না, কেবল অঙ্গুলি সঙ্কেত করিও। অর্থাৎ রাজ কন্যা যেমন অঙ্গুলি দেখাইবেন, তুমিও ঐরূপ করিবে। এই কথা ভুলিও না। এইরূপ করিতে পারিলেই রাজকন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবেন।" কালিদাস উহাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অবিলম্বে সকলে রাজ সভায় উপনীত হইলেন। রাজ সভায় সকলে উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কালিদাসকে পণ্ডিতেরা উত্তম আসনে বসাইলেন, এবং নিজেরা উহার পশ্চাতে বসিলেন। উহারা আরও এই বলিয়া কালিদাসের পরিচয় দিলেন যে ইনি অতি বিখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহারসমকক্ষ কেহই নাই। রাজকন্যার ইঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই ধৃষ্টতার কর্ম্ম; তবে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াই বিচার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইনি কথায় আর কি বিচার করিবেন, সঙ্কেতে দুই চারিটী

প্রশ্নোত্তরাদি করিবেন মাত্র। সকলে এই কথায় সম্মত হওয়াতে বিদ্যোত্তমাও সঙ্কেতে বিচার করিতে সম্মত হইল। অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল। কালিদাস প্রথমে একটী অঙ্গুলি উত্থাপন করিলেন। পণ্ডিতেরা ইহার ব্যাখ্যা করিলেন যে এই বিশ্বের আদিতে কেবল এক মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন আর কিছুই ছিল না। বিদ্যাত্তমা ইহার উত্তরে তিন অঙ্গুলি উঠাইলেন। ইহার অর্থ হইল এই যে যদিও সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন বটে কিন্তু তিনি পরে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক ব্রহ্ম হইলেও তিনি সত্বাদি ত্রিগুণাত্মক। কালিদাস পরে ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে তুমি যাহা বলিতেছ ঠিক তাহা নহে। *পণ্ডিতেরা এইস্থানে কালিদাসকে সাধুবাদ দিলেন এবং এইরূপ* ব্যাখ্যা করিলেন। ব্রহ্ম পণ্ডিতেরা পুরুষার্থ সাধিনী প্রকৃতি ও প্রকৃতি কার্য্যদর্শী উদাসীন পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, পুরুষ নিত্য, সুতরাং সত্বাদিগুণ শূন্য। অর্থাৎ বিদ্যোত্তমা সাঙ্খ্যমতে বিচার করিতে উদ্যত হইলে পণ্ডিতেরা বেদান্ত মতে তর্ক উপস্থিত করেন এবং বিদ্যোত্তমা বেদান্ত মতে তর্ক আরম্ভ করিলে তাঁহারা সাঙ্খ্য মতে তর্ক উপস্থিত করিতে লাগিলেন। আর মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কালিদাসকে সাধুবাদ দেওয়াতে বিদ্যোত্তমা কিছু অপ্রতিভ হইলেন এবং অবনত বদনে রহিলেন। পণ্ডিতেরা বলিলেন যে কালিদাস জয়ী হইয়াছেন। আরও বিদ্যোত্তমা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাতে উহারা স্থির করিল যে বিদ্যোত্তমা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে রাজকন্যা বিচারে পরাজিতা হইয়াছেন। সুতরাং রাজা আজ্ঞা দিলেন যে অবিলম্বে বিবহাদির আয়োজনাদি করা হউক। সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন

হইল। বিবাহ হইয়া গেল। বিদ্যোত্তমা কেন যে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন উহাও অচিরে প্রকাশ পাইল :—

"ভদ্রং ভদ্রং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারঃ তত্র মৌনং সুশোভনং॥"

তিনি মনে করিয়াছিলেন যে এ সভায় কথা কহা ও বিচার করায় কোনও ফললাভ হইবে না। বরং যতই কহিব ততই ইঁহারা আমাকে আরও অপ্রতিভ করিতে চেষ্টা করিবেন। সুতরাং মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। তিনি মূর্খ কালিদাসকে বাধ্য হইয়া পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু রাত্রে যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে তিনি স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে মূর্খের সহিত তিনি তিলার্দ্ধ যাপন করিতে পারিবেন না। আরও ইহা প্রকাশ পাইল যে তিনি মূর্খকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। রাত্রে শয়নাগারে উভয়ে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে হঠাৎ উষ্ট্ররব শুনা গেল। শ্রবণমাত্রেই উভয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিদ্যোত্তমা কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের রব শুনা যাইতেছে"। কালিদাস বলিলেন "উষ্ট ডাকিতেছে।" বিদ্যোত্তমা অশুদ্ধ উষ্ট্র শব্দ শুনিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে—আবার বল কি ডাকিতেছে। "কালিদাস একটু চকিত সাবধানে বলিলেন "উট্র ডাকিতেছে।"

বিদ্যোত্তমা শুনিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন :—

"কিং ন করোতি বিধিঃ যদি তুষ্টঃ, কিংন করোতি স এব হি রুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা, তস্মৈ দত্তা বিপুল নিতম্বা॥"

কালিদাস ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং আপনাকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করিলেন। পরে বিদ্যোত্তমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া

বলিলেন "যদি কথনও বিদ্যালাভ করিয়া তোমায় বিচারে পরাস্ত করিতে পারি তবে পুনরায় গৃহে আসিয়া বাস করিব, নতুবা এই আজ জন্মের মত বিদায় লইলাম।" এই বলিয়া কালিদাস বিবাহের রাত্রেই গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে রাজার অনুচরবর্গেরা কালিদাসের কত অনুসন্ধান করিল কিন্তু তিনি যে কোথায় গিয়াছেন কেহই সে সন্ধান পাইল না। এদিকে কালিদাস নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া একমনে সরস্বতীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এরূপ কথিত আছে যে দেবী সরস্বতী বন মধ্যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মূর্ত্তিতে কালিদাসকে দেখা দিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ সরস্বতীর প্রসাদে কালিদাসের মুখ হইতে অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক বাহির হইয়াছিল। তিনি শ্লোক দ্বারা সরস্বতীকে বন্দনা করিয়াছিলেন। সরস্বতী সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। সরস্বতীর বরেই কালিদাস মহাকবি এবং তজ্জন্য লোকে কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া থাকে। কি ঘটনা উপলক্ষে যে কালিদাসের মুখ হইতে অনর্গল দেবী সরস্বতীর স্তুতি বাহির হইয়াছিল এবং কোন স্তুতিটা যে প্রথম স্তুতি তাহা সঠিক্ জানা যায় নাই। কিন্তু এরূপ কথিত আছে যে দেবী সরস্বতী যেমন স্তবে তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন, সেইরূপ তিনি আবার কালিদাসের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঁহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন। দেবী সরস্বতীর অসন্তোষের কারণ এই যে, কালিদাস বন্দনাকালে সরস্বতীর বদন হইতে চরণ পর্য্যন্ত বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অগ্রে দেবীর চরণ বন্দনা করা কালিদাসের কর্ত্তব্য ছিল এবং কথিত আছে এই অপরাধে কালিদাসকে শেষাবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কালিদাসের বিষয়ে একটী অরণ্যকাণ্ড অথবা একটী বনপর্ব্ব নাই।

তিনি বনমধ্যে কিরূপে কাটাইলেন তাহা কিছুই জানা যায় নাই ; তবে তিনি যে রাত্রিকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন সে বিষয় নিশ্চিত।

একদা এক রজনীতে কালিদাস আসিয়া পত্নীর গৃহদ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। পত্নী গৃহাভ্যন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে—এত রাত্রে দ্বারে আঘাত করিতেছ—দ্বার খুলিব কেন?" কালিদাস তদুত্তরে বলিলেন "অস্তি কশ্চিৎ বাক্ বিশেষঃ"। কালিদাস বক্তব্য সমুদায় ক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

'অস্তি' পদটী তৎপ্রণীত কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকের আদিতে আছে ; যথা :—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥"

তিনি কুমারসম্ভব কাব্য আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন।

'কশ্চিৎ' পদটী তৎপ্রণীত মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের আদিতে আছে ; যথা :—

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তঙ্গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া স্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রাম গির্য্যাশ্রমেষু।"

তিনি মেঘদূতের কথা বলিলেন।

'বাক্' শব্দটী তাঁহার রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকের আদিতে আছে ; যথা

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥"

তিনি রঘুবংশ মহাকাব্য প্রণয়ন করিলেন।

অনন্তর তিন খানি কাব্যের সুললিত কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্যোত্তমা বুঝিলেন যে কালিদাস অদ্বিতীয় কবি হইয়াছেন। সুতরাং তিনি আর বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া কালিদাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য উঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য যে কালিদাস উঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। অতঃপর উভয়ে সুখে কালাতিপাত করেন।

কালিদাস নানা কাব্যাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ গুণগ্রাহী নৃপতি বিক্রমাদিত্যের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়েই উভয়েরই গুণ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তৎপ্রণীত "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" নামক গ্রন্থে তিনি বিক্রমাদিত্যের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আর বিক্রমাদিত্যের যত্নেই কালিদাসের নাম আজিও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন। তৎসাহায্যেই কালিদাসের প্রতিভা ক্রমিক উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছিল। যদি কালিদাসকে উদরান্নের জন্য চিন্তিত হইতে হইত অথবা অর্থাগমের জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইত তাহা হইলে তিনি মেঘদূত বা শকুন্তলার ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কালিদাস কুমারসম্ভবে লিখিয়াছেন।

"অনন্ত রত্ন প্রভবস্য যস্য
হিমংন সৌভাগ্য বিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

"হিমালয় পর্ব্বত রত্নরাজির আকর। কেবল এক দোষ আছে—

হিম। তথাপি এই এক দোষ থাকিলেও হিমালয়ের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই। কেননা চন্দ্রের কিরণ মধ্যে উহার কলঙ্ক যেরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ অনন্তগুণ রাশির মধ্যে একটা দোষ লোপ পাইয়া থাকে।"

কালিদাস ইহা লিখিয়াছেন দেখিয়া কোন দরিদ্র কবি তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"একোহি দোষো গুণসন্নিপা'ত
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্রদোষো গুণরাশী নাশী।"

"একটা দোষ গুণরাশি মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়" এই কথা যে কবি বলিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন না যে এক দারিদ্র্যদোষ গুণ রাশিকে বিনষ্ট করে।" উপরোক্ত শ্লোক পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যে কবি উহা লিখিয়াছিলেন তিনি দারিদ্র্য দুঃখের জন্য মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্ব উদরান্নের চিন্তার জন্য বিকশিত হইবার অবসর পায় নাই। বিক্রমাদিত্য যে কালিদাসকে রাজভোগে রাখিয়াছিলেন তজ্জন্যই আমরা কালিদাসের অতুলনীয় কীর্ত্তি স্বরূপ তাঁহার গ্রন্থসমূহ দেখিতে পাইতেছি। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, কেন না তাঁহার যত্নেই কালিদাসের প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

কবির বিপদ।

আমার কবি হইবার বড় সাধ। তাই আমি আমার একজন কবি-বন্ধুর নিকট কবিতা লিখিবার প্রণালীটা শিখিবার জন্য গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"সাধ করিয়া এ বিপদ সঙ্কুলে কেন?'

আমি। এ পথে আবার বিপদ কি?

কবি। জাননা কবিদের জীবন চিরদুঃখময়?

আ। দুঃখময় জীবন বলিয়াইত আসিয়াছি। সেই জন্য আমার ভয় নাই।

ক। কিন্তু আরও ভয়ের কারণ আছে।

আ। কি?

ক। আজিকার দিনে তোমায় হয়ত বুঝাইতে হইবে না যে কবি হইলে মানহানির মোকদ্দমার বিপদটা পদে পদে ঘটিতে পারে।

আ। বোধ করি সাবধানের বিনাশ নাই।

ক। হাঁ তাত বটেই—বিনাশ ত নাই—তবে ঘটনা চক্রে পড়িয়া হয়ত আবার কারাবাসটাও লাভ হয়।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"সে লাভটাও ত মন্দ নহে—নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে খাওয়া যা'বে।"

ক। আচ্ছা যেন বাহিরের বিপদে তোমার বুক বাঁধা; ঘরের বিপদ সহিতে পারিবে কি?

আ। ঘরের বিপদ আবার কিরূপ?

কবি বলিলেন তবে শোন ঃ—

এক দিন আমি নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় শয়ন করিয়া বই পড়িতেছি এমন সময় আমার গৃহিণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমাদের কেমন ভাবে দেখিয়া থাক?"

আমি হঠাৎ এ প্রশ্ন করিবার কারণ না দেখিয়া রহস্য করিয়া বলিলাম—"কেন—সোণার চক্ষে।"

গৃ। তামাসা রাখ; সত্য সত্য বল দেখি?

আ। সত্যইত, দেখিতেছনা এই সোণার চসমা চোকে দিয়া তোমায় দেখ্‌ছি?

গৃ। আমি এখন তোমার সহিত ঠাট্টা করিতে আসি নাই। নারী জাতিকে তুমি কি চক্ষে দেখ তাহাই আমাকে বল; আর না বলিতে চাও তাহাও স্পষ্ট করিয়া বল।

আ। নারী জাতিকে? তাই বল—

গৃ। তাইত বলিতেছি—

আ। নারী জাতিকে আমি প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি।

গৃ। মিথ্যা কথা।

আ। কেন? আমি কি তোমায় কিছু বলিয়াছি?

গৃ। আমাকে কিছুই বল নাই বটে কিন্তু তোমার লেখা দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি আমাদের জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাক।

আ। মিথ্যা কথা; আমার হাত দিয়া অমন লেখা আসে না।

গৃ। হাত দিয়ে আস্‌বে কেন? প্রাণের ভিতর দিয়ে এসেছে—এটা কা'র লেখা বল দেখি?

এই বলিয়া গৃহিণী একটী কবিতা লেখা কাগজ আমাকে দেখাইল। দেখিলাম আমারই লেখা—কোথা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আজ এই বিভ্রাট বাধাইতে বসিয়াছে। আমি অগত্যা বলিলাম—হাঁ আমার হাতের লেখা বটে—কিসের কবিতা পড় দেখি?

গৃ। নারী স্তোত্র।

আ। তবে? যে তোমাদের জাতির স্তোত্র লিখে, সে তোমাদের জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে কেমন করিয়া?

গৃ। স্তোত্র নামে—শোন দেখি কি লিখেছ?

আ। আচ্ছা পড়।

গৃহিণী তখন পড়িতে লাগিল।

১

তিনিই পরম সুখী আপন জীবনে,
ঘটেনি অদৃষ্টে যাঁর কভু পরিণয় ;
সংসারে চলেন যিনি জায়ার বচনে
নিদারুণ কষ্ট পান তিনি সুনিশ্চয়।

২

মানব প্রকৃত শান্তি পায় না কখন,
পরিণয় করি যবে লভে সে সঙ্গিনী ;
যদবধি নাহি হেরে প্রিয়ার আনন,
তদবধি সুখে যাপে জীবন আপনি।

৩

অবলার হৃদি মাঝে সদা করে বাস—
কপটতা, প্রবঞ্চনা, বৃথা অভিমান ;
অমায়িক সরলতা, সত্য ও বিশ্বাস,
বনিতা হৃদয়ে কভু নাহি পায় স্থান।

৪

বর্ণিতে শকতি ধরে কাহার রসনা,
নারীর আছে যে দোষ আপন চরিতে ?
ললনা-হৃদয়ে কি যে আছে গুণপনা,
আমাদের জ্ঞানে তাহা পারি না বুঝিতে।

৫

নিশ্চয় ধাঁধায় পূর্ণ তাঁদের নয়ান,
যাঁরা ভাবে প্রমদায় আদরের ধন ;

করে না প্রদান যাঁ'রা নারীর সম্মান
তাঁহারাই দূরদর্শী কবি বিচক্ষণ।

এই কি তোমার প্রীতির চোকে দেখার পরিচয়? তুমি আমাদের প্রবঞ্চক বলিয়াছ, কিন্তু তুমিই এতক্ষণ কেবল মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিলে—ইহা কি তোমার শঠতা নহে? আর যদি আমরা এতই মন্দ তবে বিবাহ করিলে কেন?

আ। তুমি ও কত দিনের একটা পচা লেখা কোত্থেকে বাহির করিয়া মিছামিছি গোলযোগ করিতেছ? ও হয়ত কার লেখা—নয়ত বিবাহ হইবার আগে ছেলে বেলায় লিখেছিলাম—তখন কি ছাই সব বিষয় ভাল ক'রে বুঝতে পারিতাম?

গৃ। তবে তুমি শুধু প্রবঞ্চক নও—আবার অবিশ্বাসী; কারণ তুমি মিথ্যাবাদী।

আ। কেন?

গৃ। দেখ দেখি তারিখটা কি লিখেছ?

সর্ব্বনাশ! দেখিলাম তিন মাসও গত হয় নাই সেই কবিতাটী লিখিয়াছি!!

আমি তখন নিরুত্তর হইয়া রহিলাম। জেরার জ্বালায় অস্থির হইয়া আর সঙ্গে সঙ্গে দলিলের নজির দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। গৃহিণীও নিরুত্তর দেখিয়া বলিল—"আর কথা কওনা যে? তোমা হইতে আজ বেশ বোঝা গেল যে পুরুষ জাতিই কপট, শঠ, মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী।

মনে মনে ভাবিলাম উপযুক্ত কশাঘাতই পৃষ্ঠে পড়িতেছে। শেষ আর গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া বলিলাম—"আচ্ছা কবিতাটী দাও দেখি কেমন আমি ঐরূপ লিখিয়াছি?"

গৃ। এই নাও দেখ। তুমি কি মনে কর আমি এক পড়িতে আর পড়িয়াছি ?

আমি তখন কবিতাটী হাতে লইয়া আদ্যোপান্ত দেখিয়া বলিলাম–"তা" নয়, তবে তুমি যেমন আজ আমার সঙ্গে মিছামিছি ঝগড়া কর্‌বার জন্য এলো মেলো ভাবে এসে দাঁড়াইয়াছ—কবিতাটীও তেমনি এলোমেলো হ'য়ে গিয়েছে। তুমি যদি একবার স্থির হইয়া শোন, তাহা হইলে এই কবিতাটীতে তোমাদেরই স্তুতি দেখিতে পাইবে।

গৃ। আচ্ছা—দেখি তোমার কথায় কাযে ঠিক্ হয় কি না ?

আমি তখন পড়িতে লাগিলাম—

নারীস্তোত্র।

১

তিনিই পরম সুখী আপন জীবনে,
সংসারে চলেন যিনি জায়ার বচনে ;
ঘটেনি অদৃষ্টে যাঁর কভু পরিণয়,
নিদারুণ কষ্ট পান তিনি সুনিশ্চয়।

২

মানব প্রকৃত শান্তি পায় না কখন,
যদবধি নাহি হেরে প্রিয়ার আনন ;
পরিণয় করি যবে লভে সে সঙ্গিনী,
তদবধি সুখে যাপে জীবন আপনি।

৩

অবলার হৃদি মাঝে সদা করে বাস—
অমায়িক সরলতা, সত্য ও বিশ্বাস ;
কপটতা, প্রবঞ্চনা, বৃথা অভিমান,
বনিতা-হৃদয়ে কভু নাহি পায় স্থান।

৪

বর্ণিতে শকতি ধরে কাহার রসনা
ললনা-হৃদয়ে কি যে আছে গুণপনা?
নারীর আছে যে দোষ আপন চরিতে,
আমাদের জ্ঞানে তাহা পারি না বুঝিতে।

৫

নিশ্চয় ধাঁধায় পূর্ণ তাঁ'দের নয়ান,
করে না প্রদান যাঁ'রা নারীর সম্মান;
যাঁ'রা ভাবে প্রমদায় আদরের ধন,
তাঁহারাই দূরদর্শী কবি বিচক্ষণ।

গৃ। 'তাইত! ইহার কি তবে প্রত্যেক শ্লোকই পয়ার ছন্দে পড়িতে হইবে?

আমি তখন সাহস ভরে বলিলাম—"আরে এও জান না—যত কাছে কাছে মিল হয় ততই ভাল—দূরে দূরে মিল ভাল হয় কি?"

গৃহিণী তখন হাসিতে হাসিতে প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়ে বাহুলতা বিস্তার করিয়া আমার গলদেশ জড়াইয়া বলিল—"কেমন এবার খুব কাছে এসে মিল হইয়াছেত?"

আমি তখন প্রীতিভরে সেই ফুল্লরক্তিমাধর চুম্বন করিয়া বলিলাম—"হাঁ! এই মিলনই প্রকৃত মিলন।"

অতঃপর কবি আমাকে বলিলেন—এইরূপে ত ভাই সে দিনকার বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম—এখন কবি হইতে তোমার আর প্রয়াস হয় কি?

আমি বলিলাম "হাঁ ইহা প্রয়াসের উপযুক্ত বটে—চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

সুখের সঞ্চার ও দুঃখের হ্রাস। মনুষ্য যে কার্য্যই করুক না কেন অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার মূল লক্ষ্য সুখ। এই সুখ লাভ করিবার জন্য মনুষ্য জগতে কি না করিতেছে? তত্রাচ তাহার সুখ কোথায়? জগতের সুখ কেবল নামে। তাহার আগা গোড়াই দুঃখ। বাস্তবিক যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, তাহা লাভ করিবার চেষ্টা মনুষ্য আদৌ করে না। সামান্য পুতুল পাইয়া মানুষ ভুলিয়া থাকে ও পরম পদার্থ লাভের চেষ্টা বিস্মৃত হয়। এই মায়া কাটাইয়া তোলা ভার। যে যে উপায়ে মনুষ্য আপনার মনের একাগ্রতা ক্রমশঃ সম্পাদন করিয়া আনিতে পারে, যাহা মানবের প্রবৃত্তির ও মনের উৎকর্ষ ও পবিত্রতা বিধায়ক, যাহা সেই জন্য আত্ম-জ্ঞান লাভের পক্ষে অনুকূল, যে উপদেশ মনুষ্যকে স্বতঃই ক্রীড়নক হইতে ভোলাইয়া পরম পদার্থ লাভের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে তাহাই প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মপদবাচ্য। এবং তাহাই সাধারণতঃ ধর্ম্ম বা Religion বলিয়া অভিহিত।

এই আত্মজ্ঞানলাভ যে ধর্ম্মে শিক্ষা না দেয় তাহাকে আমরা ধর্ম্মই বলি না, যাহার চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ নহে অন্য কোন শব্দ তাহার পরিচায়ক হওয়া উচিত। হিন্দুরা ধর্ম্ম বলিতে অন্য কিছু বোঝেনা। যাহা অন্য কিছু বোধক তাহাকে সেই ভাব ব্যঞ্জক কোন শব্দে অভিহিত করা উচিত। মনুষ্যই কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। কারণ মনুষ্যই আপনার মনকে নানারূপী অবস্থায় আনিতে পারে। সচরাচর মনের তিনরূপ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানশক্তি (knowing), অনুভবশক্তি (feeling), ইচ্ছাশক্তি (willing), ধর্ম্ম জ্ঞান পথে বা ভক্তি পথে সম্পন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে অসম্ভব। এই জন্য হিন্দুদিগের ধর্ম্মলাভের দুইপথ, জ্ঞান পথ ও ভক্তি

পথ। যে জ্ঞানপথ অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে তাহাকে হিন্দুরা জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত করে। যে আবার ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে সে ভক্ত বলিয়া অভিহিত। যে প্রারম্ভে জ্ঞানপথ অবলম্বন করে সে কিন্তু শেষে একজন প্রকৃত ভক্ত হইয়া উঠে। আবার যে প্রারম্ভে ভক্তিপথ অবলম্বন করে সে পরিণামে একজন জ্ঞানী হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমে উভয়ে যে টুকু প্রভেদ ছিল পরিণামে আর সে টুকু প্রভেদ থাকে না। তখন দুই জনেই সমভাবাপন্ন হয়। তখন দুজনেই সমান অবস্থায় উপনীত হয়। তখন পার্থক্য বলিয়া কোন পদার্থই থাকে না। তখন একমেবা দ্বিতীয়ং ভিন্ন অন্য কিছুরই উপলব্ধি হয় না।

জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগী যোগের যে যে অবস্থায় (stages) যে যে জ্ঞান লাভ করে তাহা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টীয়, কি বৌদ্ধ সকল যোগীর সেই সেই অবস্থায় সেই সেই জ্ঞান একরূপ। কারণ তাহা কেবল মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। তাহা জাতিভেদেও সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন নহে। যোগের প্রথম সোপানের জ্ঞান দ্বিতীয় সোপানের জ্ঞান হইতে কেবল মাত্র পরিমাণে ভিন্ন তাহা ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন নহে। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রভৃতি সোপানের জ্ঞান, অবস্থা বা সোপান ভেদে ভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় বা অন্য কারণে ভিন্ন নহে। অবস্থা বা সোপান বিশেষের যে জ্ঞান তাহা নিত্য ও সত্য এবং তাহা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন নহে। এই জ্ঞান যে ধর্ম্মের ভিত্তি নহে তাহা অনিত্য ও অসত্য। যে ধর্ম্ম এই জ্ঞানমূলক কথার অসত্যতা প্রতিপাদিত করে; যে ধর্ম্ম এই জ্ঞানের প্রতিকূল সত্য প্রকাশ করে সে সত্য অসত্য এবং সে ধর্ম্ম ধর্ম্মপদ-বাচ্য নহে। যে ধর্ম্ম এই জ্ঞানের প্রতিকূল জ্ঞানের

প্রচার করে সে ধর্ম্ম অসত্য। সত্য এক এবং তাহা এই একই উপায়ে গম্য। সেই জন্য যে ধর্ম্ম এই যোগলব্ধ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র সত্যের আভাস দেয় সে ধর্ম্ম মিথ্যাধর্ম্ম এবং সে সত্যনামধারী অসত্য প্রকৃত অসত্য। এই যোগলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং এই জ্ঞান যে ধর্ম্মে বর্ত্তমান সেই ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম এই জ্ঞানলাভের পন্থা বা উপায শিক্ষা দেয় না, কেবল জ্ঞান মাত্র প্রচার করিয়া ক্ষান্ত থাকে তাহা প্রকৃত পক্ষে শাখা ধর্ম্ম, তাহা মূলধর্ম্ম নহে। সত্য ধর্ম্ম এজন্য জগতে এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। যদি হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মই প্রত্যেকে যোগলব্ধ জ্ঞানের অনুরূপ সত্য প্রচার করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্ম্মই অসত্য ইহার অপরটী যাহা যোগলব্ধ জ্ঞানের প্রচারক তাহাই সত্য। এই সমস্ত প্র[illegible] একটী সত্য ইহাদের অপরটী (যদি একের সঙ্গে[illegible] সত্যের মিল না থাকে) অসত্য। যদি মিল থা[illegible] ধর্ম্মে ঐ সত্য-লাভের উপায় আছে সেইটী মূ[illegible] শাখা ধর্ম্ম। পরস্পর প্রতিকূল মত-প্রচারক [illegible] সত্য অপরটী অসত্য। সত্য ধর্ম্ম এক ভিন্ন দুই হই[illegible] ধর্ম্মই সত্য একথার যাথার্থ্য কেবল একটী অপরটী[illegible] করিয়া প্রতিপাদিত করা যাইতে পারে। অন[illegible] যে একজন খৃষ্টান অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মকে[illegible] কলঙ্কিত করে সে তাহার ধৃষ্টতা বা দৃপ্ততা প্রযুক্ত। [illegible] অন্য ধর্ম্মের যে নিন্দা করে সে নিজেই অবগত নহে যে তাহার ধর্ম্মের মূল ও অন্যের ধর্ম্মের মূল একই। হিন্দু অন্যের ধর্ম্মকে গালি পাড়ে না কারণ সে বিশেষরূপে অবগত যে অন্যের ধর্ম্মও যে

ফল প্রসব করিবে আপনার ধর্ম্মও তাহাই করিবে। ধর্ম্মের কার্য্যই এই যে, প্রত্যেক মনুষ্যকে আত্মজ্ঞানী করিবে। যে ধর্ম্ম তাহা না করিতে পারিবে এবং যতক্ষণ তাহা না করিতে পারিবে ততক্ষণ সে বৃথা ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এক অঙ্গ সাধনা, যে ধর্ম্মের ইহা নাই অথচ কেবল মাত্র অন্তঃসারশূন্য বাক্যসমষ্টির দ্বারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পায় সে ধর্ম্মের কি প্রয়োজন ?

শ্রীঅমৃত লাল বসু।

বিধির বিচার।

প্রথম পরিচ্ছেদ প্রলোভন।

ফাল্গুন মাস বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়াছে এখনও রবি কিরণের প্রখরতা কমে নাই। পল্লিগ্রামের পথে কচিৎ দুই একটি লোক গ্রামান্তরে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে। এমন সময় ধুলিধূসরিত পদে একটী পথিক গোবিন্দপুরের রাস্তা দিয়া যাইতেছে। পথিকের মলিন বদন দেখিলে বোধ হয় তিনি অনেক হাঁটিতেছেন কিন্তু তাঁহার আঁখিদ্বয় যেন স্পষ্টই বলিতেছে যে এ ক্লেশ তাঁহার পক্ষে সামান্যমাত্র। যেন ভাবী সুখের ছবি তাঁহার নয়নে খেলিতেছে। বাস্তবিক তিনি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কার্য্যান্তরে কলিকাতায় গিয়াছিলেন এবং সেখান কার কার্য্য সুচারূপে সম্পন্ন করিয়া আজ বাড়ী ফিরিতেছেন। আজ তাঁহার আসিবার কথা নয়, তিনি একদিন পূর্ব্বে আসিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং হঠাৎ বাড়ী গিয়া কিরূপে প্রণয়িনী প্রমদাকে চমকিত করিবেন সেই ভাবনাতেই নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত।

বাড়ী প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আর দশ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিবে না। অঙ্গরাখার মধ্য হইতে কাগজ মোড়া এক জোড়া ক্ষুদ্র জুতা বাহির করিলেন। জুতা জোড়াটি তাঁহার এক বৎসরের শিশু পুত্রের জন্য কলিকাতা হইতে আনিয়াছেন। শিশুর ক্ষুদ্র পদে এই ক্ষুদ্র বিনামা কত সুন্দর দেখাইবে তাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন, এমন সময় পথিপার্শ্বস্থ বাগানের ভিতর হইতে বামা কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। স্বর তাঁহার পরিচিত, নরেন্দ্রনাথ চম্‌কাইয়া উঠিলেন। জুতা জোড়াটি পকেটে রাখিলেন, কাগজ খানি হাত হইতে পড়িয়া গেল। যে বাগানের ধারে আসিয়াছেন তাহা তাঁহার বাড়ীর সংলগ্ন এবং এই বাগানে "ছোটদিঘী" নামে একটি সাধারণ পুষ্করিণী আছে। গ্রামস্থ স্ত্রীপুরুষ এই পুষ্করিণীর জলে স্নান অবগাহন করে এবং জল অতি পরিষ্কার বলিয়া পানার্থেও লইয়া যায়। প্রাতে এবং অপরাহ্ণে পুষ্করিণীর ঘাটে অনেক স্ত্রীলোক জল লইতে বা কাপড় কাচিতে আসে। প্রমদাও আসিয়া থাকে। তবে আজ প্রমদার কণ্ঠস্বর এই বাগানের ভিতর হইতে শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ চম্‌কাইয়া উঠিলেন কেন? বাগানের সম্মুখে উচ্চ লতার বেষ্টনি থাকায় ভিতরের কিছু হঠাৎ দেখা যায় না, নরেন্দ্র লতা গুল্মের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার ধমনীতে শোণিত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; দেখিলেন তাঁহাদের গ্রামের জমিদার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পথ আটক করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর অপর দিকে অবগুণ্ঠনবতী একটি রমণী পথ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত কত অনুনয় বিনয় করিতেছে। রমণীর কাতর কণ্ঠস্বরে তাহাকে প্রমদা বলিয়া চিনিলেন, আর দেবেন্দ্রনাথকে এই সময় এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার আর অভিপ্রায় বুঝিতে বাকী রহিল না। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র

পশুর অপেক্ষাও অধম। কোন রমণী তাহার নাম মুখে আনিতেও ঘৃণা করে। প্রমদা কাতর কণ্ঠে পথ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত কতই সাধ্য সাধনা করিতেছেন কিন্তু বধিরকে গীত শুনাইবার ন্যায় সমস্তই বৃথা হইতেছে। নরেন্দ্র একবার মনে করিলেন এক লম্ফে গিয়া দুর্বৃত্তের গলা টিপিয়া ধরেন, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। একবার দেখিলেন যেন দেবেন্দ্র একটু দয়া পরবশ হইয়াই পথ ছাড়িয়া দিতেছে আবার পরক্ষণেই পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে, বোধ হইল যেন প্রমদার নিকট হইতে কোনও কথা স্বীকার করাইয়া লইতেছে। প্রমদা কিন্তু রাজী হইতেছে না। এদিকে দেবেন্দ্রও অন্যথা পথ ছাড়িবে না। নরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। প্রতিলোমকূপ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলে হয়ত সতীর সতীত্ব নষ্ট হয়। কিন্তু নরেন্দ্র এখনও বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না যে দেবেন্দ্রেরই দোষ সম্পূর্ণ। আজ কুক্ষণে প্রমদা জনশূন্য ঘাটে আসিয়া এই পশুর কবলে পড়িয়াছেন তাহা নরেন্দ্রের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তিনি ভাবিতেছেন হয়ত প্রমদারও কিছু দোষ আছে অঙ্কস্থিতা রমণীর চরিত্র দেবতারা পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন, নর নরেন্দ্র কোন ছার। এই সন্দেহ টুকুর বশবর্ত্তী হইয়াই বিশেষরূপে সকল কথা শুনিবার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া বাগানের অপর পার্শ্ববর্ত্তী বেড়ার নিকট আস্তে আস্তে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে একটু ঘন ঝোপের মত ছিল বলিয়া অধিক নিকটবর্ত্তী হইলেও ভিতর হইতে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা রহিল না; অধিকন্তু তিনি সকল কথাই স্পষ্ট শুনিতে পাইবেন এই সুবিধাটী হইল। সেখানে গিয়া দেখিলেন প্রমদা অমনোন্মুখী, দেবেন্দ্র বলিলেন "তবে ভুলিও না—কাল সন্ধ্যার

পর শিব মন্দিরের নিকট—যেন মনে থাকে।” প্রমদা ঘাড় নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইলেন। নরেন্দ্রনাথের বাড়ী যাওয়া হইল না। তিনি এ অভিনয়ের শেষ না দেখিয়া কি বাড়ী ফিরিতে পারেন? দেবেন্দ্রের চরিত্র যতই কলুষিত হউক না কেন, প্রমদার চরিত্র আরও হীন বোধ হইতে লাগিল। প্রমদা যদ্যপি এত দিন ধরিয়া এই কালকুট হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে, এতদিন ধরিয়া এই দেবেন্দ্রের সংসর্গ বাসনা করিয়া থাকে, তবে—আর অধিক নরেন্দ্র ভাবিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন অভিসার স্থলেই প্রমদার প্রেমের পরিণাম দেখিবেন।

এই স্থির করিয়া নরেন্দ্র গ্রামস্থ থানায় সংবাদ দিতে চলিলেন। কিছু দূর যাইয়াই তাঁহার মনে হইল থানায় এ সংবাদ দেওয়া বৃথা, কারণ তিনি জানিতেন থানার কর্ম্মচারীরা জমীদারের বশীভূত; এবং তখনকার ইনেস্পেকটরের সহিত দেবেন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বের বলে দেবেন্দ্রনাথ কত অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছেন, কত গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কত দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছেন, কত কুল বধুর ধর্ম্মনাশ করিয়াও পুলিষ প্রভুদের গোচরে আসেন নাই। যাহা হউক নরেন্দ্রনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইন্স্পেকটরের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া কাতর কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পুলিষ কর্ম্মচারী নীরবে সমস্ত শুনিলেন; কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক তাঁহার অভিযোগ কাল্পনিক বলিয়া উপহাস করিয়া উঠিলেন। এবং এরূপ ভদ্রলোকের নামে মিথ্যা সংবাদ প্রদানে যে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহাও শুনাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রও যে নির্ম্মল নহে ইহাও বলিতে ছাড়িলেন না। হায়! নরেন্দ্র কি কুক্ষণে আজ তুমি

গোবিন্দপুরে পদার্পণ করিয়াছ! আর্ত্তের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, শাস্তির রক্ষক বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, আজ দরিদ্র নরেন্দ্রনাথ সেই প্রবল প্রতাপ পুলিষ প্রবরের নিকট স্বীয় পত্নীর সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত সাহায্য চাহিতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেন। এ ব্যবহার নরেন্দ্রত ইতি পূর্ব্বেই কল্পনা পথে আনিয়াছিলেন, তবে তখন সেটা কল্পনা মাত্র ছিল, আর এখন তীব্র উপহাসের অট্টহাস অগ্নিস্রোতের ন্যায় তাঁহার শিরায় শিরায় বহিয়া গেল। চক্ষে এক বিন্দু জল আসিয়াছিল কিন্তু সে তাপে শুখাইয়া গেল। শুদ্ধ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন কি জানি যদি এই পাপাত্মা আমাকেই আবার আটক করিয়া রাখে।

নরেন্দ্র কোথা যাইবেন? বাড়ী? না হইতে পারে না। তথায় যাইবার আগে নিজের সন্দেহ ভঞ্জন হওয়া দরকার। তবে কি সে রাত্র কোনও বন্ধুর বাড়ী আশ্রয় লইয়া থাকিবেন? না। তাহা হইলে সেখানেই বা কি বলিবেন; আর তাঁহার দেশে পৌছান সংবাদ প্রচার হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতও হইতে পারে। এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে তিনি কি কল্য সন্ধ্যার সময় চিত্ত পুত্তলিকা প্রায় অভিনয় দর্শন করিবেন! তাঁহার সদসৎ বিবেচনা রহিত হইবার যোগাড় হইল। একবার মনে করিলেন, যাক্ পাপপ্রাণ উদ্বন্ধনে বিসর্জ্জন দিয়া সকল জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু তাহা হইলেও যে এ দারুণ স্মৃতি মৃত্যুর পরও তাঁহাকে বিরাম লাভ করিতে দিবে না। নরেন্দ্র কেন তুমি প্রমদাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছিলে? তাইত তোমার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া প্রতি কাযে বাধা দিতেছে। স্ত্রীকে কে না ভালবাসে? কিন্তু বিচিত্র বিধি-লীলায় কেন তুমি আজ সহায় সম্পদ হীন; আজ যদি তোমার লোকবল অর্থ-

বল থাকিত তাহা হইলে শত বৃশ্চিকসম এই চিন্তা কি তোমায় যন্ত্রণা দান করিত? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র পথের ধারে একটী বৃক্ষ মূলে বসিয়া পড়িলেন, এবং কি করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় ভাবিতেছেন। এদিকে পথ পর্য্যটনের শারীরিক পরিশ্রম এবং অত্যধিক চিন্তা ও উদ্বেগ ও মানসিক ক্লান্তি প্রযুক্ত তিনি ধীরে ধীরে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। যেন সমস্ত পার্থিব দুশ্চিন্তা হইতে এক কালে মুক্তি লাভ করিলেন। নিদ্রা চিরশান্তির ছায়া মাত্র এবং এই মোহিনীশক্তি আছে বলিয়াই নিদ্রা দেবী নামে অভিহিত। ব্যাধিজ্বালা বিষজ্বালা এমন কি পতি-পুত্রহীনা রমণীর শোকানল ক্ষণিকের তরেও নিদ্রা দেবীর কৃপায় নির্ব্বাণ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে সন্ধ্যাগমে দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রমদা লাভের বাসনা অনেক দিন হইতেই তাঁহার কলুষিত চিত্তে সুষুপ্ত ছিল। আজ অপরাহ্নে সেই পূর্ণযৌবনা প্রমদাকে দৈব একাকী মিলাইয়াছিল, এবং তাঁহারই বচন চাতুর্য্যে সে আগামী কল্য সন্ধ্যার পর শিবমন্দির সন্নিকটে সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ইহাতে দেবেন্দ্র কিছুই আশ্চর্য্য ভাবেন নাই। তিনি মনে করিতেন যুবতী মাত্রই রূপবান ধনী যুবককে আত্মসমর্পণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তবে অবসর বুঝিয়া মনের মত করিয়া বলা যাই। দেবেন্দ্রের ধন আছে লোকে জানে এবং নিজে সুরূপ বলিয়াও তাঁহার বিশ্বাস। আর নরেন্দ্রের অনুপস্থিতিজনিত বিরহকাতরা প্রমদাকে নির্জ্জনে পাইয়া মনের কথা মনোমত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাতে যে আশানুরূপ ফল ফলিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এখন সময় থাকিতে থাকিতে অভিসন্ধি সমাধা করিতে পারিলেই হয়। কিন্তু তিনি নিজেই যে কার্য্য

স্নাট করিয়াছেন। তিনি আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের কথা বলিয়াছেন। এখন নরেন্দ্র যদ্যপি ইতিমধ্যে আসিয়া পড়ে তবে কি তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়া নিজকর্ম্মদোষে সব নষ্ট করিবেন? এই দুর্বুদ্ধিবশতঃ তিনি আপনাকে কতই ধিক্কার দিলেন। নিজের বুদ্ধিবৈগুণ্যের দরুণ হয়ত এমন দুর্ল্লভ শীকার বা হাতছাড়া হয়। কিন্তু তাঁহার এটুকু বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে শিকার একেবারে হাতছাড়া হইবার নয়, তাহা হইলে কি সে স্বীকার করে? 'আচ্ছা শুভকার্য্যে বিলম্ব করিয়াই বা ফল কি? আজই কেন আমি প্রমদার সহিত দেখা করি না?' এই মতলব মনে হওয়াতে তিনি বড়ই ব্যগ্র হইলেন এবং এত সহজ উপায়ে সকল দিক বজায় রাখা যাইতে পারে ভাবিয়া দ্বিগুণ আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে বার বার আত্মপ্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর নটবরবেশে দেবেন্দ্র নাথ অবলা কুলবালার সতীত্বনাশ সঙ্কল্পে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

রাত্র প্রায় নয়টা বাজে। পল্লিগ্রামে নয়টা বাজিলেই অনেক রাত্র হয়। প্রমদা গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছেন। হরির মা ভাতের থালা হাতে করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল "বউদিদি তবে হরিকে ভাত দিয়া আসি, দরজাটা দিয়ে যাও।"

হরির মা সদ্গোপকন্যা। নরেনদের পল্লী মধ্যেই বাস করে এবং এই দম্পতীকে বিশেষ ভালবাসে। নরেন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গেলে হরির মা আসিয়া প্রমদার নিকট থাকিত। হরির মার হরি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। যে কএকদিন হরির মা এবাড়ীতে থাকিত সে কয়দিন মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় তাহাকে হরির ভাত দিয়া আসিতে হইত। তাই আজও হরির মা ভাতের থালা লইয়া বাড়ি যাইতেছে।

প্রমদা অপরাহ্নের ঘটনা পরম্পরা মনে মনে কেবলই আলোচনা করিতেছেন। যতক্ষণ না তাঁহার স্বামী বাটী ফিরিয়া আসেন ততক্ষণ প্রমদা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। কি যেন এক আশু বিপদ পাতের সম্ভাবনা তাঁহার মনে থাকিয়া থাকিয়া জাগিতেছে। তিনি অপরাহ্নের ঘটনা হরির মার কাছে বলিতে সাহস করেন নাই। স্বামী ভিন্ন কুলকামিনী দিঘীর কুলে কুলনাশের সম্ভাবনা কাহার নিকট ব্যক্ত করিবেন? এবং প্রকাশ করিয়াই বা কি করিয়া লোকগঞ্জনা সহ্য করেন। লোকে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের লোকেত এরূপ একটী সংবাদের আভাষ পাইলে হয়, অমনি তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে শতগুণ হইয়া শতজিহ্বায় শতকর্ণে উঠিবে।

হরির মা সন্ধ্যা হইতেই প্রমদার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়াছিল নরেনের অনুপস্থিতিই ইহার কারণ। প্রমদার একদণ্ড একাকী থাকিতে ভয় করিতেছে, অথচ হরির মাকে যদি না ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে হরির সে রাত্রে কিছুই খাওয়া হইবে না। পুত্রবতী রমণী কি তাহা করিতে পারেন? দরজা বন্ধ করিতে গিয়া প্রমদা হরির মাকে বারম্বার বলিয়া দিলেন "যতশীঘ্র পার ফিরিয়া আসিও, আমার মাথার দিব্য, আমার একলা বড় ভয় করে।"

প্রমদা একটী কেরোসিন তৈলের ডিবা জ্বালিয়া দ্বার বন্ধ করিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া মেঝেতে ডিবাটি রাখিয়া ঘরে খিল দিবেন, অমনি এক অপরূপ পুরুষমূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল।—"আরে কর কি সুন্দরি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আসিয়াছি, একটু পদে স্থান দাও" এই কথা বলিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। হঠাৎ এই নরপিশাচ মূর্ত্তি কিরূপে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল সে ভাবনা প্রমদার মনে

স্থান পায় নাই, কারণ হয় হরির মা খিড়কীর দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে নয় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া এই দুর্বৃত্ত কুলাঙ্গার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক একাকী পল্লীগ্রামে যাহারা বাস করিতে অভ্যস্থ, স্ত্রীলোক হইলেও তাহাদের কেমন একটু অসমসাহসিকতা দেখা যায়, তাই তদবস্থ অপর রমণীর ন্যায় প্রমদা মুর্চ্ছিতা হইলেন না বরং সবলে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া একটু পিছাইয়া দাঁড়াইলেন—সতী সতীত্ব রক্ষায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবেন্দ্রও এক লম্ফে ঘরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আসিবার কালীন অতর্কিত ভাবে তাহার পা লাগিয়া কেরোসিনের ডিবাটি উল্‌টাইয়া গেল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতে ফেলিতে তৈলে অগ্নি সংযোগ হওয়াতে ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র কিছু সাদা চোকে আসে নাই যে একটু সাবধান হইয়া চলিবে। সুরা এবং রমণী উভয়ে তাহার মাথা তোলপাড় করিতেছে। যাহা হউক পার্শ্বের আন্‌লায় কএকখানা কাপড় ছিল তাহাও ধরিয়া উঠিল, ঘর অগ্নি ও ধূমে পরিপূর্ণ হইল। নিমেষ মধ্যে প্রমদা মসারির ভিতর হইতে নিদ্রিত শিশু সন্তানকে বুকে করিয়া এক লম্ফে মুক্তদ্বার দিয়া বাহিরে আসিলেন।

এই অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া দেবেন্দ্রের নেশা ছুটিয়া গেল। তাহার কোঁচায় আগুণ ধরিল, গাত্রে ফোস্‌কা হইতে লাগিল। অগ্নিতে দেবেন্দ্রের ভেল্‌কী লাগিয়াছে, চারিদিকেই যেন অগ্নিময় পিশাচের তাণ্ডবমূর্ত্তি নৃত্য করিতেছে। দেবেন্দ্র বিকট চিৎকার করিয়া ঘরের ভিতর লাফালাফি করিতে লাগিল। ধূমে কিছুই দেখা যায় না তবুও দুইএকবার দরজার নিকট আসিয়া খুলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না, প্রমদা যে বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া পলাইয়াছে। দেবেন্দ্র ত পুণ্যশ্লোক পাণ্ডব

নহে যে যতুগৃহ দাহনকালে মৃত্তিকায় সুড়ঙ্গ প্রকাশ পাইবে। দেখিতে দেখিতে ঘর পুড়িয়া গেল একটি আত্মা পাপ দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া নৈশগগনে মিসাইয়া গেল।

পরদিন প্রাতে গোবিন্দপুরে মহা গোলযোগ উঠিল। সকলেরই মুখে গতরাত্রের অগ্নিকাণ্ডের কথা। দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা নরেনদের বাড়ি পুড়িয়া গিয়াছে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। দরিদ্র গৃহস্থের জন্য সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। নরেন্দ্রের স্ত্রীপুত্র তৎসঙ্গে পুড়িয়া মরিয়াছে শুনিয়া অনেকেই শোকাশ্রুপাত করিতেছে। বৃক্ষতলে নরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন দলে দলে লোক ছুটিতেছে এবং তাহাদের দুই একটী অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার বড় ভয় হইল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। সেখানে লোকে লোকারণ্য জনতা ভেদ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আর জ্ঞান রহিল না। এ বিশ্বে তাঁহার জুড়াইবার একমাত্র স্থান বাস্তুভিটাটি ভস্মাবশেষ হইয়াছে। মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। নিকটের দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই বাড়ীতে আগুন লাগিয়া একটী স্ত্রীলোক ও একটি শিশু পুড়িয়া মরিয়াছে। নরেন্দ্রের পক্ষে এই সংবাদ যথেষ্ট হইল, তিনি জানিলেন যে ইহ জীবনের সঙ্গিনীটি তিনি হারাইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র ক্ষুদ্র শিশুটিও অগ্নিদেব রাখেন নাই। স্বামীর পক্ষে, পিতার পক্ষে ইহাপেক্ষা আর কি ভয়ানক সংবাদ হইতে পারে। চক্ষে জল নাই যে তিনি ক্রন্দন করিবেন। মনের এ অবস্থায় চক্ষে জল আসে না। নরেন্দ্রের মন ঝটিকান্তে নির্ব্বাত নিস্তব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল।

সারাদিন তিনি সেই শ্মশানের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সোনার

সংসারের ভস্মাবশেষ দেখিতে লাগিলেন আর লোক চক্ষের অন্তরালে শিশু ও পত্নীর জন্য কতই অশ্রুজল ফেলিলেন। সামান্য ভিক্ষুকের পর্য্যন্ত থাকিবার স্থান আছে, পশু পক্ষীরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে কিন্তু এ বিশাল বিশ্বে আজ নরেন্দ্রনাথ উদ্বাস্তু, আজ তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই তাঁহার জুড়াইবার স্থান নাই। সন্ধ্যাগমে শৃগালাদির আগমন হইল। আজ নরেন্দ্রের দুঃখে পশুকুলও বুঝি আকুল। যেখানে লোকালয় ছিল আজ হঠাৎ সেখানে ভস্মস্তুপ দেখিয়াই যেন শিবাগণ উর্দ্ধমুখে বীভৎস চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের চীৎকারে নরেন্দ্রের চমক হইল। তখন তিনি গত জীবনের সুখ-ছবি কল্পনা নেত্রে দেখিতেছিলেন জ্ঞান হওয়াতে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। কোথায় যাইবেন স্থিরতা নাই অথচ যেন কলের পুতুলের ন্যায় চলিতেছেন। নিকটে দেখিলেন হরির মার ঘর, আবার একে একে চিন্তাস্রোত আসিল। কি ভাবিয়া তিনি হরির মার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক মেঝেতে বসিয়া একটী শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছে। সন্দেহোৎফুল্ল নেত্রে তিনি স্ত্রীলোক ও শিশুর প্রতি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, একি স্বপ্ন না সত্য? প্রত্যক্ষকে আর অধিকক্ষণ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, স্থির করিলেন এরা আমারই বটে। প্রমদাকে পাইয়া নরেন্দ্রের যুগপৎ হর্ষ বিস্ময় উপস্থিত হইল। উভয়ের অনেক বলিবার ও শুনিবার ছিল। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর শিশু সন্তানটিকে লইয়া উভয়ে সে পাপ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন। প্রমদার গাত্রে যে সামান্য অলঙ্কার ছিল, যাইবার সময় তাহার দুই এক খানি হরির মাকে দিয়া গেলেন।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

ফুলের সাজি।

সুহৃদের কন্যাবিয়োগে।

নন্দন কানন হতে এসেছিলে হেথা
স্বর্গীয় সুষমাময় পবিত্রতা লয়ে,
পাপ স্পর্শিবার আগে ফিরে গেল সেথা
বৃন্তচ্যুত পারিজাত ত্রিদিব আলয়ে।
অমর মানব আত্মা নাহিক বিনাশ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সদা করে বিচরণ,
তবে কেন তারি তরে এ দীর্ঘ নিঃশ্বাস
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে গিয়াছে যে জন।
এক গ্রহে মৃত্যু যাহা জন্ম গ্রহান্তরে
জন্ম মৃত্যু দেহে শুধু, দেহই নশ্বর,
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি আত্মা নববস্ত্র পরে
তাহাকেই কহে মৃত্যু মায়া বশে নর।
মায়া মোহে বিজড়িত মানব হৃদয়
চেতন কি নাহি পাবে হে চেতনাময়?

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার।

অদ্ভুত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

চস্‌মা লইয়া নাসিকা, নয়নে
করে মহা কোলাহল
কারতরে বিধি চস্‌মা সৃজিয়া
পাঠালেন ধরাতল,
রসনা উকিল বচন বাগীশ
উগারে আইন রাশি,
ন্যায়ের আধার শ্রবণ সুধীর
বিচারে বসিল আসি।
"বহুকাল হতে ধর্ম্ম অবতার
নাসিকা চস্‌মা ধরে,
অতএব তার দাবী সব আগে
অন্যের দাবী সে পরে;
আবার দেখুন যদি মানবের
নাক না থাকিত হায়!
চস্‌মা পরাটা (বলুন হুজুর)
হতোনাকি মহাদায়?
মোটের উপর, বুঝিলেন বেশ
চস্‌মা নাকের তরে,
নাক চস্‌মার ব্যবহার হেতু
আসিল অবনী পরে।"
আঁখির হইয়া, তার পর কিছু
বলেন রসনা বীর,
কি যে সে বক্তৃতা, এতদিন কেহ
জানেনাক' তাহা স্থির।
বিচারের ফলে সমুৎসুক সবে
আপনা আপনি চায়,
ধীর বিবেচক, শ্রবণ সুমতি,
প্রকাশেন শেষে 'রায়'
কি দিবা নিশায় নাসিকা যখন,
চস্‌মা পরিয়া রবে,

নয়ন যুগল, আজ হ'তে সদা
জানিও মুদিত হ'বে''

শ্রীগিরিজা কুমার বসু।

কেন আর ? *

দূরে আছি ভাল আছি সখা কেন আর,
নিকটে যাইতে মোরে ডাক বারে বার ?
যে সুখের লালসায়
কাঁদিয়ে ধরেছি পায়,
সে সুখে আজি এ দূরে পূর্ণ হৃদাগার ॥
কাছে থেকে দিবা যামি
তোমারে পাইনি আমি,
পেয়েছি তোমারে দূরে থাকি প্রাণাধার।
সিদ্ধিলাভ হইয়াছে আজি সাধনার ॥

২

দূরে আছি ভাল আছি সখা কেন আর,
নিকটে যাইতে মোরে ডাক বারে বার ?
তুমি হের দূরে তমঃ
আমি দেখি নিরুপম
তবরূপ উজলিছে হেথা চারিধার ॥
বিরহের ক্ষীণ হাসি
নহে এত সুধারাসি
উথলিছে ভাসাইয়া হৃদিপারাবার।
এইত সে মন্দাকিনী পারিজাত হার ॥

৩

দূরে আছি ভাল আছি সখা কেন আর,
নিকটে যাইতে আজি ডাক বারে বার ?
কোথা বিরহের ব্যথা ?—
এ যে গো মিলন গাথা
গাহে গরজিয়ে তব প্রেম পারাবার ॥
এ অকূলে তুমি কূল,
হৃদয়ের তুমি ফুল,
তুমি যে মাধুরী রাশি হৃদি পূর্ণিমার !
মধুময় করে আছে তুমি চারিধার ॥

৪

দূরে আছি ভাল আছি আজি কেন আর,
নিকটে যাইতে সখা ডাক বারে বার ?
হেথা আমি নহি একা,
তব ছবি প্রাণে লেখা
আর কারে প্রয়োজন আছে গো আমার ॥
যে শশী তারকা হেথা,
ত্রিজগতে নাহি কোথা,
তাপহীন স্নিগ্ধ আলো' দেয় অনিবার।
কে জানিত এত সুধা প্রেম মদিরার ॥

৫

দূরে আছি ভাল আছি তবে কেন আর ;
নিকটে যাইতে সখা ডাক বারে বার ?
হোথা হৃদণ্ডের খেলা
সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র মেলা

---

*জানুয়ারীর "প্রয়াসে" প্রকাশিত "আসিতে বলনা তায়" কবিতার প্রত্যুত্তর

হেথা যে অনন্ত প্রেম পূর্ণ চারিধার॥
দূরে হেথা নিরালয়
সারাটি হৃদয় ময়
ব্যপিয়ে রয়েছে ওই মূর্ত্তি সাধনার।
নিকটে কি এত সুখ? পূর্ণ কামনার?
বেরিলি। শ্রীসত্য চরণ চক্রবর্ত্তী

প্রেমময়ী।

১

প্রাণহরা কি মাধুরী! কি সৌন্দর্য্য তার!
উষার প্রথম রাগে
তার সে সুষমা জাগে
তারি সে লাবণ্য ঝরে জ্যোৎস্নায় অপার।
অরুণ কিরণ চোখে
প্রেম মন্দাকিনী বুকে,
প্রেমের সে মূর্ত্তি খানি দয়া মমতার॥

মানবী সে কভু নয় দেবী অলকার।
আমরি তাহারে ঘিরে,
মলয় বসন্ত ফিরে,
তরুণ অরুণ, শশী পদে লোটে তার
কৃতার্থ সে পদ সেবি,
সে যে প্রেমময়ী দেবী,
মানস প্রতিমা সে যে কবি কল্পনার।
মহিষাদল। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

তোরি তরে।

১

আমি যে আকুলভরে
চাঁদিনী যামিনী তরে
পথ পানে চেয়ে থাকি সারাদিন ধ'রে
আমি যে প্রাণের টানে
চাহিয়া চাঁদের পানে
থাকি কত নিশি হায় উদাস অন্তরে,
সখি তোরি তরে, শুধু তোরি তরে।

২

আমি যে প্রভাত কালে
তুলিয়া কুসুম দলে
গাঁথি কত ফুলমালা যতন করে
আমি যে কুসুম ডালি
তটিনী সলিলে ঢালি
কভু হাসি কভু কাঁদি কিভাব ভরে,
শুধু তোরি তরে সখি তোরি তরে।

৩

আমি যে কাননে পশি
নিভৃতে একাকী বসি
পরাণের গাথা কত গাই প্রাণভ'রে
আমি যে ধরণীতলে
বিষাদের মাল্য গলে
পাগলের মত ফিরি হেথা হোথা ঘুরে,
সেও তোরি তরে, সখি, তোরি তরে।

৪

আমি যে এ ভগ্নহৃদি
পাষাণ নিগড়ে বাঁধি
আজিও রয়েছি সখি এ পরাণ ধ'রে,
ভগ্ন হৃদে ভগ্ন গীতি
আজিও রয়েছে স্মৃতি
আজিও যা মনে হ'লে দুনয়ন ঝরে;
সেও তোরি তরে, সখি তোরি তরে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

কেন কাঁদি?

কেন কাঁদি?—শুধু বিড়ম্বনা।
বহিব কি অনুক্ষণ, সমভাবে আজীবন,
হৃদে করি বিষাদ-ভাবনা?
শান্তি বুঝি জনমে পা'বনা!

গেছে চলি যা' ছিল আমার;
শুকায়েছে যত আশা, যত স্নেহ ভালবাসা,
আছে শুধু মুখে 'হাহাকার'—
হৃদি ভরা সন্তাপ-আঁধার।

খোলা প্রাণে বহে সমীরণ; [উঠে
খোলাপ্রাণে নদী ছুটে, খোলাপ্রাণে ঢেউ
হাসে কুল আনন্দে মগন।
আমি কেন কাঁদি অনুক্ষণ?

গাহিতেছে আনন্দে পাপিয়া,
দিক্ দিগন্তর ক্রোড়ে, অনন্ত আকাশ'পরে,
যাইতেছে লহরী ভাসিয়া,
ধীরে ধীরে দিগন্তে মিশিয়া।

আমি কেন কাঁদি অবিরল?
এ সুখ-সৌন্দর্য্য সাধ, শুধু হৃদে অবসাদ
মিশা'তেছি সনে আঁখিজল
দগ্ধ প্রাণ হবেনা শীতল?

এস শান্তি, করি আলিঙ্গন;
হৃদয়ে যাতনানল, বহিতেছি অবিরল,
শীতলিতে নিভাও দহন,
এস দেবি, জুড়াই জীবন

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ

খুকির প্রতি।

১

খুকি,
তোর মুখ শশী, কেন ভালবাসি
দেখিবার সাধ মিটেও মিটে না।
যত দেখি হাসি, আনন্দেতে ভাসি,
সে আনন্দ কারে বোঝান যায় না॥

২

ননীর পুতলি, কোথা হ'তে এলি
মজাতে আমার স্বাধীন মন।
স্বর্গধাম ভুলি, কেন হেথা এলি
তুইরে আমার হৃদয় ধন।

৩

বাবা বাবা ব'লে, আধ আধ স্বরে
যখন তুইরে ডাকিস্ মোরে,
মাতালের ন্যায়, অধীর অন্তরে,
ধাই মুখ খানি চুমিব ব'লে॥

৪

আয়রে সুচারু! আয় মা আমার
তোরে বুকে ক'রে সতত রই —
ধরিতে যাইলে পালাস্‌নে আর
তোরে হেরে আমি সুখী যে হই।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

রেশমী বা পশমী বস্ত্রে তৈলের দাগ লাগিলে ঐ দাগের উপর এক খণ্ড ব্লটিং কাগজ রাখিয়া ব্লটিং কাগজের উপারভাগের নিকট উত্তপ্ত লৌহ ধরিলে ঐ বস্ত্র হইতে তৈলের দাগ উঠিয়া যাইতে পারে।

*
* *

অদ্ভুত যাদু বিদ্যা। নিম্নলিখিত ঘটনাটি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, সম্প্রতি এলাহাবাদের "মর্ণিং পোষ্টে"ও "ভেরিটাস্" স্বাক্ষরিত কোনও পত্র প্রেরক ইহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। "মধ্য প্রদেশে একজন দেশীয় যাদুকর যেরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইয়াছে তাহা অতুলনীয়। ঐ যাদুকর একটি সরু সুতুলির (twine) গোলা হস্তে লইয়া উহার এক দিক তাহার ঝুলিতে বাঁধিয়া সজোরে উচ্চে ছুঁড়িয়া দিল। ঐ গোলাটি নিম্নে না পড়িয়া ক্রমাগত উচ্চে উঠিতে লাগিল ও অবশেষে শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিকটে কোনও বাড়ি ছিল না যে তথায় পড়িবে, অধিকন্তু ঐ সুতালি শূন্যে বহুদূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। যাদুকর তখন তাহার পুত্রকে ঐ সুত্যলি ধরিয়া উঠিয়া যাইতে আদেশ করিল, সেও বানরের ন্যায় হস্ত পদ দ্বারা ঐ ধরিয়া উঠিয়া গেল। ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল অবশেষে

সুতালির গোলার ন্যায় সেও দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। যাদুকর তখন সে দিকে গ্রাহ্য না করিয়া দু একটি ছোট খাট রকমের বাজি দেখাইতে লাগিল, পরে কোনও একটী ক্রিয়ায় ঐ বালকের সাহায্য প্রয়োজন বলিয়া তাহাকে নামিয়া আসিতে বলিল। শূন্য হইতে স্বর শ্রুত হইল "আমি যাব না"। যাদুকর অনেক প্রলোভনেও যখন ঐ বালককে নামাইতে পারিল না তখন ক্রুদ্ধ হইয়া একখানি দীর্ঘ ছুরিকা দন্তে ধারণ করিয়া ঐ সুতা বহিয়া শূন্যে উঠিয়া গেল ও ক্রমে সেও অদৃশ্য হইল। হঠাৎ শূন্য হইতে চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হইল, এবং সকলেই বিস্ময়সূচক নেত্রে দেখিল যে শূন্যে যেখানে ঐ যাদুকর অদৃশ্য হইয়াছিল সেই স্থান হইতে রক্ত বিন্দু পতিত হইতেছে। পরে ঐ বালকের হস্ত পদাদি ও মস্তক একে একে ছিন্ন ভাবে পতিত হইতে লাগিল। তাহার ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত হইলে ঐ যাদুকর রক্তাক্ত ছুরিকা কটিদেশে ধারণ করতঃ নামিয়া আসিল, এবং বালকের ছিন্ন অবয়ব গুলি অবসর মত কুড়াইয়া একত্রিত করিল, এবং একখানি কাপড়ের নীচে ঐ সুতালি সহ রাখিয়া দিল। সে তখন তাহার অন্যান্য যন্ত্র গুলি সংগ্রহ করিয়া ঐ বস্ত্র উন্মোচন করিল, এবং সেই বালককে অক্ষত শরীরে দেখা গেল।" এরূপ ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, যেরূপ "ভেন্‌ট্রিলকুইস্‌ম্‌" দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রতারিত হয় সেইরূপ হিপ্‌নটিস্‌ম্‌ দ্বারা চক্ষুও প্রতারিত হয়। ঐ যাদু করের হিপ্‌নটাইজ করিবার শক্তি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহা যে কেবল চক্ষের ধাঁধা ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহার প্রমাণ, আমেরিকার একজন ভদ্রলোক ঠিক ঐরূপ একটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন "যাহা দেখিতেছ তাহার যথাযথ বর্ণনা কর," এবং তিনি একটি ফটোগ্রাফের ক্যামেরা লইয়া বসিলেন।

বন্ধু অবিকল উক্তরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে লাগিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফটোগ্রাফে উহার কিছুই উঠিল না। কারণ মনুষ্যকে "হিপ্‌নটাইজ" করা যাইতে পারে কিন্তু কাষ্ঠনির্ম্মিত ফটোগ্রাফের ক্যামেরাকে পারা যায় না। বিজ্ঞানের কাছে জুয়াচুরি খাটে না, ধরা পড়িতেই হইবে।

***

চুম্বন বিক্রয়—আমেরিকার কোনও বিখ্যাতা অভিনেত্রী সম্প্রতি নিলামে একটী চুম্বন বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাম দিতে পারিবে সেই ক্রেতা হইবে। বিক্রয়োপার্জ্জিত অর্থ নিউইয়র্কের এক সভায় দান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ চুম্বন ক্রয়ার্থ নিউইয়র্কের যুবকেরা এত আগ্রহ প্রকাশ করিল ও উহার এত অধিক দর উঠিল যে অবশেষে অভিনেত্রীর স্বামী নিলাম বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। (অবশ্য কেহ কেহ হয় ত জানেন না যে ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় থিয়েটারে অনেক ভদ্র মহিলা অভিনয় করিয়া থাকেন)। সম্প্রতি বিলাতে উক্ত ঘটনার পুনরভিনয় হইয়া গিয়াছে। কোনও একটী সুন্দরী অভিনেত্রী প্রাদেশিক দাতব্য সভায় দান করিবার জন্য চুম্বন বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একটী চুম্বনের জন্য অতি শীঘ্র দুই হইতে একেবারে ত্রিশ গিনি অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চারি শত টাকা পর্য্যন্ত দর উঠিল। তখন সৈনিক বিভাগের কোনও কর্ম্মচারী (কর্ণেল) একেবারে ৮০০ পাউণ্ড অর্থাৎ বার শত টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইল। অবশ্য তিনি ক্রেতা হইলেন। কিন্তু যখন তিনি চুম্বন আদায় জন্য একটী ক্ষুদ্র শিশুকে ঐ অভিনেত্রীর নিকট দিলেন তখন উপস্থিত সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কর্ণেল বলিলেন "এটি আমার প্রপৌত্র, ইহারই জন্ম দিন উপলক্ষে

উপহার প্রদানার্থ আমি চুম্বন ক্রয় করিয়াছি।” অভিনেত্রী সযত্নে শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিয়া সুদ সমেত তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিলেন। ঠাকুরদাদার অদ্ভুত খেয়ালে ঐ প্রাদেশিক দাতব্য সভা ১২০০৲ টাকা লাভ করিল। বলা বাহুল্য ঐ সভার সহিত কর্ণেলের বরাবর সহানুভূতি ছিল সেই জন্যই ঐ অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

***

ধূম পানের ফল।—কোনও দার্শনিক পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এক মুখ চুরুটের ধূমে দুইশত কোটি পরমাণু, এক মুখ পাইপের ধূমে একশত আশি কোটি পরমাণু এবং এক মুখ সিগারেটের ধূমে দুই শত নব্বই কোটি পরমাণু বিদ্যমান আছে। উহার লক্ষ লক্ষ পরমাণু মুখের ভিতর থাকে এবং অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ পরমাণু উদরস্থ হয়। অবশ্য ঐ পরমাণু অতীব ক্ষুদ্র। কড়া চুরুট প্রভৃতি হইতে নরম চুরুট অপেক্ষাকৃত ভাল, কারণ নরম চুরুটাদি হইতে অধিকতর পরমাণু নির্গত হইয়া, মুখ ও ফুস্‌ফুস্ (lungs) হইতে অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ শোষণ করিয়া রক্ত শুষ্ক করে।

***

মনুষ্য চর্ম্ম ব্যবসা। সম্প্রতি আমেরিকায় এই ভীষণ ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। অনেক বিখ্যাত জহুরীরা স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা মনুষ্য চর্ম্মের কোমরবন্ধ ও কার্ডকেস্ (card case) নির্ম্মাণ করাইতেছে, এবং চামড়া প্রস্তুতকারীরাও বলিয়াছে যে তাহারা হাঙ্গর ও বাঁনরের চর্ম্ম যেরূপে তৈয়ার করে, মনুষ্য চর্ম্মও সেইরূপে অনেক তৈয়ার করিয়াছে। অনেক রমণী মনুষ্য চর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রব্যাদি তাঁহাদের নিকট আছে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, এবং

সম্প্রতি কোন নব বিবাহিতা নারীর সাজ সজ্জার সহিত একখানি সুন্দররূপে পরিষ্কৃত (tanned) নর-চর্ম্মও স্থান পাইয়াছিল। যে সকল দরিদ্র ব্যক্তির কেহ নাই তাহাদের মৃতদেহ হইতে ঐ চর্ম্ম সংগ্রহ করা হয়। অস্ত্র পরীক্ষার (dissection) জন্য ঐ সকল মৃতদেহ হাঁস-পাতালে প্রেরিত হইলে দরিদ্র ছাত্রেরা জহরী ও চর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগের নিকট উহাদের চর্ম্ম বহু মূল্যে বিক্রয় করে। সম্প্রতি নূতন ও কঠোর আইনের দ্বারা সেই নৃশংস ব্যবসা একেবারে বন্ধ হওয়া সম্ভব।

***

পিতামহের উপদেশ। খোকা, (খোকার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র) দুচাকার গাড়ি আর চড়িস্ নে, বুড়োর কথা শোন্।

খোকা—কেন, ঠাকুরদা, ডাক্তার আমায় বলিয়াছে, যে একটু ব্যায়াম আবশ্যক, দুচাকার গাড়ি চড়ার ন্যায় প্রীতিপ্রদ ব্যায়াম আর নাই, ইহাতে শরীরের অনেক উপকার?

ঠাকুরদা—তোমরা ছেলে মানুষ জাননা, ডাক্তার ত বল্‌বেই, তোমার হাত পা ভাঙ্গিলেই ত তাদের দুপয়সা লাভ।

***

সমানে সমানে। দুকড়ি—ভাই আমার বাড়ী এত উচ্চ যে ছাদ দেখা যায় না। তিন কড়ি—আমার বাড়ী ভাই এত নিচু যে ভাত খাবার সময় ঘরের মেজেতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তবে জলের গেলাস রাখিতে হয়, না হইলে ঘরের চালে ঠেকিবে।

***

প্রণয়ী—সুন্দরি, আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছি।

প্রণয়িণী—কখনই নয়, তাহা হইলে অতদূরে বসিয়া থাকিতে না।

***

বেলুন নির্ম্মাণে মাকড়সা। প্যারিসের নিকটবর্ত্তী (Chalais Meudon) নামক স্থানে সামরিক বেলুনের জন্য দড়ি প্রস্তুতার্থ একটি মাকড়সার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত উপায়ে দড়ি প্রস্তুত হয়। মাকড়সার জাল যে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম লুতা তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত, প্রত্যেক মাকড়সাকে সেইরূপ ৩০।৪০ গজ লুতাতন্তু বাহির করিতে হয় তবে তাহার বিশ্রাম লাভ হয়। একটা কাটিমের উপর বারটা মাকড়সা স্থাপিত হয় এবং ধীরে ধীরে ঐ কাটিম ঘুরান হয়। ইহাতে মাকড়সা দ্বারা সুতা যেমন উৎপন্ন হইতে থাকে অমনি ঐ কাটিমে জড়ান হইতে থাকে। ঐরূপ আট গাছি সুতা একত্র করিয়া জলে ধুইয়া ফেলা হয়। জলে ধুইলে উহাতে যে আটা থাকে তাহা তাহা নষ্ট হয়। পরে ঐ আট গাছি সুতা একত্রে বুনিয়া যে সুতা প্রস্তুত হয় তাহা রেশমের সুতা অপেক্ষা মজবুত ও হাল্কা; এই জন্য বেলুনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কিন্তু ইহার মূল্য আপাততঃ অত্যন্ত অধিক। কিন্তু এখন যেরূপ গুটিপোকার চাষ হয়, ক্রমে সেইরূপ মাকড়সার চাষ হইলে উহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে; মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ হইবে। জগতে কোনও বস্তুই যে অপ্রয়োজনীয় নহে জ্ঞানোন্নতির সহিত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ধন্য মনুষ্যের বুদ্ধি, ধন্য ঈশ্বরের মহিমা!

* * *

পল্লিগ্রামের কোন একটি লোক কলিকাতার কোনও এক ডাক্তার খানায় জিজ্ঞাসা করিল "টাকের ঔষধ পাওয়া যাইবে কি?" ঔষধ বিক্রেতা আগ্রহ সহকারে বলিল "পাবেন বৈ কি? এমন ঔষধ আমার নিকট আছে, যে মাথায় মাখিলে ২৪ ঘণ্টায় কেশ বাহির হইবে। এ বিষয়ে অনেক বড় বড় লোকের সার্টিফিকেট আছে,

এই দেখুন” এই বলিয়া তাহাকে একখানি পুস্তিকা প্রদান করিল। ক্রেতা বলিল “থাক্, মহাশয়, সার্টিফিকেট দেখিয়া আমার প্রয়োজন নাই, আপনার মাথায়ও টাক দেখিতেছি, আজ আপনি ঔষধ লাগাইয়া রাখুন, আপনার কথা মত যদি ২৪ ঘণ্টায় কেশ বাহির হয় তাহা হইলে আমি কাল আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ঔষধ ক্রয় করিব।”

* * *

আশ্চর্য্য প্রভুভক্তি। মনিব প্রভুভক্তি শিখাইবার জন্য চাকরদিগের নিকট এই গল্প আরম্ভ করিবেন। এক রাজা ছিলেন এক যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য আহত হয়। একদিন আহত সৈন্য দিগের শিবির পরিদর্শন করিতে গিয়া এক বৃদ্ধ সৈন্যকে দেখিতে পাইলেন উহার এক হাত কাটা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার জন্যই তোমা এদশা হইয়াছে তজ্জন্য কি তুমি আমায় অভিসম্পাত কর না?” সে উত্তর করিল “কখনই না বরং যদি আপনার কার্য্যে আমার অপর হস্তটির প্রয়োজন হয়, উহাও কাটিয়া দিতে আমি প্রস্তুত।” রাজা বলিলেন “আমার কথনই বিশ্বাস হয় না।” তখন সে রাজার নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ করিয়া অম্লান বদনে তাহার অপর হস্তটি এক আঘাতে কাটিয়া ফেলিল।” গল্প শুনিয়া একজন বৃদ্ধ ভৃত্য বলিয়া উঠিল “উঃ কি আশ্চর্য্য প্রভুভক্তি।” পার্শ্বস্থ একজন নাপিত ভৃত্য তাহার কাণে কাণে বলিল “দূর মূর্খ, দেখিতেছিস্ না সব কথাই মিথ্যে? যার এক হাত নেই সে অপর হাত কাটিল কিরূপে?”

* * *

জেলের উপস্থিত বুদ্ধি।—এক মৎস্যজীবির জালে একটী অতি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মৎস্য উঠে। মৎস্যজীবি

তাহার জীবনে কখনও ওরূপ বিচিত্র মৎস্য দেখে নাই। সে পুরস্কারের লোভে তত্রস্থ রাজাকে উক্ত মৎস্য উপহার দেয়। রাজা এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব মৎস্যের মনোরম বর্ণ বৈচিত্র দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া ধীবরকে দুই শত টাকা পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা দিলেন। মন্ত্রি দেখিলেন পারিতোষিকটা বড় অসম্ভব রকমের হইল কিন্তু রাজার উপর কথা কহা তাঁহার শক্তি বহির্ভূত। সুতরাং তিনি কৌশল করিয়া বলিলেন যে মহারাজ আপাততঃ ধীবরের পুরস্কারটা স্থগিত রাখুন এবং উহাকে ঐ মৎস্যের জোড়া মিলাইবার জন্য আর একটী মৎস্য আনিতে আজ্ঞা করুন ; নহিলে একটা মৎস্য রাখিয়া লাভ কি ? মন্ত্রিবর মনে মনে বেশ জানিতেন যে উহার অনুরূপ মৎস্য সংগ্রহ করা ধীবরের সাধ্য নহে—দৈবাৎ একটা মিলিয়াছে মাত্র। রাজাও মন্ত্রির কথা শুনিয়া বলিলেন সেই ভাল—এক্ষণে ধীবরকে আমার নিকট আসিয়া দেখিতে বল এই মৎস্যটী পুং কি স্ত্রী ? যদি স্ত্রী মৎস্য হয় তবে উহার অনুরূপ পুং মৎস্য ও পুং মৎস্য হইলে উহার অনুরূপ স্ত্রী মৎস্য আনিতে আদেশ কর। ধীবরকে রাজার সমক্ষে আনিয়া উক্ত আদেশ পালন করিতে বলা হইল। সে আদেশ শুনিয়া মন্ত্রির চাতুরী বেশ হৃদয়ঙ্গম করিল। পরে মৎস্যটাকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—মহারাজ দেখিতেছি এ মৎস্যটা নপুংসক। সুতরাং জোড়া মিলাইব কেমন করিয়া ?

রাজা ধীবরের এই উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চারিশত টাকা পুরস্কার দিতে আজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রিবর আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ধীবরকে চারি শত টাকা গুণিয়া দিলেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা প্রয়াসের বিনময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১। বসুমতী। ২। প্রতিবাসী। ৩। এডুকেশন গেজেট। ৪। চুঁচড়া বার্ত্তাবহ। ৫। আলোচনা। ৬। দারগার দপ্তর। ৭। নব্যভারত। ৮। মহাভারত নাট্যকাব্য। ৯। ব্রহ্মতত্ত্ব। ১০। প্রদীপ। ১১। মুকুল। ১২। The Behar News. ১৩। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী। ১৪। সৎসঙ্গ। ১৫। উদ্বোধন।

সমালোচনা।

পঞ্চমবেদ বা মহাভারত নাট্যকাব্য। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। ইহা একখানি পাক্ষিক পত্র—আকার ডিমাই চারি ফর্ম্মা, মূল্য সহরে ২, মফস্বলে ২৷৹ কাগজ ও ছাপা সুন্দর। নাট্যাকারে মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। মহাভারতের গল্প যেরূপ ভাবে যত প্রচালিত হয় ততই মঙ্গল। প্রফুল্ল বাবুর কবিত্ব শক্তি আছে। তিনি যে বিরাট ও গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হউন এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রদীপ—চৈত্র। এবারকার প্রদীপে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর একখানি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য চিত্রগুলিও অতি সুন্দর। প্রদীপের প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। প্রদীপ ঘরে রাখিলে গৃহ উজ্জ্বল হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মতত্ত্ব। শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র। সীতানাথ বাবুর দার্শনিক জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। আমরা "ব্রহ্মতত্ত্বের" ৩য় ভাগ, ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেকগুলি গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ "ব্রহ্মতত্ত্বে" সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুই এক কথায় সেই সকলগুলির পৃথক পৃথক সমালোচনা

করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে "ব্রহ্মতত্ত্ব" যেরূপ বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত হইতেছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের না হউক বিশেষজ্ঞ পাঠকদিগের মধ্যে চিন্তাশীলতার বৃদ্ধি হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার হইবে। ৩য় ভাগ ২য় সংখ্যায় "বঙ্কিম চন্দ্রের ধর্ম্মমত" প্রবন্ধটি "কৌমুদী" ১ম ভাগ ২য় সংখ্যায় (১৩০১ সাল) একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা "ব্রহ্মতত্ত্বে" পুনর্মুদ্রিত না করিলেই ছিল ভাল, অন্ততঃ স্বীকার করা উচিত ছিল যে উহা কৌমুদী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

উদ্বোধন। ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। উদ্বোধনে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন" একটি ইংরাজি প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ হইলেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, পাশ্চাত্য দর্শন প্রাচ্য দর্শনের নিকট কত ঋণী তাহা না জানিয়া যিনি প্রাচ্য দর্শনকে হেয় ও অপদার্থ মনে করেন, এই প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার ভ্রম দূর হইবে। আমরা "উদ্বোধনে"র স্থায়িত্ব কামনা করি।

সৎসঙ্গ। ৫ম ভাগ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অধিকাংশ প্রবন্ধ বিচার করিতে সমর্থ হইলাম না। তবে "পল্লী চিত্র"টি মন্দ হয় নাই ; উহা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। "আর্য্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের" ভূমিকায় অনেক গুলি সারগর্ভ কথা আছে।

বিভক্তি নির্ণয়।—কাঁথি এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীঅক্ষয়নারায়ণ কাব্যভূষণ প্রণীত ও প্রকাশিত। ইহাতে বিভক্তি গুলির ব্যবহার শ্লোকাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে ও উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা অতি বিশদ ভাবে বুঝান হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে অল্প পরিশ্রমে ছাত্রদিগের বিভক্তি ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞান জন্মিবে, ও সংস্কৃত রচনার যথেষ্ট সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রেরই ইহার এক খণ্ড রাখা উচিত। মূল্য।• চারি আনা মাত্র।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। মে, ১৮৯৯ সাল। পঞ্চম সংখ্যা।

নিশীথ সঙ্গীত।

৺ বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

শারদ পূর্ণিমা—যামিনী যাপন।

১

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশান্ত, দশ দিশি!
জ্যো'স্নায় ঘুমায় তরুলতা,
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,
নাহি কোন সাড়া শব্দ
পাপীয়ার মুখে নাই কথা।

২

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে,
জ্যো'স্নার আলোক আসি' ফুটেছে অধরে।
শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘ গুলি
নীরবে ঘুমা'য়ে আছে খেলা দেলা ভুলি',
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে।
দূরে দূরে নীল জলে
দু'একটী তারা জ্বলে,
আমার মুখের পানে দীপ্ দীপ্ চায়,
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায়।

৩

একা বসি' নির্জ্জন গগনে
বল শশি, কি ভাবিছ মনে?
একটুও বাতাস নাই
তবু যেন প্রাণ পাই
তোমার এ অমৃত কিরণে।

৪

ফুল বনে ফুল ফুটে আছে
কেহ না সঞ্চরে কাছে কাছে;

তেমন আমোদ ভরে
কে আর আদর করে,
আজি সমীরণ কোথা গেছে !

৫

নীরব প্রকৃতি সমুদয়,
নীরবে প্রাণের কথা কয়,
সমীর সুধীর স্বরে
সেই কথা গান ক'রে
আহা আজি কেন নাহি বয় !

৬

মানবেরা ঘুমা'য়ে এখন,
মোহমন্ত্রে হ'য়ে অচেতন,
নিসর্গের ছেলে মেয়ে
কেনগো র'য়েছ চেয়ে !
তোমরা কি সাধের স্বপন ?

৭

আমার নয়নে ঘুম নাই,
কেবল তোদের পানে চা'ই,
এক একবার ফিরে
চেয়ে দেখি প্রেয়সীরে
আদরে গোলাপ তুলে অলকে পরাই।

৮

শিশুর সুন্দর মুখ
দেখে পাই স্বর্গসুখ
মর্ত্তে সুখ যুবতীর প্রফুল্ল বয়ান ;
কিন্তু এই হাসি হাসি
—পরিপূর্ণ ভালবাসি—
মুখ নাই প্রেয়সীর মুখের সমান।

৯

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায় ;
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে
কত কথা জাগে প্রাণে,
জানকী অশোক বনে দেখেছে তোমায়।

১০

কেকয়ী বিষাক্তশর
জর জর মর মর
থর থর কলেবর পাগলের প্রায়—
কি চক্ষে হে ! দশরথ দেখিল তোমায়,
তুমিই বলিতে পার
তুমি-ই বলিতে পার
ভাবিয়া বিহ্বল মন বুঝা নাহি যায়।
ওইরে জীবন-দীপ নেবো নেবো প্রায়,
ওইরে অন্তিম আশা আঁধারে মিশায়,
মনের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়—
কোথা রাম রাজা হ'বে বনে কেন যায় !

১১

জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস বাল্মীকিরে,
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটীরে।
তপোবনে ছেলে দু'টী
কচি মুখে হাসি ফুটি
জননীর কোলে বসি' দেখিত তোমায়,
কি যে সে কহিত বাণী,
জানে তাহা কুল রাণী,
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায় ;

করি সে অমৃত পান
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ
ভারত-পাতাল আজো অমরার প্রায়।

১২

কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে;
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল্ল ফুল বনে,
যৌবন তরঙ্গ রঙ্গে
গড়ায় সাগর সঙ্গে,
অন্তিমে আনন্দে মগ্ন নন্দন কাননে।

১৩

কখনো নামিয়া ভূমে,
আচ্ছন্ন শোকের ধূমে
শ্মশানে যোগিনী বালা কাঁদে উভরায়,
শিহরি সকল প্রাণ
সেই দিকে ধাবমান
কি যেন আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়।

১৪

এখন ভারতে ভাই
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্টহাসে কেরে কার্‌ছায়া
হা ধিক্! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উকি-মুখী আয়া?

১৫

নেক্‌ড়ার্ গোলাপ ফুলে
বেঁধে খোঁপা পর্‌চুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল
পরস্পরে গলা ধরি'
নাচিছেন যেন পরী
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল!

১৬

কেন এ অলীক তৃষা,
সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে!
হেলিয়া নলিনী রাণী,
কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটী মালা দিব শ্রীচরণে?
দু-মিনিটে ঝ'রে যা'বে
ম'রে যা'বে ক্ষুদ্র প্রাণী;
দিওনা মায়ের পায়ে
প্রসাদি কুসুম আনি।

১৭

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
হেরিয়া অমর নর পশু পক্ষী প্রাণী
সচেতন অচেতন
সকলে প্রফুল্ল মন,
কি অমৃত আছে ওই আননে না জানি।

১৮

প্রিয়ার পবিত্র মুখ,
উদার স্বরগ সুখ,
কেবল আমারি তরে বিধির সৃজন;
কেহ নাই চরাচরে
প্রাণ ভোরে ভোগ করে
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন

তুমি শশি সকলের,
মোহ মন্ত্র হৃদয়ের,
নয়নের পারিজাত কুসুম অমর,
রূপ রসে ঢলঢল
চারিদিকে অবিরল
উছলে উছলে চলে সুধাংশু সাগর।

২০

করি ও অমৃত পান
প্রাণে হয় বলাধান
শুষ্ক তরু মঞ্জরে, সঞ্চরে সমীরণ,
ফুল ফোটে থরে থরে
লতা সব নৃত্য করে,
উল্লাসে উন্মত্ত প্রায় মানুষের মন।

২১

চক্রবাক চক্রবাকী
আনন্দে বিহ্বল আঁখি
হরিণী হরষ ভরে দেখিছে তোমায় ;
তোমারি অমৃত ভুখে
ছুটিয়াছে উর্দ্ধমুখে
না জানি কি পাখী ওই শূন্যে গান গায়!

২২

জাগিল সকল তারা
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা,
মেঘগুলি ঢুলি ঢুলি কোথায় চলিল !
লুকায়ে চপলা মেয়ে
থেকে থেকে দেখে চেয়ে
কি যেন মনের কথা মনেই রহিল।

২৩

যোগীর প্রশান্ত মন
শান্তিময় ত্রিভুবন
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন,
তোমার সুধাংশু শশি,
তাঁহার প্রাণেতে পশি'
করেছে কি অপরূপ রূপের সৃজন !

২৪

আনন্দ আনন্দ তাঁ'র
হৃদয়ে ধরে না আর
অমূর্ত্ত আনন্দময় মূর্ত্তি মনোহর,
আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে,
কি আজ উদয় ধ্যানে !
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আনন্দ সাগর।

২৫

কবির প্রাণেতে পশি'
আচম্বিতে কে রূপসি,
বীণা করে খেলা করে হসিত বয়ানে ;
অলস অপাঙ্গে চায়,
কবি নিজে মোহ যায়,
জগৎ জাগিয়া ওঠে একমাত্র গানে !

২৬

শোকার্ত্ত নিরাশ প্রাণে
চায় তব মুখ পানে,
ও মুখ দর্পণে দ্যাখে সেই মুখ খানি ;
তোমার অমৃত পিয়া
বেঁচে আছে তা'র প্রিয়া
হেরিয়া জুড়ায় তা'র কাতর পরাণী।

২৭

প্রাণপতি দেশান্তরে
বুক তা'র কি যে করে
বলিতে পারে না সতী তোমা' পানে চায়।
সর্ব্বদর্শী রশ্মিজাল
বলে "সে তোর্ আছে ভাল"
একেলা একান্ত মনে ধেয়ায় তোমায়।

২৮

উদাসিনী চায় যা'কে
সে এসে দাঁড়ায়ে থাকে
দৃষ্টি পথ প্রান্ত ভাগে তোমার কিরণে,
শুনি বাতাসের বাণী
মনে করে ধ'রে আনি;
ধেও নাক পাগলিনি, প্রেমের স্বপনে!

২৯

কেন তোর ফুলরাশি
বিরস বদন খানি,
হাসি নাই মধুর অধরে,
বিলোচন ছল ছল
কপোলে গড়ায় জল
মনে মনে কাঁদ কা'র তরে?

৩০

পুরুষ পাংশুল মতি,
মনে তা'র অধোগতি,
মুখ তুলে চেয়ে আছে মিছে স্বর্গপানে;
সরল হৃদয় লুটি'
আহ্লাদে বেড়ায় ছুটি,'
আর তুমি দেখা তা'র পাবে কোন্ খানে!

৩১

ধিক্‌রে অধম ধিক্
ভালবাসা 'প্লেটোনিক্'
ছদ্মবেশী রসিক, মধুর "মিয়ু মিয়ু,"
প্রেমের দরাজ্ জান্,
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ
সজোরে পাপিয়া হাঁকে 'পীহ্ পীহ্ পীহ্।'

৩২

দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে!
(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছ চাঁদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে।

৩৩

উথলি' অমৃত রাশি,
মুখেতে ধরে না হাসি
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর;
প্রেয়সীরো থর থর
হাসি মাখা বিম্বাধর
সাধের স্বপনময়ী মুর্ত্তি মনোহর।

৩৪

আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই;
যাই আমি যেই খানে
যেন আমি খোলা প্রাণে
একমাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই।

তরঙ্গ ও তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহ।

তরঙ্গ।

১। জলে তরঙ্গঃ—কোন স্থির জলাশয়ে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলে, জলাশয়ের যেখানে প্রস্তর খণ্ড পতিত হয়, তথা হইতে কতকগুলি গোলাকার তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ তীরাভিমুখে বিস্তৃত হইতে থাকে। জলাশয়ে যদি কতকগুলি শুষ্কপত্র ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে যেমন তরঙ্গ ঐ পত্র গুলিকে অতিক্রম করিয়া আসে, উহারাও তেমনি আন্দোলিত হইতে থাকে। বায়ু নিস্তব্ধ ও জল স্রোতহীন থাকিলে, শুষ্ক পত্রগুলি তরঙ্গ সকল দ্বারা আহত হইবার পূর্ব্বে জলাশয়ের যে স্থানে ছিল, তরঙ্গ নিবৃত্ত হইবার পর ঠিক্ সেই স্থানে থাকে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, জলের অণুগুলি* স্রোতদ্বারা যেরূপ (জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরাল গতি প্রাপ্ত হইয়া) একস্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয়, তরঙ্গ দ্বারা সেরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করে না। তরঙ্গ দ্বারা জলের অণুগুলি ঘড়ির দোলনী বা পেণ্ডুলমের মত স্পন্দিত হয়, ও তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই স্পন্দন দ্বারা জলের অণুগুলি জলের উপরিভাগ হইতে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী হয়; কিন্তু তরঙ্গ জলের উপরিভাগ দিয়া ক্রমশঃ তীরাভিমুখে প্রসারিত হয়। এই স্পন্দনের নাম (transverse vibration) অনুবিস্তার কম্পন।

২। শব্দ ও বায়ু তরঙ্গ :—জলে যেমন লোষ্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, করতালি দিলে বায়ুতে সেইরূপ অদৃশ্য তরঙ্গ মালা উত্থিত

* পদার্থমাত্রকেই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়; এইরূপ এক একটী অংশকে অণু বা molecule বলা যায়।

হইয়া সর্ব্বদিকে প্রসারিত হয়। যদি দূরস্থ কোন ব্যক্তির কর্ণপটহে ঐ তরঙ্গ মালা উপযুক্ত বল সহকারে আঘাত করে, তাহা হইলে তিনি ঐ শব্দ শুনিতে পাইবেন। বায়ুর অণুগুলির কম্পন বশতঃই যে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা নানা প্রকারে প্রমাণ করা যায়। যদি বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের আধার মধ্যে একটী ঘণ্টা রাখিয়া কোন কৌশলদ্বারা ঐ ঘণ্টাটীকে ধ্বনিত করা যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ আধার হইতে বায়ু নিষ্কাশিত হইতে থাকে, ঘণ্টার শব্দও তেমনি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে; অবশেষে বায়ু সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কাশিত হইলে ঘণ্টার শব্দও আর শ্রুত হয় না। বায়ু নিষ্কাশন করিবার পূর্ব্বে ঘণ্টার কম্পন আধারস্থ বায়ুকে কম্পিত করে; এই বায়ু-কম্পন আধারের গাত্রে আঘাত করাতে আধারের অণুগুলি কম্পিত হয়; আধারের কম্পন আবার বাহিরের বায়ুতে কম্পন সঞ্চারিত করে, এই বায়ু-কম্পনই আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দের অনুভব জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু বায়ু নিষ্কাশিত হইবার পর ঘণ্টার কম্পন বায়ুর অভাব হেতু আধারে কম্পন উৎপন্ন করিতে পারে না, তজ্জন্য বাহিরের বায়ুতে কোনও কম্পন জন্মে না, সুতরাং আমাদের কোনও শব্দ জ্ঞান হয় না। একটী শূন্য বাটীকে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই আঘাত দ্বারা বাটী কাঁপিতে থাকে। বাটীর এই কম্পন, ধীরে ধীরে অঙ্গুলী দ্বারা বাটীটী স্পর্শ করিলে বুঝিতে পারা যায়। এই কম্পমান্ বাটীটীকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ বাটীটীর কম্পন থামিয়া যায় ও তৎসঙ্গে শব্দও বিলুপ্ত হয়। এখানেও বাটীর কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হয় বলিয়াই শব্দ আমাদের শ্রুতি গোচর হয়; বাটীর কম্পন থামিলেই বায়ুর কম্পন থামিয়া যায় সুতরাং শব্দও শ্রুত হয় না।

শব্দ-তরঙ্গ দ্বারা বায়ুর অণুগুলি স্পন্দিত হয়। কিন্তু জল-তরঙ্গ ও বায়ু-তরঙ্গের প্রভেদ এই যে, জলের অণুগুলি যেমন তরঙ্গ দ্বারা জলের উপরিভাগ হইতে ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে ও নিম্নে আসে, কিন্তু তরঙ্গ তীরাভিমুখে প্রসারিত হয়, বায়ু-তরঙ্গে সেরূপ হয় না। বায়ু-তরঙ্গ দ্বারা, তরঙ্গ যেদিকে প্রধাবিত হয়, অণুগুলিও সেই দিকেই স্পন্দিত হইতে থাকে; এই জন্যই বায়ু-তরঙ্গ দ্বারা অণুগুলি ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত ও বিস্ফারিত হয়। এইরূপ স্পন্দনের নাম (longitudinal vibration) অনুদৈর্ঘ্য কম্পন।

শূন্য গৃহে, বিস্তীর্ণ মাঠে কিম্বা উচ্চ ছাদের উপর চীৎকার করিলে সেই চীৎকারের অনুযায়ী শব্দ বা প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রত্যাবৃত্ত শব্দ তরঙ্গই এই প্রতিধ্বনির উৎপাদক। ঘরের মেঝেতে রবার বা মার্ব্বেল নিক্ষেপ করিলে ঐ রবার বা মার্ব্বেল লাফাইয়া উঠে; জলের তরঙ্গ তীরের উপর সবলে পতিত হইলে ঐ তরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই প্রত্যাবর্ত্তনকারী তরঙ্গকে প্রত্যাবৃত্ত তরঙ্গ বলা যায়। প্রত্যাবৃত্ত শব্দ-তরঙ্গও এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। শব্দ-তরঙ্গ কোন প্রতিবন্ধকের উপর পতিত হইলে ঐ তরঙ্গ, দুইটী বিভিন্ন তরঙ্গে বিভক্ত হয়। একটী তরঙ্গ প্রতিবন্ধকের অণুগুলিতে কম্পন উদ্ভূত করে; অপরটী প্রতিবন্ধক দ্বারা প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই শেষোক্ত তরঙ্গকে প্রত্যাবৃত্ত তরঙ্গ বলা যায়। শূন্য-গৃহে শব্দ করিলে শুদ্ধ যে গৃহ মধ্যে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; গৃহের বাহিরেও শব্দ শ্রুত হয়। গৃহ-প্রাচীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত শব্দ-তরঙ্গ হইতেই প্রতিধ্বনির উৎপত্তি; আদি শব্দ-তরঙ্গ হইতে প্রাচীরের অণুগুলিতে যে কম্পন জন্মে, সেই কম্পন বাহিরের বায়ুতে সঞ্চারিত হয় বলিয়াই বাহিরে শব্দ শুনা যায়।

বীণায় যে তন্ত্রী ব্যবহৃত হয়, শুধু এক গাছি সেই তন্ত্রীর মুখদ্বয় যদি

দুইটী আবদ্ধ ক্ষুদ্র লৌহ কীলকে (পেরেক) টানিয়া বাঁধা যায় এবং বীণাদণ্ড (ছড়ি) দিয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ তন্ত্রী হইতে অতি মৃদু ধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু বীণায় ঐরূপ আঘাত করিলে শব্দ প্রবল হয়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, শুধু তন্ত্রী কম্পিত হইলে কেবল তন্ত্রীর পার্শ্বস্থ বায়ুতেই কম্পন সঞ্চারিত হয়; কিন্তু বীণাস্থ তন্ত্রীর কম্পন বীণার পাতলা কাষ্ঠময় অবয়বে অনুকম্পন সঞ্চার করে, তজ্জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বায়ুরাশিতে কম্পন বিস্তৃত হয়; সুতরাং শব্দও অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া থাকে। মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, প্রভৃতি যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ আবদ্ধ বায়ু, চর্ম্মের কম্পন সহিত আন্দোলিত হয় বলিয়াই এই সকল যন্ত্রোত্থিত শব্দ প্রবল ও দূর ব্যাপী হইয়া থাকে। যদি কেহ স্বীয় মুখের নিকট শূন্য গর্ভ ও সরুমুখ বিশিষ্ট কোন আধার (যেমন ঘটী, বা কলসী) ধরিয়া (সুর ভাঁজিবার ন্যায়) নিম্ন (খাদ) হইতে ক্রমশঃ উচ্চ (চড়া) শব্দ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত কোনও একটী বিশেষ শব্দ, ঐ আধারস্থ বায়ু দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রবল হয়। এই শব্দটী বহির্বায়ুতে যে কম্পন উদ্ভূত করে, আধারস্থ সমগ্রবায়ু সেই কম্পনের সহিত তালে তালে অনুকম্পিত হয় বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। উন্মুক্ত মুখ ও বায়ুপূর্ণ যে কোন আধার, শব্দ বিশেষকে এইরূপে প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রবল করিতে পারে। এই প্রকার অনুকম্পন উৎপাদন করিয়া শব্দ প্রবল করাকে অনুপ্রতিধ্বনি (Resonance) বলা যায়।

৩। আকাশ ও আলোক তরঙ্গঃ—যে সকল পদার্থ স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় নয়, অন্ধকার গৃহে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু এই গৃহে আলোক প্রবেশ করিতে দিলে, ঐ পদার্থ সকল আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়; সুতরাং আলোক দ্বারা আমাদের দৃষ্টি জ্ঞান জন্মে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে আলোকও শব্দের মত কম্পন সম্ভূত। কিন্তু শব্দের উৎপত্তির জন্য যেরূপ বায়ু বা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অন্য কোন পদার্থের কম্পন আবশ্যক, আলোকের জন্য এরূপ কোন পদার্থের কম্পন আবশ্যক করে না। কেন না বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের আধার হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিলে, আধারস্থ পদার্থ পূর্ব্ববৎ দেখিয়া থাকি ; অন্তরীক্ষস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি বিনির্গত আলোকও বায়ুহীন স্থান অতিক্রম করিয়া আসে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কল্পনা করেন যে বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বায়বীয় কোন এক পদার্থ, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছে। কি বায়বীয় পদার্থ, কি তরল পদার্থ, কি কঠিন পদার্থ, সকল পদার্থের মধ্যে এবং বায়ুহীন শূন্য দেশেও এই পদার্থ বর্ত্তমান আছে। এই পদার্থ আকাশ, ব্যোম অথবা ঈথর (ether) নামে অভিহিত হয়। এই আকাশের অণুগুলির কম্পন বশতঃই আলোকের উৎপত্তি ও সঞ্চালন হইয়া থাকে। বায়ু অপেক্ষা আকাশ অতিশয় স্থিতিস্থাপক বলিয়া শব্দের অপেক্ষা আলোকের বেগ অত্যন্ত অধিক। বায়ুতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৮৯ ফুট্ এবং আকাশে বা ঈথরে আলোক-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

আলোক-তরঙ্গ ও শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে কম্পন সম্বন্ধে কিছু তারতম্য আছে। শব্দ তরঙ্গে বায়ুর অণুগুলির কম্পন (longitudinal) অনুদৈর্ঘ্য ; কিন্তু আলোক তরঙ্গের কম্পন (transverse) অনুবিস্তার।

শব্দোৎপাদনকারী পদার্থ যেমন কম্পিত হইতে থাকে, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থও (যেমন দীপালোক) তদ্রূপ কম্পিত হইতে থাকে ; এই কম্পন চতুর্দ্দিকস্থ আকাশে কম্পন সঞ্চার করে। এই আকাশ-কম্পন আমাদের চক্ষে উপনীত হইলে আমাদের দৃষ্টি জ্ঞান জন্মে ও আমরা ঐ পদার্থ

দেখিতে পাই। কিন্তু যে সকল পদার্থ স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় নয়, তাহারা প্রতিফলিত আলোক দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন শব্দ-তরঙ্গ কোন প্রতিবন্ধকের উপর পতিত হইয়া ফিরিয়া আসে, এবং ঐ প্রত্যাবৃত্ত তরঙ্গই প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে, তেমনই আলোক-তরঙ্গ কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে ঐ পদার্থ দ্বারা প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে ; এই প্রত্যাবৃত্ত আলোক-তরঙ্গই ঐ পদার্থকে আমাদের দৃষ্টি-পথের অন্তর্গত করে।

আকাশ-কম্পন যেমন আলোক রশ্মি (luminous rays) উৎপাদন করে, সেইরূপ অদৃশ্য তাপরশ্মি (invisible heatrays) এবং রাসায়-নিক ক্রিয়াক্ষম অদৃশ্য রশ্মিও উৎপাদন করিতে পারে। আলোকের উৎপত্তি স্থান হইতে এই ত্রিবিধ রশ্মিই বহির্গত হয়। বহুভূমিক কাচ (ঝাড়ের কলম) দ্বারা যে কোন আলোক বিশ্লেষিত করিলে, ঐ আলোককে যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিৎ, নীল, ধূমল ও অরুণ (violet) এই সাতটী মূল কিরণে বিভক্ত হইতে দেখা যায় ; কিন্তু এতদ্ব্যতীত লোহিত কিরণের বাহিরে ও অরুণ কিরণের বাহিরে আরও কতকগুলি অদৃশ্য রশ্মি আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। বহির্লোহিত-রশ্মি সকল (ultra-red rays) তাপ প্রদান করে, এই জন্য ইহাদিগকে অদৃশ্য তাপ-রশ্মিও বলে। বহিররুণ-রশ্মি (ultra-violet rays) সকল রাসায়নিক ক্রিয়াক্ষম। এই বহিররুণ-রশ্মি দ্বারাই আলোকচিত্র (photograph) উৎপন্ন হয়। আলোক-রশ্মি, বহির্লোহিত-রশ্মি ও বহিররুণ-রশ্মি এই ত্রিবিধ রশ্মি মধ্যে বহিররুণ-রশ্মির জন্য আকাশের এক একটী অণুর একটী মাত্র কম্পন সম্পূর্ণ করিতে, অপর দুইটী রশ্মির অপেক্ষা অল্প সময় লাগে। এই জন্য বহিররুণ-রশ্মি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, অন্য দুই

রশ্মি-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র*। বহির্লোহিত-রশ্মি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তাড়িতালোক হইতে উপরোক্ত ত্রিবিধ তরঙ্গ ব্যতীত তাড়িত চৌম্বক-তরঙ্গ আকাশে সমুদ্ভূত হয়। এই তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উল্লিখিত ত্রিবিধ রশ্মি-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বৃহৎ।

তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহ।

১। মার্কনির যন্ত্র :—তাড়িতালোক হইতে আকাশে যে তাড়িত-চৌম্বক-তরঙ্গ সকল (electro magneto waves) উৎপন্ন হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্রান্‌লি (M. Branly) সাহেব একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তিনি ইহাকে 'radioconductor' বা "বিকীরক-সঞ্চালক", নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এই যন্ত্র সাধারণতঃ 'coherer' বা "সংযোজক" নামে পরিচিত। মার্কনি সাহেব (Signor Marconi) এই যন্ত্রাবলম্বনে তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালী অতি সহজ। একটী সরু কাচের নলের ভিতর একটী ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ের দুইটী তার বিভিন্ন ভাবে স্থাপিত আছে। আরও ঐ নলের ভিতর স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রভৃতি যে কোন এক ধাতুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু সকল সন্নিবেশিত আছে। 'সংযোজক' যন্ত্রের ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ের দুইটী তার পরস্পর সংযুক্ত নয় বলিয়া, ঐ ব্যাটারীতে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হয় না; বরং নলমধ্যস্থ ধাতব রেণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত বলিয়া উহারা

$$\text{*তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য} = \frac{\text{আলোকের বেগ}}{\text{প্রতি সেকেণ্ডে একটী অণুর কম্পন সংখ্যা}}$$

সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যা যেমন বেশী হইবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও (wave-length) তেমন ক্ষুদ্র হইবে।

ব্যাটারীতে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চার পথে বাধা প্রদান করে। কিন্তু যদি কোন বহিঃপ্রদেশ হইতে তাড়িত চৌম্বক-তরঙ্গ আকাশ মধ্য দিয়া আসিয়া "সংযোজক" যন্ত্রের নলমধ্যে উপনীত হয়, তাহা হইলে নলস্থিত ধাতব রেণু সকল পরস্পর সংযুক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ হয়; সুতরাং তাহাদের তড়িৎ-পরিচালন-শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই শ্রেণীবদ্ধ রেণুগুলি নল মধ্যস্থ ব্যাটারীর তারদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত করে; সুতরাং "সংযোজকে" তাড়িত প্রবাহ জন্মে। আকাশে তাড়িত চৌম্বক-তরঙ্গ থামিলে "সংযোজকের" নলস্থিত ধাতব রেণু সকল পূর্ব্ববৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় ও তাহাদের তড়িৎ-পরিচালনা শক্তিও তৎসঙ্গে বিলুপ্ত হয়; সুতরাং ব্যাটারীতে তড়িৎ-প্রবাহের লোপ হইয়া থাকে। এইরূপে একস্থানে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিলে "সংযোজকের" সাহায্যে অপরস্থানে ইহার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায়। বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে "সংযোজক" যন্ত্রের তাড়িত প্রবাহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে এবং বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে "সংযোজক" যন্ত্রে তাড়িত প্রবাহও অল্পক্ষণ স্থায়ী হইবে। মর্সেসের তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রে, সংবাদ এই প্রণালীতেই প্রেরিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের রিলে* (Relay) ও ইণ্ডিকেটর (Indicator) নামক অংশ "সংযোজকের" ব্যাটারীর তারের মধ্যে স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে "সংযোজকে" উৎপন্ন তাড়িত প্রবাহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে কাগজে রেখা পাত এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে কাগজে বিন্দু পাত হইবে। এই রেখা ও বিন্দু সাহায্যে যেমন মর্সেসের বার্ত্তাবহ যন্ত্রে

---

* Relay দ্বারা ক্ষীণ তাড়িত প্রবাহ, electro-magnet ও অপর ব্যাটারীর সাহায্যে অধিক বলবান হয়।

সংবাদ নির্ণীত হয় এখানেও তদ্রূপ নির্ণীত হইবে। সুতরাং তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহের জন্য যে স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে তথায় যাহাতে ইচ্ছামত অল্পক্ষণ ও বেশীক্ষণ স্থায়ী তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিতে পারা যায় এমন একটী যন্ত্র, ও যে স্থানে সংবাদ গ্রহণ করিতে হইবে তথায় "রিলে" সম্বলিত "সংযোজক" যন্ত্র রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

এক স্থানেই সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, তথায় ইচ্ছামত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনকারী যন্ত্র ও 'রিলে' যুক্ত "সংযোজক" যন্ত্র এই উভয়ই থাকা আবশ্যক। কিন্তু স্বস্থানোদ্ভূত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গজ তাড়িত তরঙ্গ দ্বারা সংযোজকের ক্রিয়া হইতে পারে। এই ক্রিয়ার প্রতিবিধানের জন্য "সংযোজক" যন্ত্রকে ধাতব আবরণে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। এবং এইরূপ আবৃত সংযোজক যন্ত্র যাহাতে বহিঃপ্রদেশাগত তাড়িত তরঙ্গ দ্বারা চলিতে পারে, তজ্জন্য সংযোজক ব্যাটারীর একটী তার-প্রান্ত (electrode) হইতে একটী ধাতব শিক্ নভঃস্থলে খুব উচ্চ করিয়া রাখিতে হয় ও অপর তারপ্রান্ত আর একটী ধাতুময় তার দ্বারা ভূমিতে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বহুদূরে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনকারী যন্ত্রের তারপ্রান্তদ্বয়েও (electrodes) ঐরূপ করা উচিত।

সংযোজক যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সংযোজক যন্ত্র যে কোন তাড়িত-চৌম্বক-তরঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। যেমন বায়ুপূর্ণআধার স্বর বিশেষ দ্বারা অনু প্রতিধ্বনিত (resonated) হইয়া ঐ স্বরকে প্রবল করে, তেমনি এক একটী সংযোজক যন্ত্রও এক একটী বিশেষ তাড়িত তরঙ্গ দ্বারা চালিত হয়। সুতরাং এই যন্ত্র দ্বারা গোপনীয় সংবাদ নির্ব্বিঘ্নে প্রেরিত হইতে পারে।

ইটালীতে সম্প্রতি রণতরী সমূহে প্রচলিত প্রথামত পতাকা বা আলোক-মূলক সাঙ্কেতিক দ্বারা সংবাদ চালনার পরিবর্ত্তে সংযোজক যন্ত্রের দ্বারাই উক্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতেছে। এই যন্ত্র সাহায্যে দুর্গাবরুদ্ধ সৈনিকগণ স্বীয় দুরবস্থা অনায়াসে মিত্রদিগের নিকট জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইবে। প্রচণ্ড ঝটিকার সময় বা অন্ধকারে, আলোকগৃহ (light house) হইতে অদূরস্থ অর্ণবযানে এই যন্ত্র দ্বারা বিপদবার্ত্তা জানাইয়া সতর্ক করিতে পারা যাইবে।

মার্কনির যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ইংলণ্ডের দক্ষিণস্থ কাউস বন্দরে গত বাচ্‌খেলার সময় পরীক্ষিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের যুবরাজ (Prince of Wales) রাজকীয় তরীতে থাকিয়া মার্কনির যন্ত্র দ্বারা অস্‌বরণ (Osborne) প্রাসাদস্থিতা মহারাণীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। কিংসটাউনের বাচ্‌খেলার সময়ও এই যন্ত্রের আর একটি পরীক্ষা হইয়াছে।

গত এপ্রেল মাসে মার্কনির যন্ত্রের আর একটি সন্তোষজনক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মার্কনি স্বয়ং এই পরীক্ষার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থ বোলোঁ সহরের কিছু উত্তরে উইমারো নামক গ্রামে একটি ১৮০ ফুট উচ্চ দণ্ড প্রোথিত করা হয় ও তথায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি স্থাপিত হয়; এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে সাউথ ফোরল্যাণ্ড নামক আলোক-গৃহেও ঐরূপে একটি দণ্ড প্রোথিত হয় ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি একটী গৃহে রাখা হয়। মার্কনির তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র ঠিক্ তারযুক্ত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। এই পরীক্ষা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ক্রমে ও ফরাসীর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ের প্রতিনিধির সমক্ষেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

২। জিকলারের যন্ত্র :—দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য যত গুলি যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে অধ্যাপক জিক্‌লার (Professor Zickler) যে যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজে নির্ম্মিত হইতে পারে ও যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যাওয়া যায়। এই যন্ত্রের ক্রিয়া বহিররুণ রশ্মির নিম্নলিখিত ধর্ম্ম দ্বারা সাধিত হয়—(১) বহিররুণ-রশ্মির তরঙ্গাঘাতে বায়ুর বিদ্যুৎ পরিচালন ক্ষমতার বৃদ্ধি হয় ; হোল্টজ্ (Holtz) দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। (২) বহিররুণ-রশ্মি কাচের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না ; যেমন অস্বচ্ছ পদার্থ আলোক গমন পথে বাধা প্রদান করিয়া থাকে, তেমনিই কাচ (স্বচ্ছ হইলেও) বহিররুণ-রশ্মির গমন পথে প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করে। যে স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, তথায় তেজস্কর তাড়িতালোক উৎপাদনকারী একটী যন্ত্র, একখানি বৃহৎ অন্তর্গোল দর্পণ (concave mirror) ও একটী কাচের আবরণী থাকা আবশ্যক। তাড়িতালোক উৎপাদনকারী যন্ত্রটীর আলোক যাহাতে উক্ত দর্পণের কেন্দ্র স্থানে (focus) জ্বলিতে পারে এরূপ বিধান করিতে হইবে। এবং দর্পণটীকে ঘুরাইয়া যাহাতে অভিপ্রেত দিকে একত্রীভূত রশ্মি সমূহ চালিত করিতে পারা যায়, তাহাও করা আবশ্যক। দর্পণ ও আলোক এতদুভয়ের সম্মুখে কাচের আবরণী এরূপ কৌশলে রাখিতে হইবে যে, ইহাকে ইচ্ছামত ঐ স্থানে স্থাপিত এবং ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিতে পারা যাইবে।

যে স্থানে সংবাদ গ্রহণ করিতে হইবে তথায় একটী স্বচ্ছ প্রস্তরের লেন্স (Qartz lens) একটী কাচের আধার ও একটী ব্যাটারী থাকা আবশ্যক। লেন্সের পশ্চাতে কাচের আধারটী রাখিতে হইবে এবং আধারটীর যে পার্শ্ব লেন্সের দিকে থাকিবে তাহা স্বচ্ছ

প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। আধারের পার্শ্বদেশে দুইটী ছিদ্র করিয়া দুই খণ্ড তার আধারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে ও ছিদ্রদ্বয় উত্তম রূপে বন্ধ করিতে হইবে। আধারস্থ তার-প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে একটীতে ক্ষুদ্র গোলক ও অপরটীতে একটী ক্ষুদ্র গোলাকৃতি থাল (disc) সংযুক্ত করিতে হইবে। এই গোলক ও থাল সিতকাঞ্চন (platinum) মণ্ডিত করা উচিত। এই ক্ষুদ্র থালটী যাহাতে লেন্সের কেন্দ্র স্থানে (focus) থাকে তাহা করিতে হইবে, এবং ঐ থালটী যেন লেন্সের নির্গত রশ্মির সহিত অর্দ্ধ সমকোণ করিতে পারে। উপরোক্ত স্বচ্ছ প্রস্তর ও কাচ নির্ম্মিত আধারের বহির্ভাগস্থ তার প্রান্তদ্বয়, ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ে সংযোজিত করিতে হইবে। গোলক ও থালের মধ্যে যে ব্যবধান থাকিলে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যবধান থাকা আবশ্যক। বহিররুণ-রশ্মি থালের উপর পতিত হইলেই গোলক ও থালের মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইবে এবং বহিররুণ-রশ্মির নিবৃত্তির সহিত স্ফুলিঙ্গেরও নির্ব্বাণ হইবে। বহিররুণ রশ্মি দ্বারা বায়ুর বিদ্যুৎপরিচালনাশক্তি বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার স্থানে অন্তর্গোল দর্পণ ও তাড়িতালোকের সম্মুখস্থ কাচের আবরণীর উন্মোচন ও সংস্থাপন দ্বারা ইচ্ছামত বহিররুণ-তরঙ্গ আকাশে প্রবাহিত করিতে ও নিবৃত্ত করিতে পারা যায় এবং ইহার অনুযায়ী তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি, সংবাদ গ্রহণ স্থানে আধার মধ্যে সংঘটিত হয়; এইরূপ আলোক সাংকেতিক দ্বারা একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। যদি কর্ণ দ্বারা সংবাদ শুনিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্যাটারীর তারের মধ্যে টেলিফোন্ যন্ত্র স্থাপিত করিতে হইবে; স্ফুলিঙ্গ যেমন

উদ্ভূত হইবে তদনুযায়ী চিড়িক্ বা ক্র্যাক্ (crack) শব্দ শ্রোতার কর্ণ গোচর হইবে। যদি মর্সেসের বার্ত্তাবহ যন্ত্রের মত সংবাদ মুদ্রিত করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাটারীর তারের মধ্যে সাধারণ তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের রিলে ও ইণ্ডিকেটর অংশ স্থাপিত করিতে হইবে। এই প্রণালীতে জিক্লার প্রায় এক মাইল দূর স্থানে সংবাদ পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন। যন্ত্রের উৎকর্ষের সহিত যে দূরতার বৃদ্ধি হইতে পারিবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

স্বর্গীয়া কবি প্রমীলা নাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রমীলার পতিপদে আত্মত্যাগ বড়ই মধুর ও আন্তরিক বলিয়া মর্ম্ম-স্পর্শী। আমরা তাঁহার সাময়িক হৃদয়োচ্ছ্বাস হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

'জীবনের সব সাধ প্রাণের বাসনা নাথ!
ঘুমাক্ ও চরণে তোমার,
তোমারি স্নেহের করে মেটে যেন চিরদিন
প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা আমার।
জানিনা হৃদয় তব, দেখি নাই এজীবনে,
হাতে বেঁধে দিতেছে সংসার,
আমি শুধু এই জানি দেবতাও অদৃশ্য ত
পূজি তবু চরণ তাহার,
তোমায়(ও) দেবতা বলি দিতেছি এ পুষ্পাঞ্জলি
দিতেছি ও হৃদি উপহার।'

আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর কথা। পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দাম্পত্য প্রণয়ের এরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিনা জানি না।

বিবাহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর প্রমীলা-জীবনের সুখময় অংশ। এই সময়ে নববধূ বেশে প্রমীলা স্বামীসদন বারুদি বা সোণারগাঁয় যাইয়া কিছুদিন বসবাস করিয়া আসিলেন। তাঁহার সাহিত্য সেবার এখনো বিশেষ কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। প্রমীলার বড় আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বিবাহিত জীবন তাঁহার কবিতা রচনার চির অন্তরায় হইবে, তাই তিনি কুমারী অবস্থা পরিবর্ত্তন কালে সকরুণ আর্ত্তধ্বনি তুলিয়াছিলেন—

"তিন দিন দেও অবসর,
বিষাদের ক্ষীণ কায়া　　আজ(ও) ছড়াইয়া ছায়া
কবিতার গলা জড়াইয়া　　থেকে থেকে উঠিছে কাঁদিয়া,
একবার আদর করিয়া　　বুকে তারে রাখিব তুলিয়া,
তিন দিন দেও অবসর!
আজীবন ভালবেসে হায়,
হৃদয়ের মাঝখানে　　মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে,
রাখিয়াছি মূরতি যাহার　　সুখে দুঃখে সঙ্গিনী আমার,
পাষাণেতে বাঁধি হৃদি হায়　　দিব আজ তাহারে বিদায়,
তিন দিন দেও অবসর।"

প্রমীলা কল্পনায় যত আশঙ্কা করিয়াছিলেন বাস্তবিক কিন্তু তাহা ঘটে নাই। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্য সেবা তাঁহার কুমারী অবস্থারই ন্যায় চলিতেছিল। এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় এবং শেষ কবিতা পুস্তক "তটিনী" প্রকাশিত হইল। তটিনীর অনেক গুলি কবিতাই তাঁহার কুমারী জীবনে লিখিত এবং পূর্ব্বে "সাহিত্য" "প্রতিমা" "ভারতী" "কল্পনা" ও "বামাবোধিনী" পত্রিকাতে সমাদরে

গৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার প্রমীলার যশোভিত্তি বঙ্গ-সাহিত্যে দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সমস্ত সাময়িক পত্র সম্পাদকগণ এক বাক্যে লেখিকার কবিত্ব শক্তির ক্রমন্নোতি উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার রচনার উত্তরোত্তর অধিকতর পারিপাট্য ও উৎকর্ষ স্বীকার করিলেন। বাস্তবিকই "তটিনী"র তরঙ্গ ভঙ্গ বড়ই প্রীতিপ্রদ ; ইহার মৃদুমন্দ কল্লোল বড়ই মদিরাময় এবং ইহার শ্যামলতটবাহী সুশীতল সমীর বড়ই স্নিগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী। 'সময়' ইহার প্রতিপংক্তিতেই বিচক্ষণ কবির অনুপম রচনা নৈপুণ্য দেখিলেন এবং স্ত্রীলোকের এরূপ সুন্দর কবিতা রচনা বঙ্গের অসামান্য গৌরব ও আনন্দের বিষয় মনে করিলেন। "বঙ্গ-নিবাসী" আশা করিলেন যে রচয়িত্রীর কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইলে সমগ্র বঙ্গভূমি মুগ্ধ হইবে। 'সহচর' ও 'Bengalee' প্রমীলার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা পরিহার করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রমীলারও সেই ইচ্ছা এক্ষণে হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। তিনি বড় সাধে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"মাত ! বঙ্গভাষা মিটিবে কি আশা
দিবে কি চরণে স্থান ?
আকিঞ্চন পুরে সেবিতে তোমারে
তনয়া কাতর প্রাণ ?"

জননী বঙ্গভাষা বোধ হয় প্রমীলার প্রথম সাধটি পূর্ণ করিয়াছেন, এমন সেবিকা তাঁহার বড় বেশী নাই, সহজে চরণে ঠেলিতে পারিবেন না। কিন্তু হায় বিধিবশে প্রমীলার শেষ সাধটি মিটিল না, মনের সাধ তাঁহার মনেই মিশাইল।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই তিনি জননী হইলেন। পুত্র মুখ

সন্দর্শনে প্রাণময়ী প্রসূতির স্নেহের উৎস খুলিয়া গেল। তিনি মনের আবেগে প্রাণ পুতলি শিশুটিকে সোহাগ করিয়া বলিলেন—

"ওই মুখ পানে চেয়ে এ সংসার দেখিব চাহিয়ে,
ওই মুখ পানে চেয়ে বিলাইব স্নেহ ভালবাসা,
হৃদয়ে ফুটিবে পুন নির্ব্বাপিত কত সুখ আশা।
ও নিঃস্বার্থ স্নেহনীরে ভাসাইয়া এ হৃদয় মন,
ওই চারু মূর্ত্তি খানি বুকে লয়ে যাপিব জীবন।" *

প্রমীলার পুত্রপ্রেম-উথলিত হৃদয়ের বাসনা এইরূপ, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। পুত্র লাভের বৎসরেক পরে যে ভয়াবহ পীড়ার আতঙ্ক এত দিন প্রমীলার অন্তরে দুঃস্বপ্নের ন্যায় গুরুভারে বিচরণ করিতেছিল, সেই ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ সত্য সত্যই তাঁহার দেহে দেখা দিল। ভিষকেরা তাঁহার কাশ রোগ হইবার আশঙ্কা করিলেন এবং সাগর-বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। প্রমীলার আত্মীয় স্বজনেরা ঐ ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিলেন। একান্ত অনুগত পতি এবং শিশু পুত্র সমভিব্যাহারে প্রমীলা অচিরেই সমুদ্র পথে সিংহলদ্বীপে নীতা হইলেন। কিছুদিন কলম্বো বন্দরে এবং লেভিনিয়া শৈলে অবস্থান করিয়া তিনি মান্দ্রাজে আসিলেন, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বঙ্গোপসাগরের অনন্ত বারিরাশি দর্শন করিয়া তিনি যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন তাহা হিন্দুললনার প্রত্যক্ষ সাগর দৃষ্টে বঙ্গ ভাষায় প্রথম কবিতা বলিয়া আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে

* সাহিত্য ১৩০৩ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রমীলা রচিত 'শিশু' শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

পারিলাম না। ইহার জন্য আমরা সুযোগ্য সহযোগী সাহিত্যের নিকট ঋণী।*

"অকুল, অনন্ত বারি, তরঙ্গিত দূর দূরান্তর ;
সীমাশূন্য কুলশূন্য অসীম এ অনন্ত-সাগর।
অনন্তের অন্তঃস্থল পৃথিবীতে রাখিছে ঢাকিয়া,
তরঙ্গিত সিন্ধুবুকে অলসেতে পড়েছে হেলিয়া।
দূর হতে দূরান্তরে ছুটিতেছে তরঙ্গ ভীষণ।
গাঢ় নীল বারি রাশি মরকত বিমল যেমন।
স্থির নীলিমাকাশ বিরাজিছে বারিধির বুকে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু ছুটিয়াছে গগনের মুখে।
সাম্য চাঞ্চল্যের এই সুগভীর মহান্ মিলন,
এক স্থির, অপরের দিগব্যাপী কল্লোলে ভীষণ।
সীমাশূন্য মহাগীত উঠিতেছে কল্লোলে কল্লোলে ;
প্রকৃতি গভীর স্থির সুগভীর সাগরের জলে।"

* * * *

সাগর বায়ু সেবনে এবং স্থান পরিবর্ত্তনে প্রমীলার সমূহ পীড়া উপশমিত হইয়া তিনি এরূপ প্রত্যক্ষ কায়িক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিলেন যে তাঁহার পুনঃ পীড়িত হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। তাঁহার ক্ষীণ দেহ পুষ্ট হইল, চম্পকবরণ রক্তিমাভ হইল, এবং দেহে নূতন বল ও মনে স্ফূর্ত্তি আসিল। কিন্তু হায়! এই নবস্বাস্থ্যলাভ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় হইল।

পুত্রলাভের দুই বর্ষ পরেই প্রমীলা কন্যা মুখ দর্শন করিলেন। এত দিনে তাঁহার নারী জীবন অধ্যায়িকার কোন অধ্যায়ই অসম্পূর্ণ রহিল না বটে, কিন্তু এইবার প্রমীলার বিবাহ বিষয়ে ৺মনোমোহন বাবুর

* সাহিত্য, পৌষ, ১৩০৪।

অমঙ্গল কল্পনা ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিণত হইল। এই দ্বিতীয় সন্ততি প্রসবের পর প্রমীলার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। এবার তাঁহার পীড়া যথার্থই ভয়ের কারণ হইল।

অশুভ সূচনা সংক্রামক। এতদিন প্রমীলার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, এই বিশ্বাস তাহার নিজ হৃদয়েই আবদ্ধ ছিল। এই বার তাঁহার জননীর অন্তরেও বুঝি অজ্ঞাতসারে এই আশঙ্কা প্রবেশ করিল। এসময়ে আসন্ন বিপদাশঙ্কার কোন কারণ ছিল না সুতরাং সে সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু তিনি একটী বিচিত্র স্বপ্ন দর্শনে ভীতা না হউন অতিশয় বিস্মিতা ও বিচলিতা হইলেন। তিনি নিদ্রাবেশে দেখিলেন যেন দুইজন দিব্যাঙ্গনা একটী শ্বেত পক্ষীপৃষ্ঠে প্রমীলার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত কথোপকথনের পর অকস্মাৎ তাঁহাকে লইয়া অদৃশ্যা হইলেন। তিনি তাঁহার এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর স্বপ্নের অর্থ তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতা মনোমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে, মনোমোহন বাবু চিন্তিত স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন "কি জানি।" প্রিয়তমজনবিয়োগ অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ হইলে মানব-অন্তর জ্ঞাতসারে ঐ অমঙ্গল চিন্তাকে স্থান দিতে চাহেনা, কিন্তু অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ এই আত্ম প্রতারণার আয়ত্বাধীন নহে।

চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে প্রমীলা এবার নিঃসন্দেহ ক্ষয়কাশ পীড়ায় (Pthisis) আক্রান্তা হইয়াছেন। গতবারের সুফলে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে মান্দ্রাজে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু এবার ব্যাধির কিছুমাত্র প্রতিকার হইল না। বাষ্পীয় অর্ণবযানে স্বদেশে প্রত্যাগমন-কালে জলতরঙ্গে দোদুল্যমান পোতোপরি দুর্ঘটনাক্রমে উপরিতন কক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তিনি আঘাত পাইলেন। পরে জানা গেল যে

ঐ আঘাতে তাঁহার পঞ্জরের একখানি অস্থি ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এই দুর্ঘটনা তাঁহার কঠিন পীড়াকে কঠিনতর করিয়া তুলিল। মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর আরোগ্য আশায় তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে চুনার, ও মধুপুরে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু কোন স্থলেই সুফলের সম্ভাবনা দেখা গেল না। অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় পুনরানয়ন করা হইল, এবং এই খানেই এই দুর্লভ রমণী জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইল। দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর ব্যধির যন্ত্রণাও তাঁহার চিরমধুর স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে নাই। পীড়িত শয্যায় তাঁহাকে দেখিলে মূর্ত্তিমতী শান্তি ও সহিষ্ণুতা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার সরল ও পবিত্র মুখ খানিতে যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইত না। ধীরে ধীরে তাহার স্নেহ মমতা মাখান কথাগুলি সকলেরই কর্ণে মধুক্ষরণ করিত।

এই সময় মনোমোহন বাবু উতকামন্দ যাইবার বাসনায়, প্রমীলার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই দেখাই উভয়ের শেষ দেখা হইল। মনোমোহন বাবু সান্ত্বনাচ্ছলে ঐদিন প্রমীলাকে বলিয়াছিলেন 'মা, আমাদের সকলকেই এখান হইতে যাইতে হইবে, দুই এক দিন আগে আর পিছে। হয়ত আমিই তোমার আগে যাইব, না হয়ত তুমি আমার আগে যাইবে'। কে জানিত যে তাঁহার এই কথাগুলি ভবিতব্য বাক্যের ন্যায় হইবে। তিনিই প্রমীলার ১৯ দিন পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমিকে কাঁদাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

প্রমীলাকে তাঁহার প্রিয়তম মাতুলের মৃত্যু সংবাদ শুনাইলে পাছে তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে অসহনীয় আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় কেহই তাঁহাকে এ শোকসংবাদ দেয় নাই। তাঁহার মাতুল কৃষ্ণনগরে

পীড়িত কেবল মাত্র এই কথা বলা হইয়াছিল। তথাপি তিনি তন্দ্রাবেশে মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, কে যেন তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার এক রমণী বন্ধুকে একদিন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "* * বড়মামা এসেছেন, চেয়ার দাও।" বুঝিবা তাঁহার অন্তরাত্মা প্রিয়জন বিচ্ছেদ অনুভব করিয়াছিল।

সন ১৩০৩ সালের ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার প্রমীলার ইহজীবনের শেষ দিন। জীবন-প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া, তিনি দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন গণের নিকট একে একে চির বিদায় গ্রহণ করিতে ছিলেন। ঐদিন শ্যামা পূজা। তিনি মধ্যাহ্নকালে তাঁহার স্নেহ-পুত্তল চারিবর্ষ বয়স্ক পুত্র ও শিশু কন্যাটিকে এক একবার হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পুত্রটিকে বলিলেন "বাবা আশীর্ব্বাদ করি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি যেন জগতে একজন মহৎ লোক হও।" দুগ্ধপোষ্যা কন্যাটিকে বলিলেন "মা আমি তোমাকে নিরাশ্রয়া ও মাতৃহীনা করিয়া চলিলাম। জগদীশ্বর তোমাকে পবিত্রা ও সুখী করুন।" রাত্র সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার জননীকে অতি স্নেহভরে নিদ্রা যাইতে বলিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই পীড়া-প্রাবল্য হেতু তাঁহাকে জাগরিত করিয়া কহিলেন "মা আমার সময় আসিয়াছে, উঁহাকে ও বাবাকে ডাকুন্।" মাতার আর্ত্তনাদ তন্মুহূর্ত্তে প্রমীলার পতি ও পিতাকে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে আনয়ন করিল। সেই শ্যামাপূজার অর্দ্ধরাত্রে, যে সময়ে আনন্দ-বাদ্যে ও আতসবাজি-শব্দে দিগ্বিদিগ প্রতিধ্বনিত করিয়া নগরীময় জগৎ জননীর মহাপূজা আরম্ভ হইয়াছে, সেই পবিত্র ও গম্ভীর মুহূর্ত্তে সাধ্বী তদ্গত-প্রাণ পতি হস্তে তাঁহার শেষ চুম্বন করিলেন। পরক্ষণেই শান্তিময়ীর চির শান্তি লাভ হইল।

স্বর্গপ্রসূন! মরজগতের অনভ্যস্ত বায়ু তোমাকে ম্লান করিতেছিল। তুমি মন্দার পারিজাতের দেশে যাও! অমর কবিকুঞ্জ চিরশোভিত ও সুরভিত করিবার জন্য দেবললনাগণ অনেক দিন হইতে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

রাজপুতদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ।

নাত্রায়ত রাজপুতদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। পুমার, চোহান, ভাটী, সিষোদিয়া, পরিহার, সোলঙ্কি, রাঠোর প্রভৃতি রাজপুত শ্রেণী হইতে নাত্রায়তদিগের উৎপত্তি। ইহাদের পালি, বালি, জালোর, সাঁচোর ও মালানি এই কয়েকটী পরগণায় অধিক বাস আছে। ইহাদের সহিত অন্য উচ্চশ্রেণীর রাজপুতেরা আহার করেন না বা এক হুঁকায় তামাক খান্ না। উচ্চ বংশীয় রাজপুতদিগকে জমীদার বা সর্দ্দার বলে, কিন্তু নাত্রায়ত শুদ্ধ রাজপুত নামেই অভিহিত হয়। ইহাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। নাত্রায়ত রমণীরা মাথায় কলসী লইয়া জল আনিতে যায় এবং ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত স্বামী বা পুত্রের জন্য আহারাদি লইয়া গিয়া থাকে। সচরাচর নাত্রায়তদিগের আচার ব্যবহার প্রায় অসভ্যের মত। সিবানা নামক পরগণায় নাত্রায়তেরা বিধবা-বিবাহকালীন কন্যা পক্ষীয় হইতে ৮৪৲ টাকা "নাতা দস্তর" বা পণ লইয়া থাকে। এজন্য তথাকার নাত্রায়তদিগকে "চৌরাসিয়া" কহে।

জালোর মাড়োয়াড়ের একটী পরগণার নাম। কথিত আছে

তথায় কুমারদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় কন্যার সহিত জসলমিয়রের রাবলের (অধিপতির) বিবাহ হয়; গ্রহ বৈগুণ্যবশতঃ বালিকা বয়সেই উক্ত কন্যা বিধবা হয়। যখন তাহার সহচরীরা উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ও অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া নিজ নিজ স্বামী সদনে যাইত, তখন এই অভাগিনী রাজ কন্যারও স্বামী সহবাস করিতে একান্ত বাসনা হইত। একে কন্যার বালিকা বয়সে বৈধব্য দশা দেখিয়া রাণীর শোকের অবধি ছিল না, এখন আবার তাহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া তিনি সাতিশয় ম্রিয়মাণা হইলেন। অবশেষে তিনি অবসর বুঝিয়া একদিন কন্যার মনোগত ভাব রাজাকে জানাইলেন। এবং কন্যার আবার যাহাতে বিবাহ হয় সে জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে অনেক অনুনয় করিলেন। রাজা তাঁহার পুত্র বিরামদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। অবিলম্বে চিতোরের রাণার নিকট ঘটক পাঠান হইল; কিন্তু পাত্রী যে বিধবা একথা প্রকাশ করা হইল না। রাণা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন এবং তদুদ্দেশে জালোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজপুতানার সর্ব্বত্রে প্রথা আছে যে হিন্দুদের বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যের সময় দরজার উপর কাষ্ঠ নির্ম্মিত কতিপয় পক্ষী টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তাহার নাম "তোরণ"। রাণা জালোরে বিবাহ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে বহির্দ্বারোপরি "তোরণ" নাই। বিস্মিত হইয়া রাণা কারণ জিজ্ঞাসিলে উত্তর পাইলেন যে "আমাদের প্রথানুসারে উহা চামরিতে (ছাদ্‌নাতলায়) রাখা হইয়াছে। সেখানে যাইলে দেখিতে পাইবেন।" রাণা নিঃসন্দেহ চিত্তে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলে বিরামদেব সহসা অসি নিষ্কোসিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিধবা ভগিনীকে

বিবাহ করিতে বলিলেন। পাছে প্রজারা ও স্বদেশীয়েরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে প্রথমে রাণা স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু যখন কন্যা পক্ষীয়েরা তাঁহার রাজ্য নাশ হইলে, একটী দুর্গ সমেত গোড়য়াড় পরগণা দান করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন তাঁহার এই বিবাহে আর কোন আপত্তি রহিল না। তিনি ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন; সে বিবাহের নাম হইল "নাতা"। এদিকে রাজ-অন্তঃপুর হইতে রাণাকে তিন দিন বাহিরে আসিতে না দেখিয়া তদীয় অনুচরেরা সন্দিহান হইয়া উঠিল এবং রাজা কুমারদেবকে বলিল যে হয় আমাদের রাণাকে আনিয়া দিন, নচেৎ আপনি স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন! এ সংবাদ রাণার নিকট পৌঁছিলে তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে রাজ প্রাসাদের নিকট ডাকাইয়া আনিয়া বাতায়নের মধ্য হইতে দর্শন দিলেন। সেই দিন হইতে রাণা-বংশ মধ্যে বিবাহ সময়ে ঐরূপে গবাক্ষ মধ্য হইতে মুখ দেখান প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহাকে বলে "বিয়াকা ঝাঁকি"।

দরিদ্র রাজপুত, যাহাদের দারিদ্র্যের অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্য বিবাহ হয় না তাহারাই প্রায় "নাতা" বিবাহ করিত। কিন্তু এরূপ বিবাহ করিলে সঙ্গেই সঙ্গেই জাতিচ্যুত হইতে হইত। তাহাদের সহিত কেহ একত্র এক পংক্তিতে পানাহার করিত না; বা তাহাদের সঙ্গে বিবাহাদি হইত না। এই প্রকারে নাত্রায়ত রাজপুতের উৎপত্তি হয়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি চলিত। অন্যান্য যে সকল রাজপুত তাহাদের ঘরে বিবাহ করিত, তাহারাও জাতিচ্যুত হইয়া ঐ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল।

যে স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা করে, সে তাহার মৃত স্বামীর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে এবং যে তাহাকে

বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে "নাতার" জন্য টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। "নাতার" জন্য পণ বরপক্ষে অবস্থা বিশেষে দিতে হয়। ১৪০৲ টাকার বেশী "নাতা দস্তর" নাই। বিধবার মৃত স্বামীর পিতা বা মাতার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। পূর্ব্ব স্বামীর প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কারাদি ও তাহার ঔরসজাত পুত্র কন্যাদিও ফিরাইয়া দিতে হয়। নূতন স্বামী নূতন বস্ত্রালঙ্কার ও চুড়ি পরাইয়া স্ত্রীকে প্রায় শনিবার বা সোমবার রাত্রে নিজ বাটীতে লইয়া যায়। কখন কখন রবি মঙ্গল বারেও "নাতা" পরিণীতা স্ত্রীকে তাহার স্বামী নিজ বাড়ীতে লইয়া যায়। জালোরে দিবসেও লইয়া যাইবার প্রথা আছে। বিধবার স্বামী বা পিতৃবংশীয় কাহারও সহিত "নাতা" হয় না। উচ্চ জাতীয় রাজপুত "নাত্রায়ত" জাতীয় রাজপুত কন্যাকে বিবাহ করিলে জাতিচ্যুত হইয়া থাকেন এবং ঐ বিবাহের সমুদ্ভূত পুত্র কন্যাও জাতিতে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে একটা প্রবাদ আছে ঃ—

"নাত্রায়াত কি তিজি পিরহি গড় চড়ে হ্যায়" অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষের পর নাত্রায়ত কন্যা দুর্গারোহরণের যোগ্য। অর্থাৎ তখন তাহাকে দুর্গাধিকারী জাইগীরদার বা রাজা পাণিগ্রহণ করিতে পারেন যদিও এরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীনন্দলাল গুপ্ত।
(যোধপুর।)

অপূর্ব্ব-মিলন।

হরিশ্চন্দ্র রায় কোনও এক ধনী জমীদারের একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার শৈশব অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ

করেন। তিনি কলিকাতায় শ্যামবাজারে একটি বাটিতে বাস কারতেন। সংসারের মধ্যে তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তাঁহার স্ত্রী রূপবতী, কিন্তু যেমন রূপ তেমন গুণ তাঁহার ছিল না, স্বামীকে আদৌ যত্ন করিতেন না। কিসে স্বামী সুখে থাকেন, কি করিলে স্বামীর মঙ্গল হয়, এ চিন্তা তাঁহার অন্তরে বড় একটা স্থান পাইত না। আপনার সাজ সজ্জা লইয়া তিনি বিব্রত থাকিতেন। যে সংসারে গৃহিণী ভাল না হয়, সে সংসারের কিছুই শৃঙ্খলা থাকে না। তিনি সকল কার্য্য দাস দাসীর হস্তে দিয়া বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং তদ্দ্বারা কুফল ব্যতীত সুফল হইত না। হরিশ্চন্দ্র অতিশয় সচ্চরিত্র ব্যক্তি। তিনি তাঁহার স্ত্রীর এই সকল ব্যবহার দেখিয়াও কখন তাঁহার প্রতি কুব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তাঁহার একটি প্রধান দোষ এই যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর এই সকল দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা আদৌ করিতেন না। যদি কোন দিন অনেক ঘুরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "এক গ্লাস জল দাও ত" ? তাঁহার স্ত্রী অমনি উত্তর করিতেন "আমি তোমার চাকরাণী নাকি ?" এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

কলিকাতায় বাস করিবার পর তাঁহার দু'একটি বন্ধু জুটিয়াগেল। তাহারা হরিশ্চন্দ্রকে সঙ্গতিসম্পন্ন দেখিয়া কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে লাগিল। তিনি কিছুতেই তাহাদের চাতুরীতে ভুলিলেন না। তখন তাহারা কৌশল আরম্ভ করিতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ণে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একজন বন্ধু আসিয়া বলিল "ভাই আজ আমাদের বাগানে মাছ ধরিতে যাইবে ? তুমি যদি সম্মত হও ত চল ; কারণ

আর বেশী দেরী করা হইবে না।" হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন যে বাটিতে যতক্ষণই থাকেন ততক্ষণ মনে কিছুমাত্র শান্তি পান না। তিনি এখন শান্তি প্রার্থী; অতএব তিনি তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধু সমভিব্যাহারে বাগানে গমন করিলেন।

তাঁহারা দুইজন বাগানের বাঁধাঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছেন; এমন সময় তাঁহার বন্ধু বলিল, "ভাই আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি এখনই আসিতেছি তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার ছিপ্‌টা দেখো।" হরিশ বাবু বলিলেন "আচ্ছা ভাই বেশী দেরী করিও না।" হরিশ্চন্দ্রের বন্ধু চলিয়া গেলে পর তিনি ছিপ্‌ লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া আছেন, এমন সময় "ওগো আমায় মেরে ফেল্লে গো, তোমরা কে কোথায় আছ শীঘ্র আমায় রক্ষা কর গো" পুনঃ পুনঃ এইরূপ বামা কণ্ঠ নিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি স্বভাবতঃই সাহসী ও বলিষ্ঠ; অসহায়া রমণীর সাহায্যার্থে সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া বাগানের মধ্যস্থিত অট্টালিকার একটি গৃহে যেমন প্রবেশ করিলেন, অমনই পশ্চাৎ হইতে কে সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। হরিশ্চন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা একটি অতিশয় সুন্দরী যুবতী তাঁহার প্রতি মৃদু মৃদু হাসিয়া ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে, আর কোথা হইতেই বা এই আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলাম?" তখন রমণী উত্তর করিল "আমি আপনার দাসী; আমাদের বাটির জানালা হইতে পথে আপনাকে অনেকবার যাইতে দেখিয়াছি ও আমার ভাই,—আপনার বন্ধুর নিকট

আপনার গুণের কথাও অনেক শুনিয়াছি। আমি আপনার রূপে ও গুণে মোহিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন আমি আপনার চরণ সেবা করি; আমি আপনাকে আমাদের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আমার ভাইকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। তাই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি, আমার দোষ হইয়াছে ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া সেই দুশ্চারিণী হরিশ্চন্দ্রের চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

হরিশ্চন্দ্র এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সকল বাক্য হরিশ্চন্দ্রের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন রমণী যে এত সরলা হয়, এত অকপট হৃদয়ে একাকিনী একটি পুরুষের নিকট আপনার দোষ স্বীকার করিতে পারে, তাহা ত আমি জানিতাম না। এতদিন মনে করিতাম রমণীর হৃদয় পাষাণে গঠিত; কিন্তু এ আবার কি? এ আমার ন্যায় একজন সামান্য ব্যক্তির চরণ সেবার নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে এবং এক্ষণে তাহার দোষ হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছে?

হায়! হরিশ্চন্দ্র, এই অন্তঃকরণ যে বিশেষ চাতুরীময় তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না। কিন্তু তোমারই বা দোষ কি? যিনি কখনও আপনার স্ত্রীর ভালবাসা পান নাই, যিনি স্ত্রীর সেবা, যত্ন কি তাহা জানেন না, যিনি স্ত্রীর নিকট সামান্য একগ্লাস জল চাহিলে তিরস্কৃত হন, তাহার নিকট অযাচিত হইয়া যদি কোনও রমণী মধুর সম্ভাষণে তাঁহার পদসেবা ভিক্ষা মাগে, তাহা হইলে তাঁহার কর্ণে সেই সকল বাক্য যে মধুবর্ষণ করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি! হরিশ্চন্দ্র সেই রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে পদতল হইতে উঠাইলেন ও বলিলেন "আমি আপনার সরলতায় মোহিত হইয়াছি,

আপনি যে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করিলেন ইহাতে আমি আপনার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই রমণী বলিল "প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেব, আমি আপনার দাসী মাত্র, আপনি আমায় "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিয়া লজ্জা দিতেছেন কেন? যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ "আপনি" সম্বোধন ছাড়িয়া দিন।" এই সকল প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিশ্চন্দ্র মনে করিলেন সত্য সত্যই তিনি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছেন। তিনি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন এবং সেই রমণী তাঁহার প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।

পাঠক, আপনারা সকলেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন কিরূপে সর্প আপনার শীকার বশীভূত করে। কিন্তু কুটিলা রমণী কুটিল কটাক্ষে পুরুষকে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বশীভূত করিতে পারে। হরিশ্চন্দ্র কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি এখনও অবিবাহিতা?" যুবতী উত্তর করিল "না অতি শৈশবে আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের দুইমাস পরেই ভীষণ জ্বরে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আমার এক্ষণে তাঁহাকে কিছুই মনে নাই; কিন্তু দেখুন দেখি আমাদের হিন্দুধর্ম্মের এ সম্বন্ধে যে সকল রীতি আছে সে সকল কি কঠিন। তিনি উত্তর করিলেন "সত্যইত আমারও কঠিন বলিয়া মনে হয়।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় কে অতিশয় চীৎকার করিয়া ডাকিল "হরিশ।" হরিশ্চন্দ্র আপনার বন্ধুর স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে বলিল "বেশ ত ভাই তোমায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমি যে হায়রাণ্ হইয়া গেলাম।" হরিশবাবু বলিলেন "যাও যাও, এখন

ঠাট্টা রাখ, বলি ইহার জন্য আর এত কৌশল কেন ? তখন প্রকাশ করিয়া বলিলেইত হইত।" যাহা হউক তাঁহার বন্ধু স্থির করিল যে আপাততঃ সেই যুবতীকে একটি বাগান ভাড়া করিয়া তথায় রাখা হইবে; তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এইরূপে নানা আমোদ আহ্লাদের পর তাঁহারা সেই উদ্যান হইতে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন।

সেই দিবস হরিশ্চন্দ্র বাটীতে যাইতে অতিশয় ঘৃণা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন বাটীতে পৌঁছিয়াছেন, অমনই তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে অতি রূঢ়স্বরে বলিলেন "এতক্ষণ ছিলে কোথা ? আমাকে কি দিবারাত্রিই বাটীর সকল কায দেখিতে হইবে? কি জানি বাপু বাপ মা কেন তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন।" হরিশ্চন্দ্র যদিও পূর্ব্বে এইরূপ অনেক গঞ্জনা শুনিয়াছেন কিন্তু অদ্য আর এ সকল সহ্য করিলেন না। তিনি অনেক কথা বলিলেন, অনেক তিরস্কার করিলেন, পরে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেই দিন অবধি তিনি আর বেশী বাটীতে যাইতেন না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর মনে সেই দিবস হইতে কি এক অভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। স্বামীর প্রতি পূর্ব্বকৃত যত কুব্যবহার সব একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন যে, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারেন নাই যে এক্ষণে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষায় আর কোনও সুফল ফলিবে না।

হরিশ্চন্দ্র এখন সেই উদ্যানেই থাকেন। বাটিতে কদাচিৎ কখনও আসেন, তাঁহার স্ত্রীর কাকুতি মিনতি তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। তিনি মনে করিতেন ও সকল ছলনা মাত্র; তাঁহার স্ত্রী হিংসার বশবর্ত্তিনী

হইয়া তাঁহাকে পুনরায় আপনার আয়ত্তাধীনে আনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। হরিশ্চন্দ্রের এই দুই বৎসরে এত অধিক খরচ হইয়া গেল যে তাঁহাকে দুই খানি জমীদারী বিক্রয় করিতে হইল। এ দিকে তাঁহার আয়ও ক্রমে কমিয়া আসিল। একদিন কোন কর্ম্মোপলক্ষে তিনি বাটিতে আসিয়াছিলেন, তথা হইতে বাগানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে রাগে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সেই বন্ধু ও আর একটি বাবু বাগানের হল ঘরে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সেই ভালবাসার সামগ্রী কখন নৃত্য করিতেছে, কখনও বাবুটীর গলা জড়াইয়া ধরিতেছে। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। যেমন সেই বাবুটি তাঁহার দিকে চাহিয়াছে, অমনই আপনার হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা বাবুটির মস্তকে এমন প্রহার করিলেন যে বাবুটি অচৈতন্য হইয়া গেলেন এবং তাঁহার মস্তক হইতে রুধির ধারা ছুটিতে লাগিল। সেই গৃহস্থিত সকলেই হরিশ্চন্দ্রকে দেখিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র, সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মনে করিলেন যে, বাবুটি তাঁহার গুরুতর আঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দেহ দুই এক বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে দেহ অসাড়। সেই গৃহে আর বিলম্ব করা উচিত নয় মনে করিয়া তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি বরাবর আপনার বাটীতে আসিয়া ক্যাস্ বাক্স হইতে কিছু টাকা লইয়া কাশীধামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বাটীতে তখন দাস দাসী কেহ ছিল না যে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করে। কাশীতে সন্ন্যাসী বেশে গোপন ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

উক্ত ঘটনার তিন দিবস পরে তাঁহার স্ত্রী একখানি পত্র পাইলেন ; পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে পত্রে তাঁহার স্বামীর স্বাক্ষর রহিয়াছে, পাঠান্তর সব জানিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামীর কোন ঠিকানা পাইলেন না। তিনি তখন কতই ক্রন্দন করিতে এবং আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। মনে করিলেন যে, তিনি যদি স্বামীকে যত্ন ও আদর করিতেন, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাঁহাকে কুপথে লইয়া যায়।

ওদিকে যে বাবুটির মস্তকে হরিশ্চন্দ্র প্রহার করিয়াছিলেন সে বাবুটি মরেন নাই, কিন্তু গুরুতর আঘাত লাগায় তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ব্যবসা করেন, তাঁহার বেশ সংস্থান আছে, তাঁহার নাম বিজয়কৃষ্ণ। তাঁহার স্ত্রী অতিশয় গুণবতী। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের সেই পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, হরিশ্চন্দ্রের আয় কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া, এই ভদ্রলোকটীর সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। তিনি এই কার্য্যে উক্ত ঘটনার দিবস প্রথম ব্রতী।

বিজয় বাবু দশ বার দিন পরে ঈষৎ সুস্থ হইলেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্রের সেই বন্ধু এক দিবস বিজয় বাবুর নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিল "মহাশয় আপনি তাহার নামে এখনও ওয়ারেণ্ট বাহির করেন নাই ? বিজয় বাবু বলিলেন "না তাঁহার দ্বারাই আমার শিক্ষা হইয়াছে, আমি আপনার লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীর মনে দারুণ কষ্ট দিয়া একটি সামান্য বেশ্যা লইয়া আমোদ করিতে গিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমায় বেশ শিক্ষা দিয়াছেন ; হরিশ বাবু আমার গুরু ; আমি তাঁহার নামে কখনই নালিশ করিব না, আপনি আমার বাটিতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর আসিবেন না।" ঐ বন্ধুটী এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। সে মনে

করিল, যে এরূপ গুরুতর রূপে বিজয় বাবুর মস্তকে প্রহার করিল, যে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিল, তাহাকে তিনি অনায়াসে "গুরু" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। আর আমি বন্ধুত্বের ভাণ দেখাইয়া, যে আমার কখনও কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে কুপথে লইয়া যাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলাম না।" তখন সে বিজয় বাবুর নিকট অতি কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং পূর্ব্বে সে হরিশ্চন্দ্রকে কুপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল সেই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বিজয় বাবুর নিকটে প্রকাশ করিল।

বিজয় বাবু সেই অনুতপ্ত বন্ধুকে ক্ষমাপ্রার্থী দেখিয়া স্বীয় উদারতা গুণে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিশ বাবুর উপস্থিত খবর কি—তিনি কোথায় থাকেন?" বন্ধুটি বলিল "আমি শুনিয়াছি তিনি কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না, তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দুঃখে ও কষ্টে কালযাপন করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া বিজয় বাবুর মনে অতিশয় কষ্ট হইল। তিনি হরিশ্চন্দ্রের কলিকাতাস্থিত বাটির ঠিকানা জানিয়া লইলেন।

পরদিন বিজয় বাবু আপন স্ত্রীকে হরিশ বাবুর স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় বাবুর স্ত্রী হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীর নিকট আপনার পরিচয়াদি দান করিয়া বলিলেন "ভগ্নি, কোন ভয় নাই, আমার স্বামী তোমার স্বামীকে ক্ষমা করিয়াছেন।" ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী তাঁহার পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন "দিদি, তোমার কাছে আমার কোনও কথা লুকাইবার নাই। আমি আমার স্বামীর মনে চিরকাল কষ্ট দিয়াছি—তাই আজ আমার এই দশা;

আমার ন্যায় হতভাগিনী এ জগতে আর কেহ নাই।" তখন বিজয় বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক সান্ত্বনা দিলেন; তিনি বলিলেন "ভগ্নি, আমি আমার স্বামীকে তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করিতে বলিব।" তিনি হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীকে আপনার বাটিতে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে সম্মত হইলেন না, অনেক পীড়াপীড়ির পরে সম্মত হইলেন।

বিজয় বাবু দুই মাস পরে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্বামীর চিন্তা হইতে বিরত হন নাই। আহার নিদ্রা এক রকম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিজয় বাবু সম্পূর্ণ আরোগ্য হন নাই, দেখিয়া তিনি কাহাকেও তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য বলিতে সাহস করিতেন না। কতদিন মনে করিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং স্বামীর অনুসন্ধান করিতে যাইবেন, এমন কি একদিন স্বামীর অনুসন্ধানার্থ পলাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বিজয় বাবুর স্ত্রী, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ভগ্নি, আমার স্বামী আরোগ্য হইলেই তোমার স্বামীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনুরোধ করিব। তুমি বুঝি মনে করিয়াছ যে আমি তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভুলিয়া যাইব।" তখন হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবেন ঠিক্ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক বিজয় বাবু আরোগ্য লাভ করিয়া, স্ত্রীর নিকট হরিশ্চন্দ্রের অনুসন্ধানের কথা পাড়িলেন। তিনি বলিলেন "চল আমরা সকলে মিলিয়া তীর্থ করিতে যাই। সেখানে হরিশবাবুরও সন্ধান পাইতে পারি এবং বায়ু পরিবর্ত্তনে আমার শরীরও সুস্থ হইতে পারে।"

তাঁহার স্ত্রী ইহাতে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। পর দিবস হইতে বিজয় বাবু তীর্থ পর্য্যটনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উপরিউক্ত কথোপকথনের দুই সপ্তাহ পরে হরিশ বাবুর স্ত্রীকে লইয়া তাঁহারা কাশীধামে যাত্রা করিলেন। কাশীতে দশ দিন ছিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের কোন সন্ধান পাইলেন না। তাঁহারা কাশী হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। হরিশ বাবুর স্ত্রী দেব দেবী দর্শন করিয়া মনে অনেক শান্তি পাইতেন। বিজয় বাবু বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকিবার নিমিত্ত একটি বাটি ভাড়া লইলেন। এক দিন দুই দিন করিয়া এক মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, হরিশ্চন্দ্রের কোনও সন্ধান নাই।

একদিন রাত্রে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে, রাত্র অত্যন্ত অন্ধকার; বৃন্দাবনের পথে জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। হঠাৎ বিজয় বাবুর বাটির দ্বারে একটি লোক ধাক্কা দিয়া ডাকিল "আমি নিরাশ্রয়, আমায় যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অদ্য রাত্রের মত আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয়।" বিজয় বাবু নীচে নামিয়া যেমন দ্বার খুলিলেন, অমনি ঝড়ের প্রভাবে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল; তিনি আপনার চাকরকে আর একটি প্রদীপ আনিতে বলিলেন এবং আগন্তুককে ঘরে বসাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই ভয়ানক রাত্রে একাকী বাটির বাহির হইয়াছেন?" সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, "আমি সন্ন্যাসী বহুদূর হইতে আসিতেছি, আপনি আজ আমায় আশ্রয় না দিলে বোধ হয় আমায় ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইত।"

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই, চাকর প্রদীপ লইয়া আসিল। সন্ন্যাসী সেই আলোকে বিজয় বাবুকে

দেখিয়াই পলায়ন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। বিজয় বাবুও জটাজুট শূন্য সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সজোরে ধরিয়া ফেলিলেন। এই সন্ন্যাসীই আমাদের হরিশ বাবু। তাঁহার পরচুলের দাড়ি ও জটা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল। রাত্রে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া সেই গুলি ভিক্ষার ঝুলির ভিতর রাখিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য লীলা, যাঁহার ভয়ে তিনি পরচুলের জটা ও দাড়ি ধারণ করিয়াছেন, তিনিই আজ এই ভয়ানক রাত্রে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। হরিশ্চন্দ্র পলাইবার উপক্রম বৃথা দেখিয়া হতাশ হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। বিজয় বাবু বলিলেন "হরিশবাবু আপনার কোন ভয় নাই, আমি আপনার অনুসন্ধানেই তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি।" হরিশ বাবু এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিজয় বাবু তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন "আপনি আমার গুরু, আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিব না।" হরিশ বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি একদিন রাগে অন্ধ হইয়া একটি সামান্য বেশ্যার জন্য যাঁহাকে খুন করিয়াছিলেন তিনি আজ তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিজয় বাবু তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। পরে একখানি কাপড় আনাইয়া তাঁহাকে পরিধান করাইলেন। দুই জনে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। বিজয় বাবু, সেই বন্ধু তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, সব বলিলেন। চাকর জলখাবার লইয়া আসিলে হরিশ্চন্দ্রকে বিজয় বাবু উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। আহার সমাপনান্তে বিজয় বাবু

ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি আপনাকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি—শপথ করুন আপনি আমার পুরস্কার যত্ন করিয়া রাখিবেন।" হরিশ্চন্দ্র উত্তর করিলেন "আপনার পুরস্কার যেরূপই হউক না কেন আমার শিরোধার্য্য ; আমি শপথ করিতেছি আপনার পুরস্কারের অযত্ন করিব না।" "পুরস্কার পাঠাইয়া দিতেছি" এই বলিয়া বিজয় বাবু গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র বসিয়া আছেন ও ভাবিতেছেন বিজয় বাবু আমায় এমন কি পুরস্কার দিবেন ? কিন্তু ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে একটি রমণী প্রবেশ করিলেন—আর অমনই দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র আপন স্ত্রীকে বিজয় বাবুর বাটিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রথমে দুই জনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন ; হরিশ বাবু কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে" ? তাঁহার স্ত্রী, হরিশ বাবুর পলাইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। হরিশ বাবু স্ত্রীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক চুম্বন করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে, তোমায় এখানে দেখিব কখনও আশা করি নাই, ইহা অতি অপূর্ব্ব মিলন।"

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ সেন।

আধুনিক নাট্যশালা ও প্রহসন।

থিয়েটার গৃহ মর্ত্তভূমে কলির স্বর্গধাম। এখানে যে কেবল গোলকপুরী, বৈকুণ্ঠপুরী আছে এমত নহে। এই স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট স্থানে যিনি যাহা চাহিবেন তিনি তাহাই পাইবেন। যাঁহার

যে দেশ, গৃহ, ষ্ট্রীট বা গলির প্রয়োজন হইবে, যিনি যে কোন বন, উপবন, উদ্যান, নদী বা পাহাড়ের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি সকলই এ স্থানে বিদ্যমান দেখিতে পাইবেন। কালীঘাট ও বারাণসীর মন্দির, নিমতলার ঘাট ও কলেজ ষ্ট্রীট, গরাণহাটার চৌমাতা, উইলসনের হোটেল, ইডেনগার্ডেন, মেদিনীপুরের রাস্তা, পারস্যদেশের বাদসাহের অট্টালিকা, পঞ্চবটীর বন, বাল্মীকীর কুটীর, সিন্ধুরাজকুমারীর প্রমোদ কানন, বিলাসিনীর আমোদ ভবন প্রভৃতি সকলই এস্থানে শোভা পাইতেছে। তাহা ছাড়া এখানে বাজার হয়, ফিরিওয়ালা ফিরি করিয়া বেড়ায়, নৌকা, রেলগাড়ী চলে, জাহাজে লড়াই হয়, পুলিশ ও আদালতে বিচার হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে আর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের যে কোন লোকের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করিতে বাসনা হইবে, অষ্ট আনা ব্যয় করিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিলেই অমনি তাঁহার দর্শন লাভে সুখী হইবেন। তাই বলি থিয়েটারের ন্যায় এরূপ মনোরম স্থান আজ কাল আর কিছুই নাই।

আজ কালকার থিয়েটার পূর্ব্বেকার যাত্রারদলের রূপান্তর মাত্র। তবে ইহা পাশ্চাত্য ধরণে সংস্কৃত এবং ইহার হাব ভাব, কথা বার্ত্তা ও নৃত্যগীতাদি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত। মানব যত সভ্য হইতেছে, তাহাদিগের রুচিও তত মার্জ্জিত হইতেছে। পূর্ব্বে 'রামযাত্রা' 'কৃষ্ণযাত্রা' দেখিয়া লোকে কত আনন্দ উপভোগ করিত, কিন্তু আজ কাল নব্য যুবক যুবতী মণ্ডলীর মধ্যে কয় জনের মন তাহাতে মুগ্ধ হয়? মেষশাবক দলের ন্যায় বালক সম্প্রদায় যখন কর্ণযুগলে হস্ত দিয়া সমস্বরে গগনভেদী সংগীত আরম্ভ করে, তখন অনেকেই সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু

থিয়েটারের নৃত্যগীতাদিতে যে প্রায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ যাত্রার দল অপেক্ষা থিয়েটারে অনেক শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানকে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার অধ্যক্ষগণ যে কর্ম্মপটু তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এরূপ স্থলে আমরা থিয়েটারের সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরতার আশা কেন না করিব ?

কিন্তু বর্ত্তমান থিয়েটার গুলির নাটক ও প্রহসন লেখকগণ একবার মাতৃভাষার দিকে না চাহিয়া, দেশ বা সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কি উপায়ে অল্পদিনের মধ্যে তাহাদিগের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইবে, সেই চেষ্টাতেই অনুক্ষণ ব্যস্ত। আর অভিনয়-রাত্রে কিরূপে বহুসংখ্যক দর্শকের সমাগম হইয়া আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন হইবে থিয়েটার অধ্যক্ষগণের এখন কেবল সেই চেষ্টাই বলবতী। প্রহ্লাদ চরিত্র, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, নীলদর্পণ, সরলা প্রভৃতির ন্যায় কয়খানি পুস্তক আজকাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দেখা যায় ? সমালোচক ও থিয়েটার অধ্যক্ষগণের দোষে আজকাল যা' তা' ছাই ভস্ম রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে। থিয়েটারের অধ্যক্ষগণকে অনেক স্থলে অনুরোধে পড়িয়া এরূপ কার্য্য করিতে হয় ; নচেৎ তাঁহাদিগের বন্ধুগণের রাবিস্ পুস্তক সকল বিক্রয় হয় না। সমালোচকগণেরও এই দশা। নচেৎ তাঁহারা বিনাব্যয়ে রঙ্গ গৃহের উচ্চ আসন লাভে বঞ্চিত হন।

নিকৃষ্ট পুস্তক অভিনয়ে আমরা কেবল গ্রন্থকার বা থিয়েটার-অধ্যক্ষগণের দোষ দিতে পারি না। সাধারণ লোকের রুচি অনুসারে গ্রন্থকর্ত্তাকে গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়। আজকাল নীরস পুস্তক পাঠে সাধারণে আদৌ আনন্দ অনুভব করে না—পূরা রস চাই,

কাজেকাজেই গ্রন্থকর্ত্তাকে নানা রসের আমদানী করিতে হয়, অনিচ্ছা সত্বেও জোর করিয়া একটু রস প্রবেশ করাইতে হয়; নচেৎ তাহার মাল বিক্রয় হয় না—অভিনয় দর্শনে দর্শকের সমাগম হয় না। 'শকুন্তলা' অভিনয়ে ধীবর পত্নী, সংসারের সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া, যদি একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসরে আসিয়া তাহার "তেলোপনা মুখ" খানা নাড়িয়া প্রাণনাথের সহিত দু'টা রসিকতা বা মিষ্টালাপ না করিত, একটা রসের গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের হাসির ফোয়ারা না ছুটাইত, তাহা হইলে বোধ হয় উক্ত দৃশ্যটী তত ভাল লাগিত না। আজ কাল সাধারণ লোকের রুচিই এইরূপ। ধ্রুব চরিত্র বা চৈতন্যলীলা অপেক্ষা আবুহোসেন বা ব্রজলীলার অভিনয়ে অধিক দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে; এবং দর্শকমণ্ডলী শেষোক্ত প্রকার অভিনয় দর্শনেই অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

নাটক অপেক্ষা প্রহসন রচনায় লেখকগণের ভাষার শৈথিল্য, রুচির বৈলক্ষণ্য, অশ্লীলতা ও ভাবের যথেচ্ছাচারিতা দোষ প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চরংগুলি থিয়েটার খানার মজাদার চাট্‌নী। চাট্‌নী না হইলে যেমন আহার করিয়া তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ প্রহসন না থাকিলে থিয়েটার দেখিয়া সুখ হয় না। রসিক দর্শকগণের রুচি বিকৃত হইলে তাহারা এই অম্লরসের আস্বাদনে নীরস রসনায় রসের সঞ্চার করিয়া লন।

পঞ্চরঙ্গের উদ্দেশ্য দর্শকের প্রাণে হাস্য রসের উদ্রেক করা। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা তাহা লিখিয়া লোক হাসান মার্জ্জিত রুচি লেখকের কর্ত্তব্য নহে। একজনকে হাসান কিছু গুরুতর কার্য্য নহে। কোনও লোক সহজ অবস্থায় আপন মুখে কালি মাখিয়া প্রকাশ্য রাজ পথ দিয়া যাইলে, অনেকে তাহাকে দেখিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বে যাত্রার দলে "কালুয়া ভুলুয়া" বা "ভিস্তী"র সং দেখিয়া দর্শক মণ্ডলী একেবারে হাসিয়া আকুল হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, আর সে রুচি নাই। আজকাল দিন দিন মানুষ সভ্য হইতেছে সমাজ উন্নত হইতেছে এবং লোকের রুচিও মার্জ্জিত হইতেছে। অতএব আজ কালকার পঞ্চরংগুলি যাহাতে একেবারে দোষ শূন্য হইয়া মার্জ্জিত রুচি ভদ্রমণ্ডলীর শ্রবণ যোগ্য হয়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই দর্শন করিয়া যদ্দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতে পারেন যাহাতে দেশের ও সমাজের প্রচলিত দোষ সকল দর্শাইয়া, সাধারণকে শিক্ষাদানে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে পুস্তক প্রণেতা ও থিয়েটারের অধ্যক্ষ উভয়েরই যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রহসন রচনায় আজকাল লেখকদিগের মাথা ঘামাইবার তত আবশ্যক হয় না। উহার কয়েকটী বাঁধা গৎ বা নিয়ম আছে সেই কয়টা রক্ষা করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা হইল। আধুনিক পঞ্চরং লিখিবার উপকরণ গুলির মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান (১) ফিরিওয়ালা ফিরিওয়ালীর আমদানী (২) রংদার (৩) ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত আক্রমণ (৪) অশ্লীল ভাবের সূচনা। প্রহসন রচয়িতাগণ মনে করেন এই উপকরণ গুলির যিনি যত অধিক ব্যবহার করিতে পারিবেন তাঁহার রচনা তত উৎকৃষ্ট হইবে। তাঁহারা এক বারও ভাবেন না যে এই সকল বিসদৃশ, বিশৃঙ্খল ও অসময়োপযোগী ভাব ও ঘটনা সমূহের সূচনা দ্বারা তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিতেছেন এবং মার্জ্জিত রুচি দর্শক মণ্ডলীর বিরক্তি ভাজন হইতেছেন।

ফিরিওয়ালা ও ফিরিওয়ালী আজকালকার পঞ্চরঙ্গের একটী প্রধান অঙ্গ এবং নবীন লেখকদিগের মধ্যে একটী সংক্রামক পীড়া হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। "তাজ্জব ব্যাপারে" অমৃত বাবু প্রথমে দুগ্ধের ব্যবসা খোলেন। ব্যবসায় বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া সেই হইতে যাহার ঘরে যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির হইলেন। ফুলওয়ালা, ফুলওয়ালী, কাপড় ওয়ালা, কাপড়ওয়ালী, এসেন্সওয়ালী ঘুগ্নিদানাওয়ালা, চুড়িওয়ালা, বেদানাওয়ালা, বড়িওয়ালা প্রভৃতি আর কিছুই বাকী রহিল না। এখন সকলেই বেশ দুপয়সা লাভ করিতেছে। অমৃত বাবু বৃদ্ধ বয়সে এই সকল ব্যবসার পথ দেখাইয়া ভাল করেন নাই। এখন বিক্রেতার জ্বালায় ক্রেতা অস্থির হইয়াছে। তাহাদিগের প্রাণ বাচান-ভার হইয়াছে। এ ব্যবসায়ের কি লাইসেন্স নাই? কতদিনে এ কোম্পানি ফেল হইবে?

আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদি কোন লেখক তাঁহার পঞ্চ রঙ্গে দুইটী কি তিনটী ফিরিওয়ালার আমদানী করিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ অমনি বাজারের সকল ফিরিওয়ালাকে হাজির করিয়া, একটী হ-য-ব-র-ল করিয়া বসিলেন। ভাব ও ঘটনায় সামঞ্জস্য থাকুক আর নাই থাকুক, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য লোক হাসাইবার জন্য তিনি সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হইলেন। অনুকরণ বিষয়েও ইঁহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। একজন দুধের ভাঁড় কাঁকে করিয়া গাহিলেন "বাঁটের মুখের খাঁটী দুধ কে নিবি তা বল" অমনি তাহার পরবর্ত্তী চতুর লেখক ঈর্ষা পরবশ হইয়া "চা"র কেট্‌লী ঘাড়ে করিয়া সুর ধরিলেন "কে নিবে গরম টি।" এরূপ উদাহরণ আর কত দেখাইব।

আজ্‌কাল সাধারণের রুচি অনুসারে অশ্লীল পুস্তক প্রণয়ন এবং সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রশংসার সহিত উহার অবাধে অভিনয় হইয়া আসিতেছে। ইহার উদাহরণের অভাব

নাই। তথাপি আমরা এস্থলে একটী মাত্র উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"মুই হঁ্যাদু" পঞ্চরংখানি বহুকাল হইতে অতি সুখ্যাতির সহিত বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। অনেক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও সুযোগ্য সমালোচকগণ আবার এই পঞ্চরংখানির এতদূর প্রশংসা করিয়াছেন, যে তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের মতে "মুই হঁ্যাদু"র ন্যায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সামাজিক ফটো এপর্য্যন্ত কেহ কখনও আঁকিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবেন না। তাঁহারা ইহার প্রত্যেক রং, তামাসা, হাসি খুসি, ব্যঙ্গ কৌতুক, নাচন কোদন দেখিয়া বাস্তবিক অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ইহার প্রত্যেক অংশে "উপদেশ ও শিক্ষার বেশ কৌশল অঙ্কিত" দেখিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা উহার প্রত্যেক অংশে মাতৃ ভাষার শ্রাদ্ধ এবং উহার প্রতি রং তামাসায়, প্রতি ব্যঙ্গ কৌতুকে, প্রতি গানে, প্রতি নাচন কোদনে অশ্লীলতার বিভীষিকাময়ী বিকট মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। যাঁহারা এইরূপ জঘন্য পুস্তকের অভিনয় দেখিয়া নিরতিশয় সুখানুভব করেন, তাঁহাদিগের রুচিকেও ধন্য! যাঁহাদিগের প্রশ্রয়ে এই অশ্লীল পঞ্চরংখানি পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত অবাধে অবলীলাক্রমে "বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চে" সাধারণের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই মাতৃ ভাষার শত্রু, হিন্দুসমাজের শত্রু, হিন্দুধর্ম্মের শত্রু। আমরা এই পঞ্চরঙ্গের কোন জঘন্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া মার্জ্জিত রুচি পাঠক মহাশয়দিগের বিরাগ ভাজন হইতে ও মাতৃ ভাষাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। "পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসে" একটী মাত্র অশ্লীল কথার জন্য রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া, যদি

উহার অভিনয় বন্ধ থাকিতে পারে, তবে এইরূপ আদ্যোপান্ত অশ্লীল পুস্তকের অভিনয় কেন না বা বন্ধ হইবে?

থিয়েটার অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা আর দুই এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাঁহাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। গ্রন্থের ভাব, ভাষা, রুচি ও ঘটনা যাহাতে সময়োপযোগী, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত হইয়া ভদ্রসমাজের শ্রবণোপযোগী হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই কয়েকটী বিষয় রক্ষা করিতে হইলে বিচক্ষণ লেখকের আবশ্যক। কারণ প্রহসন বা দৃশ্য কাব্য শিশুর ক্রীড়ার সামগ্রী নহে। এরূপ স্থলে থিয়েটারকারগণ যদি উচ্চ বেতন দিয়া সুলেখক নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও আশাতীত লাভ হইবার সম্ভাবনা এবং বঙ্গ সাহিত্যেরও উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

উৎকৃষ্ট লেখক নিযুক্ত করা যেমন থিয়েটার অধ্যক্ষগণের একান্ত কর্ত্তব্য উচ্চ বেতন দিয়া উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিযুক্ত ও মধ্যে মধ্যে পারিতোষিক দানে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করাও সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, পুস্তক উৎকৃষ্ট হইলেও উপযুক্ত অভিনেতা বা অভিনেত্রী অভাবে অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। নাটক বর্ণিত বিষয় গুলির পাঠ অপেক্ষা রঙ্গালয়ে উহাদিগের অভিনয় দর্শন যে দ্বিগুণ হৃদয়গ্রাহী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব কবিগণ অপেক্ষা অভিনেতাগণের ক্ষমতা যে অল্প প্রশংসার যোগ্য তাহা কথনই নহে। একজন কবি ভাব ও ভাষারূপ অস্থি পঞ্জর সংগ্রহ করিয়া একটী জড় দেহ গঠিত করিতে এবং তাহাকে আপন মনোমত ছন্দ ও অলঙ্কারাদি বেশ ভূষায় সুশোভিত করিতে সমর্থ; কিন্তু একজন

উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী কবি, কল্পিত এই জড় দেহে প্রাণ ও গতির সঞ্চার করিয়া, সাধারণ সমক্ষে তাহার প্রত্যেক হাব ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ। সুললিত দৃশ্য কাব্যের চিত্রগুলি প্রকৃত রূপে চিত্রিত হইলে, উহা এত চিত্তাকর্ষক হয়, যে সময়ে সময়ে দর্শকবৃন্দ উহার ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া আপনাদিগকে বিস্মৃত হইয়া যায়। অতএব দৃশ্যকাব্যের সহিত আমাদিগের মনের গতির যখন এত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন রঙ্গালয়ে অভিনীত পুস্তকগুলি দোষ শূন্য হইয়া মার্জ্জিত রুচি ভদ্র মণ্ডলীর শ্রবণ যোগ্য হওয়া যেরূপ কর্ত্তব্য, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণেরও অভিনয় বিষয়ে সেইরূপ উত্তমরূপে শিক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব আশা করি থিয়েটারকারগণ ভবিষ্যতে এই কয়েকটা বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি কল্পে যত্নবান হইয়া সাধারণের আন্তরিক অনুরাগ ও ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার।
ভগলপুর।

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম।

(২)

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের উপাসনা যে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম ইহার বিচার করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যে শুধু আমাদের একমাত্র উপাস্য তাহা নহে; শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় ও সাধু পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে শ্রীভগবান্ জীবগণের পরম প্রিয়। এক্ষণে ইহার পর্য্যালোচনা করা যাউক।

আমারা দেখিতে পাই যে, যে সকল বহির্বস্তুতে আমাদের আত্ম সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ "আমি" ও "আমার" বলিয়া জ্ঞান হয় সেই সকল

পদার্থই আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে; আর যে সকল পদার্থে আত্ম সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ "আমি" ও "আমার" এরূপ জ্ঞান নাই, সে সকল পদার্থে আমাদের প্রীতিও হয় না। যেমন আমার দেহের উপর আমার যত যত্ন ও মমতা, অপরের দেহের উপর আমার তত যত্ন ও মমতা হয় না; কারণ আমার দেহই আমার আত্মার নিবাস। সেইরূপ আমার পিতামাতা প্রভৃতিতে আমার আত্ম সম্বন্ধ আছে বলিয়া যেরূপ স্বতঃই ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির উদ্রেক হয় অপরের পিতা মাতার উপর সেরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সেরূপ ভক্তি প্রভৃতির সঞ্চার হয় না। এইরূপে যে সকল বস্তু আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয় সেই সকল বস্তুই আমাদের প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে।

আত্ম সম্বন্ধীয় বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকিলেও আত্ম-সম্বন্ধের দূরতা ও নৈকট্য অনুসারে উহাদিগের উপর আমাদের প্রীতিরও তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন বিত্ত হইতে পুত্র প্রিয়, পুত্র হইতে ভার্য্যা প্রিয়া, ভার্য্যা হইতে নিজ দেহ প্রিয় ও দেহ হইতে দেহী অর্থাৎ আত্মা প্রিয়। দেহ হইতে যে আত্মা প্রিয়, আত্মদেহ নাশকতাই (আত্মহত্যা) তাহার প্রমাণ। কেননা একমাত্র আত্মসুখ সাধনার্থেই লোকে বিষপান বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা নিজ দেহের ধ্বংশ করিয়া থাকে। অতএব দেহ অপেক্ষা আত্মা যে প্রিয়তর তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সেই আত্মার আত্মা যে পরমাত্মা, তিনি যে পরম প্রিয় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব সেই প্রিয়তম পরমাত্মার সেবা সুখ স্বরূপই বটে। ভাগবতে দেখা যায়

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতঃ সন্নিয়তোর্থোভজেত
সংসার হেতূপরমশ্চ যত্র॥২স্কা২অ।

তিনি (পরমাত্মা) জীবদিগের চিত্তে স্বতঃই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছেন ; তিনি আত্মা, অতএব প্রিয় ; তিনি সত্য স্বরূপ, অনাত্মবস্তুর মত মিথ্যা নহেন। তিনি ভগবান্ সুতরাং ভজনীয়, তিনি অনন্ত, নশ্বর নহেন। অতএব জীবগণ সেই প্রিয়তম ভগবানের প্রতি চিত্ত ধারণা দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া স্থিরতর বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সেবা করিবে। তাঁহার ভজনা দ্বারা সংসার হেতু অবিদ্যা বা মায়ার নাশ হইয়া থাকে। এতদ্বারা ভজনের সুখ স্বরূপতা দর্শিত হইল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন শ্রবণ মননাদি জ্ঞান সাধনও ভগবৎসম্মুখ্যের কারণ ; কেননা ব্রহ্মাকারতাই তদনুভবের হেতু ; অতএব তৎপরম্পরারূপে সাংখ্য, আত্মানাত্ম বিবেক, অষ্টাঙ্গ যোগ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি), এবং কর্ম্মও (নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা) তৎসাম্মুখ্য অর্থাৎ তৎপ্রবণতার কারণ সমূহ। তন্মধ্যে শ্রবণ মননাদি সাধনের কোন প্রকারে ভক্তিত্ব উপজাত হয়। এবং কর্ম্ম, ভগবৎ আজ্ঞাপালন রূপেতে তাঁহাতে অর্পিত হইলে, তাহার ভক্তিত্ব উপপন্ন হয়। এবং জ্ঞানাদির অন্যত্র অনাসক্তি হেতুতাবশতঃ ভক্তি সচিবতা বিধান করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে যখন উক্ত হইয়াছে যে অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্কে ভজন করিবে, তখনই কর্ম্ম জ্ঞানাদি অনাদৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণা সাক্ষাদ্ভক্তি দ্বারা যে ভজন, তাহাই নিরপেক্ষ রূপে উক্ত হইয়াছে ; কেন না তদ্রূপই শ্রীসুত মুনির উপদেশের উপক্রমেতেই সহেতুক দৃষ্ট হইতেছে যথা "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম" ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাবগত মহাপুরাণের প্রারম্ভে শৌনকাদি মুনিগণ উগ্রশ্রবা নামক সুতকে সর্ব্ব শাস্ত্রের সার জীবের ঐকান্তিক শ্রেয় জিজ্ঞাসা

করেন। তদুত্তরে সুত বলেন "যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে ভক্তি অর্থাৎ শ্রবণাদিতে রুচি জন্মে তাহাই জীবের পর ধর্ম্ম।" অন্বয় মুখেতে এই রূপ বলিয়া পুনর্ব্যতিরেক মুখেতে বলিয়াছেন যথা—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১স্ক॥ ২অ॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম যদি ভগবৎ কথাতে রতি উৎপাদন না করে, তবে সেই সকল ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাকে শ্রম বলিয়াই জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল নাই। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সংসিদ্ধি অর্থাৎ ফলই ভগবৎ সন্তোষ। ভগবানের সন্তোষ নিমিত্ত কৃত যে ধর্ম্ম, তাহাই পর অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সংসার-বিরতি পূর্ব্বক মোক্ষ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহাও পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেন না প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মে যেরূপ ভগবৎ বিমুখতা, এই নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মতে ও সেই বৈমুখ্য দোষ তুল্যরূপে রহিয়াছে। যথা নারদ বাক্য ঃ—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং॥

শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১স্ক॥ ৫ অ॥

যতি প্রবর শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা :—

ভক্তি হীন কর্ম্ম যে একেবারে নিষ্ফল, কৈমুতিক ন্যায়ের দ্বারা তাহাই দেখাইতেছেন যথা, সর্ব্বোপাধি নিবর্ত্তক যে ব্রহ্ম জ্ঞান তাহাও ভগবৎ ভক্তি বিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তাহাতেও

পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয় না। তবে সাধন কালে এবং ফলকালে দুঃখরূপ যে কাম্যকর্ম্ম, এবং ঈশ্বরে অনর্পিত যে নিষ্কামকর্ম্ম, তাহা কিরূপে শোভা পাইবে? অর্থাৎ ভগবৎ বহির্মুখতা হেতু তাহাতে চিত্ত শুদ্ধি পর্য্যন্ত জন্মে না। অতএব পূর্ব্বোদ্দিষ্ট পর ধর্ম্মই নিরতিশয় শ্রেয়ঃ। এবং ইহা বলা বাহুল্য যে ভগবৎ কথাদি শ্রবণে রুচি রূপ যে পরধর্ম্ম, তাহার চরম ফলই শ্রীভগবদ্ভক্তি। এত দ্বারা তাদৃশ পর ধর্ম্ম হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইল।

শ্রীবসন্ত লাল মিত্র।
শ্রীবৃন্দাবন।

ফুলের সাজি।

প্রার্থনা পূরণ

('প্রদীপে' প্রকাশিত 'যাচনা' পাঠে)

তোমার প্রেমের তুলি লয়ে সখা
তোমারি মূরতি আঁকিব—
আমার মরম-অন্দরে!
অযুত বীণার তানমুখরিত
তোমার স্বরটি রাখিব—
আমার মানস-কন্দরে!
তোমার শতেক অনুরাগ মাখা
বিহগে রাখিব বাঁধিয়া—
আমার সরম-বন্ধনে!
তোমার পায়ের চিক্কণ নূপুর
জনমে জনমে বাজিবে—
আমার হরষ-নন্দনে!
তোমার হিয়ার সুষমা বিকাশ
চিরতরে সখা করিবে—
আমার পরাণ-রঞ্জন!
তোমার মুখের সুধাহাসি টুকু
জীবনে হইয়া রহিবে—
আমার নয়ন-অঞ্জন।
তোমার আঁখির আকুল বিজলী
ভাসিবে নয়নে, করিবে—
আমার হৃদয়-চঞ্চল!
তুমি মরণ সময়ে একবার এসে
তোমার প্রেমেতে করিও—
আমার আবেশ উজ্জ্বল!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।
কাঁথি।

বিনিময়।

সে নিয়ে কৌমুদী রাশি, রেখে গেছে অন্ধকার
নিয়েছে সুখের গীতি, দিয়ে গেছে হাহাকার
আশার শীতল ছায়া, সমূলে নিয়েছে হরি
হুতাশের মহাতাপ, দিয়েছে এ প্রাণ ভরি।
লয়েছে কুসুমদাম, যাহার উপমা নাই ;
গেছে রেখে মম তরে, শুধু শ্মশানেরি ছাই।
ল'য়েছে সুখের হাসি, রেখে গেছে অশ্রুজল ;
নিয়েছে নিকুঞ্জ বন, রাখি ঘোর মরুস্থল।
হ'রেছে সুষুপ্তি মম, দিয়ে গেছে কুস্বপন ;
নিয়েছে কামনা সব, দিয়েছে নির্ব্বৃত্তি প[illegible]।
না চাহি এসব মম, যাহা নিয়ে গেছে চলে ;
যদি সে ফিরিয়ে চায়, বারেক আপনা বলে।
খুঁজি তারে পথে পথে, আকুল হৃদয়ে একা।
আছি বসে দিবা নিশি, যদি তার পাই দেখা।

শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ, মেহেরপুর।

"চোক গেল।"

বসিয়া তমাল ডালে কি এক বিষাদ ভরা
ঢালিছে শ্রবণে পাখী সুমধুর ধ্বনি।
পশিয়া শ্রবণে তাহা জাগায় কতকি ভাব
কত উপদেশ বাণী তার স্বরে শুনি।
মানবের উচ্চ আশ বৃথা দম্ভ অহঙ্কার
দেখে দেখে "চোক গেল" কি বলিব হায়!
ভীষণ জীবন স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কেহ
অনন্ত জীবন-পথে চলেছে কোথায় ?
মানুষে মানুষে আর নাহিক সে স্নেহ প্রীতি
নাহিক সে ভালবাসা পবিত্র প্রণয় ;
জীবন সংগ্রামে ঘোর জর্জ্জরিত দেহ মন
নির্জ্জীব মানবে হেরে আঁখি ভেসে যায়॥
এখন(ও) প্রকৃতিরাণী হেসে হেসে কয় কথা
স্বভাবের মাঝে আছে এখন (ও) মিলন।
কলকণ্ঠ বিহঙ্গাদি গায় সে মিলন গীত
কেন গো মানব তবে ভ্রমেতে মগন ?
সাগরের তরে যদি এখন (ও) তটিনী ধায়
ফুল দলে তোষে অলি সুমিষ্ট সঙ্গীতে ;
হেসে ঢলে পড়ে যদি চাঁদে হেরি কুমুদিনী
কাঁপে যদি কিশলয় মলয় মরুতে।
স্বভাবের জীব মাঝে বিরাজে প্রণয় যদি
মানবের মাঝে কেন হ'বে না প্রবল ?
বৃথা দম্ভ অহঙ্কারে কেন নর মত্ত হ'য়ে
জীবন কুহকে পড়ি' হইবে বিকল ?
মানবের পরিণাম প্রতিদিন দেখে দেখে
প্রীতির মাঝেতে থেকে(ও) "চোক গেল" মোর
দুর্ব্বল মানব কুল বুঝেও বুঝেনা কেন
কি আশে পুড়িয়া মরে এ অনলে ঘোর!
প্রকৃতির হাসি দেখে হাসিতে দেখেনা কেন
প্রণয় শেখেনা কেন প্রকৃতির কাছে ?
কেন গো দেখেনা হায়, যে স্বর্গীয় শান্তি রাশি
প্রকৃতি দেবীর মাঝে সতত বিরাজে।
তাহলে ত' ঘটে সুখ, জন্মে প্রীতি ভালবাসা
দগধ অপরিচিত হৃদয়ে হৃদয়ে ;
তা'হলে বহেগো বেগে, সুনির্ম্মল প্রেম ধারা
ছোটেগো অপূর্ব্ব ভাব হৃদয় প্লাবিয়ে।

শ্রীরাখালদাস রায়, গুপ্তিপাড়া।

শ্মশান।

১

শ্মশান তোমারে ভাবি কি প্রকারে
লিখিতে লেখনী কাঁপিয়া যায়;
তোমার আগুনে শিশুসুতগণে
জননী তুলিয়া আহুতি দেয়।

২

যতনের ধন—প্রাণের রতন
ভগিনা তোমারে দিতেছে ভাই;
ওরে ও শ্মশান, তুই কি পাষাণ
দয়ামায়া স্নেহ কিছু কি নাই?

৩

নীরবে বিরলে বসি নদীকূলে
আপন আনন্দে আছিস্ মাতি;
দেখিস্ না চেয়ে কচি কচি মেয়ে
হারাইয়ে যায় পরাণ-পতি।

তুইরে শ্মশান, কি কঠিন প্রাণ,
কেমনে রহিস্ যাতনা ভুলি,
নিরদয় হ'য়ে করুণা ভুলিয়ে
তা'দের হৃদয় নিস্‌রে তুলি।

ব্যথিত হৃদয় যে যাতনা পায়
তুই কি বুঝিবি সে ব্যথা হায়,
শ্মশান তোমারে ভাবি কি প্রকারে
লিখিতে লেখনী কাঁপিয়া যায়।

শ্রীমতী সরসীবালা দাসী,
মিরাট।

বাসনা।

১

এই যে যামিনী স্তব্ধ ধরণী মণ্ডল,
সুষুপ্তির অঙ্কশায়ী যত জীবচয়,
খুলিয়া নিসর্গ সতী হৃদয়-অর্গল
দেখাইছে সংসারের প্রিয় অভিনয়।
হ'য়েছে ধরার মূর্ত্তি শান্তির আধার,
এ সময়ে হৃদি-বীণা বাজ এক বার।

২

সুরঙ্গিনী যামিনীর ললাট ফলকে
উজলিছে শশধর তারকা জড়িত;
কামিনী সীমন্তে যথা সিঁদুর ঝলকে
রুচির মুকুতা দামে হইয়ে গ্রথিত।
অমল কমল-দল নীরে নিমজ্জিত
বিকচ কুমুদ মালা প্রেমে বিগলিত।

৩

নীবিড় নিশীথে হৃদি, খুলি একবার
গাওলো কল্পনে, বীণা সুমধুর স্বরে;
মাতায়ে প্রকৃতি হৃদি উঠুক ঝঙ্কার;
জলধি, কান্তার, গিরি, কানন, প্রান্তরে
বিমল দাম্পত্য প্রেম লহরী গাথায়—
পূর্ণ প্রতিধ্বনি যেন ভাসিয়ে বেড়ায়।

৪

একিরে সহসা হেন ভাব কি কারণ?
বিষম আঘাত পেয়ে হৃদিতন্ত্রী চয়;

উঠিল কাঁপিয়ে কেন করে ঝন্ ঝন্?
ভাঙ্গিল সুখের মোর সঙ্গীতের লয়!
রয়েছে পতিত পূর্ব্ব স্মৃতির মুকুর
নিসর্গের চারু চিত্র করিয়ে বিদূর।

৬

বিস্মৃতির যবনিকা চির নিপতিত,
রয়েছে সম্মুখে তবে; অন্যায় বাসনা
কেনরে পাগল মন! তারে উদ্বেলিত
করিলে সহসা? হায় বাড়ারে যাতনা
হৃদয় নিহিত বহ্নি কেন দুরাচার
ফুৎকারি' জ্বালায়ে তুই দিলি রে আবার।

শ্রীআশুতোষ রায় গুপ্ত,
সয়দাবাদ।

"সেই মুখ খানি।"*

আজি এই বসন্তের নীলিমা-পাথারে
উদ্বেলিত সুধাময় পূর্ণ প্রেমধারে
হাসিছে পূর্ণিমা শশী; কুসুম বল্লরী
বিনম্রা নবোঢ়া যেন মলয়ে মঞ্জরি'
পুলকিছে শুভ্র বাসে বিশ্বজন মন;
রজত-দুকূলা গঙ্গা সঙ্গীত মোহন
গাহিছে শশাঙ্কে লভি' প্রণয়-বিহ্বলা;
আজিকে প্রকৃতি রাণী স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বলা
চম্পক অঙ্গুলি দামে হিয়া-তন্ত্রী তাঁ'র
ঝঙ্কারিছে মুহুর্মুহু;—সম্মুখে আমার
"উদ্ভ্রান্ত প্রেমেতে" লেখা "সেই মুখখানি"—
ত্রিভুবন-উন্মাদনী বিরহের বাণী।

বলগো আমায় কবি! সুধাই তোমায়
এমনি কি পূর্ণিমায়, মধু মন্দ বায়,
এমনি মধুর রাতে, শূন্য গৃহ-বনে
গেয়েছিলে রুদ্ধ কণ্ঠে সজল নয়নে
প্রণয়িণী-প্রেম-গাথা আপনা ভুলিয়া?
"সেই মুখ খানি" নাম জপিয়া জপিয়া,
কাটিয়া কি ছিল কবি! দীর্ঘ ফুল্লনিশি?
প্রিয়া সনে গিয়াছিলে মনে মনে মিশি'?
"সেই মুখ খানি" নাম স্বকণ্ঠে বাহি'য়া
"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া"
আকুল কি করেছিল তব ভগ্ন হিয়া?
প্রকৃতির পূর্ণ ছন্দে রণিয়া রণিয়া?
নাহি জানি কত সুধা সেই মুখে কবি!
রেখেছিলা যত্নে বিধি; সেই প্রেম ছবি
কত নিপুণতা ভরে ধরেছিলা হায়
প্রেম-সমুজ্জ্বল তব নয়ন-বিভায়?
না জানি সে প্রেমময়ী কেমন সুন্দরী,
কি অপূর্ব্ব গুণে তব হৃদয়-ঈশ্বরী,
রচিলে, হারায়ে যারে, হেম পুষ্পহার
ললিত "উদ্ভ্রান্তপ্রেম" নন্দন মন্দার।
অন্তর-ব্যথার তব সত্য প্রতিধ্বনি
শুনিয়া তন্ময় হৃদি, আকাশ, অবনী;
জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞে যাহা না পাবার
তব কাব্য পাঠে তাহা মিলিবে সবার।

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

* ১৩০৪ সনের চৈত্র পূর্ণিমা নিশায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিরুপম গদ্য-কাব্য "উদ্ভ্রান্ত প্রেম পাঠে" এই কবিতাটি রচিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ইংরাজি ব্যাকরণ রহস্য।

Box হ'ল একবচনে, বহুবচনে Boxes,
Ox এর বেলা হ'বে কিন্তু Oxen, not Oxes.
Goose হ'ল একটা হাঁস, দুটো হ'লেই Geese,
Mouse যদি একশ' হয়, হবেনাকো Meese.
Mouse এর বেলা একান্তই বোল্‌তে হবে Mice,
House কিন্তু বহুবচনে হবেনাকো Hice.
Man যদি বহুবচনে হয় সদা Men,
Pan কেন ঐ নিয়মে হবে নাক Pen ?
Cow অনেক হ'লে হবে Cows or Kine,
Vow এর বেলা হ'বে সদা Vows, not Vine.
Foot হ'ল এক বচনে, বহুবচনে Feet,
Boot এর বেলা বোল্‌তে কভু পারবে নাকো Beet.
Tooth হ'ল একটি দাঁত, অনেক হলে Teeth,
Booth অনেক হলে কিন্তু হবে নাক Beeth.
This যদি একবচনে, বহুবচনে These,
Kiss এর বেলা বহুবচনে নয়কো কেন Keese ?
That যদি বহুবচনে বল্‌তে হয় Those,
Hat কেন বহুবচনে হবেনাক Hose ?
Cat বা কেন ঐ নিয়মে হবে নাকো Cose ?
Brother এর বেলা যে নিয়মে হবে Brethern,
Mother কেন সেই নিয়মে হবেনা Methern ?

পুংলিঙ্গে হ'ল যদি He, His, Him,
স্ত্রীলিঙ্গে কেন না হ'বে She, Shis, Shim ?

* * *

তিনটিই সমান। চিত্রকর বিদ্যা শিক্ষার্থী তিনটি যুবকের মধ্যে একজন বলিল "ভাই আমি সে দিন মার্ব্বেল পাথরের অনুকরণে কাগজে একখণ্ড কাষ্ঠ চিত্রিত করিয়াছিলাম, উহা এত ঠিক্ হইয়াছিল যে কাগজ হইলেও জলে ফেলিয়া দিবামাত্র পাথরের ন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "আরে ও ত সামান্য, আমি এক খানা শীতপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য (Landscape) আঁকিয়াছিলাম, তার উপর থারমমিটার রাখিয়া দেখি যে একেবারে জিরো ডিগ্রীর নিচে ২০ ডিগ্রী নামিয়া গিয়াছে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "ও কিছুই নয়, অমি একজন ভদ্রলোকের চেহারা আঁকিয়াছিলাম, উহা এত ঠিক্ হইয়াছিল যে সপ্তাহে দুই বার করিয়া দাড়ি কামাইয়া দিতে হইত।"

* * *

নূতন কবি। সম্পাদক মহাশয়, আমি আপনাকে যে কবিতাটি দিয়াছি উহাতে আমার অন্তরের গভীরতম ও গূঢ়তম ভাব সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সম্পাদক।—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দ্বারা আপনার অন্তরের ভাব জন সমাজে প্রকাশিত হইবে না, ভয় নাই।

* * *

উকিল। সে তোমায় কোথায় চুম্বন করিয়াছিল ?

প্রতিবাদী রমণী। মুখে।

উকিল। না না, বুঝিতে পারিতেছ না, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

প্রতিবাদী রমণী। (সলজ্জভাবে) তাহার বাহুপাশে।

***

রাজ ভ্রাতার বিপদ। কোনও ইংরাজি পত্রে নিম্নলিখিত কৌতুকপ্রদ ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে। বেল্‌জিয়ম্‌ রাজের ভ্রাতা কাউণ্ট অব্‌ ফ্ল্যানডারস্‌ ও তাঁহার পুত্র প্রিন্স এল্‌বার্ট একদা শিকারে বহির্গত হন। অনুচরবর্গ হইতে পৃথক হইয়া পড়িলে ও ক্লান্ত বোধ করিলে, তাঁহারা ঐ অরণ্যের অনতিদূরবর্ত্তী কোন একটি ক্ষুদ্র সরায়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহারাদির পর কাউণ্ট দেখিলেন তাঁহার নিকট টাকা কড়ি কিছুই নাই, তিনি পুত্রকে মূল্য ফেলিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! প্রিন্সের নিকটও কিছু ছিল না। তখন ঐ সরায়ের স্থূলাঙ্গী কর্ত্রী অর্থহীন আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাউণ্ট অব্‌ ফ্ল্যানডারস্‌ ও প্রিন্স এলবার্ট বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিলেন, সরাই কর্ত্রী স্তম্ভিত হওয়া দূরে থাকুক ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিল "তা যদি হয়, তবে আমিও চীন দেশের সাম্রাজ্ঞী।" তাঁহারা এ কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাহাতে সরাই কর্ত্রী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁউরুটি, বিয়ারের বোতল প্রভৃতি উঁহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় একজন অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইলে ও প্রাপ্য মূল্য চুকাইয়া দিলে সমস্ত গোল মিটিয়া গেল।

***

পোষ্ট কার্ডের দ্বারা দাবা খেলা। সম্প্রতি উতকামন্দ ও সিংহলে পোষ্টকার্ডের দ্বারা যে দাবা খেলা চলিতেছিল তাহাতে কোন পক্ষের হার হয় নাই। প্রথম বাজি এক বৎসর ধরিয়া চলিয়া

ছিল এবং সিংহলের ঐ বাজিতে জয়লাভ হয়। দ্বিতীয় বাজিতে উতকামন্দ জয়ী হইয়াছিল, এজন্য উভয় পক্ষেরই সমান সম্মান। জেনারেল বেকারের উদ্যোগে ঐ খেলার অনুষ্ঠান হয়, ক্রকোড ও প্রিডো সিংহল পক্ষের প্রধান খেলোয়াড়।

***

বিট্‌কেল্‌ সক্‌। বিখ্যাত সার্ জন লবক্ একটি বোলতা পুষিয়া ছিলেন, উহা তাঁহার হস্ত হইতে আহারাদি লইত এবং তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত। উহা অজ্ঞাতসারে দলিত হওয়াতে এক বার মাত্র তাঁহাকে হুল্ ফুটাইয়া ছিল, আর কখনও ফুটায় নাই। বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রণ কতিপয় ঝিঁঝি পোকা পুষিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত, কখনও বাড়াবাড়ি করিলে একগাছি খড়ের দ্বারা শাস্তি দিতেন। কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত পোকা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সারা বার্ণহার্ড (Sarah Barnhardt) একটি চিতা বাঘ পুষিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত অভিনেতা এড্‌মাণ্ড কিনের (Edmund Kean) এক পালিত সিংহ ছিল, বৈঠকখানায় উহা খেলিয়া বেড়াইত, বলা বাহুল্য আগন্তুকেরা উহাতে অত্যন্ত ভীত হইত। লর্ড আরস্কিন্ (Lord Erskine) একটি হাঁস ও একটি জোঁক পুষিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন একদা সাংঘাতিক পীড়ার সময় ঐ জোঁকই তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

***

প্রশ্ন যুগলের এক কথায় উত্তর দান।

তারক অসুরে কেবা করিল নিধন,
কার আবির্ভাবে গৃহ আনন্দে মগন। (কুমার)।

কারে বধি দশরথ শাপে বর পায়,
কারে বাঁধি দাশরথী পশিল লঙ্কায়। (সিন্ধু)।

চকোর বিভোর হয় কার সুধা পানে,
বোম্বাই হইতে প্লেগ এদেশে কে আনে। (ইন্দুর)।

বীজনের সৃষ্টি কোন বৃক্ষ পত্র কাটি।
কি কাটিলে গীতবাদ্য একেবারে মাটি। (তাল)।

সুন্দরে বাঁধিল কোন সুন্দরী হিয়ায়,
কোন ধন বিতরণে আরো বৃদ্ধি পায়। (বিদ্যা)।

***

কাপড় হইতে "মসে" তুলিবার উপায়। কাপড়ের যে স্থানে 'মসে' ধরিয়াছে সেই স্থান সাবান দিয়া উত্তম রূপে ঘসিতে হইবে, পরে সেই স্থানে খুব মিহি খড়ির গুঁড়া দিয়া রৌদ্রে বা হাওয়ায় রাখিতে হইবে এইরূপ ৩।৪ বার করিলে কাপড় হইতে কৃষ্ণবর্ণ মসের দাগ উঠিয়া যাইবে।

***

কাপড়ে রঙ লাগিলে তাহা তুলিবার উপায়।— রঙ্ কাঁচা থাকিতে থাকিতে একখানি নেকড়ায় টারপিন মাখাইয়া সেই ন্যাকড়া দিয়া ঐ কাঁচা রঙের উপর ঘসিলে রঙ কাপড় হইতে উঠিয়া যাইবে। রঙ শুকাইয়া গেলে টারপিনের সহিত আল্‌কোহল মিশাইয়া লইতে হইবে।

***

ছুরির ফলা হইতে দাগ তুলিবার উপায়। আলু কাটিয়া সেই কাটা দিক ছুরির ফলার উপর ঘসিলে এবং পরে সাবানের জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে দাগ একেবারে উঠিয়া যাইবে।

***

কৌতুহলপ্রদ পত্র। অজ্ঞাত নামা লোকের দরখাস্ত বা পত্রাদি মহারাণীর নিকট পৌছে না। একটি বালিকা একখানি বড় কৌতুহলপ্রদ পত্র লিখিয়াছিল, কার্য্যাধ্যক্ষ সেখানি মহারাণীর নিকট না পাঠাইয়া থাকিতে পারেন নাই, পত্র খানি এই—

"প্রিয় রাণি,

আমার পুতুলটি পর্ব্বতের একটি গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি পৃথিরীর অপর অংশও আপনার শাসনাধীন ; তাই আশা করি একজন লোক পাঠাইয়া আমার পুতুলটি সেখান হইতে আনাইয়া দিবেন— ইতি।"

সরলা বালিকা মনে করিয়াছিল যে গর্ত্তটি বরাবর পৃথিবীর অভ্যন্তর ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং একজন লোক পাঠাইলেই অনায়াসে পুতুলটি পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক মহারাণী বালিকার এ প্রার্থনাটি পুরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নাকি একটি নুতন পুতুল পাঠাইয়া ছিলেন।

***

আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।—আমেরিকার শিকাগো প্রদেশে এরগো গ্রাফ (Ergograph) নামক একটী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। এই যন্ত্র বালক বালিকার শ্রম সামর্থ্য ও ক্লান্তি নির্ণায়ক। বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত সহরে, যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্র সাহায্যে সে সহরে কত খানি তড়িৎ খরচ হইল জানা

যায়, সেই রূপ এই যন্ত্র সাহায্যে একজন বালক বা বালিকা সমস্ত দিনে কত খানি পরিশ্রম করিয়াছে বা করিতে পারে এবং কতখানি পরিশ্রমে সে ক্লান্ত হয়, তাহা জানা যায়। বালক বা বালিকাকে বেশী কিছু করিতে হয় না। একটী টেবিলে ঐ যন্ত্র রাখিয়া বালক বা বালিকাকে টেবিলের সম্মুখস্থিত চেয়ারে বসাইতে হয়। তৎপরে যন্ত্র হইতে যে একটী রিং বাহির হইয়াছে মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়া ঐ রিংটি টানিলেই সেদিন কতখানি কোন মাংসপেশী কার্য্য করিয়াছে এবং কত দূর ক্লান্ত হইয়াছে তাহা জানা যায়। রিংটা একগাছি দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা আছে এবং ঐ দড়ি গাছটী একটী কপি কলের সাহায্যে ঝোলান থাকে। দড়ির অপর প্রান্তে একটী ভার দেওয়া আছে। সেই ভারে একটী কাঁটা লাগান আছে। কম্পাসের ন্যায় একটী কোন ডালার উপর ঐ কাঁটাটী একটী কাগজে আঁটা। স্কুলের শিক্ষকদিগের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী। তাঁহারা কোন বালক বা বালিকার কতখানি ক্ষমতা সেই বুঝিয়া পড়া দিলে, আর অধিক পরিশ্রমে বালক বালিকার মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা হইবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

১। বসুমতী। ২। প্রতিবাসী। ৩। এডুকেশন গেজেট। ৪। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ। ৫। আলোচনা। ৬। দারোগার দপ্তর। ৭। নব্যভারত। ৮। মহাভারত নাট্যকাব্য। ৯। প্রদীপ। ১০। মুকুল ও কুসুমলীন পত্রিকা। ১১। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী। ১২। The Behar news. ১৩। উদ্বোধন। ১৪। সোম প্রকাশ। ১৪। কমলা। ১৪। উৎসাহ। ১৬। অন্তঃপুর। ১৭। কোহি-নুর। ১৮। ফরিদপুর হিতৈষিণী।

অন্তঃপুর—এক খানি মহিলা পরিচালিত মাসিক পত্রিকা, মূল্য বৎসরে ১৲ টাকা মাত্র। মহিলারাই অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপিণী, অতএব মহিলা-

দিগের দ্বারা "অন্তঃপুর" পরিচালিত হওয়াই সঙ্গত। বুদ্ধিমতী মহিলাদিগের হস্তে অন্তঃপুরের ভার ন্যস্ত থাকিলে শান্তি, প্রীতি ও শৃঙ্খলার যেরূপ আশা করা যায়, এই পত্রিকা খানির দ্বিতীয় বর্ষের চারি সংখ্যা পাঠে আমাদের সেরূপ আশা হয়। লেখিকাদিগের উদ্যম ও লিপি কৌশল প্রশংসাযোগ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে "অন্তঃপুরের" দিন দিন উন্নতি কামনা করি, কারণ অন্তঃপুরের উন্নতিতে সাহিত্য ও সংসার উভয়েরই উপকার।

কমলা—প্রথম খণ্ড ২য় ও ৩য় সংখ্যা। টালাবাগান বান্ধব-সমিতি ও পাঠাগার হইতে প্রকাশিত। "অতি স্বল্প মূল্যে সাধারণের মাসিক পত্রিকা পাঠের সুবিধার নিমিত্ত "কমলার" অবির্ভাব, কিন্তু ইহা "প্রয়াসের" আকারের ঠিক অর্দ্ধেক হইলেও মূল্য অর্দ্ধেক না হইয়া এক টাকা হওয়ায় তত স্বল্প বলিয়া বোধ হইল না "কমলার" কাগজ ও ছাপা সুন্দর, অনেক গুলি প্রবন্ধ পাঠোপযোগী, "বিলাতী চাষ" প্রবন্ধটী নূতন ধরণের এবং উপাদেয়। আমরা "কমলার" দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

কোহিনুর—১ বর্ষের ৬য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। "হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত"। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সকলেরই এই সাধু উদ্দেশ্যে সহানুভূতি থাকা উচিত। হিন্দু মুসলমান উভয়েই কোহিনুরের লেখক, এরূপ ধরণের মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালায় এই প্রথম। একই ঈশ্বরের সৃষ্টজীব হিন্দু তাঁহার মুসলমান ভ্রাতাকে, ও মুসলমান তাঁহার হিন্দু ভ্রাতাকে কেন না আলিঙ্গন করিবে? হিন্দুমুসলমানে যত সম্প্রীতি সাধিত হয় ততই মঙ্গল। প্রার্থনা করি কোহিনুরের উদ্দেশ্য সফল হউক। ইহার স্থায়িত্ব ও উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিলে সুখী হইবে।

উৎসাহ—২য় বর্ষ আশ্বিন। রাজসাহী হইতে প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য ১৷৹ মাত্র। এই সংখ্যার সকল প্রবন্ধগুলিই প্রশংসার যোগ্য "রাজা রামানন্দ রায় প্রবন্ধটির প্রথমাংশ আমরা না দেখিলেও এই সংখ্যায় যত টুকু আছে তাহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। "আশা" নামক পদ্যে বঙ্গ জননী যে রবিবাবুকে শুভ্র মালা প্রদানে "চিরন্তন সন্তান" বলিয়া বরণ করিতেছেন, উহা তাঁহার "শুধু স্বপন" ভাবিবার কোনও কারণ নাই। "পরোলোক" পদ্যটী বাস্তবিক উৎসাহ পূর্ণ।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। জুন, ১৮৯৯ সাল। ষষ্ঠ সংখ্যা।

নিশান্ত সঙ্গীত।

(৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।)

আহা স্নিগ্ধ সমীরণ!
কোথা ছিলে এতক্ষণ,
এস মোর আদরের চির-সহচর!
আলু থালু হ'য়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া,
আলু থালু কুন্তলে সুখে খেলা কর!

২

বড় তুমি চুলবুলে.
গোলাপের দল খুলে
ছড়া'য়ে কপোলে চুলে হাসিয়া আকুল!
তোমারি আনন্দোৎসবে
মত্ত ফুল তরু সবে,
মুদিত নয়ন পদ্ম করে দুলদুল।

আহা এই মুখ খানি
প্রেম মাখা মুখ খানি
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি' কে দিল আমায়
কোথায় রাখিব বল,
ত্রিভুবনে নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায়!

৪

সদাই দেখিরে ভাই,
তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্ব্ব জন্ম কথা জাগে মনে মনে;
অতি দূর দিগন্তরে
কে যেন কাতর স্বরে
কেঁদে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে?

উঠ প্রেয়সি আমার
উঠ প্রেয়সি আমার
হৃদয় ভূষণ কত যতনের হার !
হেরে তব চন্দ্রানন
যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উথলে ওঠে আনন্দ অপার !
উঠ প্রেয়সি আমার !

৬

প্রতিদিন উঠি' ভোরে
আগে আমি দেখি তোরে
মন প্রাণ ভরি ভরি সাধে করি দরশন ?
বিমল আননে তোর
জাগিছে মূরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দু'টী যেন ধ্যানে নিমগন।

৭

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে প'ড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই ;
ভালবাসি নারী নরে
ভালবাসি চরাচরে
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

৮

উঠ প্রেয়সি আমার
উঠ প্রেয়সি আমার
জীবন জুড়ান ধন হৃদি ফুলহার !
উঠ প্রেয়সি আমার।

৯

মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব
সমুখে ও মুখ শশী জাগে অনিবার ;
কি জানি কি ঘুম ঘোরে
কি চক্ষে, দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতেরে পারিবনা আর ;
নয়ন অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার !

১০

ওই চাঁদ অস্তে যায় !
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান ;
হিমেল্ হিমেল্ বায়,
হিমে চুল ভিজে যায়
শিশির-মুকুতা-জালে ভিজেছে বয়ান ;
উঠ প্রেয়সি আমার, মেল নলিন নয়ান !

ধর্ম্মবিষয়ে আন্তরিকতার অভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একদিকে যেরূপ বিজ্ঞানের বিস্ময়-কর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি ধর্ম্মবন্ধন অনেকটা

শিথিল হইয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু অস্মদ্দেশের কথা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের দেশে অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এখনও ধর্ম্মবিশ্বাসে বিপর্য্যয় ঘটে নাই বটে, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়—প্রথম, যাঁহাদের সকল ধর্ম্ম বিশ্বাসেই অনাস্থা; দ্বিতীয়, যাঁহাদের সকল ধর্ম্ম বিশ্বাসেই অনিশ্চয়তা; তৃতীয় যাঁহাদের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে অবিচলিত ভক্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা কোনও ধর্ম্মই মানেন না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই, কারণ তর্কযুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব; বিশ্বাসই ভক্তির মূল, "বিশ্বাসে মিলিবে রত্ন তর্কে বহু দূর।"

এস্থলে আমাদের একটি ক্ষুদ্র গল্প মনে পড়িল। কোনও বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া, অনেক গবেষণা করিয়া স্থির করিলেন—ঈশ্বর নাই। কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া, স্বীয় পঞ্চমবর্ষীয়া দুহিতাকে বাল্যকাল হইতেই নাস্তিকতায় দীক্ষিতা করিবার জন্য, ঘরের দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন, "God is no where." একদিন গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে উহা পড়িতে বলিলে সে পড়িল "God is now here." আবার ভাল করিয়া পড়িতে বলাতে সে আবার ঠিক্ ঐরূপই পড়িল। দার্শনিক পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন, মনে করিলেন আমি এতদিন পড়িয়া শুনিয়া এত তর্কযুক্তি দ্বারা যাহা স্থির করিলাম, ক্ষুদ্র শিশুকে তাহার অন্যথা পড়িতে কে শিখাইল? সেই দিন হইতে তিনি নাস্তিকতা প্রতি ত্যাগ পূর্ব্বক আপন পঞ্চমবর্ষীয়া দুহিতার নিকটে আস্তিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বা জন ব্রাইটের ন্যায় ব্যক্তিরা নাস্তিক

হইলেও অনেক আস্তিক অপেক্ষা ন্যায় ও নীতি পরায়ণ হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা নাস্তিকতার পোষকতা করিতে অক্ষম।

ধর্ম্মবিশ্বাসে অনিশ্চয়তাই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রধান লক্ষণ। তাঁহাদের কোনও রূপ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। ইহারা বাইবেল পড়িয়াছেন, খ্রীষ্টের চরিত্র মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম ও স্বীকার করিলেও যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক; তবে তাঁহাকে দেবোপম মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাই বলিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহারা বেদ, উপনিষদ্ ও গীতার ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়াছেন, কিন্তু সে কেবল মোক্ষমূলর (Max Muller) সোপেনহাওয়ার (Scopenhauer) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের খাতিরে। কোরাণেরও অনুবাদ পড়িয়াছেন। কিন্তু এত পড়িয়া শুনিয়াও তাঁহারা না খ্রীষ্টিয়ান্, না হিন্দু, না মুসলমান। অথচ ঐ তিনের সংমিশ্রণে এক প্রকার নূতন জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আহার বিষয়ে মুসলমান অপেক্ষা ইংরাজদিগেরই সহিত ইহাদের সমধিক সাদৃশ্য; কারণ মুসলমানেরও অস্পৃশ্য বরাহ ইহাদের খাদ্য যায় না; মাতৃপিতৃ বা কন্যাদায়ে ইহারা হিন্দু; পোষাক পরিচ্ছদ ও কথাবার্ত্তায় একেবারে খাঁটি সাহেব! ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কোমৎ বা কার্লাইলের শিষ্য—কোমতের "Humanity worship" (মানবত্ব পূজা) বা কার্লাইলের "Hero-worship" (মহাত্মা পূজা) কেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেরই একটি অঙ্গমাত্র, পূর্ণাবয়ব নহে। এই অনিশ্চয়তা নিবন্ধন তাঁহারা যখন যে ধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন তখনই সেই ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। জেনারেল বুথ, ডাক্তার

ব্যারোস্ ও ডাক্তার ফেয়ারবেয়ারন্ সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন। আবার যখন আনি বেসাণ্টের অসাধারণ ও হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতা শ্রবণ করেন, এবং ইংরাজ রমণীর নিকট হিন্দু-ধর্ম্মের প্রশংসা ও আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদানের কথা চিন্তা করেন, তখন স্বধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। কিন্তু "লেক্‌চার হল্" হইতে বাহির হইবার পর সমস্তই ভুলিয়া যান।

সুখের বিষয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর হিন্দুধর্ম্মের আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ আদরের অন্তঃস্থলে অনেক সময়ে আন্তরিকতার অভাব ও বিলাতি অনুকরণ দৃষ্ট হয়। বিলাতি অনুকরণ আমাদের এরূপ অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, চালচলনে, কথোপ-কথনে, পোষাক পরিচ্ছদে, আহার বিহারে এমন কি পত্র লেখায় এবং ধর্ম্মচিন্তায়ও উহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি না। তাই অনেক বাঙ্গালা কথার ইংরাজি ভাষায় অবাধ প্রচলন থাকিলেও আমরা "গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু"র স্থানে "লর্ড গৌরাঙ্গ" বলি, সংসার বিরাগী রামকৃষ্ণের উপদেশাবলি লিপিবদ্ধ করিয়া নাম দিই "Leaves from the Gospel of Lord Ram Krisna." শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিলে কি তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করা হয়? না বরং ইংরাজদিগের নিকট এরূপ অনুকরণ জন্য হাস্যাস্পদ হইতে হয়? পরমহংস রামকৃষ্ণকে যদি একান্তই ইংরাজি উপাধি দেওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে লর্ড না বলিয়া সেণ্ট (Saint) বলিলে ক্ষতি ছিল কি? কৈ আমরা যে ইংরাজগণের অনুকরণ করি, তাঁহারাও স্বদেশীয় ধর্ম্মাত্মাদিগকে লর্ড বলেন না; কৈ তাঁহাদের মুখেও ত সেণ্ট জর্জ, সেণ্ট প্যাট্রিক বা সেণ্ট এণ্ড্রুর পরিবর্ত্তে লর্ড জর্জ, লর্ড প্যাট্রিক, বা লর্ড এণ্ড্রু শুনিতে পাই না? তবে বৃথা এ বিসদৃশ ও হাস্যাস্পদ অনুকরণে প্রয়োজন কি?

মান্য ও ধন্যবাদার্হ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ও গৌরাঙ্গ সমাজের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন বিকট বিলাতি "লর্ড" উপাধি ছাড়িয়া, চির প্রচলিত সর্ব্বজন বিদিত "মহাপ্রভু" উপাধিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভূষিত করেন। শিশির বাবু ও গৌরাঙ্গ সমাজের যত্নে কলিকাতায় গত দোল পূর্ণিমার রাত্রে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। কলিকাতায় সে দিন যে ভক্তি প্রবাহ উঠিয়াছিল, এখন সেই প্রবাহ ব্যাপ্ত হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে সমগ্র কলিকাতা মাতাইয়া তুলিয়াছে। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলকেই এক নব প্রাণে প্রণোদিত করিবার উপক্রম করিয়াছে; আন্তরিকতার অভাব না থাকিলে কে বলিল সমগ্র বঙ্গ ভূমিকে উহা প্লাবিত করিবে না?

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই সকল সংকীর্ত্তনাদিতে অনেক সময় আন্তরিকাতর অভাব দৃষ্ট হয়; না হইলে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে দলাদলি, বিবাদ বা মারামারি কেন? ভাল গাহিতে পারিলেই ভক্তি প্রদর্শন করা হইল না, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, দলাদলি ভাব তাঁহার হৃদয় কলুষিত করিতে পারে না, যেখানে প্রকৃত ভক্তির অভাব সেই খানেই ঐ ভাব দৃষ্ট হয়। আন্তরিক ভক্তির পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে হুজুকই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

এই আন্তরিকতার অভাবই ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আর একটি প্রধান দোষ। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহার সেই ধর্ম্মে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। যিনি খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার শ্রীখৃষ্টকে ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া জ্ঞান করা ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপদেশ পালন করা একান্ত আবশ্যক; নতুবা রবিবারে একবার গির্জ্জায় যাইলেই প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান্ হয় না। যিনি হিন্দু বলিয়া আপনাকে

পরিচয় দেন, অথচ হিন্দু দেব দেবীর পূজা পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে করেন, ট্রামগাড়িতে যাইবার সময় আরও পাঁচজনের দেখাদেখি কালীতলার কালীকে লোক দেখান প্রণাম করা, অথবা পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় অথবা মকদ্দমায় জয় লাভের আশায় "হরির নোট," "সিন্নি" ও কালীর কাছে "জোড়া পাঁঠা" মানা তাঁহার কখনই উচিত নহে। উহাতে কপটতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ পায় মাত্র। বরং যিনি প্রকাশ্য ভাবে নিজেকে পৌত্তলিকতার বিরোধী বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হন না, তাঁহার সাহস ও আন্তরিকতা প্রশংসাযোগ্য। আবার যিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী ও নিরাকার-বাদী, তাঁহার পক্ষে উপাসনা সময়ে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আনন," "চরণারবিন্দ যাচে তোমারি" প্রভৃতি মনুষ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা অসম্ভব হয়, তবে মুখে নিরাকার উপাসক বলিয়া, সাকার উপাসনায় আন্তরিকতার অভাব প্রকাশ পায় না কি?

অনেক সময় আবার বাহ্যিক আড়ম্বরে আন্তরিকতার অভাব দৃষ্ট হয়। কোনও ব্যক্তি, ধর্ম্ম, বা সম্প্রদায় বিশেষকে গালি দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলে যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহার মুক্তি হইবে এই রূপই আমাদের ধারণা। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে আন্তরিকতার অভাব দেখিলে ন্যায় ও সত্যের খাতিরে দু'একটি কথা বলিতে হইবে; আমাদের বিনীত নিবেদন তাহাতে যেন কেহ অসন্তুষ্ট না হন। আমাদের যেরূপ বিশ্বাস সেই রূপই লিখিব, ঐ বিশ্বাস যদি ভ্রম পূর্ণ হয়, ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে বাধিত ও উপকৃত হইব।

রামকৃষ্ণের শিষ্য অনেক আছেন। কিন্তু গুরু হইতে শিষ্যদিগের কার্য্য কলাপে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। রামকৃষ্ণকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া না মানিলেও, তাঁহাকে একজন জ্ঞানী মহাত্মা বলিয়া শ্রদ্ধা করি। জ্ঞানী হইলেই যদি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সলোমন্, সক্রেটিস্ প্রভৃতি বাদ যান কেন? অথবা দু'একটি অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইলেই যদি ঈশ্বরের অবতার বলা যায়, তাহা হইলে যে কোনও যাদুকর বেদেকে, অথবা এডিসন্, রণ্ট্‌জেন্‌কে কেন না ঈশ্বরের অবতার বলিব? মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের অংশ বিদ্যমান। তবে যেমন একই পিতার পুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের পুত্রগণের মধ্যে কাহাতে বা ঈশ্বরের অংশ অধিক পরিমাণে, কাহাতে বা অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। যাঁহাতে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান তিনি পরম জ্ঞানী ও পরম যোগী বলিয়া অন্যান্য সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাস্পদ। রামকৃষ্ণকেও আমরা জ্ঞানী ও যোগী বলিয়া শ্রদ্ধা করি। তিনি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসী বেশে সংসারী বা শিষ্যদের মধ্যে রামকৃষ্ণের মত যোগী ও জ্ঞানী কেহ নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না এবং গুরু প্রশংসায় তাঁহার শিষ্যেরাও বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হইবেন না। অথচ শিষ্যদের ভিতর গুরু অপেক্ষা অধিক আড়ম্বর দৃষ্ট হয়। গুরু সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেও মাতৃ পিতৃ দত্ত নাম পরিত্যাগ করিবার বা নিজের নাম জাহির করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা মাতৃ পিতৃ দত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্রদত্ত আড়ম্বর বিশিষ্ট "স্বামী" ও "আনন্দ" যুক্ত নামে অভিহিত হইতেই অধিক প্রিয়। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও প্রতিপত্তি দেখিয়া

আজকাল "স্বামী" ও "আনন্দের" ছড়াছড়ি। বঙ্কিমবাবু এক আনন্দমঠ সৃজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে মঠের "আনন্দ" নামধারী ব্যক্তিগণের মুখে "বন্দে মাতরম্" গীতি শ্রবণ করিলে প্রাণ বাস্তবিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তাঁহাদের সন্ন্যাস ব্রতও অতি কঠোর ছিল, কিন্তু সে আনন্দ মঠ আর নাই, সে "বন্দে মাতরম্" গীতধ্বনিও আর শ্রুত হয় না। এখন আনন্দ নাম শুনিলেই প্রাণে কেমন একটা নিরানন্দ ও সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া মনে কেমন একটা ঘৃণা ও ভয়ের সঞ্চার হয়, জগদীশ্বর করুন এ ভয় যেন অমূলক হয়! স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন ও ভক্তি ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু "নরেন্দ্র" নাম কি এতই শ্রুতি কঠোর যে উহা না বদ্‌লাইলে চলিত না? আর একটি নাম দেখিলাম "স্বামী ত্রিগুণাতীত"; অবশ্য তাঁহার সহিত আমাদের আলাপের সৌভাগ্য ঘটে নাই, এবং তাঁহার প্রতি আমাদের কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ নাই, তবে নামটা দেখিয়া মনে হইল কি স্পর্দ্ধা! ঈশ্বরকেই বরাবর ত্রিগুণাতীত বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি মনুষ্যও নিজেকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন না। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী হইতে পারেন, কিন্তু কিসে ত্রিগুণাতীত হইলেন অবশ্য উহা আমাদের বোধাতীত! আবার দেখিলাম একজন ইংরাজ রমণী স্বামী অভয়ানন্দ নাম ধারণ করিয়াছেন! কি বিসদৃশ! রমণী হইলেন "স্বামী" ভাগ্যে "স্বামী"দের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই, নতুবা, ঐ "স্বামী"র স্বামী লইয়া মহা গোলযোগ হইত। আমরা কিন্তু এরূপ যথেচ্ছ নাম ধারণে আড়ম্বর ও আন্তরিকতার অভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। যাঁহারা

এইরূপ নামের জন্য ব্যস্ত তাঁহাদিগকে মহাকবি সেক্ষপীরের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম,—

"What's in a name? that which we call a rose,
By any other name will smell as sweet".

তবে বৃথা মাতৃ-পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি ?

এতদ্ব্যতীত অন্য বিষয়েও রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শিষ্যগণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়! গুরু নামে সন্ন্যাসী না হইলেও কার্য্যে প্রকৃত সন্ন্যাসী; কিন্তু শিষ্যেরা কার্য্যের প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইয়া নামে সন্ন্যাসী। শুধু গৈরিক আলখাল্লা বা গৈরিক কামিজ ও ধুতি ব্যতীত অনেক সময়ে শিষ্যদের প্রকৃত সন্ন্যাসীর অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সুরম্য অট্টালিকায় বাস, রাজভোগ, ও অনেক সময়ে অখাদ্য ভোজন ও ভদ্র সন্তানের দ্বারা সজ্ঞানে পদ সেবা, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নাম ধারী ব্যক্তির পক্ষে কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে; ওরূপ বিলাসিতা সন্ন্যাসীর সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। ভক্ত রামপ্রসাদ সেন অনেক দুঃখে গাহিয়া ছিলেন "ফকির হওয়া নয়কো সোজা" ইত্যাদি।

শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর কথা বলা হইল, আর এক শ্রেণীর কথা বলিলেই এই প্রবন্ধ শেষ হয়। ইহাদের সম্বন্ধে অধিক বলিবারও কিছু নাই। ইহারা কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম মানেন এবং সেই ধর্ম্মে আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাদের মনের ভিতর কপটতা নাই, ধর্ম্ম বিষয়ে কপটতা অতীব নিন্দনীয়। কপটতার পরিবর্ত্তে আন্তরিকতা, কাপুরুষতার পরিবর্ত্তে নির্ভীকতা, আড়ম্বরের পরিবর্ত্তে বিনয়ই ইহাদের লক্ষণ, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে ঐ সকল গুণই একান্ত আবশ্যক একথা বলা বাহুল্য।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার।

স্বর্গীয়া কবি প্রমীলা নাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে আমরা স্বর্গীয়া কবির কবিতা এবং কবিত্বের সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাঁহার রচনাবলীর বিস্তৃত সমালোচনা করা এস্থলে আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা যে প্রতিভার পূজা করিতে এ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াই বিদায় গ্রহণ করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রমীলার প্রায় সমস্ত শিক্ষাই স্বতঃ-সিদ্ধ তাঁহার কবিতা রচনায় প্রবৃত্তিও তদ্রূপ। স্ত্রীশিক্ষার প্রভাত সময়ে বঙ্গরমণী যে কবিতাতে আপনার মনোভাব উচ্ছ্বসিত করিবেন ইহা স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী। বঙ্গভাষার বাল্য কাল চলিয়া গিয়াছে সত্য—মধুসূদন প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত কবিগণ এবং চিরপূজ্য বঙ্কিম বাবু বঙ্গসাহিত্যকে নবযৌবনে ভূষিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গরমণীকুলের সাহিত্যচর্চ্চার আরম্ভ প্রকৃত পক্ষে ত্রিংশ বৎসরের অধিক হইবে না। এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহাদের বঙ্গ সাহিত্যানু-শীলনের প্রভাত ও মধ্যাহ্নের ব্যবধান অন্তর্হিত করিলেও এখনও তাঁহাদের সাহিত্য সেবার ঊষাকাল। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী, শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী, শ্রীমতী মানকুমারী, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী, শ্রীমতী কামিনী সেন প্রভৃতি যে কয়জন শিক্ষিতা সুলেখিকা মনোবিজ্ঞানের যে নিয়মের অনুগামিনী হইয়া, কবিতায় তাঁহাদের সাহিত্যানুরাগের উদ্বোধন গীতি গাহিয়াছেন, বালিকা প্রমীলাও যে সেই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইবেন ইহা স্বাভাবিক। আর বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্রমোন্নতির সহিত কবি-কল্পনার অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইলে, বঙ্গীয়রমণী কবিগণের বর্ত্তমান

কালের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এ কথার সত্যাসত্যের প্রমাণ ভবিষ্যগর্ভে নিহিত, কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি বা প্রবীণতার সহিত প্রমীলার কবিতাগুলির মাধুর্য্যের হ্রাস না হইয়া তাহারা যে চিরদিন কৌমুদীস্নাত নববিকশিত রজণীগন্ধাগুচ্ছের ন্যায় কাব্যানুরাগীদিগকে মোহিত করিবে, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

প্রমীলা দুইখানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, "প্রমীলা" ও "তটিনী"। ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত কবিতার মধ্যে দুই একটী "সাহিত্য" পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, আরও কয়েকটী কবিতা উক্ত সহযোগীর হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। আশা করি সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কবিতা কবির পীড়িত শয্যায় রক্ষিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শোকবিহ্বল আত্মীয়গণ কবির মৃতদেহের সহিত, তাঁহার শয্যা সমেত সে গুলিকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

কবি কোন কাব্য রচনা করিয়া যান নাই সুতরাং তাঁহার চরিত্র-চিত্রণে পারদর্শিতা বা ঘটনা সংযোগ নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তাঁহার সমস্ত রচনাই গীতি কবিতা শ্রেণীভুক্ত এবং করুণরস প্রধান। বীর, হাস্য, বা বীভৎস্য রসের অবতারণা তাঁহার প্রকৃতির বহির্ভূত ছিল। মানব জীবনের কোন কৌতূহলোদ্দীপক বা বিচিত্র ঘটনা লইয়া কবিতা লিখিতে তিনি প্রয়াস পান নাই। তাঁহার "যমুনা" নামক কবিতাটী ঐ শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাহা ভাব ও বাক্যের শিল্পপারিপাট্যের জন্য উল্লেখযোগ্য, ঘটনা সমাবেশের জন্য ~~নহে~~। কাব্য কাননের একটী সঙ্কীর্ণ অংশে মাত্র তিনি বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে স্থানটী বড়ই মনোরম। সে স্থান বসন্ত মলয়ানিল প্রবাহিত, কুসুম-পরিমল-সুবাসিত, সেখানে অমরার সৌন্দর্য্য বিন্যা-

জিত। তিনি মল্লার মালকোষের আলাপ করিতে প্রয়াস পান নাই, কিন্তু রমণীকণ্ঠের অধিকতর উপযোগী ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, বেহাগের যে মূর্চ্ছনায় ভরা ছোট ছোট মৃদুতান তুলিয়াছিলেন সে গুলি বড়ই মধুর, ভুলিবার নয়। প্রমীলা যে শ্রেণীর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা শেলী, কীট্‌স, টেনিসন্ প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় মহাকবিগণের প্রদর্শিত পথে অল্পদিন হইল বঙ্গভাষায় নবীন কবিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই শিক্ষিত সমাজে ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সরল প্রেম ও বৈরাগ্যোচ্ছ্বাস এক প্রকার অসম্ভব, ও ভারতচন্দ্র প্রদর্শিত অপূর্ব্ব শব্দ বিন্যাস নৈপুণ্যকে প্রকৃত কবিত্ব বলিয়া ভ্রান্ত হইবার দিনও অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন সুখ দুঃখ, স্নেহ মমতা, প্রেম বিরাগ, আশা নৈরাশ্য প্রভৃতি মানব অন্তরের কোমল গম্ভীর উন্নত অস্ফুট ভাব গুলির প্রাণস্পর্শী ছবি আঁকিয়া জগতের চক্ষু সম্মুখে ধরিতে না পারিলে, বহির্জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুষ্প রেণু বা উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী, ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ রব বা জলধির কল্লোল অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইলে যে যে ভাবের বিকাশ হয় তাহা সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, অমর রেখায় অঙ্কিত করিতে না পারিলে কেহ প্রকৃত কবি নামের গণ্য হইতে পারেন না। ভাবের বিকাশ গীতি-কবিতার প্রাণ, ভাষার লালিত্য ও ছন্দোবন্ধের পারিপাট্য তাহার বাহ্য অবয়ব। প্রমীলার রচনায় গীতি কবিতার সমস্ত সদ্‌গুণ গুলির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তিনি শব্দ কুশলী ছিলেন। আমরা তাঁহার মদির ভাষায় পুলকিত, ভাবের মধুর তন্ময়তায় চমকিত এবং স্বপ্নময়ী কল্পনায় বিমোহিত হই। সাহিত্য শিল্পির বাকপটুতা তাঁহার আয়ত্বাধীন ছিল, নিরর্থক শব্দাড়ম্বর তাঁহার রচনায় আদৌ

লক্ষিত হয়না এবং তাঁহার কল্পনা দুর্ব্বোধ্য বা জটিল বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে অন্তরালে থাকিত। শেলী, কীট্‌স্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের অনুকরণে বঙ্গ সাহিত্যে যে অস্পষ্ট কাব্যের অবতারণা হইয়াছে, প্রমীলার কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায় না। তাঁহার কবিতা নির্ঝরিণীর স্ফটিক জলধারার ন্যায় স্বচ্ছ, আবিলতার সংস্পর্শ মাত্র নাই। এই সরল মাধুর্য্যের শুভ্র জোৎস্না তাঁহার প্রায় সকল কবিতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বালিকার কবিজন-বিচরিত পথ প্রবেশে পশ্চাৎপদ হৃদয়ের প্রতি উৎসাহ বাক্য হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

ফোটেনা কি ফুল কুল, কেহ না দেখিলে চেয়ে ?
শুনিবে না কেহ ব'লে, পাখী কি ওঠেনা গেয়ে ?
কে শুনে কাননে গিয়ে ফুলের প্রণয় কথা,
তবুতো সে বলে ধীরে আপন মরম ব্যথা !
শুনিবে না কেহ যদি নিভৃত শৈলের বুকে
নিঝর গাহিছে গান হৃদয়ের কোন সুখে ?
তুমি কেন সুধু তবে জীবন বিফল ব'লে
শান্তিময়ী বীণাটীরে অনাদরে দেও ফেলে ?

কিন্তু বয়স ও জ্ঞানের সহিত অধিকতর সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাহিত্য জগতের সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ তাঁহার স্বাভাবিক ম্রিয়মাণ হৃদয়কে অভিভূত করিল। তাই আত্মদমন-প্রয়াসী কবি তাঁহার কবি যশঃ-প্রার্থী মনকে দুরাশা-চালিত বলিয়া সংযম শিক্ষা দিতেছেন।—

আসিছে কুসুম বাস সুদূর কানন হতে
কোন স্বপনের ঘোরে, যাস্ তারে তুলে নিতে ?
সংসার কণ্টক বন নারিবি এ হ'তে পার!
কণ্টক বিঁধিবে পায়ে ঝরিবে নয়ন ধার !

ভাবিছ অদূরে ফুল　　ও যে গো কানন পার।
কেন এ মহান আশ　　স্বরগে জনম তার!
সুদূরে জ্বলিছে আলো　　চলেছিস লক্ষ্য করে
তোর পথে অন্ধকার　　ওযে তারা স্বর্গপুরে?

অপ্রাপ্ত বয়স্কা কবির অকারণ সংকোচ উপেক্ষা করিয়া সাহিত্য-সেবিগণ তাঁহাকে সাদরে ও সস্নেহে সম্ভাষণ করিলে কৃতজ্ঞ অথচ সন্দিহান কবির সরল উত্তর মর্ম্মস্পর্শী। যথা—

অনন্ত এ সাহিত্য সংসার　　তোমাদের চরণে বিস্তৃত,
আমায় ডেকোনা সেথা কেহ　　হ'য়ে যাব নিমেষে দলিত।
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র কীট আমি,　　তৃণ মাঝে মিশাইয়ে যাই,
তোমাদের যশের সোপানে,　　উঠিবার শকতি যে নাই।
আমায় দিওনা কেহ তবে,　　এতখানি স্নেহ ভালবাসা,
আমায় ডেকোনা কেহ আর,　　ক্ষুদ্র প্রাণে দিওনাক আশা।
তোমাদের অসীম প্রেমের,　　পারিনে যে প্রতিদান দিতে,
মরে যাই কৃতজ্ঞতা ভারে,　　পরিতাপ জেগে উঠে চিতে।

কবির কোন কোন কবিতায় ভাবের ক্রমবিকাশ দেখিয়া মন বিমোহিত হইয়া যায়। "ডেকো মা আমারে" প্রভৃতি কয়েকটী পদ্যের ছন্দের দোল এত চমৎকার যে পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন মৃদু পবন হিল্লোলে ঈষদান্দোলিত তরণীবক্ষে কল্লোলিনীর অনুকূল প্রবাহে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছি। আবার কোন কোন কবিতার সরল কারুণ্য আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তম স্থলে গিয়া স্পর্শ করে। কবি উপহার প্রার্থী কোন শৈশব সহচরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন।—

ছিল দিন একদিন আস নাই কাছে হায়,
হৃদয় পূর্ণিত ছিল কত স্নেহ সুখ তায়।
শারদ চাঁদিনী রাতে,　　বীণাটি লইয়া হাতে

গাহিতাম আনমনে বিজনে একেলা বসি,
শুনিত প্রকৃতি শুধু, শুনিত তারকা শশী!
বীণাটি আকুল হ'য়ে, চারিধারে র'ত চেয়ে,
ভরন্ত প্রাণের গান ছুটে ছুটে চারিধারে
ভরা প্রাণ প্রদানিতে কি জানি খুঁজিত কারে!
সে মধু শরত রাতে, (তখন) আস নাই নিকটেতে
সঙ্গীত কুসুম দামে গাঁথিতাম উপহার,

* * * * *

মনে নাই সেই গান, সে হৃদি যে নাই আর!
এবে, শুখাইয়া গেছে মালা, নীরবেতে নিরাশায়
দূর তটিনীর জলে ভাসায়ে দিয়েছি তায়!
বসন্ত গিয়েছে চলি, শুকায়েছে ফুল গুলি!
সাধের বীণাটি আজ গড়াগড়ি যায় ভূমে,
ছিঁড়ে গেছে তার গুলি অনাদরে অযতনে!
কল্পনার ভাঙ্গা ঘরে, কবিতা গিয়েছে মরে,
শূন্য প্রাণে শূন্য হাতে চাহিয়া আঁধার নিশি
শুকানো কাননে প্রাণ একেলা র'য়েছে বসি!
আজ, এদুর্দ্দিনে কাছে তার চাহিয়াছ উপহার
কি দিবে ভাবিয়া সারা' কিছুই যে নাই আর,
অশ্রুর মুকুতা হার ধর তবে উপহার।

আমরা বিশেষ নির্ব্বাচন করিয়া এ কবিতা উদ্ধৃত করি নাই। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। এইরূপ সরল কারুণ্যের ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে উল্লেখ করিয়াই Reis and Rayyet "প্রমীলা" সমালোচনের সময় বলিয়াছিলেন যে শত ছিদ্রান্বেষী বিশ্ব নিন্দুকও প্রমীলার কবিতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। "Full of pathos as they are, they will wring admiration from the most confirmed *nil admirari* Cynic." কবির অতীত সুখ-

স্মৃতির আবেগময়ী অশ্রুপ্রবাহ কাহার হৃদয়কে না দ্রবীভূত করিবে ?

কবির নিকটে জড়প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই, প্রকৃতি প্রাণময়ী, প্রকৃতির ভাষা আছে। প্রকৃতি আমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী। প্রকৃতির সমবেদনা প্রকাশের উপায় অনন্ত। কবি তাহা কেমন অনুভব করিতেন দেখুন।—

সে কি আর আসিবেনা ফিরে ?
আশা পথ চেয়ে চেয়ে,　　সারাদিন সারা রাত
প্রভাতের বুকে যায় ঝ'রে
ফুলগুলি কাঁদিয়া নীহারে !
সে কি আর আসিবে না ফিরে ?

গগনের গবাক্ষ খুলিয়া
উষা আসি ফুল বনে,　　একাকিনী নিরজনে
খুঁজে খুঁজে না দেখিয়া তায়
আঁখিনীরে ভেসে চলে যায় !
সে কি আর আসিবেনা হায় ?

সারা মধ্যাহ্নটী ধ'রে
ছুটে ছুটে দিশে হারা,　　কোকিল ডাকিয়া সারা,
পাখীগুলি কাতর চীৎকারে
অবিরত ডাকিতেছে তারে,
সে কি আর আসিবে না ফিরে ?

নীরব নিশীথ কালে
বিমল কৌমুদী রাশি,　　শূন্য হতে নেমে আসি
ধরাময় খুঁজিয়া বেড়ায়,
তবু তার দেখা নাহি পায়,
সে কি আর আসিবে না হায় !

ধরণী আকুল তার তরে,
হেথা হোথা আশে পাশে, কাঁদে বায়ু হা হুতাশে।
নদীতীরে কাননের গায়
নীরবতা করে "হায় হায়"
সে কি আর আসিবে না তায়?

নীরব প্রকৃতির অব্যক্ত ভাষা নিজ মনোভাবের ন্যায় কবির নিকট সুখপাঠ্য। প্রভাত তপনের প্রথম রশ্মির সহিত যাঁহার হৃদয়ে গোধূলির বিষাদ-ছায়া স্পর্শ করিয়াছে সে কবির অন্ধকার বর্ণন দেখুন।—

অমানিশি, ঘোর অন্ধকার, প্রকৃতির মুখখানি ম্লান,
দূর নভে দু একটী তারা, চেয়ে ছিল আকুল পরাণ
অন্ধকার বিশাল গগণ দাঁড়াইয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া
কি যেন কি শূন্য বুকে লয়ে প্রকৃতির বদনে চাহিয়া!
অন্ধকার ধরণী হৃদয় ভাষা তার হইয়াছে ক্ষীণ,
টুপ টুপ হিম অশ্রু ধারা আঁধারেতে হতেছিল লীন!
আঁধারেতে মিশিয়া আঁধার দিতে ছিল ধীর আলিঙ্গন
বিষাদের তরলিত কায়া শিশিরাশ্রু ঢালিছে নয়ন।

প্রাচীন পাশ্চাত্য কবিগণশ্রুত বিশ্ব-সঙ্গীতের (Music of the spheres) মৃদু গম্ভীর তান লহরী সময়ে সময়ে তাঁহারও হৃদয় বীণায় আঘাত করিয়া তারে তারে প্রতিধ্বনি তুলিত। তিনি ছায়াময় স্বপ্নময় সে সঙ্গীত রবে জগৎ সংসার উথলিত হইতেছে অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন—

দেখিলাম অনন্ত সংসার
সুধু সে মাধুরী মাখা, সুধু স্বপনেতে ঢাকা
দেখিলাম জীবপূর্ণ এ বিশাল ধরা
সুধু সেই কণ্ঠ সেই স্বর, সে সঙ্গীতে ভরা!

কবি—রমণী ; পরদুঃখকাতরতা রমণীর সার ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া এই পতিত জাতির জন্য কবির হৃদয় কাঁদিয়াছিল। সে ক্রন্দন যদি বাঙ্গালীর মরমতলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উদ্বেলিত না করে তাহা হইলে কবির ঈপ্সিত অভ্যুত্থানের দিন বাঙ্গালায় আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। কবির নিকট প্রকৃতির শিক্ষাগ্রন্থ উন্মুক্ত,—কবি গুরু। কবি তাঁহার ভ্রান্ত নিশ্চেষ্ট স্বজাতির শিক্ষার জন্য যে মধুর উপদেশ গান গাহিয়াছেন, তাহা শুনিয়াও যদি বাঙ্গালীর চৈতন্য না হয় তাহা হইলে তাহারা নিতান্তই বধির, অলস ও অসার।—

ওই দেখ ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে,　　দেখ ওই বিশাল গগন
কি মহান্ উদার হৃদয়,　　রক্ষিতেছে ধরার জীবন,
প্রকৃতির বিশাল হৃদয়,　　রাখিয়াছে মহাশিক্ষা খুলি,
কে আছরে অলস হৃদয়,　　একবার দেখ আঁখি তুলি।
অন্ধ নর দেখিলে না চেয়ে,　　কিবা কাজ সাধিলে ধরায়,
ভাবিলে না দিনেকের তরে,　　জীবনের উদ্দেশ্য কোথায় ?
দেখিয়াছ পবিত্রতা ওই,　　তারকার নির্ম্মল বদনে,
দেখিয়াছ সরলতা সেই　　ঊষার সে কনক আননে,
দেখ ওই মহান গাম্ভীর্য্য　　বিরাজিছে মহাসিন্ধু মুখে
জীবনের কঠোর সাধনা　　হের ওই পর্ব্বতের বুকে।
কোমলতা দেখরে চাহিয়ে　　বিরাজিছে চারু কিশলয়ে,
স্বার্থ হীন পরহিত ব্রত　　সমীরের বুকে যায় ব'য়ে।
নিরজন নির্ঝরিণী বুকে　　প্রণয়ের দেখ নিদর্শন,
জাহ্নবীর পবিত্র হৃদয়ে　　হের ওই আত্ম বিসর্জ্জন।
রবি শশী অটল হৃদয়ে　　সম ভাবে সাধে নিজ কাজ,
শিক্ষা দেয় মহাবীর্য্য বল　　প্রভঞ্জন হৃদয়ের মাঝ।

ক্ষুদ্র ওই তৃণরাজি পানে দেখ চেয়ে একতার সুখ।
জড়াইয়া হৃদয়ে হৃদয় পরহিতে পেতে দেছে বুক
মহান এ জগতের মাঝে কত শিক্ষা নয়ন উপরে,
পড়ে রব কত দিন আর অজ্ঞানতা ঘোর অন্ধকারে,

প্রমীলার অধিকাংশ কবিতা করুণ রস প্রধান এবং কতকগুলি কবিতা আদ্যোপান্ত বিষাদ জড়িত বলিয়া দুই একটী সমালোচক প্রমীলার কবিত্বের প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিষাদময়ী রাগিণীর আতিশয্য প্রযুক্ত প্রমীলার গীত-ধ্বনিতে তৃপ্তি পান নাই, ভিন্ন সুরের অভাবের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই করুণ রসই প্রমীলার কবিতার প্রাণ এবং তাহাদের চিত্তাকর্ষণী ও হৃদয়দ্রাবণী শক্তির প্রধান কারণ। আর যখন আমরা স্মরণ করি যে এই করুণ রসোচ্ছ্বাস অপ্রাপ্ত বয়স্ক লেখক লেখিকা সুলভ কাল্পনিক দুঃখনীতি নহে, অথবা বায়রণ, শেলী প্রমুখ কবিগণের ন্যায় উদ্দাম এবং অসংযত, কল্পনা প্রসূত নিরাশা বা দুঃখ-বাদ (Pessimism) নহে ; যখন আমরা বালিকার চির অসুস্থতার এবং অকালমৃত্যুর কথা মনে করি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে এই শোকধ্বনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বাহির হইয়াছিল এবং ইহাই তাঁহার কবিতার জীবন। প্রমীলার সুখগান বা হাস্যরসের অবতারণা, সদ্য পুত্রহীনার মুখে হাস্যরোলের মত, অস্বাভাবিক হইত এবং বেসুরা লাগিত। কবি তাঁহার নিজ হৃদয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" কবিশেলীর এই প্রসিদ্ধ উক্তির সার্থকতা আমরা প্রমীলার কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভব করি।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

কবি ও শিশু।

তিন বর্ষ পাঁচ মাস শিশুর বয়স;
তাহারে আদর্শ ভাবি'
প্রকৃত শৈশব ছবি
লিখিতে বসিল কবি—কবিতাসরস।—

তুমি নন্দনের জ্যোতিঃ।
(থাম্—আগে মুছাইয়ে দিই অশ্রু তোর,)
মম ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি
(এইরে, কাণেতে বুঝি পুরেছে মটর।)
তুমি ফুল্ল শতদল
সুকোমল সুবিমল
তোমার তরল মতি পাপ তাপহীন।
(ও হরি! ছেলেটা বুঝি গিলিছে আলপিন

বিচিত্র খেলেনা লয়ে,
খেলিছ বিভোর হ'য়ে,
পাখী যথা গান গেয়ে আকাশে বেড়ায়;
(ওইরে! দ্বারের কাছে ছেলেটা গড়ায়।)
একমাত্র প্রিয়ধন,
(একি! বাছু দেশলাই জ্বেলেছ জামায়!)
তুমি মম হে নন্দন,
ভালবাসা ডোরে বাঁধি রেখেছ আমায়।
আমার সোণার ছেলে—
(দোয়াত দিয়েছে ফেলে,
সব কালি পড়ে গেল হেথায় হোথায়।)

মধুর জ্যোৎস্নারাতে
সুর বালিকার সাথে,
একমাত্র যোগ্য তুমি খেলা করিবার;
(বিড়ালের ল্যাজ ধ'রে টানি'ছে আবার।)
বিশ্ব সাজে নানা ফুলে
তোমারে তুষিবে ব'লে;
শৈশব-স্বরগ-গীতি করিছ প্রচার।
(পড়ে গেল—নাক ছেঁচে গিয়েছে বাছার।)
তুমি মম সুখ আশ
(লোকা'য়ে ভাঙ্গিবে বুঝি আর্‌সি এবার।)
প্রকৃতির নগ্ন বাস,
রেখেছে পবিত্র করি' মুরতি তোমার।
(টেরা হ'তে কোথা থেকে শিখিল আবার।)
তুমি শান্তি নিরমল—
(ফেলিল্‌ কাচের গ্লাস হ'লো চুরমার।)
শুভ পরিণয় ফল
(কাঁচি দিয়ে জামা কেটে করে একাকার।)
মানবের ক্ষুদ্র ছবি,
(টেবিলে উঠিবে ব'লে ধরেছে আব্দার।)
প্রভাত জীবন রবি
(কোথা হতে ছুরি টেনে করেছিস্‌ বার।)

ঈর্ষা হয়—প্রতিদিন
ঝটিকা, জলদ, হীন
বিমল হৃদয়াকাশ হেরিয়া তোমার;

খেলাকর খেলাকর,
তুমি প্রিয় শিশু'বর,
আনন্দে দোলাও তব দোলা খেলিবার।
কোমল ননীর দেহ,
সুখে নাচ অহরহ,
(চুপি চুপি ঢাকা খুলে খেতেছ খাবার।)
বিকচ গোলাপ তুমি,
(যা'—তোর মায়ের কাছে নাক মুছে আয়।)

ক্ষুদ্র করি মর্ত্ত্য ভূমি
পলে পলে নব ভাব জাগাও হিয়ায়।
উষা তারা সম মূর্ত্তি
উষা সম পাও স্ফূর্ত্তি
(গরাদ খুলিছে ব'সে ভাঙ্গা জানালার।)
তোমার সাহস ধন্য,—
(গিন্নি তুমি কোথা—শোন,
ছেলেটাকে না সরা'লে লেখা হ'লো ভার!)

শ্রীরসময় লাহা।

গদাই কাঠুরিয়া।

(একটী ফরাসী গল্প অবলম্বনে লিখিত।)

কোন গ্রামে গদাধর নামে এক কাঠুরিয়া বাস করিত। বাল্যকাল হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন এবং তাহার অবস্থাও অত্যন্ত দরিদ্র। কেহ কখনও তাহার সহিত মিশিত না, এবং তাহার চেহারাখানি এক অদ্ভুত রকমের। বর্ণ কয়লার মত, মুখখানি সহসা দেখিলে চক্ষু ও নাসিকার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইত, শরীর স্থূল এবং মাথায় লম্বা লম্বা জটা—লোকে তাহাকে "বুনো গদাই" বলিয়া ডাকিত।

এক দিন গদাই একটা প্রকাণ্ড গাছ কাটিবার পর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বনের মধ্যে একটী পুকুরের ধারে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল কিয়দ্দূরে ঘাসের উপর এক পরমা সুন্দরী ঘুমাইতেছে।

গদাই সহসা এ দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। ঐ সুন্দরীর পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র সর্প সুন্দরীকে দংশন করিতে উদ্যত হইতেছে

দেখিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। এবং "এত টুকু প্রাণী তোর শরীরে এত সাহস" এই বলিয়া কুঠারদ্বারা ঐ সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কুঠারের শব্দে ঐ সুন্দরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং সে এক পরীরূপ ধারণ করিয়া গদাইকে বলিল, "তুমি, আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয় বস্তুকে বাঁচাইয়াছ।"

গদাই কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া বলিল—"না গো আমি বিশেষ কিছু করি নাই—আর কখনও বনের ভিতর ঘুমাইও না যাও এখন বাড়ী যাও—আমি এখানে একটু বিশ্রাম করি।" এই বলিয়া গদাই নিজে ঘাসের উপর শুইল এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিল। পরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমার নিকট হইতে কি চাও?" গদাই বলিল "কিছু না কেবল, তুমি আমাকে আর বিরক্ত করিও না—একটু ঘুমাইতে দাও।" এই বলিয়া সে ঘাসের উপর শুইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল।

পরী তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিল "হায়রে নির্ব্বোধ, তুই এখনও আমাকে চিনিতে পারিলি না; যাহা হউক তুই যখন আমাকে আমার পরম শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিস্ আমি তোর কিছু না করিলে অকৃতজ্ঞ বলিয়া চিরকাল অসুখী হইব। তুই না থাকিলে আমাকে একশত বৎসর সর্প হইয়া কাটাইতে হইত। আমি তোকে এই বর দিতেছি যে তুই যাহা ইচ্ছা করিবি, তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া পরী অদৃশ্য হইল।

গদাই এ সকল কিছুই জানিত না। ক্রমে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে এমন সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেদিন বেশী কাঠ কাটা হয় নাই দেখিয়াই তাড়াতাড়ি কতক গুলি গাছ কাটিতে লাগিল; কিন্তু তাড়াতাড়ি করার জন্য সে শীঘ্র বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল

এবং ঘর্ম্মাবৃত কলেবর হইয়া তাহার ভোঁতা কুঠার খানি দেখিয়া বলিতে লাগিল এমন কোন প্রকার অস্ত্র পাই, যাহা দ্বারা বড় বড় গাছ নরম মমের মত কাটা যাইতে পারে। এই বলিয়া তাহার কুঠারখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহা একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষে লাগিয়া তাহাকে গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া গদাইয়ের সম্মুখে মড়্ মড়্ করিয়া ফেলিল। গদাই প্রথমে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু পরে ভাবিল যে তাহার নিজের কৌশলে ঐ গাছ কাটিয়াছে। তাহার পর সে কতকগুলি শুষ্ক শাখা একটী দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর বসিয়া বলিতে লাগিল যে এ কাঠের বোঝাটার যদি ঘোড়ার মত পা হয়, তাহা হইলে আমাকে আর এটা মাথায় করিয়া এতদূর হাঁটিয়া কুটীরে ফিরিতে হয় না। ইহা বলিবা মাত্র ঐ কাঠের বোঝা গদাইকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। গদাই কোন রকম আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া, সুখে তাহার সেই অদ্ভুত অশ্বে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিল।

এই গ্রামে সেই দেশের রাজা লক্ষ্মীধরের এক বাগান বাটী ছিল রাজা এই সময়ে তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত প্রিয় মন্ত্রী দিগ্‌গজ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক লোকজন সেখানে ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা ললিতাও তাঁহার কতিপয় সহচরী সঙ্গে লইয়া সেখানে ছিল। ললিতা পরমা সুন্দরী, ও যৌবনোম্মুখিনী। রাজা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও মনে সুখ ছিল না, কন্যার বিবাহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। বহুদেশের রাজা ও রাজপুত্র ললিতার করপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তাঁহার কন্যারত্ন দান করিতে সম্মত হন নাই কারণ কেহই ললিতার মনোমত হয় নাই। সুতরাং কিরূপে এক

সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পাত্র পাওয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন।

ললিতা প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় বাগান বাটির ছাদে বসিয়া বিমর্ষভাবে কি চিন্তা করে। তাহার প্রিয়সখীরা তাহাকে উৎফুল্ল করিবার নিমিত্ত গান গাহে, নৃত্য করে, গল্প বলে, কৌতুক করে; কিন্তু সে সকল কেবল বৃথা হয়, ললিতা এক ভাবেই বিমর্ষ থাকে।

গদাইকে প্রত্যহ সেই বাগান বাটীর সম্মুখ দিয়া গৃহে ফিরিতে হয়। কাঠের বোঝার উপর চড়িয়া গদাই যখন এই বাটীর নিকট উপস্থিত হইল তখন ললিতা ছাদের উপর চিন্তায় নিমগ্না। নিকটে দুইজন সহচরী। সখীদ্বয় সহসা এইরূপ অদ্ভুত অশ্বে গদাইকে আরোহিত দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। এবং তাহাদের হাতে যে কমলা লেবু ছিল তাহা গদাইয়ের মুখে ছুঁড়িয়া মারিল।

গদাই ঐ সখীদ্বয়ের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তোমরা হাস, হাস, চিরকাল যেন এই রকম হাস, এবং তোমাদের হাসি যেন কখনও না থামে।" ইহাতে তাহারা আরও হাসিতে আরম্ভ করিল, এবং ললিতার আদেশ সত্বেও তাহারা ক্রমাগতঃ হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

গদাই ললিতাকে দেখিয়া মোহিত হইল, এবং বলিতে লাগিল "কি সুন্দরী রাজকন্যা; এত সুন্দরী তবু এত বিমর্ষ কেন? এই রাজ কন্যার সকলই শুভ হউক, এবং যে ইহাকে প্রথমে হাঁসাইতে পারিবে ইনি যেন তাহাকে ভাল বাসেন এবং বিবাহ করেন।" মনে মনে এই বলিয়া গদাই মস্তক অবনত করিয়া রাজ কন্যাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিবার সময় তাহার কাঠের বোঝার দড়ি খুলিয়া গেল এবং বস্তাটী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে গদাই ডিগ্‌বাজি খাইয়া পড়িয়া গেল।

ইহা দেখিয়া ললিতা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। ক্ষণকাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া গদাইয়ের দিকে একবার আগ্রহ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

গদাইয়ের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আস্তে আস্তে কাঠগুলি কুড়াইয়া একটী বস্তা বাঁধিয়া তাহা মাথায় করিয়া গৃহে ফিরিল।

পরে ললিতা পিতার নিকট আসিয়া বলিল "পিতঃ, এতদিনে আমি মনোমত বর পাইয়াছি। আর আপনাকে আমার নিমিত্ত চিন্তা করিতে হইবে না। আমি তাহাকে বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছা করি।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এত দিনে কাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল? তনি কি মহারাজা উদয়াদিত্য, অথবা মহারাজ প্রতাপচাঁদ? অথবা কুমার মহেশ্বর কিংবা মহাপ্রতাপশালী কুমার সিংহ। শীঘ্র করিয়া বল কে তোমার মনোমত হইয়াছে?"

ললিতা বলিল "না আপনি যাহাদের নাম করিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ নয়। তিনি কে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না।"

রাজা—কি! আমি যাহাদের নাম করিলাম তাহাদের মধ্যে কেহ নয়? সে কে তাহা তুমি জান না? এ কি রকম কথা? তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিয়া থাকিবে?

ললিতা—হাঁ। তাহাকে আমি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই বাগানের সম্মুখে দেখিয়াছি।

রাজা—সে কি তোমাকে কোন কথা বলিয়াছে?

ললিতা—না মনের মিল হইলে কথার আবশ্যক কি?

রাজা লক্ষ্মীশ্বরের মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল এবং ক্ষণকাল ললিতার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া বলিলেন "সে নিশ্চয়ই কোন রাজা কিম্বা রাজকুমার।"

ললিতা বলিল "তাহা আমি জানি না। তাহা না হইলেই বা ক্ষতি কি?

রাজা—ইহাতে অনেক ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। তোমার মনোমত বর এখন কোথায় আছে বল ?

ললিতা—তাহা আমি জানি না।

রাজা তখন সহচরীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ক্ষণকাল পরে সখিদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তাহারা হি হি হি করিয়া উচ্চহাস্য করিতেছে।

রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোরা শীঘ্র থাম্।" কিন্তু তাহারা আরও বেশী হাসিতে লাগিল।

তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন।

ললিতা কাঁদিতে লাগিল এবং বলিল "পিতঃ, পিতঃ, এ কিরূপ আদেশ হইল।"

সখিদ্বয় বলিল "প্রভু, দয়া করুন। আমরা হাসি থামাইব। আমরা মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা স্বেচ্ছায় এইরূপ হাসিতেছি না, তাহা আপনি জানিবেন। এক যাদুকরের মন্ত্রে আমরা এইরূপ করিতেছি।" এই বলিয়া তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

রাজা স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন "আমার রাজ্যে যাদুকর! তাহা অসম্ভব। আমি তাহাদিগকে ত বিশ্বাস করিনা। তাহারা কি করিয়া আমার রাজ্যে অবস্থিতি করিবে?"

একজন সখী বলিল "মহারাজ, একটী কাঠের বোঝা কি মানুষকে লইয়া অশ্বের মত চলিতে পারে? আমরা বাগানের সম্মুখে ঠিক এই রূপ দেখিয়াছি।"

রাজা বলিলেন "ইহা নিশ্চয়ই যাদু বিদ্যার মত বোধ হইতেছে। প্রহরিগণ, তোমরা শীঘ্রই এই মনুষ্যকে কাঠের বোঝা সমেত গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া পুড়াইয়া ফেল। তাহা হইলে আমার রাজ্যে শান্তি স্থাপন হইতে পারে।"

ললিতা ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিল "কি, আমার প্রিয়তমকে পোড়াইবার আদেশ দিতেছেন, পিতঃ, ইহাকেই আমি বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তাঁহার মস্তকের চুল যদি কেহ স্পর্শ করে তাহা হইলে আপনি জানিবেন যে আমি নিশ্চয় মরিব।"

রাজা ভয়ে ও বিস্ময়ে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রী দিগ্‌গজকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন।

দিগ্‌গজ আসিলে পর রাজা ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "মন্ত্রি, আমার রাজ্যে এত প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে—আমি ইতিপূর্ব্বে ইহার কিছুই শুনি নাই এ কিরূপ হইতেছে। তুমি কি রাজ্যের কোন খবর রাখ না?"

দিগ্‌গজ উত্তর করিল "মহারাজ, এ রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান। দেশ রক্ষকদিগের সকলেরই মতামত পাইয়াছি। তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছেন যে, এ রাজ্যে সুখ ও শান্তি পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে।

রাজা ইহা শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আমার বাগানের সম্মুখ দিয়া এক যাদুকর কাঠের বোঝার উপর চড়িয়া অশ্বারোহীর ন্যায় গিয়াছে এবং যাদুমন্ত্রে আমার কন্যাকে বশীভূত করিয়াছে। এক্ষণে আমার কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে।"

তখন দিগ্‌গজ বলিল "মহারাজ, এ সংবাদ আমার জানা আছে। আমি এ রাজ্যের মন্ত্রী, আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। এই সমস্ত

সামান্য কথা মহারাজের কর্ণে তুলিতে ইচ্ছা করি নাই। যাহা হউক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার আদেশ পাইলে এই যাদুকরকে ফাঁসি দেওয়া হইবে।"

বুনো গদাইয়ের অদ্ভুত চেহারা গ্রামের কাহারও অপরিচিত ছিল না। বিশেষ কাঠের বোঝায় চড়িয়া গ্রামে প্রবেশ করাতে প্রত্যেক লোকই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং দেশ রক্ষক তাহাকে সহজেই গ্রেপ্তার করিল। গদাই তাহাতে কোন প্রকার বিচলিত না হইয়া দেশ রক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে রাজার বাগানবাটীর দিকে চলিল। বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, দুই ধারে পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিহিত রাজ প্রহরিগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাজকন্যা, গদাইকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তাহারা সকলে জ্ঞাপিত। সুতরাং তাহারা সকলেই গদাইকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিল। গদাইও তাহাদিগের প্রণাম প্রত্যার্পণ করিল। এইরূপ গদাই দশ বার বার মস্তক অবনত করিবার পর বিরক্ত হইয়া বলিল "যথেষ্ট হইয়াছে; তোমাদের মাথা নোয়ান ত ঢের দেখিলাম। এইবার তোমরা নাচিতে আরম্ভ কর।"

প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ সকলে মিলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্য দিয়া গদাই বাটীতে প্রবেশ করিয়া রাজ সমীপে নীত হইল।

গদাই রাজাকে দেখিয়া কোন প্রকারে ভীত না হইয়া একবার প্রণাম করিয়া রাজার সম্মুখে একখানি আসনে অনাহূত হইয়া বসিল এবং পা নাড়িতে লাগিল। ললিতা এই সময় বলিল "পিতঃ, ইনিই আমার প্রিয়তম, ইহাকেই আমি বিবাহ করিব। ইনি কি সুন্দর, ইহার ব্যবহার কি ভদ্র! আপনি ইহাকে নিশ্চয়ই ভাল বাসিবেন

ও স্নেহ করিবেন।" রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া অন্তরালে বলিলেন "দিগ্‌গজ, এ কে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যথা সাধ্য সাবধানে ইহাকে পরীক্ষা কর।"

দিগ্‌গজ তৎক্ষণাৎ গদাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল "রে নির্ব্বোধ তুই যদি আপনাকে বাঁচাইতে চাস্ ত বল্, তুই কোন ছদ্মবেশধারী রাজা কিম্বা রাজকুমার; অথবা সত্য সত্যই একটা যাদুকর?"

গদাই আসন পরিত্যাগ না করিয়া বলিল "আমি যদি যাদুকর হই তবে তুমিও যাদুকর।"

দিগ্‌গজ বলিল "মহারাজ, হয় ইহাকে ফাঁসির হুকুম দিন্ না হয় পুড়াইয়া মারিবার আদেশ দিন্। ইহাকে জীবিত রাখিলে দেশের অনেক অনিষ্ট সম্ভাবনা।"

গদাই বলিয়া উঠিল "যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাও দেখি তোমার বুদ্ধির দৌড় কত; দেখ যেন কামড়াইও না।"

যখন এই সকল কথাবার্ত্তা হইতে ছিল ললিতা সহসা উঠিয়া গদাইয়ের পাশে আসিয়া বসিল এবং বলিল "পিতঃ, যাহা আদেশ করিবার করুন। ইহাকে আমি স্বামী মনোনীত করিয়াছি। ইহার ভাগ্যে যাহা হইবে আমারও তাহা হইবে জানিবেন।"

রাজা ললিতাকে বলিলেন, "রে নির্ব্বোধ তুই নিজের দোষে নিজের দশা মন্দ করিলি। যাহা হউক ইহার উপযুক্ত শাস্তি পাইবি"—এই বলিয়া প্রহরিগণকে ডাকিয়া বলিলেন এই দুই হতভাগ্য প্রাণীর শীঘ্র বিবাহ দিয়া উভয়কে একখানি নৌকায় তুলিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া আইস।"

দিগ্‌গজ বলিল "মহারাজ আপনার ন্যায় প্রতাপশালী রাজা এ জগতে আর নাই। আপনার মত দয়ালু নম্র এবং সহৃদয় ব্যক্তিও আর

দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনার বিচারে আমরা মোহিত হইয়াছি কারণ ইহা কেবল আপনার মহত্বই প্রকাশ করিতেছে।”

রাজা বলিলেন “হায় আমার হতভাগ্য কন্যা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে! প্রহরিগণ, দিগ্‌গজকেও নৌকায় তুলিয়া দাও।”

দিগ্‌গজ ইহাতে অবাক্ হইল এবং রাজা রাঁজেড়াদিগের হৃদয়-হীনতা ও অকৃতজ্ঞতার বিষয় বক্তৃতা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রহরিগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তাহার পর তিন জনকে নৌকায় তুলিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। নৌকার চালক কেহ ছিল না। তাহারাও কেহ নৌকা চালাইতে জানে না; সুতরাং তরঙ্গ মধ্যে নৌকা হেলিয়া দুলিয়া সমুদ্রের ক্রীড়ামৃগবৎ হইল।

ক্রমে রাত্রি হইল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহারা নৌকায় বসিয়া যাইতে লাগিল। গদাই কোন প্রকার বিচলিত না হইয়া হাল ধরিয়া গান আরম্ভ করিল। ললিতা, গদাইকে নিকটে পাইয়া আপনাকে পরমসুখী বিবেচনা করিল। এবং অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা ক্ষণ-কালও তাহার মনে স্থান পাইল না।

দিগ্‌গজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নানা প্রকার বক্তৃতা আরম্ভ করিল। কখনও বা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। গদাই এই অনন্ত বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে নিদ্রার উদ্যোগ করিল।

দিগ্‌গজ বলিল “নির্ব্বোধ যাদুকর! আমাদের কি দশা হইবে, তাহা কি কখন ভাবিয়াছিস? যদি তোর কোন ক্ষমতা থাকে ত এখন তাহা প্রকাশ করিবার সময়। তুই নিজে কোন দেশের রাজা হইয়া আমাকে মন্ত্রী নিযুক্ত কর। আমি রাজ্য শাসন না করিয়া থাকিতে

পারিবনা। বন্ধুর উপকার যদি না করিতে পারিস ত তোর ক্ষমতার প্রয়োজন কি ?"

গদাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চক্ষু খুলিয়া বলিল "আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।"

ললিতা চতুর্দ্দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "প্রিয়তম, তুমি কি খাইবে ?"

গদাই বলিল "আমি ল্যাংড়া আম ও সন্দেস খাইতে ইচ্ছা করি।"

দিগ্‌গজ তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল কারণ সে দেখিল যে এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম ও এক হাঁড়ি সন্দেস তাহার পায়ের নিকট উঠিল এবং তাহাকে নৌকার মধ্যে উলটাইয়া দিল। তৎপরে সে ভাবিল—বটে, আমি তোর ক্ষমতার বিষয় ঠিক্ বুঝিয়াছি। ধূর্ত্ত যাদুকর যদি যাহা ইচ্ছা করিস তাহাই হয় তবে ত আমি কেল্লা মেরে দিয়েছি। আমি এতদিন মন্ত্রীত্ব করিয়া যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমি শীঘ্রই আমার যাহা ইচ্ছা তাহা তোর দ্বারা করাইয়া লইব।

গদাই মনের সাধে আম ও সন্দেস খাইতে লাগিল, দিগ্‌গজ তাহাকে হাসিতে হাসিতে বলিল "প্রভু গদাধর, আমি আপনার চরণাশ্রিত বিনীত দাস। আপনার শ্রীচরণে আমার যেরূপ ভক্তি তাহা বর্ণনাতীত। আমি আপনার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী—আমিই আপনাদিগের শুভপরিণয়ের একমাত্র কারণ।"

গদাই কোন কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল "আমার এখনও পেট ভরে নাই, আরও কতকগুলি আম ও সন্দেস দাও।"

দিগ্‌গজ তাড়াতাড়ি কতকগুলি আম ও সন্দেস লইয়া গদাইকে দিল। এবং হাসিতে হাসিতে বলিল "প্রভু গদাধর, আপনি নব পরিণীত ; নব বধূ শ্রীমতী রাজকন্যাকে যৌতুক দিতে কি ইচ্ছা করেন ?"

গদাই বলিল "ওহে বুড় তোমার বক্তৃতায় আমাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে। এখানে আবার কোথা হইতে বহুমূল্য যৌতুক পাইব? সমুদ্রের তল হইতে নাকি? যাও, তুমি নিজে সমুদ্রের মধ্য হইতে কোন মাছের নিকট হইতে যৌতুক লইয়া আইস দেখি।" এই কথা বলিবা মাত্র দিগ্‌গজ নৌকা হইতে উল্‌টাইয়া পড়িল এবং সমুদ্র মধ্যে ডুবিয়া অদৃশ্য হইল।

গদাই পূর্ব্ববৎ আম ও সন্দেস খাইতে লাগিল। এবং ললিতা তাহার পাশে বসিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিল। সহসা গদাই বলিল "দেখ দেখ একটা কত বড় কচ্ছপ আসিতেছে।" কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে কচ্ছপ নহে। ইহা সেই মন্ত্রী দিগ্‌গজ তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে ছিল। গদাই তাহার চুল ধরিয়া তাহাকে নৌকায় তুলিল।— গোলাকার দিগ্‌গজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুখ হইতে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল রত্ন বাহির করিয়া বলিল—"প্রভু গদাধর, মাছেরা রাজ কন্যার যৌতুক স্বরূপ এই অমূল্য রত্ন উপহার দিয়াছেন। আপনি তাহা রাজ কন্যাকে দিন। দেখুন্ প্রভু, অধীনকে—

গদাই বাধা দিয়া বলিল "আমায় আরও গোটাকতক আম ও সন্দেস দাও।"

দিগ্‌গজ একথা শুনিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সে আবার বলিল "রাজ কন্যে, সম্মুখে চাহিয়া দেখুন। কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব!"

ললিতা বলিল "কই, আমিত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

গদাই ও বলিল "কই আমিত কিছু দেখিতেছি না।"

দিগ্‌গজ যেন কত চমৎকৃত হইয়া বলিল "ইহা কি সম্ভব? আপনারা কি ঐ সুন্দর রাজ প্রাসাদ দেখিতে পাইতেছেন না?

আগাগোড়া মর্ম্মর-প্রস্তরে-মণ্ডিত—তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া কি শোভা হইতেছে। উহার একশত সোপানাবলী কি চমৎকার। তাহার দুইধারে কেমন সুমিষ্ট ফল বৃক্ষগুলি ফলভরে শোভা করিয়া রহিয়াছে। সোপানগুলি সমুদ্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কি মনোরম!"

ললিতা বলিল "কি বলিতেছ, এক রাজপ্রসাদ! যেখানে কেবল মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর লোকেরই প্রাদুর্ভাব, আমি এরূপ স্থানলাভ করিতে ইচ্ছা করি না।"

গদাই বলিল "ইহা আমিও চাহি না। কুটীর আমাদের পক্ষে, ইহাপেক্ষা ভাল সেখানে থাকিয়া সুখ লাভ করিতে পারিব।"

দিগ্‌গজ বলিল "কিন্তু এই যে রাজ প্রাসাদ দেখা যাইতেছ, ইহাতে কোন লোক জন নাই। ইহার সকল কার্য্যই আপনা আপনি সম্পন্ন হয়। ইহার আস্‌বাব গুলির অদৃশ্য হাত আছে এবং ইহার দেয়াল গুলির অদৃশ্য কাণ আছে।

গদাই জিজ্ঞাসা করিল "দেয়াল গুলি কি কথা কহিতে পারে।"

দিগ্‌গজ উত্তর করিল "আজ্ঞে হঁা—তাহারা আপনার আদেশানু-সারে কথা কহিবে ও চুপ করিবে।"

গদাই বলিল "তাহা হইলে তাহারা তোমা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান। আমি এরূপ একটী প্রাসাদ পাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কই আমি ত এরূপ দেখিতে পাইতেছি না।

এমন সময় ললিতা বলিল "প্রিয়তম ঐ যে প্রাসাদ তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে।"

নৌকাখানি তৎক্ষণাৎ তীরে আসিয়া ঠেকিল। তথা হইতেই এক সুন্দর সোপানাবলী আরম্ভ হইয়াছে। এবং ঐ সোপানাবলীর উপরে উঠিলে প্রাসাদের প্রবেশদ্বার; তাহারা তিন জনে নৌকা

হইতে নামিল। দিগ্‌গজ আগে আগে চলিল। এবং তাহার পশ্চাতে গদাই ও ললিতা একত্র চলিল—প্রাসাদদ্বারে পৌঁছিয়া দিগ্‌গজ লৌহ-দ্বারে আঘাত করিল। লৌহদ্বার প্রশ্ন করিল "তুমি কি চাও ?"

দিগ্‌গজ উত্তর করিল "আমি এই অট্টালিকার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

লৌহদ্বার বলিল "এ প্রাসাদ প্রভু গদাধরের। যখন তিনি আসিবেন, আমি খুলিয়া যাইব।"

ক্ষণকাল মধ্যে গদাই ও ললিতা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া গেল।

তিন জনে একটী ঘরে প্রবেশ করিল। তৎপরে গদাই বলিল "কই এখানে বসিবার কোন আসন নাই।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিন খানি আসন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিল "এই যে আমরা আসিয়াছি।"

গদাই বলিল এখানে যদি আহারের সামগ্রী পাওয়া যায় ত কি আমোদ হয়। তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে ত্রিশখানি থালা ও নব্বুইটী বাটী নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া এবং কয়েকটী শীতল জলপূর্ণ গেলাস ও সুগন্ধ পানের খিলি পূর্ণ ডিপা আসিয়া বলিল "এই যে আমরা উপস্থিত হইয়াছি।" তাহারা সকলেই মনের সাধে আহার করিল। তৎপরে দিগ্‌গজ বলিল "প্রভু গদাধর, আপনি দেখিতেছেন আমি আপনার জন্য কি অসাধ্য সাধন করিয়াছি। এ সমস্ত আমারই কায।"

হঠাৎ একটা দেয়াল হইতে একটা স্বর বাহির হইল এবং বলিল "তুই মিথ্যাবাদী।"

দিগ্‌গজ স্তম্ভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দেখিল কাহাকেও দেখিতে পাইল

না। তৎপরে বলিল "ধর্ম্মাবতার, আমি কখনও কপটতা করি নাই। কখনও মিথ্যা কথা বলি না, তাহা ত আপনি জানেন।"

পুনরায় ঐ স্বর বলিল "তুই মিথ্যাবাদী।" ইহাতে দিগ্‌গজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল "প্রভু গদাধর, এখানে নির্জনে বাস করা অপেক্ষা আপনি কি কোন স্থানে রাজা হইতে ইচ্ছা করেন না যেখানকার সকল লোকই আপনার অনুগত ও বিশ্বাসী ভৃত্য হইবে?"

গদাই বলিল "কি, রাজা হইব, কি জন্য?"

ললিতা বলিল "প্রিয়তমে, আমরা এই খানেই থাকিব কারণ এখানে আমরা সকলেই সুখী।"

তখন দিগ্‌গজ বলিল "আজ্ঞে, হ্যাঁ, এখানে আমরা সকলেই সুখী। আমাপেক্ষা সুখী আর কেহ নাই। আপনাদের নিকটে থাকা অপেক্ষা আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।"

পুনরায় ঐ স্বর বলিল "তুই মিথ্যাবাদী।"

তখন দিগ্‌গজ বলিল "আপনারা ঐ স্বর বিশ্বাস করিবেন না। আমি আপনাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করি তাহা নিশ্চই জানিবেন।"

পুনরায় ঐ স্বর বলিল "তুই মিথ্যাবদী।"

তৎপরে গদাই বলিল। "দিগ্‌গজ, তুমি যাহা বলিতেছ সকলই যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে এখানে আর থাকিও না। চাঁদে গিয়া বাস কর।" এই কথা বলিবামাত্র প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌গজ শূন্যে উঠিল এবং ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

এইরূপ দিগ্‌গজ দূর হইলে গদাই ও ললিতা উভয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাসাদ পর্য্যবেক্ষণ করিল। এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তৎপরে ললিতা বলিল "প্রিয়তম তোমার কি আর কিছু ইচ্ছা করিবার আছে।"

গদাই বলিল "আমি কখনও কিছু ইচ্ছা করি নাই। এখানে দেখিতেছি চতুর্দ্দিকে অনেক গাছ আছে। কল্য হইতে আমি ঐ সকল কাটিতে আরম্ভ করিব। আমি তাহা হইলে অনেক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করিতে পারিব।

ললিতা বলিল "হায়, তবে কি তুমি আমাকে ভাল বাস না?"

গদাই বলিল "তোমাকে ভালবাসা? সে আবার কি? আমি তোমার কোন অপকার করিব না বরং উপকার করিব। এই যে প্রাসাদ, ইহা তোমার হউক, এবং আমি ইচ্ছা করি যে তোমার পিতা আসিয়া এখানে তোমার সহিত বাস করুন। আমি কাঠুরিয়া হইয়া জন্মিয়াছি এবং কাঠুরিয়া হইয়াই মরিতে ইচ্ছা করি।—তুমি কাঁদিওনা আমি তোমাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না।"

ললিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "প্রিয়তম, আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছ কেন? আমি কি এত কুৎসিতা ও গুণহীনা যে আমি তোমার ভালবাসা পাইবার যোগ্য নহি?

গদাই বলিল "ভালবাসা আবার কি? সে ত আমার যোগ্য কায বোধ হইতেছে না। তুমি পুনরায় কাঁদিতে লাগিলে? আচ্ছা, 'ভালবাসি' বলিলেই যদি তুমি সুখী হও ত আমি তোমাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করি।"

তৎক্ষণাৎ গদাইয়ের অন্তঃকরণে ললিতার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিল এবং উভয়ে সুখী হইল। এই সময় সেই পরী, রাজা লক্ষ্মীশ্বরকে লইয়া সহসা তাহাদের সম্মুখে আবির্ভাব হইল। রাজা কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অবধি অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাকে সুখী দেখিয়া তাহাকে ও গদাইকে শুভআশীর্ব্বাদ করিয়া স্বরাজ্যে পরমানন্দে ফিরিয়া গেলেন।

তৎপরে গদাই ও ললিতা সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিল। ঐ পরীও তাহাদের কখন পরিত্যাগ করে নাই।

চাকরীর বিজ্ঞাপন।

আমার নাম Mr. Talukdar। আমার পিতার নাম রামচন্দ্র সমজদার। বাসস্থান নিশ্চিন্তপুর, জেলা বলিপুর, ডাকঘর যমপুর। আমার জমীদারীতে নানারূপ লোকের প্রয়োজন। প্রথমতঃ একজন খিচুড়ি বানাইবার ভাল ব্রাহ্মণের দরকার। যদি সেরূপ ব্রাহ্মণ না মেলে না হয়, একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ করা লোক হইলেই চলিবে। রান্না যাঁকে তা'কে দিয়া করিয়া লইব, তাহাতে বিশেষ আসিয়া যাইবে না; তবে তদারকটা ভাল করিয়া করান চাই। রোগ ভাল হউক আর নাই হউক তদারক চাই। অন্ততঃ ছাত্রবৃত্তি পাশ করা লোককে Preference দেওয়া যাইবে। কারণ যে abstractএর খিচুড়ি বানাইতে বেশ নিপুণ সে concrete জিনিসে ত সোণা ফলাইয়া দিবে! কম নিপুণতার কাজ? পদার্থ বিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, রসায়ন, মেনসুরেসন প্রভৃতি এত জিনিসের বেমালম খিচুড়ি! খিচুড়ি তৈয়ারী হইবে কিন্তু দ্রব্যগুলির কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। Experienced লোক কথাটি কহিবার যো নাই!

একজন পাকা এন্‌জিনিয়ারের প্রয়োজন। বিশেষরূপে ধূম বিদ্যায় দখল থাকা চাই। যিনি ছেলে বেলা হইতে অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর বয়স হইতে (যদি তার এত অল্প বয়সের কথা না মনে থাকে, তবে তাহার বাপ মার সার্টিফিকেট্ দিতে হইবে) বার্ডসাইটা আস্টা খাইয়া ধূম বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি আবেদন করিলে

আমি তাঁহাকে দিয়া ষ্টীম এঞ্জিনের কোন নূতন প্রণালী আবিষ্কারের প্রস্তাব করিব।

আমার একজন বিচারকের প্রয়োজন। এই পদপ্রার্থী একজন সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইলে আমার অল্প পয়সায় বেশ চলিয়া যাইবে। যে সে সম্পাদক হইলে চলিবে না। শ্রাদ্ধ শান্তি করিতেও জানা চাই, কেবল মৃত ব্যক্তির জানিলে চলিবে না, জীবন্ত ব্যক্তির জানা আগে দরকার। জীবন্ত ব্যক্তির করিতে করিতে তবেত মৃত ব্যক্তিতে পৌঁছিবে। সেকেলে শাস্ত্র মতে শ্রাদ্ধ করিলে চলিবে না। মত নূতন চাই Innovation হয় তাহাতে কি আসে যায়? ব্যক্তি বিশেষের উপর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত খুঁটিয়া খুঁটিয়া নিখুঁত করিয়া গালাগালি ভাঁজিতে হইবে। ফৌজদারী আদালতের টানাটানির ভয় করিলে চলিবে না। সে ত কাপুরুষের কায। এরূপ একজন লোক হইলে বিচারকের কাযটা চলিবে কি? সম্পাদকের অন্তঃকরণ যৎপরোনাস্তি কঠিন হইলে চলিবে না। একটু দয়া মমতা থাকা চাই বিশেষ বন্ধু বান্ধবের উপর। বন্ধুবান্ধবদিগের পুস্তকাদি সমালোচিত হইতে আসিলে রূঢ়ভাবে সমালোচনা না করিয়া বরং যাহাতে সেই সকল বইয়ের অধিক কাট্‌তি হয়, এরূপ ভাবে সমালোচনা করেন। সম্পাদক মহাশয়ের সমালোচনা করিবার সময় না থাকিলেও বা পত্রিকায় স্থান না থাকিলেও যাঁহার পুস্তক তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া অপরের সমালোচনা মুলতুবি রাখিয়া, যাহাতে সেই বন্ধুর পুস্তকের সমালোচনা শীঘ্র বাহির হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে জানেন এমত একজন দয়া দাক্ষিণ্য মমতা বিশিষ্ট লোক চাই। বিচারকের mercy থাকা চাই কারণ mercy seasons justice.

আমার রাজ্যে কতকগুলি শান্তি-রক্ষকের প্রয়োজন। যাঁহারা

এক কথায় বাপকে অন্য কিছু বলিতে পারেন, বিনা দোষে পুলিশ সোপরদ্দ করিতে পারেন, হয় কে নয় ও নয় কে হয় করিতে পারেন। যাঁহারা নবাব সিরাজদ্দৌলার নাতি ভাবিয়া নিঃসঙ্কোচে বুক ফোলাইয়া বুককে বিস্তারিত করিয়া দিয়া মানুষের ঘাড়ের উপর চাপাইতে পারেন। কেবল বুকের স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকিলে চলিবে না হস্ত প্রসারণেরও কিছু special qualification চাই। অন্ততঃ হাতটা কিছু বেশী চালান চাই। মাতালকে বশ করিবার বিদ্যা যাহাদের বিশেষ আয়ত্তাধীন। মাতালদিগের সহিত বড় কুটুম্ব সম্বন্ধ পাতাইতে যাঁহারা এত নিপুণ যে তামাসা করিয়া ওঠবোস করাইয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে স্বগৃহে লইয়া গিয়া বেশ জলযোগ করাইয়া বিদায় দেন। যাঁহারা সারথী কুলের যম স্বরূপ। যাঁহাদের ভয়ে সারথীকুলে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করিতেছে। যাঁহারা মধ্যাহ্ন ও রাত্রি ব্যতীত ২৪ ঘণ্টাই যাগিয়া যাগিয়া পাহারা দিতে সক্ষম হইবেন, এরূপ লোক এ সুবিধা আর পাইবেন না। কায বসিয়া বসিয়া অথচ বেশ দুপয়সা আছে।

কতকগুলি বিশেষ পারদর্শী শিক্ষকের প্রয়োজন। এ শিক্ষক কেবল পাশ টাশ করা হইলে চলিবে না, পাশ করা না হইলেও চলিতে পারে—তবে একটু কেরামতি দেখাইতে হইবে। ভাষার অক্ষর পরিচয় না করাইয়াও সেই ভাষায় পুস্তক পড়াইতে হইবে। নেহাৎ যদি এরূপ অসম্ভব হয় তাহা হইলে না হয় বাঙ্গালায় নাটক নভেল প্রণেতা হইলেই একরূপ শিক্ষকের কার্য্য বেশ চলিয়া যাইবে। যাইবে নাকি? বাঙ্গালা নাটক ও উপন্যাসকার ত ফল্গুনদী—দিবানিশি অন্তঃসলিলে বহিতেছে। লিখিবেন বাঙ্গালা কাযে দাঁড়াইবেই ইংরাজী। ইহা ভাষার বিনা অক্ষর পরিচয়ে ভাষা শিক্ষা নহে কি? কেবল বাবুরা পেট থেকে

পড়িয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ক্ষান্ত নহেন 'বাব্বী'রাও গৃহকোণে বসিয়া দেশী বাঙ্গালা বোতলে বিলাতি সুরা পান করিতেছেন।

যিনি চাকরি প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের সব সভা অসভায় যোগ দান করা চাই। কিন্তু যোগ দানের চোটে যেন বাপ মার থাই খরচ দিতে ভুলিয়া না যান। দেশ বিদেশে স্ত্রী লইয়া ঘুরিবার ক্ষমতা থাকা চাই কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে অন্য বাজে লোক লইয়া বেড়ান অভ্যস্ত লোকের দরখাস্ত করিবার আবশ্যক নাই। যার বাজে লোকের উপর এত টান —অর্থাৎ বাপ, মা, ভাই ভগ্নী প্রভৃতির উপর এত টান—সে সব লোক আমার চলিবেনা। যদি সে কেবল স্ত্রী লইয়া ঘুরিবার অভ্যাস না করিয়া থাকে তা না হয় grace স্বরূপ একজন দূরসম্পর্কীয় পিসি কি মাসি— যিনি রন্ধনে দশ হাত বার করিতে পারেন কিম্বা অন্ততঃ দ্রৌপদীর ন্যায় দুই হাত বার করিতে পারেন—প্রকৃত পক্ষে বামুনের গতরটী অর্থাৎ অল্পভোজী বা রাত্রে উপবাসী বা অর্দ্ধভোজী, এমন একজন লোক দেওয়া যাইতে পারে।

চাকরী প্রার্থী একজন হিন্দু হইবেন কিন্তু অত prejudice থাকিলে চলিবেনা। দিনে ফল ভোজী হয় হউক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু রাত্রে লুকাইয়া হোটেল মারিতে বেশ নিপুণ—দিনের বেলায় ধর্ম্মোপদেশক, রাত্রে it is day light that makes sin এই motto আওড়াইতে আওড়াইতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাড়ী আসিবার পথ সহজেই বিস্মৃত হন। লাল পানি পাইলে যার সাদা জলে তৃষ্ণা নিবারিত হয় না কারণ মাংস ও রঙ বিশেষ পানি না খাইলে শরীরে vigour হয় না খালি শাক চড়চড়ীতে এতদূর বদিয়াতি সহিবে কেন? চাকরি প্রার্থী হিন্দু হইবেন কিন্তু হিন্দুর ন্যায় পোষাক হইলে চলিবে না। ঝল্‌ঝলে পোষাকে কোন কাজই হয় না। হ্যাট্, কোট্, পেণ্ট্‌লেন পরিয়া

(কেবল শীত কালে নহে গ্রীষ্ম কালে পর্য্যন্ত) যিনি হস্তে ছড়ি ও মুখে চুরুট দিয়া ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজী বাঙ্গালা মিশ্রিত বুলি না বলিতে পারেন সে dull লোক আমার প্রয়োজন নাই।

কেবল সমাজে অসমাজে যোগ দিলেই হইবে না তাহাকে সমাজের কার্য্যে এত দূর মন সংযোগ করিতে হইবে যে নিজ কন্যার বিবাহ কাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও যার মনে থাকে না। ছেলেরা সাবালক হইলেই যিনি বাড়ীতে থাকা পছন্দ করেন না। ধেড়ে ধেড়ে মেয়েরা অবিবাহিতা থাকিয়া চিরকাল অন্ন ধংসাইলেও যার সহ্য শক্তির হ্রাস হয় না। যিনি আরও সেই মেয়েদের লেখা পড়ার জন্য বাড়ীতে মেম আসিবার বন্দোবস্ত না করিয়া কিম্বা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী লেডী-স্কুলে না পাঠাইয়া থাকিতে পারেন না তাঁর culture হয় নাই অতএব সে মনুষ্য নামের যোগ্যই নহে সে দ্বিপদ বিশিষ্ট পশু লইয়া আমি কি করিব ?

দরখাস্ত এক মাসের ভিতর করিতে হইবে। বেশী সময় দেওয়া গেল—সত্বেও যে বিশেষ ফল হইবে তা দেখি না কারণ আমার লোক জন সব একরূপ ঠিক করাই আছে ; আমার শ্বশুর ও আমার স্ত্রীর বন্ধুর স্বামী যাঁহাকে recommend করিয়াছেন তাঁহাদেরই এক প্রকার পছন্দ করিয়া রাখিয়াছি তবে সকলকে একবার একটা chance দেওয়া উচিত তাই এই বিজ্ঞাপন দিলাম। ইহাতে আর কোন কথা থাকিবেনা লোকের কাছে আমি খালাস।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

M. T.

c/o Manager.

কালিদাস প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কালিদাস মহাকবি হইয়াও অনেকগুলি অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে নির্জ্জন স্থান ভালবাসিতেন। তিনি কখন কখন রাজধানী ত্যাগ করিয়া আসিয়া নিভৃত স্থানে কালাতিপাত করিতেন। একদা তিনি এইরূপ নিভৃত স্থানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটী কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক নৃপতি নরযানে আরোহণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় বিচারাদি করিতে যাইতেছিলেন। পথে এক জন বাহক পীড়িত হইয়া পড়ে। রাজা বাহকের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। উহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে একজন পুরুষকে দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ উহারা উহাকে ধরিয়া আনিয়া উহার স্কন্ধে যানভার দিল। কালিদাস তখনও নীরব, ভাবে বিভোর। তিনি যে যান বহন করিতেছেন তাহা তিনি আদৌ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্রমেই চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন যে তিনি নরযান বহন করিতেছেন। তখন কিন্তু আর পলাইবার উপায় নাই। কি করেন? মধ্যে মধ্যে একবার পশ্চাৎ দিকে দেখিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে স্কন্ধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যান মধ্যে রাজা বুঝিলেন যে এক ব্যক্তির স্কন্ধ ব্যথিত হইতেছে। তিনি বলিলেন,

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম, স্কন্ধ স্তে যদি বাধতি।"

"রে জাল্ম! যদি তোর স্কন্ধ ব্যথিত হইয়া থাকে তবে তুই কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্।" কালিদাস দেখিলেন যে রাজা 'বাধতি' পদ প্রয়োগ করিলেন কিন্তু 'বাধতি' পদ অশুদ্ধ। তিনি একটু দুঃখিত হইলেন।

মনে মনে ভাবিলেন স্বয়ং রাজা এরূপ অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করিলেন। তখন তিনি তদুত্তরে বলিলেন

"ন তথা বাধতে স্কন্ধঃ যথা 'বাধতি' বাধতে।"

"আমি 'বাধতি' পদ শুনিয়া যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছি তদপেক্ষা আমার স্কন্ধে অধিক বেদনা অনুভূত হইতেছে না।" রাজা তখন বাহকের কথাটা বুঝিলেন। তিনি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন উহাও বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন যে যান বাহক সামান্য লোক নহেন। তখন তিনি উহাকে ছাড়িয়া দিতে এবং নিজ সমক্ষে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহক সম্মুখে আসিল। পরিচয়াদির পর রাজা বুঝিলেন যে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার যান বহন করিতে ছিলেন। তখন তিনি উঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিচারার্থ আর না গিয়া তথা হইতেই স্বদেশ প্রস্থান করিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কালিদাসকে যখন যানবহনের নিমিত্ত ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তিনি কলের পুত্তলিকার ন্যায় চলিয়া গেলেন, কোনও প্রকার বাধা দিলেন না বা দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি তখন নীরব ছিলেন—ভাবে বিভোর ছিলেন। বস্তুতঃ কবি যখন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন তখন তিনি প্রকৃত ঘটনা সকলের বিষয়ে সম্পূর্ণই উদাসীন থাকেন। তখন তিনি স্বকল্পিত রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বর। কবি যথার্থই বলিয়াছেন "কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিং" অর্থাৎ "যদি কবিত্ব থাকে তবে রাজ্যের প্রয়োজন কি?" কবি তখন নিজের কল্পিত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ হয়েন। ছার পার্থিব রাজ্যে তখন তাঁহার প্রয়োজন থাকে না। তখন তাঁহার হৃদয় নূতন নূতন ভাবে পূর্ণ। তিনি সেই ভাবসমুদায় নূতন বেশে মানব সমক্ষে

উপস্থিত করেন। মানবগণ সেই সকল ভাবে মোহিত হইয়া যায়। কালিদাস কবি। তিনি তাঁহার কল্পনার রাজ্যে যখন নূতন ধরণে সজ্জিত করিতে ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয় সিংহাসনে যখন সেই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই সৌন্দর্য্যের মানসী মূর্ত্তিকে বসাইয়া তাঁহাকে সকল উপমা দ্রব্য হইতে উত্তমাংশ তিল তিল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণে ভরিয়া সাজাইতেছিলেন—সেই সময়েই তাঁহাকে যান বহনের জন্য ধরিয়া লইয়া যায়। তখন যে তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য থাকিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সে সময়ে তিনি যে কি কল্পনা করিতেছিলেন তাঁহার কুমারসম্ভবের উমা মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিলেন, অথবা তাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্ব,—সেই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা —শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন কেহই উহার কিছু নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

অতঃপর কালিদাসের বিষয়ে আর অধিক ঘটনা পওয়া যায় না। কালিদাসের শেষাবস্থা বড়ই শোচণীয়। কুলটার গৃহে উঁহার অপঘাত মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে কালিদাসের প্রতি সরস্বতীর যে অভিশাপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই অভিশাপ এই সময়ে ফলিয়াছিল। দেবী কালিদাসকে অভিশাপ দেন যে 'তোমার যেন অতি ঘৃণিত প্রকারের মৃত্যু হয়।' সে যাহা হউক, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত কালিদাসের কিছু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। উহার ফলে কালিদাস রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপনীত হয়েন এবং একটী শ্লোকের অর্দ্ধাংশ বলিয়া উহার অপর অর্দ্ধাংশ পূরণার্থে সভাস্থ পণ্ডিতগণকে অনুরোধ করেন। শ্লোকটী যথা :—

"কুসুমে কুসমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।"

অর্থাৎ 'পুষ্পের মধ্যে পুষ্পের উৎপত্তি হয় এ কথা কেবল শুনা যায় মাত্র কিন্তু কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না'। সভাস্থ পণ্ডিতগণ কেহই শ্লোক পূরণ করিতে পারিলেন না। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে এই শ্লোকার্দ্ধ পূরণ করিতে পারিবে তাহাকে তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপহার দিবেন। এই রূপ ঘোষণা করিবার কারণ এই যে বিক্রমাদিত্য জানিতেন যে কালিদাস ব্যতীত আর কেহ উহার উত্তর দিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপে তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে কালিদাসকে তিনি পুনরায় রাজসভায় আনাইতে পারিবেন। কালিদাস ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। একদা তিনি পূর্ব্বোক্ত কুলটা গৃহে গিয়া দেখেন যে দেওয়ালে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ লিখিত রহিয়াছে যথাঃ—

"কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।"

তিনি কবি-সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীন জগতে কোনও বস্তুই অসম্পূর্ণ দেখিতে চাহেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ইষ্টক খণ্ড লইয়া শ্লোকার্দ্ধ পূরণ করিলেন। যথাঃ—

"বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবর দ্বয়ং।"

অর্থাৎ "বালিকে! তোমার মুখপদ্মে তবে ইন্দীবর (সদৃশ) নেত্রদ্বয় কিরূপে সম্ভব হইল"।

শ্লোকার্দ্ধ পূরণ করা হইয়াছে দেখিয়া সেই কুলটা মহাহর্ষিত হইল। সে মনে ভাবিল হয়ত ইনিই কালিদাস হইবেন। কেননা কালিদাস ব্যতীত অপর কেহ এই শ্লোক পূরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় জীবিত থাকিতে কখনই যাইবেনা। এইরূপে সে তাঁহাকে জীবিতই হউক বা মৃতই হউক রাজ সভায় লইয়া যাইবে মনস্থ করিল এবং যখন বুঝিল যে তিনি জীবিত থাকিতে

রাজসভায় যাইবেন না তখন সে তাঁহাকে হত্যা করিবে স্থির করিল। নিশীথ রাত্রে সে কালিদাসকে হত্যা করিল এবং তাঁহার মৃত দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক স্থালী মধ্যে রাখিল। পরদিন সে রাজসভায় শ্লোক সহিত উপস্থিত হইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শ্লোক সম্পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মহা হর্ষিত হইলেন এবং যে কবি সেই শ্লোক পূরণ করিয়াছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর স্থালী মধ্যে কালিদাসের মৃত দেহ পাওয়া গেল। মহারাজ অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। এইত গেল কালিদাস বিষয়ে শেষ কথা। এই বিষাদ পূর্ণ ঘটনাটা কালিদাসের জীবনে গভীর কলঙ্ক রেখা দিয়া গিয়াছে।

কালিদাসের বিবরণ বলিতে গেলেই তাঁহার বিবিধ গুণের কথা স্বতই মনোমধ্যে উদিত হয়। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইলেও নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি রঘুবংশের প্রথমেই লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।"
মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

অর্থাৎ রঘুবংশের বিবরণ লিখিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর পারের চেষ্টার ন্যায় হইতেছে। উন্নত পুরুষ লভ্যফল লাভ মানসে বামন যেমন হস্ত প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয় মৎসদৃশ মূঢ় জনেরও কবি যশঃ প্রার্থী হইয়া সেই উপহাসাস্পদ হওয়া সম্ভব।" মহাকবি কালিদাসের নিকট হইতে এরূপ কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় বটে।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিপিন বিহারী সেন গুপ্ত।

কাশ্মীর।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে একটী প্রদেশ আছে তাহার নাম কাশ্মীর। এই কাশ্মীরে অনেক আশ্চর্য্য বস্তু আছে। সে সকল জিনিস আমাদের দেশের বলিয়া আমরা তাহার গৌরব করিতে পারি। সকল সময়েই নানা দেশীয় ভদ্রলোকেরা কাশ্মীরে বেড়াইতে যান।

কাশ্মীর পার্থিব স্বর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের জন্যই বোধ ইহাকে ঐরূপ বলা হয়। বাস্তবিক কাশ্মীরের শোভা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর যাইতে হইলে রাউলপিণ্ডি পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া মরি হইয়া টঙ্গা নামক এক প্রকার যানে যাইতে হয়। ঝিলাম নদীর তীর দিয়া এই রাস্তা বরাবর শ্রীনগর গিয়াছে।

কাশ্মীর পার্ব্বত্য প্রদেশ। বৎসরের অধিকাংশ সময় কাশ্মীর বরফে আচ্ছাদিত থাকে। ঝিলামের উপর সাতটী প্রাচীন কাষ্ঠ সেতু আছে।

নদীতীরস্থ অট্টালিকাগুলি দেখিতে তত ভাল নহে, তবে নদীতীরে অবস্থিত বলিয়া বড়ই সুন্দর দেখায়। নদী তীরস্থ অধিকাংশ অট্টালিকারই নদীতে বাঁধা ঘাট আছে। কলিকাতায় যেমন দরজা হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে উঠিতে হয় সেইরূপ কাশ্মীরের অধিকাংশ স্থানেই ঘাটে নৌকা আনাইয়া কোথাও যাইতে হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট আকবর কাশ্মীর জয় করেন। গ্রীষ্মকালে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা কাশ্মীরে যাইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে খুব বড় বড় বাগান তৈয়ার করাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এখনও আছে—এই সকল বাগান "বাগ" নামে

অভিহিত হয়। কাশ্মীরের কমনীয়তা এই সকল বাগিচার জন্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীনগরে একটী মনোহর হ্রদ আছে। এই হ্রদে কতকগুলি ভাসমান দ্বীপ আছে। বেগে বাতাস বহিলে এই সকল দ্বীপ বৃক্ষ, লতা, ঘরবাড়ী সমেত ইতঃস্তত ভাসিয়া বেড়ায়।

মোগলদিগের পর আফগানেরা কাশ্মীর অধিকার করেন। তাহার পর শিখবীর রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর জয় করেন ও গোলাপ সিংহকে উপহার দেন। গোলাপ সিংহের পৌত্র প্রতাপ সিংহ এখন কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছেন।

শ্রীনগরের "ক্ষীরভবানী" একটী বৃহৎ কুণ্ড। এই কুণ্ডের জলের বর্ণ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কেন এইরূপ হয় ইহার কারণ এতাবৎ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

একস্থানে একটী খুব বড় প্রস্তর খণ্ড আছে। উহার নিকট "হলদর জল দাও" বলিলেই উহার গাত্র হইতে বারিকণা পড়িতে থাকে। ইহাকে তত্রস্থ লোকেরা "হলদর" বলে।

শ্রীনগরের দক্ষিণভাগে এক স্থানে একটি উচ্চভূমি আছে; এই উচ্চভূমির নিম্নভাগে একটী বৃহৎ নালা আছে। নালাটী প্রায় বিশহস্ত প্রশস্ত। বৎসরের সকল সময়েই নালাটী শুষ্ক থাকে; কিন্তু ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নালাটি জলপূর্ণ হইয়া যায়, তাহার পর এই জল আবার কোথা চলিয়া যায়। বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র নালাটি জলপূর্ণ হয়। এই নালাটির নাম জটাগঙ্গা।

একস্থানে একটী গিরিগুহা আছে এই গুহার দ্বার এখন এক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে; শুনিতে পাওয়া যায় কোন জিনিস সেই গুহার ভিতর গিয়া থাইলে ঠিক বরফের ন্যায় লাগিত। কিন্তু

তাহা খাইতে খাইতে বাহিরে গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা যেরূপ সেইরূপ লাগিত।

ভারতবর্ষ নানা রত্নের আকর। এই ভারতবর্ষ সমস্ত ভাল করিয়া দেখিয়া তবে অন্য দেশ দেখিতে যাওয়া উচিত। কাশ্মীরের সমস্ত কথা বলিতে গেলে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে। যেগুলি খুব প্রধান সেগুলির উল্লেখ করা গেল। যদি সুযোগ পাই তবে বারান্তরে আবার কিছু বলিব।

শ্রীইন্দু প্রকাশ বন্দোপাধ্যায়।

ফুলের সাজি।

সেক্ষপীর।

মর জগতের তুমি হে অমর কবি!
প্রকৃতির বিদ্যালয়ে করি' অধ্যয়ন,
দেখা'লে সুকৃতি-ফলে সূক্ষ্মদৃষ্টি লভি,'
দুরাশা, পার্থিব সুখ, অসূয়া, বিলাস,
কেমনে গোপনে আসি' করে আক্রমণ
মানব অন্তর;—ধীরে করিয়া নির্ব্বাণ
ত্রিদিবের মৃদু জ্যোতিঃ নিত্য স্বপ্রকাশ—
ধর্ম্মাত্মার চির প্রিয় হিতাহিত জ্ঞান।
মোহের আবর্ত্তে পড়ি, স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত
হয় নর সুধাবৃত গরল আহারে;
আপাত সুখের লোভে হইয়া উন্মত্ত
রেখে দেয় স্ব-আত্মায় অনুশোচিবারে;
শেষে আত্মগ্লানি দহি' গ্রাসে কার মন,
তব কীর্ত্তি মাঝে তা'র দীপ্ত নিদর্শন।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র লাহা।

উচ্ছ্বাস।

১

মিশিছে সময় অনন্তের সনে
তটিনী সাগরে ঢালিছে কায়;
যামিনী-ভূষণ তারকার পানে
হাসিয়া হাসিয়া নিয়ত চায়।
সৌন্দর্য্য মিশিছে সৌন্দর্য্য বিভায়
এ মর-ভুবন আনন্দে ভরা;
এক প্রাণ হ'য়ে তোমায় আমায়
কেননা মিশিব যাবৎ ধরা?

২

কুসুমে হেরিয়া কুসুম যে হাসে
হরষে বিভোর দুলিয়ে বায়;
হাসিছে দামিনী জলধর পাশে
কৌস্তুভ যেমতি মাধব গায়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হাসিতেছে সুখে
রোগ, শোক, তাপ নাহিক আর;
কেন নাহি তবে তোমার ও মুখে
ক্ষরিবে অতুল সুধার ধার?

৩

প্রেমের আবেশে তরুবর কোলে
কাঁপায়ে নবীন পল্লব শত
লতা বধূ হের পড়িতেছ ঢলে
সৌরভে আকুল ভ্রমর যত।
জড় জগতেও প্রেমের সঞ্চার
কোমল করিছে কঠিন হিয়া;
প্রণয়ের উৎস হৃদয় তোমার
কেন না তুষিবে আমায় প্রিয়া?

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

দুঃখীর দুঃখ কেহ বোঝে না।

১

আমি কারে বা বুঝাব প্রাণের কথা
কারে বা বুঝাব মনোবেদনা;
কেই বা বুঝিবে হৃদয় ব্যাথা
নিঠুর মানব ব্যথা বোঝে না
পরের রোদনে পরের বেদনে
পরের মরণে কেহ ত কাঁদে না।

২

ভবে কেহ ত পরকে ডাকে না কোলে
কেহ ত দুঃখীকে লয় না তুলে
দাঁড়াইয়া কাছে কত দুঃখী আছে
কেহ তো ডাকেনা আপন ব'লে।

৩

সবে ব্যস্ত হয়ে দ্রুত কর্ম্ম ক্ষেত্রে ধায়
ঘৃণিত বচনে দুঃখীরে তাড়ায়;
সকলে সতত অর্থাগমে রত
দুঃখী পানে কেহ ফিরে নাহি চায়।

৪

পিতঃ দয়ার নিধান তুমি হে মহান্
ছোট বড় তব সকলি সমান
আমি করুণা কাহার যাচিবনা আর
তোমার প্রেমেতে রহিব মগন।

শ্রীমতী মৃণালিণী বসু।

সদ্যঃ প্রসূত শিশুর মরণে,—

১

ফুটিল ক্ষণেক তরে ফুল,
নিমেষ পড়িল একবার;
একবার চেয়ে মোর পানে,
ফিরে কই চাহিলনা আর!

২

ফুটেছিল নিমেষের তরে
প্রফুল্ল বদন শতদল ;
ভুলাইয়ে সকল যাতনা
দিয়েছিল হৃদয়েতে বল।

৩

ফুটে ফুল একদিন তরে,
একদিন খেলার প্রয়াসী ;
নিমেষে ঝরিলে তুমি ফুল,
হাসিতে মিশালে শোকরাশি !

৪

বাজাইলে হৃদয়ের বীণা
কেন যদি থামিবে ঝঙ্কার !
ধিক্ ভালে ! কে জানে আসিবে
হায়, উষাগতে অন্ধকার !

শ্রীমতী অ——মিত্র।

আর কতদিন তারা।

১

আর কতদিন তারা
আর কতদিন এ যাতনা ?
ডুবেছে জীবন ধ্রুব তারা
ভস্ম রাশি সকল কামনা।
হৃদয়ের ছিঁড়েছে বন্ধন
কে বুঝিবে প্রাণের ক্রন্দন ?
করেছ মা জনম দুঃখিনী
দয়াময়ি একি দয়া তোর ?
ছিল এক আশা কুহকিনা
দাবাগ্নি পশিল হৃদে মোর।
অম্বু নিধি দেখে দেখে হায়
পিপাসায় প্রাণ ছাড়ে কায়।

কবে চাই জন ধন মান
এক হৃদয়ের তান ভরেছে সকল প্রাণ
আশৈশব নাহি চাহে আন।
সে বাঁশি হয়েছে বাম অন্য কিবা মনস্কাম?
বনমালা নাহি চায় প্রাণ।

কতবার মৃত্যু আলিঙ্গন !
মরণের ভয় নাহি করি,
তবু আশা নিবারিতে পারি
কুহকিনী কাণে ধরি বলে
আশা তোর পূরিবে এখন।

চিরতরে কবে যাবে বল
মরু মরিচীকা আশা কেবল দুঃখের বাস
কেবল সে অমৃতে গরল
সংসার শ্মশান ভুমি ছায়া সম ফিরি আমি
ভস্মে ঢাকা হৃদয়ে অনল।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা বসু।

কোথায় আমার ঘর ?

উপরে আমার রয়েছে উজল
আকাশ নিলীমা ময়,
চারিদিক ঘেরি শোভার আধার
শ্যামল বিটপী চয়।
জগৎ ব্যাপিয়া আবর্ত্তন শুধু,
আলো আঁধারের খেলা
কোথায় কোথায় কোথা হতে আসে
হেথায় কিসের মেলা।
নীরব ধরণী দেখিছে চাহিয়া
স্তিমিত তারকা মালা,
বিশাল জগৎ ঢাকিয়া কেবল
অসংখ্য নিয়ম খেলা।
ঘুরিছে আকাশে কত যে জগৎ,
নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা,
সৃজন কল্লোলে যেতেছে ভাসিয়া
তিলেক মানেনা বাধা।
আবর্ত্তনে পড়ি দেশ ছেড়ে এনু
কত দূর দুরান্তর
অসংখ্য এসব সৃজন মাঝারে
কোথায় আমার ঘর ?

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়,
বর্দ্ধমান।

বালা-প্রেম।

ঊষার কিরণ চুমিছে চরণ
আনত বদনে বালা
বকুল তলায় আনমনে বসি'
গাঁথিছে বকুল-মালা।
আসে পাশে কিবা খেলিছে চিকুর,
বকুল পড়িছে ঝ'রে,
ফোটা ফোটা সাদা বকুলে বালার
উৎসঙ্গ যেতেছে ভ'রে।
রাঙা দুটি ঠোঁটে হাসিটি ফুটিছে,
গাঁথিছে চিকণ হার ;
ভাসিছে কাননে পিউ পিউ পিউ
পাপিয়ার স্বর ধার।
ঝুরু ঝুরু ঝুরু মলয় পবন
আকুলি তুলিছে মন ;
বালা-মুখ খানি গোলাপ বিভ্রমে
করে অলি জ্বালাতন।
গাঁথা হ'ল মালা চাহিলা সুন্দরী
হরিণ-নয়ন তুলি,
কা'র চোকে চোক পড়িল, সরমে
জড় সড় পড়ে ঢলি।
মৃদু ভাষে যুবা বলিলা হাসিয়া
কা'র তরে মালা গাঁথা ?
লাজেতে বালার নত হ'ল আঁখি,
লাজে হ'ল হেঁট মাথা।
ভাষা বিজড়িত হৃদয়ে তড়িৎ
নিমেষ খেলিয়ে গেল,
থর থর কর যুবার গলায়
মালা দিয়ে পলাইল।

চমকি শিহরি কহিল যুবক-
"কারে দিয়ে গেলে মালা ?
আমি দীন, এই রাজ্যেশ্বর তব
প্রণয় ভিখারী বালা।"
অন্তরাল হ'তে ভাসিয়া আসিল
মধুর বীণার স্বর—
"যারে চায় প্রাণ দিছি তারে—সে যে
এ হৃদয় রাজ্যেশ্বর।"
বকুলের ডালে পিউ পিউ পিউ
পাপিয়ায় দিল সায়।
যুবার শিরায় শোণিত ছুটিল,
ঝিমিয়ে পড়িল কায়।
হৃদয়-মাঝারে কতই তরঙ্গ
উঠে মিশে যায় দূরে,
বালা-প্রেম যুবা ভাবিতে ভাবিতে
ধীরে ধীরে গেল ঘরে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস,
মহিষাদল।

ঘুমন্ত ছবি।

ঘুমায় প্রকৃতি গভীর শর্ব্বরী
থেকে থেকে শিবা ডাকিছে দূরে ;
চমকি উঠিছে স্বভাব সুন্দরী
কি যেন অশুভ স্বপন ঘোরে।

তারা সনে শশী সুনীল অম্বরে
চ'লেছে ভাসিয়া লভিতে কুল,
রজতের থালা ভাসিছে সাগরে
ছড়ায়ে কত যে হীরার ফুল।

কোমল শয়নে প্রেয়সী ঘুমায়
শিথিল কবরী, উরস-বাস ;
ধুয়ে গেছে টীপ শোভিছে তথায়
স্বেদবিন্দু যেন মুকুতা রাশ।

সুরভিত বায়ু শশিকর সনে
খেলিছে প্রিয়ার পবিত্র মুখে ;
সে ঘুমন্ত ছবি হেরি হয় মনে
স্বপনে ত্রিদিবে ভ্রমিছে সুখে।

হইয়া অধীর কভু সমীরণ
অলকে অধর ঢাকিছে ভুলে ;
ঘুরিয়া ফিরিয়া বুকের বসন
আবার কখন দিতেছে খুলে।

আবেশ মগন যুগল নয়ান
বাঁকা ভুরু আঁকা তুলিকা ভরে ;
নিমিলিত আঁখি মুগ্ধ করে প্রাণ
উন্মেষে না জানি কি শক্তি ধরে,

বড়সাধ মনে বসিয়া বিরলে
ঘুমন্ত প্রতিমা নেহারি তোর ;
ডুবাইয়া স্মৃতি বিস্মৃতির জলে
তোমারি ধেয়ানে হইয়ে ভোর।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

হৃদয়োচ্ছ্বাস

নীরব নিশীথে আমি হইয়া স্থির,
হেরিতেছি নিসর্গের মূরতি গভীর
প্রাণের ভিতর হ'তে উঠিল ঝঙ্কার
"দ্যাখ দ্যাখ কারুকার্য্য জগৎপিতার।"
সবিস্ময়ে চাহিলাম, উর্দ্ধেতে অনন্ত-ধাম,
তন্ন, তন্ন, খুঁজিলাম মানস-ভাণ্ডার।
বাহির জগতে বায়ু বহে স্বন স্বনি
অন্তর-জগতে মোর উঠে' সেই ধ্বনি—
দ্যাখ্, দ্যাখ্, কারুকার্য্য জগৎ পিতার"
অনন্ত আকাশে হেরি নীলিমা সাগরে
ফুল্ল কমলিনী-সম পুঞ্জ তারকার
কহিছে তাঁহারা যেন বসিয়া অম্বরে—
"দ্যাখ্ দ্যাখ্, কারুকার্য্য জগৎ পিতার"
তাদের মধুর গান পশিয়া পরাণে
জাগিল নূতন ভাব মধুরিমা ময়।
আমিও গাহিনু সুখে ভকতির সনে
"জয় জয় কৃপা-সিন্ধু জয় জয় জয়!"

শ্রীআশুতোষ দে,
কাঁথি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

উকিল—আচ্ছা বল দেখি, সে সচরাচর দ্রুত যায়, না কদমে যায়?

সাক্ষী—(অনেক ভাবিয়া) তার ঘোড়া যখন দৌড়ায়, তখন সে দ্রুত যায়, আর যখন তার ঘোড়া কদমে যায়, সেও কদমে যায়।

উকিল—(চটিয়া) আমি জান্‌তে চাই সে সচরাচর জোরে যায় না আস্তে যায়।

সাক্ষী—যখন তার সঙ্গীরা জোরে যায় সেও জোরে যায়, যখন সঙ্গীরা আস্তে যায় সেও আস্তে যায়।

উকিল—(আরও চটিয়া) যখন সে একলা যায় তখন জোরে না আস্তে যায়।

সাক্ষী—(অনেকক্ষণ ভাবিয়া) মশায়, সে যখন একলা যায়, আমি ত আর কাছে থাকিনে, তা কেমন ক'রে বল্‌ব কি রকম যায়? (সকলের হাস্য ও জেরায় হারিয়া হতাশ ভাবে উকিলের উপবেশন)।

অভিনেতার উপস্থিত বুদ্ধি—ফুট (Foote) নামক কোনও ইংরাজ comic অভিনেতা একদা ইংলণ্ডের পশ্চিমাংশে ভ্রমণ কালে কোনও সরায়ে আহার সমাপন করিলে পর, সরাই অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল "আহারাদি কিরূপ হইল।"

ফুট বলিলেন ইংলণ্ডের সকল লোক অপেক্ষা আমি উত্তম আহার করিয়াছি। সরাই অধ্যক্ষ—মেয়র (Mayor) বাদ।

ফুট—তাই বা কেন, আমি কাহাকেও বাদ দিতে চাই না।

সরাই অধ্যক্ষ—অবশ্য তোমায় মেয়রকে বাদ দিতেই হইবে।

ফুট—কখনই দিব না।

সরাই অধ্যক্ষ—অবশ্য দিতে হইবে।

অবশেষে সরাই অধ্যক্ষ ফুটকে মেয়রের নিকট লইয়া গেল। মেয়র সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, অনেক দিন হইতে এখানে এক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, ঐ নিয়মে সব বিষয়ে "মেয়র বাদ" এই কথা বলিতে হয়। এই বলিয়া ফুটের এক সিলিং জরিমাণা করিলেন। ফুট তৎক্ষণাৎ সিলিংটি প্রদান করিলেন এবং মেয়রের দিকে একটু কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "আমার বোধ হয়" ঐ সরাই অধ্যক্ষের মত অত বড় গাধা আর পৃথিবীতে নাই অবশ্য "মেয়র বাদ।"

* * *

বিবাহের উপকারিতা—কোনও একজন Statistician বলেন যে একহাজার অবিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে ত্রিশজন ফৌজদারি আসামী দেখাগিয়াছিল, কিন্তু একহাজার বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে মোটে আঠার জন মাত্র ঐরূপ আসামী পাওয়া গিয়াছিল।

* * *

নীল গোলাপ—নীল পদ্মের নাম শোনা গিয়াছে বটে কিন্তু

নীল গোলাপ হয় কি না জানা ছিল না। বুলগেরিয়ার কাজান্‌লিক্ (Kazanlik) নামক স্থানে এম্ ষ্টান্‌চেফের (M. Stantcheff) বাগানে নীল গোলাপ উৎপন্ন হইতেছে। ঐ প্রদেশে গোলাপের চাষ খুব বেশী এবং তথাকার আতরও খুব বিখ্যাত। যে মাটিতে নীল গোলাপ ফুটিতেছে, সেই মাটির নমুনা সোফিয়ার কেমিক্যাল ল্যাবরিটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে। জানা গিয়াছে ঐ মাটিতে চুণ, (lime), এমোনিয়া (amoniac), তাম্র-লবন (salts of copper) and লৌহের অকসাইড (oxide of iron) বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। ফেটিসফ্ (Fetisoff) নামক কোনও রুসিয়াবাসী পুষ্পতত্ত্ববিদ্ (florist) ১০ বৎসর পরিশ্রমের পর কাল গোলাপ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই গোলাপ গাঢ় কৃষ্টবর্ণ। উহার কয়েকটী রুসিয়ার সম্রাটকে প্রদত্ত হইয়াছে এবং বিলাতেও কতকগুলি পাঠান হইয়াছে। প্রকৃতিকেও বিজ্ঞানের আজ্ঞা পালন করিতে হইতেছে, ধন্য মনুষ্যের বুদ্ধি!

***

রমণীর সাহস—গত মে মাসে ইতালির অন্তর্গত সেঠিনজি (Cettinje) নামক স্থানে একটি রমণী এক বলদ বিক্রয়ার্থ আগমন করে। হাটে বিক্রয় শেষ হইবার পর স্বগ্রামে প্রস্থানোদ্যতা হইলে কোনও একটি লোক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমার সহিত আইস, সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিব। রমণী তাহার কথায় সম্মত হইয়া তাহার সহিত চলিল। কিছু দূর যাইয়া তাহারা এক উচ্চ অধিত্যকায় (precipice) ধারে উপস্থিত হইল। এই স্থানে ঐ লোকটা হঠাৎ থামিয়া, বলদ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছে রমণীর নিকট হইতে তাহা চাহিল। রমণী নিরুপায় দেখিয়া সমুদায় টাকা তাহাকে প্রদান

করিল। তখন ঐ দস্যু রমণীর নিকট আর যাহা কিছু আছে দিতে বলিল। সে ভয়ে সমস্ত প্রদান করিল এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিল। দস্যু বলিল "যদি আমি তোমায় ছাড়িয়া দিই, তুমি আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে, তাহা হইবে না, তোমায় মরিতে হইবে। হয় তুমি নিজে এইস্থান হইতে লাফাইয়া পড়, না হয় আমি জোর করিয়া তোমায় ফেলিয়া দিব।" রমণী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু কিছুতেই দস্যুর হৃদয় গলিল না। রমণী তখন হতাশ হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় ঐ দস্যু মাটি হইতে যেমন কি কুড়াইবার জন্য হেঁট হইবে অমনি কাল বিলম্ব না করিয়া ঐ রমণী তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিল। তারপর সেঠিনৃজিতে প্রত্যাগমন করিয়া পুলিশে সমস্ত বৃতান্ত অবগত করাইল। পুলিশের লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ দস্যুর চূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট মৃতদেহ প্রাপ্ত হইল এবং তাহার নিকট অপহৃত দ্রব্যাদিও দেখিতে পাইল। মণ্টিনিগ্রোর রাজকুমার ঐ রমণীর সাহসে এতদূর প্রীত হইয়াছেন যে যাহাতে সে আজীবন একটি পেন্‌সন ভোগ করিতে পারে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

* * *

অদ্ভুত ব্যাখ্যা।—শিষ্য শ্রীভাগবতের ব্যখ্যা পড়িতে পড়িতে একস্থানে নিম্নলিখিত চরণটি পাইল—

'সবল কাবল ভুসি ভুসি সে কাবল'।

ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গোস্বামী প্রভুর নিকট গেল। প্রভু চরণটি শুনিয়াই ব্যাখায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, বৎস এটি যে শ্রীভাগবতের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা দেখিতেছি। শিষ্য প্রভুর ভাগবতে দখল দেখিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

গো। এখন টিকেন্দ্র স্বামীজীর ভাষ্যার্থ বলি শোন।

'সবল'—কিনা বলবান।

'কাবল ভুসি'—কিনা কাবুলে ভুসি।

অর্থাৎ কাবুলে কলায়ের ভুসি খেয়ে সে বলবান। এটা শ্রীহরিকেই বুঝাইতেছে। যদি কেহ মনে করে ক্ষীর সর নবনী খেয়ে আর বলবান হইবে এ আশ্চর্য্য কি? তা নয় সেটা ভুল, কারণ, "ভুসি সে কাবল;" এখানে 'কাবল' আর 'কাবুলে' নয়, দ্বর্থ আছে অর্থাৎ ইহাকে সুবিধা মাফিক দুইখানা করিতে হইবে। তাহা হইলেই হইল "ভুসি সে কাবল।" সেই ভুসিই একমাত্র বল; এখন বুঝিলে কি খাইয়া হরির এত জোর।

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ বেশ বুঝিয়াছি কাবুলে কলাইশুঁটি—ভাগবত কি কঠিন! বাড়ী ফিরিবার কালীন শিষ্যের সহিত গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃই হউক অথবা সুপণ্ডিত জ্ঞানে ইহার নিকট বিশদরূপে বুঝিয়া লইবার কারণ হইল শিষ্য প্রণামান্তর ঐ কঠিন চরণটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। প্রভু ভাবিয়াই আকুল; একবার ভাল করিয়া আবৃত্তি করিলেন।

"সবল কাবল ভুসি ভুসি সে কাবল"।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি কোন ম্লেচ্ছ পুস্তকান্তর্গত শ্লোক? শিষ্য বলিলেন, "না আমি ভাগবতে দেখিলাম।"

গো।—ও তাইত বটে জানা ২ বোধ হতেছিল এতক্ষণ। এর সঙ্কেত বলিয়া দিলে অর্থ অতি সহজ। একটু সরল করিয়াই বুঝাইয়া দিই :— এটা জটিলা কুটিলার সহিত আয়ান ঘোষের গুপ্ত কথেপকথন, পাছে কেহ ভ্রাতা ভগিনীর গুপ্ত কথোপকথন শুনিয়া মতলব টের পায় তাই ভাগবতকার এইরূপ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন।

জটিলা।—সবল (সব্ তবে বল্ব ?)

আয়ান।—কাবল (কি বল্)

জটিলা।—ভুসি (ভুমে বসে শিবপূজা কর্‌ছে)

আয়ান।—ভুসি (ভুল দেখেছিস্ স্বীকার কর্)

কুটিলা।—সে কাবল (সে কালী পূজো কর্‌ছে বল্; আ মরণ আর কি চকের মাথা খেয়েছ?)

শিষ্য। প্রভু, এ ঠিক যেন হা-মা-কা ধরণের।

বড় গোস্বামী "হাঁ" বলিয়া পাশ কাটাইবার যোগাড় করিতেছেন এমন সময় সেখানে সাহিত্য-সেবক-সমিতির একটী সভ্য অন্তরাল হইতে ব্যাখ্যাটি শুনিতেছিলেন। তিনি এই কঠিন শ্লোকটি শুনিয়া বলিলেন সে কি গোঁসাইজি? এযে বটতলার বইয়ের বিষম ভুল ছাপা দেখিতেছি। আদত লাইনটা ছিল

"সকল কারণ তুমি তুমি সে কারণ।"

একথা শুনিয়া গুরু শিষ্য দুই দিক দিয়া চম্পট দিলেন তদবধি কেহ আর কাহাকেও দেখিতে পান না—'কারণ' নিরাকরণ হইল না।

***

রোগী। (রোগ যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া) ডাক্তার মহাশয়! যদি মৃত্যু হইত, তবে বাঁচতেম্।

ডাক্তার। আমি বিশেষ চেষ্টায় আছি।

***

আশ্চর্য্য জুয়াচুরি।—কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি অবিকল ঘটিয়াছিল। একটি সাহেব তাঁহার কুকুরকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনি যখন মেজে তাহার টুপি রাখিয়া বসিবেন, তখনই সেই কুকুর যেন তাঁহার টুপি লইয়া পলায়ন করে। একদিন তিনি ঐ কুকুরটিকে লইয়া এক হোটেলে গিয়াছিলেন। সাহেব মেজে টুপি

রাখিয়া আহার করিতে লাগিলেন। আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে সাহেব কাসিলেন। কুকুর টুপি লইয়া পলায়ন করিল। সাহেবও "টুপি লইয়া গেল! টুপি লইয়া গেল!" বলিতে বলিতে স্বীয় আবাস বাটীতে উপনীত হইলেন। হোটেল স্বামী মনে করিয়াছিলেন, যে সাহেব টুপি কুকুরের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া পুনরায় আসিবে। কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া সাহেবের জুয়াচুরি বুঝিতে পারিলেন।

***

প্রশ্ন। কোন্ দ্রব্য নাম করিবা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়া উঠে?

উত্তর। গোলমাল।

***

ইংরাজি উচ্চারণ রহস্য।

(ইংরাজি কথা গুলি বানান করিয়া পড়িতে হইবে)

D-o যদি ডু হয়, T-o হয় টু,
S-o কেন স্থ না হবে G-o নয় গু?
শুন্‌তে বটে খারাপ হ'ল (—'থ' এ উকার থু—)
বাংলা ভাষার একই নিয়ম, 'ক' এ উকার কু।
P-u-t র বেলা হ'ল যদি পুট্‌।
B-u-t কেন হবে নাকো বুট্‌?
ধন্য ভাষা ইংরেজি ধন্য উহার রুট্‌!
হজম্‌ যদি না হয় খাও পাঁউরুটি বিস্কুট্‌।
B-o-u-g-h হ'ল যদি বাউ।
T-o-u-g-h না হয় কেন টাউ?
D-o-u-g-h হ'ল আবার ডো
R-o-u-g-h নয় কিন্তু রো।

C-r-o-w হয় যদি ক্রো।
B-r-o-w নয় কেন ব্রো?
M-u-l-e মিউল্ কিন্তু R-u-l-e রুল।
L-u-ll লাল কিন্তু B-u-ll বুল॥
F-a-d-e ফেড্ বটে, B-a-d-e ব্যাড্
দেখো যেন ভুলোনাকো ওহে "জলি ল্যাড্।"
কতকগুলা অক্ষর আছে ভার বাড়াবার তরে।
বেকার লোকে ব'সে যথা অন্ন ধ্বংস করে॥
তার সাক্ষ্য ধর না কেন thou*gh*, ca*l*m, *p*sa*l*m।
*K*nave, *k*nife, *g*nat আরও করবো কত নাম!
Etymologyর নিয়ম সদা মনে রেখো ভাই।
*P*sychology (সাইকলজি) প'ড়ো না যেন "পিসি চলো যাই॥"

* * *

ম্যাও কর্‌লে না কেন? এক গুলিখোর রাত্র নয়টার সময় আড্ডার অভিনয় শেষ করিয়া বাড়ীতে দেখা দিল। গুলিখোর মহিষী ঘরের ভিতর ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়া ছিল। কর্ত্তা ঘরে আসিয়া আসনে গুলিখুরি ধরণে বসিয়া ঢাকা খুলিয়া ভাত খাইবার উপক্রম করিতেছে। অবশ্য এতাবৎ সে মুদিত নেত্রেই রহিয়াছে। একবার কি রন্ধন হইয়াছে দেখিয়া লইবার জন্য অতি সন্তর্পণে চক্ষু চাহিল। গুলিখোর দিব্যচক্ষে দেখিল এক কাল বিড়াল ছানা ভাতের পার্শ্বে উর্দ্ধপুচ্ছে বসিয়া আছে। 'কি আপদ্, বউ ভাল দেখিতে পায় না, আজ সব মাটি করিয়াছে' এই ভাবিয়া বিড়্ বিড়্ করিতেছে আবার থাকিয়া থাকিয়া বিড়াল ছানাকে তাড়াইবার নিমিত্ত— যাঃ যাঃ করিয়া মেঝেতে হাতের শব্দ করিতেছে। বিড়াল ছানা

কিছুতেই পলাইতেছেনা অথচ ক্ষুধার্ত্ত গুলিখোর ভাতের আশাও ত্যাগ করিতে পারেনা অবশেষে অসমসাহসে ভর করিয়া বাম হস্তের দুটি আঙ্গুল দিয়া বিড়াল ছানার ল্যাজ ধরিয়া দশহাত দূরে ফেলিয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্জ্জার কুলের সহিত কত কি সম্পর্কসূচক আলাপ করিতে লাগিল। তক্তাপোষে শয়ন করিয়া তাহার স্ত্রী আগাগোড়া এই অভিনয় দেখিতেছিল, এবং শেষে আর থাকিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আ মুখপোড়া বেগুন ভাজাটা ফেলে দিলি এখন ভাত খাবি কি দিয়ে, আজ যে আর কিছু নাই।" তখন গুলিখোর বাধ্য হইয়া আর একবার চক্ষু উন্মিলন করিয়া বলিল— "অত ঠাট্টা কেন, আমার কি আর চোখ নেই, বেগুণ ভাজার ল্যাজ এলো কোথা থেকে, যাদু? · "মরণ আর কি? ল্যাজ আবার কোথা, বেগুণের বোঁটাটা।" গুলিখোর তখন বলিল "ওঃ হো তাইত বলি, ম্যাও করলে না কেন?"

* * *

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল "ভাই আমি এত অন্যমনস্ক যে সে দিন ট্রামগাড়িতে যাইতে যাইতে এক খানা ১০ টাকার নোট থিয়েটারের হ্যাণ্ড বিল্ মনে করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, পরে দেখি যে হ্যাণ্ড বিল খানা ঠিক আছে, নোটখানি একেবারে শাত খণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আরে ও কি বলছ, আমি এত অন্যমনস্ক যে সে দিন থিয়েটার হইতে বাড়ী আসিয়া বিছানায় না শুইয়া ছড়িটাকে বিছানায় রাখিয়া নিজে ঘরের কোনে যেখানে ছড়ি থাকিত, সেই খানে গিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

(১) বসুমতী ; (২) প্রতিবাসী ; (৩) এডুকেশন গেজেট ; (৪) চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ ; (৫) আলোচনা ; (৬) দারোগার দপ্তর ; (৭) নব্য ভারত ; (৮) মহাভারত নাট্য-কাব্য ; (৯) প্রদীপ ; (১০) মুকুল ; (১১) বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী ; (১২) The Behar News ; (১৩) সৎসঙ্গ ; (১৪) উদ্বোধন ; (১৫) সোম প্রকাশ ; (১৬) কমলা ; (১৭) অন্তঃপুর ; (১৮) কোহিনুর ; (১৯) ফরিদপুর হিতৈষিণী ; (২০) ঢাকা গেজেট ; (২১) চিকিৎসক ; (২২) The City Times.

"হিন্দু কন্যার বিবাহ সংস্কার কোন সময়ে হওয়া শাস্ত্র সম্মত, অর্থাৎ ঋতুলাভের পূর্ব্বে বা পরে" ? এই পুস্তিকায় শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক উক্ত প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে আমরা শাস্ত্রজ্ঞ নহি, সুতরাং শাস্ত্রীয় সমালোচনা আমাদের দ্বারা অসম্ভব। কোন সময়ে বিবাহ সংস্কার হওয়া শাস্ত্র সম্মত ইহাই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় এবং লেখক এই আলোচনায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমে তিনি দেখাইয়াছেন, "দান" অর্থে বাগদান বোধ্য, বিবাহ বা মন্ত্রসংস্কার দানের পরে সম্পাদ্য। তারপর তিনি বেদ ও বৈদিক গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি,'পুরাণ এবং মহাভারত হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে হিন্দু কন্যার পাণিগ্রহণ সংস্কার তাহার ঋতুলাভের পরেই নিষ্পন্ন হওয়া শাস্ত্র সম্মত। দানসাধ্য বিবাহের (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, ও প্রাজাপত্য, অর্থাৎ যে বিবাহে পিত্রাদি কর্ত্তৃক কন্যাদানের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ আছে) অনেক স্থলে ঋতু লাভের প্রাক্কালে কন্যার বাগদান বা কন্যার স্বীকরণ কার্য্য বিহিত ও প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি এই বাগদানের অনুষ্ঠান কোথাও কোথাও বিকৃত ভাবে প্রচলিত আছে, ইহাও লেখক দেখাইয়াছেন। লেখকের প্রমাণ প্রণালী অতি সুন্দর, তিনি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নিজের কথার সমর্থন করিয়াছেন, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করেন নাই। এই পুস্তিকা লিখিতে যে লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। জন সাধারণের দ্বারা এই পুস্তিকা আদৃত ও আলোচিত হইতে দেখিলে সুখী হইব, ইহাতে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। পুস্তিকা খানির কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর, মূল্য ।॰ আনা মাত্র।

প্রয়াস।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। জুলাই, ১৮৯৯ সাল। সপ্তম সংখ্যা।

মধুসূদন স্মৃতি।

এই সে সমাধি—গৌড়গৌরব মন্দির—
এই অস্তগিরিতলে ধরিত্রীর কোলে
চির অস্তমিত বঙ্গ কবিকুল রবি!
চিরদিন তরে হায়, থেমেছে অকালে
সে মধুর কাব্য-কণ্ঠ গম্ভীর ঝঙ্কার—
প্রাচ্য প্রতীচ্যের শুভ সম্মিলন-গীত;
উচ্ছ্বসি' আবেগ-ভরে যা'র সুধারাশি,
নবীন প্রবাহে নব সৌন্দর্য্য বিথারি'
মিশেছে মহিমাময় কবিতা-অর্ণবে;
বঙ্গ নর নারী যা'র সুধাবারি পানে
পরিতৃপ্ত প্রতিদিন—করিয়া সফল
কবির ভবিষ্য বাণী—"গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"
বাণীর প্রসাদে কবি চির ভাগ্যবান্,
হয় কি কখন ব্যর্থ কবির বচন?
যেই পদ পূজা করি চির অভিলষিত
জয় মাল্য শিরোপরে লভিয়াছ হরষে
হইলে অমর কবি—বিবিধ রতনে
সাজাইলে মাতৃভাষা করি জ্যোতির্ম্ময়
অসীম প্রতিভাবলে, হে মধুসূদন,
আজি এই ধরাসনে অন্তিমশয়নে
(স্বভাবের প্রিয়শিশু প্রকৃতির কোলে)
নীরবে কি তাঁ'র ধ্যানে রয়েছ মগন?

বরদার বরপুত্র তুমি মহামতি!
শুনেছি তোমারি মুখে বঙ্গ-কুল-লক্ষ্মী
শুভক্ষণে দিলা তোমা' স্বপন মধুর;
পালিয়া সে স্বপ্নাদেশ প্রফুল্ল হৃদয়ে
পাইলে সুকৃতি ফলে দিব্যমণিজালে
পূর্ণ মাতৃভাষা খনি। ফিরিল অমনি
বিপথগামিনী তব প্রতিভা অসীম
সুপথে, স্বদেশ হিতে; বীর ভাবে তুমি
বঙ্গ সাহিত্যের সেবা সাধিলে যতনে।

প্রসন্ন হইয়ে বাণী তোমার সেবায়
কল্পনা, কবিতা, নিজ সহচরীদ্বয়ে
দিলা তব সাথে। সুনিপুণ শিল্পী তুমি
অনা'সে করিলে মুক্ত বঙ্গ কবিতার
মিত্রাক্ষর শৃঙ্খলিত চরণ কমল।
উধাও কল্পনা সাথে বিমুক্ত চরণে
চলিলা অবাধে তব নির্ব্বাচিত পথে
নবীন উদ্যমে বঙ্গ কবিতা সুন্দরী—
পাষাণ নিগড়ে বাঁধা নির্ঝরিণী যথা
সহসা পাইলে পথ স্বাধীন হৃদয়ে
নাচিতে নাচিতে ধায় সাগর সঙ্গমে।
হ'ল যুগান্তর বঙ্গ সাহিত্য জগতে ;
তোমার কল্যাণে ধীরে ফুটিল সরাগে
হেমোৎপল "তিলোত্তমা" বঙ্গকাব্য সরে
আমোদিয়া দশ দিক্ সুযশ সুবাসে;
সে কুসুমরত্নে তুমি পূজিলে অমনি
গৌরবে জননী পদ চিরভক্তি ভরে।
সাদরে ভারতী তব উন্নত ললাটে
পরাইলা স্নেহভরে কীর্ত্তি মণিময়
বিজয় কিরীট—যার অরুণ প্রভায়
উজ্জ্বল হইল বঙ্গ সাহিত্য জগত
লভিয়া নবীন যুগ—ঘুচিল আঁধার ;
লুপ্ত হল হীনপ্রভ ক্ষীণ তারাচয়
যেন নিশান্তের সহ। চকিতের প্রায়
ঝলসিয়া কাব্যপ্রিয় মদির নয়ান
ফুটিল প্রথম ভাতি সে শুভ প্রভাতে।

সুধীরে বহিল বায়ু প্রশান্ত বিমল,
সুধীরে জাগিল সুধী গৌড় সুভাজন
হেরি সে সুখের দিন। তুমিও সুধীরে
কবিগুরু বাল্মিকীর পূজিয়া চরণ
পশিলে তাঁহার স্নিগ্ধ কাব্য-তপোবনে
ভক্তিভরে শুদ্ধ চিত্তে বিনয়ীর বেশে,
বাজায়ে অমর বীণা সেই সুসময়ে ;
উৎসাহে পূরিল বঙ্গ সে গম্ভীর রবে—
সম্ভবিলে মেঘনাদে "মেঘনাদ বধ"
মহাকাব্য মহারত্ন বঙ্গ-কহিনুর।
উন্মত্ত কল্পনা তব উৎফুল্ল হৃদয়ে
তেয়াগি এ মরভূমি গিরি সিন্ধু ভেদি'
চলিলা তোমারে ল'য়ে; সে লীলা তরঙ্গে
তুমিও ঢালিলে অঙ্গ ভাসি সুখাবেশে;
হেরিলে কতই দৃশ্য, কত রমণীয়
কত ভয়াবহ, কত বর্ণনা অতীত
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে প্রবেশি কৌতুকে।
নরচক্ষু হেরে নাই হেরিবেনা যাহা—
তাহারি জ্বলন্তচিত্র, তোমারি গ্রথিত
রত্নশ্লোকে, প্রতি ছত্রে প্রতি পদক্ষেপে
রেখে গেছে মুগ্ধচিত্তে কবিতা সুন্দরী—
(বিমুক্ত চরণ লীলা বিচিত্র নর্ত্তন)
তোমার বীণার রবে নাচি' তালে তালে।
আমরাও ভাবাবেশে ওই তালে তালে
মানস শ্রবণে শুনি ও গম্ভীর বীণা
ভেসে যাই—ভেসে যায় উদাসীন মন

পুলকে, বিস্ময়ে, রোষে, উৎসাহে, উদ্বেগে,
রোমাঞ্চিত করি তনু ; হৃদয় প্লাবিয়া
শেষে করুণ-হিল্লোল আনে দু'নয়নে
অলক্ষ্যে শোকাশ্রুধারা; সে নয়ন বারি
সিক্ত করি প্রতি ছত্র সমাপ্ত করিয়া
ফেলে মহাকাব্য তব।
তখন বিস্মিত নেত্রে
বিহ্বল অন্তরে ভাবি অদৃষ্টের খেলা ;
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি, ভাবি লঙ্কানাথে।
কিনা ছিল তাঁর? বীর প্রসবিনী লঙ্কা
অতুল ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে পূর্ণ চিরদিন,
বীর পুত্র পুত্রবধূ সুখের সংসার
সদা পূর্ণ প্রতিভায় ; চঞ্চলা কমলা
অচঞ্চল চিত্তে রাজিত লঙ্কেশ অঙ্কে
সে কনকপুরে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে
সে সুখের রাজ্য, হায়, ভীষণ শ্মশানে
হ'ল পরিণত। শতাধিক পুত্র শোক
শতাধিক ত্রিশূলের শতাঘাত হ'তে
শতগুণে বাজিল সে দশানন বুকে,
জীবনের চির সাধ করিয়া নির্ম্মূল।
আর মনে পড়ে তোমার জীবন গতি ;
কিনা ছিল তব? সৌভাগ্য সম্পদপূর্ণ
সুখের সংসারে জন্মেছিলে একমাত্র
অমূল্য রতন ; ছিলে পিতৃ হৃদয়ের
আনন্দ কুসুম,—মাতার অঞ্চলনিধি ;
আয়ত প্রজ্জ্বোল নেত্র প্রশস্ত ললাট,
বলিষ্ঠ শরীর শ্যাম সৌষ্ঠব গঠন,
বিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশ ভ্রমর লাঞ্ছিত,
প্রতিভার ভাতি খেলিত সতত তব
প্রশান্তবয়ানে—কি শৈশবে, বিদ্যালয়ে,
কিশোরে, যৌবনে—ক্ষণজন্মা পুরুষের
প্রকৃষ্ট লক্ষণ। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে
হইলে স্বধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত তুমি
বিদেশীর বেশে শেষে উদাসীন সম
কাটাইলে আজীবন অসংযত চিত্তে
ব্যথা দিয়ে মাতৃ পিতৃ স্নেহ-পূর্ণ হৃদে।
আশার ছলনে ভুলি সহিলে যে কত
ব্যথা তব প্রীতিময় উদার হৃদয়ে
জ্বলন্ত অক্ষরে "আত্ম বিলাপে" তোমার
ছত্রে ছত্রে পরিচয় দিতেছে তাহার।
তথাপি মোহিনী আশা ঘুরালে তোমায়
প্রতীচ্যের দেশে দেশে। ভারতী প্রসাদে
তথা নানা বিদ্যালভি' পূজিলে সে পদ
বঙ্গ "চতুর্দ্দশপদী কবিতা" প্রসূনে ;—
মর্ম্মকাতরতা সহ গাহিলে আবেগে
কবীশ ও কৃতী বঙ্গ সন্তান মহিমা।
শত আশা পূর্ণ বুকে ফিরিলে স্বদেশে
ব্যবহারজীবী হয়ে—হইলে নিষ্ফল।
এইরূপে আশানল দগ্ধ প্রাণ তব
আচম্বিতে পত্নী শোক কুলিশ সম্পাতে
দাতব্য চিকিৎসালয়ে হায়রে অকালে
জ্বলিয়া হইল শেষ ; ফুরাইল আয়ু।

হায়রে বিদরে হৃদি স্মরিলে সে কথা
শিহরিয়া ওঠে তনু, বঙ্গের গৌরব-
রবি কবিকুলেশ্বর—একি পরিণাম!
হায় বিধি এই কিরে উচিত বিধান?
হায় কবি, এইরূপে লীলা সাঙ্গ করি,
লভি'ছ বিরাম সুখে মহীপদতলে।
তবু মনে হয় যেন শুনি দূর হ'তে
নীরব ও কণ্ঠরব সম্ভাষিছে যেন
প্রতি বঙ্গবাসী জনে দিতে পরিচয়—
"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে
"তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে
"(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
"বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
"দত্ত কুলোত্তম কবি শ্রীমধুসূদন।
"যশোরে সাগর দাঁড়ী কবতাক্ষতীরে
"জন্মভূমি; জন্মদাতা দত্ত মহামতি
"রাজ নারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী।"
অনুসরি' তব পথ মহিমা মণ্ডিত
সাজা'তে এ স্মৃতি-স্তম্ভ ভক্তি-পুষ্প-হারে,
তোমার সুযশ গীত গাহিয়া গৌরবে
এসেছে এ দীন কবি বিহ্বল হৃদয়
দেখাইতে কবিভক্তি জাতি ধর্ম্ম ভুলি।
বঙ্গের এ পুণ্য তীর্থে গৌরব মন্দিরে
চির অস্তমিত হায় চির দিন তরে
গৌড়ের গৌরব রবি কবি কুলেশ্বর
শ্রীমধুসূদন; যাঁ'র স্থির প্রতিভার
অম্লান কিরণ, উজলিয়া বঙ্গদেশ
বিরাজে সতত, নানা রত্ন বিভূষিত
নাটক ও প্রহসনে, কাব্যে, মহাকাব্যে,
করিয়া "অমর কবি" এ মর জগতে।

শ্রীরসময় লাহা।

সাধারণ শিক্ষা।

"কোন্ ভাষায় ভারতবাসীকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য" এই প্রশ্ন প্রথমে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় উঠে। উত্তরে তিন প্রকার প্রণালীর প্রস্তাব হয়:—(১) স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক; অর্থাৎ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালাভাষায়, উৎকলবাসীকে উৎকলভাষায়, পশ্চিম-হিন্দুস্থানবাসীকে হিন্দিভাষায়, ইত্যাদি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হউক; (২) সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক; (৩) ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইয়া যায় যে ইংরাজী

ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। কি উদ্দেশ্যে এই মীমাংসা স্থির হইল তাহা এখন সম্যগ্ জানা যায় না; তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যায় যে প্রস্তাব কর্ত্তারা ভাবিয়াছিলেন যে, যখন সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজার অধীনে তখন ইংরাজের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া সহজ হইবে এবং এই প্রকার শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিলে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা অতি সহজে শিখিতে পারিব ও ক্রমে ইংরাজের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন ও গৌরবান্বিত জাতি হইয়া উঠিব। যাহা হউক ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে এই মত স্থিরীকৃত হয় এবং অদ্যাবধি এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আজ প্রায় ৬৫ বৎসর অতীত হইল; এখন বোধ হয় শিক্ষার ফলাফল দেখিয়া স্থির করা যাইতে পারে যে উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে কি না?

উন্নতি সাধনের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা, সুতরাং শিক্ষার ফলাফল উন্নতির অল্পাধিক্যেই প্রকাশ পাইবে। যদি শিক্ষা সুফল প্রসব করিয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের অবস্থা উন্নত হইবে। যদি আমাদের অবস্থা উন্নত হয় তাহা হইলে সেই উন্নতি আমাদের দেশের অবস্থায় প্রকাশ পাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর উন্নত হইয়াছে। প্রথমতঃ মানসিক উন্নতির বিষয় দেখা যাউক। শিক্ষায় আমাদের মানসিক উন্নতি হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের মনোবৃত্তি সকলের, বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকের মন হইতে ধর্ম্মভাব একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। বাহ্যিক পূজা, হরিসভা, নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি আড়ম্বর দেখিয়া কেহ কেহ ভাবিতে পারেন লোকের মনে ধর্ম্মভাব প্রচণ্ড ভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে; কিন্তু যে সমাজে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি নাই

বলিলেও হয়, যে সমাজে ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহ মমতা নাই, যে সমাজে প্রাত্যহিক কার্য্যে স্বধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া কলাপ লোপ পাইয়াছে যে দেশে ধর্ম্ম অপেক্ষা, সচ্চরিত্র অপেক্ষা, অর্থের সম্মান অধিক হইয়াছে, যে দেশে লোকে ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত অপেক্ষা অর্থোপার্জ্জনে ব্যাঘাত দূর করা আশু প্রয়োজন বলিয়া মনে করে, সেখানে আর কি করিয়া বলিব লোকের ধর্ম্মভাব শিক্ষার গুণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে! অন্যান্য বুদ্ধি-বৃত্তিরও সম্যগ্ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। আইন আদালতে আমাদের মধ্যে অনেকে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি ভুগোল, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি গণিত কোন বিষয়েই লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য কিম্বা ভূয়োদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং স্বদেশ জাত দ্রব্যের উৎকর্ষ উৎপাদন ও বহুল প্রচার ভিন্ন, শিক্ষার পরিচয় আর কিছুই নাই। এতদ্‌সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা যে কিছু করিয়াছে তাহার নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা কেবল গলাধঃকরণ করিয়া পুনরুদ্গীরণ করিতে পারিলেই, পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হয় না। যদি আমরা কোন বিষয় যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা আমরা কার্য্যে পরিণত করিব। যেমন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের বিষয় যে বুঝিয়াছেন তাহার নিদর্শন রেল গাড়ি, জাহাজ, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, ফটোগ্রাফ, ফনোগ্রাফ, প্রভৃতির আবিষ্কারে ভুরি ভুরি প্রদান করিয়াছেন, তেমনি আমরাও যদি সকল বিষয় বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাদের নিদর্শন কই? কিন্তু কার্য্য ত পরের কথা, আমরা যে আধুনিক সভ্য জগতের উন্নতি সম্বন্ধে আদৌ কিছু চিন্তা করিয়াছি তাহা কিসে বুঝিব? পুস্তকই

চিন্তাশীলতার পরিচায়ক ; যখন আমাদের ভাষায় ও সকল বিষয়ে ভাল পুস্তক নাই, তখন আমরা কি বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি যে আমরা উন্নত হইয়াছি ? যেমন ইংরাজ যাহা ভাল বুঝিয়াছে, ফরাশী যাহা ভাল বুঝিয়াছে, জর্ম্মণ যাহা বুঝিয়াছে তাহা তাহারা নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি বাঙ্গালী যাহা ভাল বুঝিবে তাহা অবশ্য বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু শিক্ষার ফলে যখন আমাদের স্বাধীন চিন্তার কিছুমাত্র উদ্রেক হয় নাই, তখন ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে আমাদের মনোবৃত্তি সকলও সম্যগ্ স্ফূর্ত্তি পায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের শারীরিক উন্নতির বিষয় দেখা যাউক। সবল ও কর্ম্মক্ষম মন পাইতে হইলে সবল দেহের প্রয়োজন। মন ও শরীর পরস্পর এমনভাবে জড়িত যে একটিকে ধরিলেই আর একটি ধরা পড়ে। মনের কষ্ট হইলে শরীরের কষ্ট হয়, শরীরের কষ্ট হইলে মন ক্ষুণ্ণ হয়, আবার মন প্রফুল্ল থাকিলে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, এবং শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকিলে মন আনন্দিত থাকে। সুতরাং একের উন্নতি করিতে গেলে অপরের উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকেই সুস্থ শরীরে দিনপাত করিতে দেখা না বলিলে অত্যুক্তি দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। আধুনিক শিক্ষার গুণে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। দৃষ্টিহীনতা বা অম্লরোগ যাহার নাই সে বাঙ্গালী নহে বলিলে বলা যায়। 'শরীরং ব্যাধি মন্দিরং', এই কথা বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন খাটিয়াছে, তেমন আর কাহারও পক্ষে নহে। শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে কেবল বক্তৃতা করিলে চলিবে না, জিম্‌নাষ্টি-কের সরঞ্জাম রাখিলেই চলিবেনা, বলিষ্ঠ শরীর দেখাইতে হইবে।

আমাদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে 'বৃদ্ধ' কথার অর্থ উল্টাইয়া গিয়াছে। আগে বৃদ্ধ বলিলে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক জীর্ণ শীর্ণ দেহ সম্পন্ন ব্যক্তি বুঝাইত, এখন বৃদ্ধ বলিলে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি বুঝায়। 'শতায়ুঃ' কথা আর আমাদের খাটে না; উহা কেবল কথার কথা হইয়াছে মাত্র।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে স্বাস্থ্যের হানি হইবার দুইটি কারণ আছে। (১) যথাসময়ে শিক্ষার্থীরা আহার করিতে পায় না। এ দেশে প্রাতে কিঞ্চিৎ জলযোগ ও মধ্যাহ্নে আহার করিবার ব্যবস্থা চির প্রচলিত। মধ্যাহ্নেই ক্ষুধার উদ্রেক হয় সুতরাং এই সময়েই আহার করা বিধেয়। আবার উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করাও প্রয়োজন। ইহাতে যেন কেহ না বুঝেন যে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে বলিতেছি। এখন বিদ্যালয় ও অন্যান্য সকল কার্য্যই মধ্যাহ্ন কালে আরম্ভ হওয়ায় এই প্রকার আহারের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। প্রাতে জলযোগ ও মধ্যাহ্নে আহারের পরিবর্ত্তে প্রাতে আহার এবং মধ্যাহ্নে জলযোগ হইতেছে। অতি শৈশবকাল হইতে একারণ এই-রূপ অসময়ে ও অক্ষুধার উপর খাইয়া এবং ক্ষুধার সময় পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া আমাদের শারীরিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়াছে। (২) অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের থাকিতে পারে না। কিন্তু সকলকেই বিদেশীয় ভাষার শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য করিয়া অযথা পরিশ্রম করান হইতেছে এবং এই পরিশ্রম এমন সময়ে করান হইতেছে যখন বালকের পুস্তক পাঠের ক্ষমতাই পূর্ণভাবে বিকাশ হয় না, যেমন লঘু দ্রব্য তুলিতে আরম্ভ করিয়া পরে গুরুদ্রব্য তুলিবার ক্ষমতা হয়, তেমনি সহজ সাধ্য মাতৃভাষায় প্রথমে শিক্ষালাভ

করিয়া পরে বিদেশীয় ভাষা শিখিতে যাওয়া উচিত। শিক্ষার প্রথম উদ্যম হইতেছে মনকে শিক্ষালাভের উপযোগী করা; বালক যাহা মুখে বলিতেছে তাহা কিরূপে লিখিয়া বলিতে হয় তাহাই প্রথম শিখাইবার জিনিস এবং ইহা শিক্ষা করিবার জন্য যে পরিশ্রম প্রয়োজন তাহা দুগ্ধপোষ্য বালকের পক্ষে যথেষ্ট। মনোভাব প্রকাশ করিবার অকৃত্রিম প্রণালীকে কৃত্রিম প্রণালীতে আবদ্ধ করিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে যৎপরোনাস্তি আয়াসসাধ্য। ইহার উপর আবার কোন বিদেশীয় জাতি কি প্রকারে কথা কহে তাহা লিখিতে যাওয়া যে কতদূর শ্রমজনক তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। এইরূপে যাহা পরিপক্ক বুদ্ধি পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির কায তাহা কোমল মতি বালক করিতে বাধ্য হইয়া কেবল যে মানসিক পরিশ্রম করিয়াই নিষ্কৃতি পায় তাহা নহে, শরীর চালনার ও ভদ্রজনোচিত ব্যবহার শিক্ষা করিবারও সময় পায় না। এইরূপ অসঙ্গত মানসিক পরিশ্রমে যে শরীর নষ্ট হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ।

রাজা ও রাণী—অনুশীলন।

কেবল মাত্র পরলোকগত গ্রন্থকারদিগের পুস্তক অনুশীলন "সাহিত্য-সেবক-সমিতি"র উদ্দেশ্য নহে বলিয়া আজ আমরা বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ কবি রবি বাবুর "রাজা ও রাণী" অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম। বর্ত্তমান লেখকগণের পুস্তক অনুশীলনে এই লাভ যে আমরা যদি কোনও ভুল বুঝিয়া থাকি, লেখক স্বয়ং তাহা সংশোধন করিয়া দিতে

পারেন। কিন্তু ইহাতে ভয়ও আছে, কারণ সময়ে সময়ে লেখকের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রবিবাবুর নিকট আমাদের যতদূর ভয় না থাকুক, রবিবাবুর ভক্তবৃন্দের নিকট বিশেষ ভয়, রবি বাবুর বিপক্ষে একটি সামান্য কথা বলিলেই অমনি সর্ব্বনাশ, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হতভাগ্য লেখককে অজস্র গালি ও অভিসম্পাৎ প্রদান করিবেন। আমরাও রবি বাবুর ভক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ওরূপ গোঁড়া ভক্ত নহি। "রাজা ও রাণী" পাঠে আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছে নির্ভয় চিত্তে তাহাই লিখিব, যদি কোনও স্থলে ভুল বুঝিয়া থাকি আশা করি রবিবাবু ভ্রম সংশোধনে আমাদিগকে বাধিত ও উপকৃত করিবেন।

"রাজা ও রাণী" একখানি বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy)। বিয়োগান্ত নাটক ইংরাজি জিনিষ, এ দেশে উহা পূর্ব্বে ছিল না। ইংরাজি জিনিস ইংরাজি আদর্শের দ্বারাই বিচার করা সঙ্গত। এরূপ আদর্শের জন্য মহাকবি সেক্ষপীরের শরণাগত হওয়াই প্রশস্ত পন্থা। আত্মার ও মনুষ্য জীবনের অবনতি বা মুক্তি অর্থাৎ পৃথিবীতে সৎ ও অসতের সংগ্রাম, ইহাই সেক্ষপীয়র কল্পিত বিয়োগান্ত নাটকের আলোচ্য বিষয়।* রোমিও জুলিয়েট, হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ, লিয়ার, এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা, এবং কোরায়োলেনাসে ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "রাজা ও রাণী"তে, নায়ক বা নায়িকার আত্মার অবনতি বা মুক্তি, সৎ ও অসতের সংগ্রাম দৃষ্ট হয় না; বিদ্রোহীদের সহিত রাজার

*"Tragedy as concieved by Shakespeare is concerned with the ruin or the restoration of the soul and of the life of men; in other words its subject is the struggle of good and evil in the world." *Dowden.*

যুদ্ধকে সৎ ও অসতের সংগ্রাম বলা যায় না, কারণ উহাতে রাজার বা বিদ্রোহীদের আত্মার বা জীবনের অবনতি বা মুক্তি, কিছুই দৃষ্ট হয় না। ম্যাক্‌বেথের ডান্‌কেন্‌কে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণ চেষ্টাকে সৎ ও অসতের সংগ্রাম বলা যায়। এই জন্য "রাজা ও রাণী"র মূল ঘটনায় (plot) তাদৃশ রচনা চাতুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না। ক্রমশঃ ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কবি "রাজা ও রাণী"তে দম্পতি চতুষ্টয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রথম,—রাজা ও রাণী; দ্বিতীয়—দেবদত্ত ও নারায়ণী; তৃতীয়—কুমার ও ইলা (কুমারের সহিত ইলার বিবাহ না হইলেও ইলা তাঁহার বাগদত্তা পত্নী বলিয়া এস্থলে উহাদিগকে দম্পতি বলা হইল); চতুর্থ—চন্দ্রসেন ও রেবতি। প্রেম বৈচিত্র দেখাইবার জন্য, দম্পতি চতুষ্টয়কে কবি তুল্য অবয়ব বিশিষ্ট চারিটি পৃথক শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। সেক্ষপীরের কতকগুলি মিলনান্ত নাটকেও ঐরূপ তুল্য অবয়ব বিশিষ্ট বিভাগ (symmetry in the grouping of persons) দৃষ্ট হয়। সাদৃশ্য ও বিভিন্নতায় তুলনায় নায়ক ও নায়িকার চরিত্র-চিত্র প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই ঐরূপ কৌশলের আবশ্যক হয়, বিনা তুলনায় চরিত্র চিত্রণে সিদ্ধহস্ত হইলে আর ওরূপ কৌশলের সাহায্য আবশ্যক করে না। যখন সেক্ষপীয়র নিজের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন তখন আর উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। "রাজা ও রাণী"র কবি এখনও ঘটনা কল্পনায় ও চরিত্র চিত্রণে সিদ্ধহস্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা আছে, সেক্ষপীরের ন্যায় অনুশীলন ও চেষ্টা থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা করা যাইতে পারে। ঐরূপ তুল্য অবয়ববিশিষ্ট শ্রেণীর আশ্রয় গ্রহণ করাতে যে নাটকের সৌন্দর্য্য হানি হইয়াছে এরূপ কথা বলিতেছিনা, বরং উহার বৃদ্ধিই

হইয়াছে। আমরা যে দম্পতি চতুষ্টয়ের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি একে একে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিব।

প্রথম রাজা ও রাণী। রাজাকে কবি যেরূপ উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, উহা আমাদের বিবেচনায় স্বাভাবিক হয় নাই; পরিণীতা পত্নীর প্রতি (তাহাও আবার নব পরিণীতা নহে, ইহার প্রমাণ নিম্নে দ্রষ্টব্য) ওরূপ উদ্ভ্রান্ত প্রেম কেমন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়, উপপত্নী বা অপরিণীতা প্রণয়িনীর প্রতিই ওরূপ অতৃপ্ত বাসনা ও প্রবল প্রেম সম্ভব, কারণ সে স্থলে বিচ্ছেদেব সম্ভাবনা আছে। যেখানে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা অধিক প্রেমের প্রখরতাও সেখানে অধিক, কিন্তু যেখানে চিরমিলন, বিচ্ছেদের কোনও আশঙ্কা নাই, যে আপন হস্তগত, যাহাকে হারাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, যে নিজে বলিতেছে "রাজন্ তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে, অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী" তাহার জন্য এত আকুলতা, এত প্রেম ভিক্ষা, এত আত্মহারা প্রেমোচ্ছ্বাস কেন? মহাকবি সেক্ষপীয়রও আত্মহারা প্রেমিকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু উহা কত সুন্দর ও স্বাভাবিক! রোমিও জুলিয়েটে প্রেমের আগ্রহ ও প্রখরতা যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু রোমিও জুলিয়েট পতি পত্নী নহে, প্রণয়ী প্রণয়িনী মাত্র; তাহাদের মিলনে অনেক বাধা ও বিঘ্ন ছিল বলিয়াই ওরূপ আগ্রহ ও প্রখরতা। এণ্টনি ক্লিওপেট্রায়ও অতৃপ্ত বাসনা ও অনন্ত প্রেম তৃষ্ণা দেখিতে পাই বটে কিন্তু এণ্টনি ক্লিওপেট্রাও পতি পত্নী নহে, ক্লিওপেট্রা এণ্টনির উপপত্নী স্বরূপা, ক্লিওপেট্রা এককালে সিজার ও পম্পির পরিচিতা ছিল, এণ্টনি মনে মনে সন্দেহ করিত যে ক্লিওপেট্রা সিজারের অনুচর-বর্গের সহিত বিশ্বাসঘাতিনী হইতে পারে। ক্লিওপেট্রাও মায়াজালে এণ্টনিকে বদ্ধ রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। দাম্পত্য প্রেমে

উন্মত্ততা বা আগ্রহাতিশয়তা থাকে না, গভীরতা থাকে, সে প্রেম শান্ত ও অনন্ত। ব্রুটাস্ ও পোরসিয়ায় এই শান্ত ও অনন্ত প্রেমের ছবি দেখিতে পাই, কিন্তু "রাজা ও রাণী"র প্রেমে গভীরতার পরিবর্ত্তে উন্মত্ততা ও অস্বাভাবিক আগ্রহাতিশয়তাই অধিক দেখা যায়। যখন বিক্রমদেব ও সুমিত্রা "দুইটি বালক বালিকা" ছিল, তখন সেই প্রথম মিলনে, সেই "নিশি সমাগমে দুরু দুরু হিয়া," সেই "নিশি অবসানে আঁখি ছল ছল," সেই "বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন, তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয়" সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এখন তাহারা আর "বালক বালিকা" নহে, নব পরিণয় সূত্রেও আবদ্ধ নহে, এখন তাহারা "রাজা ও রাণী," এখন আর ওরূপ শোভা পায় না, স্বাভাবিক বলিয়াও বোধ হয় না। রাজা ত রাণীর প্রেমে বঞ্চিত নহেন, তবে বৃথা কেন এত কাতরতা, এত অতৃপ্ত বাসনা? রাজার ইচ্ছা রাণী সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য ভুলিয়া কেবল দিবা রাত্র তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাকেন, রাজ্য ও রাজ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তিনিও কেবল স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। আমরাও সুমিত্রার কথায় বলি, "শুনিয়া লজ্জায় মরি, ছি ছি মহারাজ, একি ভালবাসা?" এরূপ রাজার নাম 'বিক্রমদেব' না হইয়া 'মন্মথ দাস' হইলেই ঠিক্ হইত; তবে তিনি যে শেষে বিক্রম দেখাইয়া ছিলেন উহা স্বাভাবিক নহে, বিকারগ্রস্থ রোগী যেরূপ বল প্রদর্শন করিয়া থাকে, উহাও সেইরূপ। স্ত্রীর উত্তেজনায় নিরীহ বাঙ্গালিও উত্তেজিত হয় কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া সুমিত্রার উত্তেজনায় রাজা অক্ষত্রিয়োচিত ভাবে অনায়াসে বলিলেন—

"হেথা হ'তে একপদ নড়িব না, রাণি,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব।"

আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়, যে কবি কুমার চরিত্রে প্রেম ও ক্ষাত্র-

ধর্ম্মের উজ্জ্বল ছবি চিত্রিত করিয়াছেন তাঁহার তুলিকায় এরূপ নিস্তেজ, নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য রাজার ছবি কিরূপে বাহির হইল? আমরা নিজের কথায় বলিতে চাই না রাজার বাল্যসখা দেবদত্তের কথাতেই বলি—

—"দেখে হাসি আসে
রাজা করে পলায়ন—রাজ্য ধায় পিছে;—
—— অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা।"

রাজার প্রেম যথার্থ প্রেম বলিয়া বোধ হয় না, উহা কেবল sentimentality বা কাল্পনিক উচ্ছ্বাস মাত্র; উহাতে গভীরতা নাই, গভীরতা থাকিলে যে রাণীকে একদণ্ড না দেখিলে পলকে প্রলয় গণিতেন, তাঁহাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলিবেন, অভিমান ভরে রাজার এইরূপ আচরণ কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু "প্রাণ যারে চায় তারে মান ত সাজে না" ইহাই প্রেমের নিয়ম। অন্যের পক্ষে সম্ভব হইলেও রাজার ন্যায় প্রেমোন্মাদের পক্ষে ওরূপ অভিমান কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। রাজা নিজেই বলিতেছেন—

"আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে! আজি সখা
আনন্দের দিন, এস আলিঙ্গন পাশে!"

আবার তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন—

"বন্ধু, বন্ধু মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভাণ।
থেকে থেকে বজ্র শেল ছুটিছে বিঁধিছে মর্ম্মে"!

রাজা সুমিত্রাকে ভুলিতে পারেন নাই, অকারণে তাঁহাকে ত্যাগ করায় তাঁহার ক্রোধ ও অভিমান হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু যাহার উপর অভিমান হয়, সে যদি বহুদিন পরে আপনি আসিয়া দেখা করিতে চায়

তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকা যায় কি? সাক্ষাতের পর, কৈফিয়তের পর না হয় অভিমান করা চলে, কিন্তু যাহার জন্য প্রাণ আকুল, বিনা সক্ষাতে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা, অন্ততঃ ওরূপ রাজার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। আরও এক কথা, যেখানে গভীরতা আছে, সেখানে স্বার্থ ত্যাগ আছে, সেখানে আপনাকে ভুলিয়া প্রণয় পাত্রকে প্রাণপণে সুখী করিবার যত্ন আছে; কিন্তু রাজা নিজের সুখস্বপ্ন লইয়াই ব্যস্ত, রাণীর মিনতি ও অনুরোধ রক্ষায় আদৌ চেষ্টা নাই, বরং রাণীর ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় তিনি বিরক্ত; রাজা বলিতেছেন—

" —— বার বার এক কথা
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর! কাজ, কাজ, যাও, যাও!
যেতে কি পারিনে আমি? কে চাহে থাকিতে?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন করা বিন্দু বিন্দু কৃপা
এখনি চলিনু।"

কিন্তু চলিবার ক্ষমতা কোথায়, রাণীর ম্লান মুখ দেখিয়া রাজার প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? তাই তৎক্ষণাৎ সাদরে বলিতেছেন—

—— "অয়ি হৃদিলগ্ন লতা
ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ, মোছ আঁখি
ম্লান মুখে হাসি আন, অথবা ভ্রূকুটি;
দাও শাস্তি, কর তিরস্কার!

হায়! মুহূর্ত্ত মাত্র যে রাণীর ম্লান মুখ দেখিয়া রাজা পৃথিবী শূন্য দেখেন, সে রাণীকে প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কি? রাজা নিজের সুখস্বপ্ন লইয়াই ব্যস্ত, যাঁহার জন্য তিনি উন্মাদ তাঁহাকে সুখী করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই, তাই

বলিতেছি, রাজার প্রেম প্রেমই নহে, কাল্পনিক উচ্ছ্বাস বা sentimentality মাত্র; ইহাতে আদৌ স্বার্থ ত্যাগ নাই। পুনরায় আমরা দেবদত্তের কথায় বলি—

—"ধিক্ লজ্জা মহারাজ
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ সুখ স্বপ্ন
বেশি হ'ল ?"

রাজার প্রেমে যে গভীরতা ছিল না "ইলা"কে দর্শন মাত্রেই তাহাকে পাইবার ইচ্ছা, উহার আর একটি প্রমাণ। অনেকে বলিবেন প্রেমিকের স্বভাব এই যে সে কাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না, প্রেমিকের হৃদয় কখনও শূন্য থাকে না। তাহা হইলে চতুর্থ পক্ষের বৃদ্ধ বিবাহার্থী অপেক্ষা প্রেমিক ত আর নাই! অধিকন্তু ইলার প্রতি লোভ রূপজমোহ মাত্র, মনের মত মানুষ পাইলেন বলিয়া ঐ লোভ হয় নাই, কারণ ইলাকে দর্শন মাত্রেই রাজা বলিয়া উঠিলেন—"একি অপরূপ মূর্ত্তি, চরিতার্থ আমি"। ইলা মনের মত হইবে কিনা তখনও তিনি তাহার কিছু মাত্র অবগত নহেন অথচ বলিতেছেন,—

"রাজ্য ধন কিছু না থাকিত যদি—শুধু তুমি
থাকিতে আমার"—

ইলার অনিচ্ছার বিষয় অবগত হইয়াও রাজা বলিতেছেন—

"কেন দেবি মোর পরে এত
অবহেলা? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য নহি ?"

আবার—

"তাহার (কুমারের) সৌভাগ্য রবি গেছে অস্তাচলে
ছাড় তার আশা।"

রাজা যদি কুমারকে আত্মসমর্পণের কথা শ্রবণ মাত্রেই ইলার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন তবেই তাঁহার প্রকৃত প্রেমিক ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত, নতুবা সুন্দরী নারী দেখিলেই লোভ

অনেকেরই হইয়া থাকে, উহাতে মহত্ত্ব ও প্রেমিকত্বের পরিবর্ত্তে রূপ-মোহেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। যখন দেখিলেন ইলাকে পাইবার আশা নাই, তখন অগত্যা রাজা নিজ উদারতার পরিচয় দিলেন, ইহাতে মহত্ত্ব নাই এরূপ বলিতেছি না, তবে উহাতে ঐ মহত্ত্বের গৌরব হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

রাণীর চরিত্র প্রথমে বেশ সুন্দর ও পরিস্ফুট হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু রাজাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া আমাদের বিবেচনায় কেমন একটু অতিরিক্ত রকমের স্বার্থত্যাগ ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় প্রদানেচ্ছা বলিয়া বোধ হয়। রাণী বলিতেছেন—

> "পিতৃ সত্য পালনের তরে, রামচন্দ্র
> গিয়াছেন বনে, পতি সত্য পালনের
> লাগি আমি যাব।"

সুমিত্রার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু তিনি নিজের মহৎ অন্তঃ-করণের পরিচয় প্রদানে আগ্রহাতিশয়তা বশতঃ একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃ ইচ্ছায় পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন, সুমিত্রা ত পতির ইচ্ছায় পতি সত্য পালনের জন্য যাইতেছেন না, নিজের ইচ্ছায় যাইতেছেন। আর পতিসত্যই বা এস্থলে কোথায়? ইহাও এক প্রকার আগ্রহাতিশয়তা; রাজার আগ্রহাতিশয়তা প্রেমের জন্য, রাণীর আগ্রহাতিশয়তা পরোপকারের জন্য। দুইটিই নির্দ্দোষ, কিন্তু দুইটিই বাড়াবাড়ি রকমের বলিয়াই উহাতে এত বিষময় ফল ফলিল। রাণীর অবিবেচনা ও আগ্রহাতি-শয়তাই সকল অনর্থের মূল। রাজা ত রাণীর কাছে কলের পুতুল মাত্র, তিনি মনে করিলে অন্য উপায়ে বিক্রমদেবের লুপ্ত বা সুপ্ত বিক্রম উত্তেজিত করিতে পারিতেন। একটু অভিমান, এক ফোঁটা

আঁখি জলে রাজার চিত্ত বিকল করিয়া তাঁহাকে যে দিকে ইচ্ছা চালাইতে পারিত। রাজা যদি রাণীকে ভাল বাসিতেন তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার অনুরোধ, মিনতি বা ভিক্ষা, উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। আর মিনতি অনুরোধে না হইলে ক্রমাগত উত্তেজনায়ও ফল-লাভ হইতে পারিত। কিন্তু রাণী হিত করিতে গিয়া বিপরীত ঘটাইলেন, প্রাণ পতিকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। কোনও নারী অমন স্নেহময় পতিকে বিনা দোষে কেবল প্রজার উপকারের জন্য ত্যাগ করিতে পারে কি না আমাদের সন্দেহ ; উহা আমাদের নিকট কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, অবশ্য স্ত্রী চরিত্র আমরা বুঝিতে অক্ষম, নারীরাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সক্ষম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি রাজাকে পরিত্যাগ করায় সুমিত্রার উপর আমাদের রাগ হয়, রাজার ত হইবারই কথা। আবার যখন সুমিত্রা কুমারকে বলিলেন—

"—ধন্য ভাই
ধন্য তুমি! সঁপিলাম এজীবন মোর
তোমার লাগিয়া।"

তখনও তাঁহার উপর রাগ হইল। "সঁপিলাম এ জীবন মোর তোমার লাগিয়া" ? ভ্রাতার জন্য জীবন সঁপিবার অপেক্ষা পতির জন্য জীবন সমর্পণ কি রমণীর অধিকতর কর্ত্তব্য নয়? যে রাজা তাঁহার জন্য পাগল, রাণীকে অতিরিক্ত ভালবাসা ব্যতীত যাঁহার অন্য কোনও দোষ নাই, সেই প্রাণপতির জন্য জীবন না সঁপিয়া ভ্রাতার জন্য ওরূপ কথা বলাতেই সুমিত্রার উপর আমাদের রাগ। ঐ কথায় স্পষ্টই বুঝা যায়, হয় রাণী এতদিন রাজার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন নাই, (কারণ একটি জীবন দুই জনের জন্য সমর্পণ সম্ভব নহে,) না হয় রাণী ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছেন। কিন্তু

তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিলে মিথ্যা বলিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না।

"তোমার এ স্নেহ ঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ" ?

রাণী কুমারের স্নেহ ঋণ প্রাণ দিয়া পরিশোধ করিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কুমারের অপেক্ষা রাজার স্নেহ ঋণ কি শত গুণে অধিক নহে ? রাণী রাজার নিকট অপরাধিনী হইলেও রাজা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া একবারও ক্ষমা ভিক্ষা করেন নাই, পত্র বা দূত দ্বারা একবারও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠান নাই, কুমারের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। একবার ক্ষমা চাহিলে সকল গোল মিটিয়া যাইত, ইহাতে অপমান কি ? স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিতে স্ত্রীর আবার অপমান কিসে ? উহা না চাহিলেই বরং অভিমান প্রকাশ পায়। প্রত্যাখানের পর হইতে সুমিত্রার মুখে রাজার নাম উল্লেখ বা তাঁহার জন্য কাতরতা বড় একটা দৃষ্ট হয় না। শুধু একবার মাত্র কুমারকে বলিয়াছিলেন "ভাই, রাজারে মার্জ্জনা কর।" এরূপ নারীকে আদর্শ হিন্দু স্ত্রী বলিব কিরূপে ? তাই বলিতেছি রাজাকে ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুমিত্রা চরিত্র আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহাকে যথার্থ রাণী বা দেবী বলিয়া ভক্তি হইয়াছিল, কিন্তু পরে রাণীর উপর ততটা ভক্তি থাকে না, সুমিত্রা চরিত্র আর তত ভাল লাগে না। চন্দ্রসেন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"জননি সুমিত্রা,
বিক্রম কি কাশ্মীর জামাতা নহে ? এত
কাল পরে, গৃহে মোর আসিল জামাতা,
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ ?"

উত্তরে সুমিত্রা বলিলেন "হায় তাত, মোরে কিছু কোরোনা

জিজ্ঞাসা।” তার পর নিজের ক্ষুদ্রবল, ক্ষুদ্রবুদ্ধির জন্য অনেক অনুতাপ করিলেন, পরিশেষে ভাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বুদ্ধি হীনা আমি! তুমি সব জান ভাই!
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া! তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি।"

রাণী বুদ্ধি হীনা স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু হৃদয় হীনতারও পরিচয় দিতেছেন, কই স্বামীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে একটিবারও ত বারণ করিতেছেন না, একটিবারও এবার বলিতেছেন না "রাজারে মার্জ্জনা কর।" হৃদয় থাকিলে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া রাজাকে মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিতেন, "আমি কিছুই জানি না, তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর" এরূপ ভাবের কথা কখনই বলিতে পারিতেন না। "আমি শুধু তোমারই জানি" এই বা কি রকম কথা, তবে কি তিনি রাজাকে জানেন না, রাজা কি তাঁহার কেহ নহে, ভ্রাতাই তাঁহার কাছে এত বড় ?

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি "রাজা ও রাণী"র মূল ঘটনায় তাদৃশ রচনা চাতুর্য্য দৃষ্ট হয় না। এখন উহার কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে। সৎ ও অসতের সংগ্রামই বিয়োগান্ত নাটকের আলোচ্য বিষয়, আত্মা বা মানব জীবনের অবনতি বা মুক্তিই উহার পরিণাম, কিন্তু "রাজা ও রাণী"তে উহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। চন্দ্রসেন ও রেবতী চরিত্র অন্তর্গত ঘটনা না করিয়া মূল ঘটনা করিলে একখানি প্রকৃত পক্ষে বিয়োগান্ত নাটক হইতে পারিত; কারণ উহাদের চরিত্রে সৎ ও অসতের সংগ্রাম, আত্মার অবনতি পরিলক্ষিত হয়। জোর জবরদস্তি করিয়া মারিয়া ফেলিলেই প্রকৃত পক্ষে (tragedy) বিয়োগান্ত নাটক হইল না।

রাণীর মৃত্যুও তত স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যে সুমিত্রা, কুমারের মস্তক ছিন্ন করিবার কথা শুনিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, সে সুমিত্রার পক্ষে আপন প্রিয় ভ্রাতার ছিন্ন মস্তক স্বহস্তে বহন করিয়া রাজ সমীপে আনয়ন কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না ; ওরূপ দৃঢ়তা কোমল প্রাণা রমণীর পক্ষে অসম্ভব। সুমিত্রার মৃত্যু নেহাত নাটকি ধরণের হইয়াছে। বাহকের কার্য্য সমাধা করিবার জন্যই যেন রাণী এতক্ষণ অসাধারণ দৃঢ়তা সহকারে মনের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া নিদারুণ মনোবেগ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। বাহকের, কার্য্য শেষ হইলে অমনি হৃদয়ের উদ্বেলিত শোক উথলিয়া উঠিল, রাণী উর্দ্ধস্বরে বলিলেন "মাগো জগত জননি, দয়াময়ি স্থান দাও কোলে।" অমনি পতন ও মৃত্যু !

সুমিত্রার উপর রাগ হইবার আরও এক কারণ, তিনি নিজেই সমস্ত অনিষ্টের মূল হইলেও অন্তিম কালেও একটু অনুতাপ বা রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে দেখা যায় না, বরং রাজাকে তিরস্কার করিতেই দেখা যায় :—

"ফিরেছ সন্ধানে যার নিশি দিন ধরে
কাননে, কান্তারে, শৈলে, দয়া, ধর্ম্ম, রাজ্য,
রাজ লক্ষ্মী সব ভুলে ; যার লাগি দশ
দিকে হাহাকার করেছ প্রচার ; যারে
মূল্য দিয়ে চেয়ে ছিলে কিনিবারে, এই
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শির ; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ ! পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক্, শান্তি হোক্
এজগতে, নিবে যাক নরকাগ্নি রাশি,
সুখী হও তুমি !"

একি মঙ্গল কামনা, না শ্লেষপূর্ণ তিরস্কার? সুমিত্রার পতিভক্তি অপেক্ষা ভ্রাতৃ ভক্তিরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়।

"রাজা ও রাণী"তে নায়ক নায়িকা চরিত্র ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র গুলি অতি সুন্দর ও পরিস্ফুট হইয়াছে। একটি দম্পতির কথা বলা হইল, বারান্তরে বাকি তিনটি দম্পতির বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার।

বঙ্গনারীর জীবন গাথা।

আমি জন্মাবার আগে দেখিয়ে যা'কে তা'কে
দুঃখ ক'রে বলিত কে বাঁজা আমার মা'কে
বাবায় পুঃন বে করিতে বুঝাত কে ডেকে
ঠাকুর মা আমার।

কে সতত পূজা দিত ষষ্টীদেবীর কাছে,
বাঁজা হ'লে মেয়ের যদি সতীন হয় পাছে,
কে খাওয়াত জলপড়া আর যেথা যত আছে
দিদি মা আমার।

যাহা কিছু ভরসা সুখ ছিল মনের আশ
চিন্তাশূন্য শান্তিপূর্ণ ছিল যে আবাস
আমার আবির্ভাবে সেথা কে হ'ল নিরাশ,
বাবা যে আমার।

মেয়ে বলে' অবহেলা করিত না কে
লালন করিত মোরে রাখিয়ে বুকে
মোর মুখ দেখে কেবা ভাসিত সুখে
মা যে আমার।

ঘোমটা ঢাকা লজ্জা মাখা মৌন বধূটীরে
দাসীর মত খাটিয়ে নিত কতই প্রকারে
কথায় কথায় খোঁটা দিত তবুও কে মোরে
খাশুড়ি আমার।

খারাপ হ'য়েছিল বলে একখানি গহনা
পাঁচ হাজার নগদ আর একশ ভরি সোণা
পেয়েও কে ক'রে ছিল ঠকা বিবেচনা।
শ্বশুর আমার।

পায়ের উপর দিয়ে পা থাকিত কে ব'সে
হজম তরে দিন দুপুরে ঘুমাইত ক'সে
বৌ'র নিন্দে সবার কাছে ক'রত বিনা দোষে।
ননদ আমার।

থাকৃত নাক একটী রাতও কেবা আপন ঘরে
মাথা খুঁড়ে পায়ে ধরে হাজার সাধ্‌লে পরে,
(পুরুষ কেন জংলা হেন বাহিরে গিয়ে মরে)
স্বামী যে আমার।

মৌন মুখে নিজের দুঃখে কে সতত থাকে
মনের ব্যথা শোনেইবা কে, বলেইবা সে কাকে
বাঙ্গালা দেশে জন্ম বলে বিধি বিমুখ যাকে,
আমি যে আমার।

পত্র-বিনিময়ে।

প্রথম অধ্যায়।

দিন শেষে জাহ্নবী তীরে বৃদ্ধ হরলাল যখন শেষবার তাঁহার পুত্র দিগকে অন্তিমশয্যা পার্শ্বে ডাকিয়া শেষ উপদেশ প্রদান করিয়া ইহলোক হইতে চিরবিদায় লইলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর প্রবাসে হৃদয়ার্দ্ধভাগিনীর পার্শ্বে বসিয়া ব্যবসায়ের একটা বিপুল লাভের সু-খবর দিতেছেন। নববৈধব্য-বিহ্বলা ভ্রাতৃজায়ার করুণ বিলাপধ্বনি আর অগ্রজের অন্তিম অনুরোধ বাণী কানাইলালের সুদূর প্রবাস গৃহে তখনও পৌছে নাই। কারণ, এই দুর্ঘটনার দুই দিন মাত্র পূর্ব্বে কানাইলাল সংবাদ পাইয়াছিলেন দাদার সামান্য জ্বর হইয়াছে; এবং এই সামান্য জ্বর যে এত শীঘ্র কালজ্বর হইয়া দাঁড়াইবে তাহা চিকিৎসক বা আত্মীয় স্বজন কেহই ভাবে নাই।

সেই নৈশ অন্ধকারে অন্ধতর হৃদয়ে মৃতদাহ করিয়া দারুণ শোক-দগ্ধা জননীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে বাষ্পাকুলনয়নে গৃহ প্রত্যাগমন সময়ে হরলালের পুত্রত্রয়ের শ্রুতিপথে যেন বৃদ্ধের শেষ উপদেশ কথা বাজিতেছিল,—

"তোমরা একত্রে থাকিও, কানাইকে আমারই মত ভক্তি ও মান্য করিও, তা'কে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও, আর, মোহিনীকে ছোট সহোদরের মত স্নেহ কোরো।"

মোহিনীমোহন কানাইলালের প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র। কলিকাতায় ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

হরলালের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কানাইলাল, যত শীঘ্র সম্ভব, সপরিগ্রহ দীনবেশে বাড়ীতে আসিলেন; কিন্তু অনাহার শীর্ণা

শোকাভিভূতা প্রৌঢ়া ভাতৃজায়াকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তাহার সন্তাপ শুষ্ক জীবন-নদী অচিরে মরণার্ণবে মিশিল। দেবরকে স্বামীর অন্তিম অনুরোধ শ্রবণ করাইয়া, পুত্রদিগকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিবার নিমিত্তই যেন তিনি ক'দিন মাত্র দুঃসহ বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করিলেন।

তখন মাঘের শেষ। শীত ঋতু মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়াও ছাড়িতেছে না; যেন তাহার তুষারকরবেষ্টনে ধরিত্রীকে বক্ষে চাপিয়া বিদায়ের শেষ আলিঙ্গন দিতে যাইয়া মুর্চ্ছিত। সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধগণও বলিতেছেন 'ফাল্গুন পড়্‌তে যায়, তবু এমন প্রখর শীত কখনও ভোগ ক'রেছি কি না মনে পড়ে না'। তখন না ছিল তরু লতার পল্লব শোভা, না ছিল বিহঙ্গ বিহগীর কলগীতি, না ছিল হিমবিমুক্ত শশিকলা, শুধু জগৎ জুড়িয়া "কন্‌কনে বাতাস" ধরণীকে পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছিল! এমনি একটা কন্‌কনে রাত্রির অবসান সময়ে, যখন নক্ষত্র বধূরা সারানিশি অশ্রুজলে বিশ্বভূমি সিক্ত করিয়া পরিম্লান হইয়া আসিয়াছিল, পতি পদধ্যানমগ্না হর-প্রিয়া স্বামীমরণের অষ্টদিবস পরে মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

লোকে যে বলে 'বিপদ কখন একলা আসে না' তাহার যাথার্থ্য দত্তবাড়ীর ঘটনায় বেশ উপলব্ধ হয়। সদ্য পিতৃ মাতৃ বিয়োগ কাতর ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে যে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন কানাইলাল তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা পারিবেন? দাদাকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। যখনি তাঁহার মনে পড়িতেছিল দাদার মরণকালে তাঁহাকে দেখিতে পর্য্যন্ত পান নাই, তখনই যেন তিনি বৃশ্চিক দংশন জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন।

এই শোক চিত্র সম্পূর্ণ করিতে হইলে, আর এক হতভাগিনীর

মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, যাহার ক্ষীণ দেহে ক্ষীণতর জীবন প্রবাহ শুধু অনন্ত আঁখি জলে অশ্রু মাত্র রহিয়া ধীরে অতি ধীরে বহিতেছিল। সে আর কেহ নহে; হরলালেরই সর্ব্ব কনিষ্ঠ দুহিতা, দুর্ভাগিনী বালবিধবা পদ্মা!

বস্তুতঃ ইহাদের ভুলাইবার জন্য ছিল কেবল দুই জন, দুটি প্রেম-ভরা কিশোর হৃদয়—মোহিনীমোহন আর তা'র অন্তর মন্দিরের জীবন্ত কনকপ্রতিমা বালিকাবধূ মুরলা। আগ্নেয় গিরির মত তাহারা দু'জনে অন্তরে অন্তরে দারুণ শোকবহ্নি গুপ্ত রাখিয়া সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত। তাহাদিগকে কত গল্প শুনাইত, কত বা মধুর কবিতারসে তাহাদের শুষ্ক মনভূমি সিক্ত করিতে যত্ন করিত, কত বিচিত্র দেশের বিচিত্র বিবরণ শুনাইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বহুবিত্তশালী হরলালের তিন পুত্র উপযুক্ত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেও পৈত্রিক ব্যবসায়ের কোন সংবাদ রাখিত না। তাহারা সাহিত্য-চর্চ্চা, পরোপকার সাধন, এবং সংসারের নিত্যকর্ত্তব্যপালনে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইত। হরলাল মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে অনুজের হস্তে সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া গৃহে অবসর সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার বিপুল বিষয় সম্পত্তির কথা কেবল কানাইলালই সম্পূর্ণ জানিতেন।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কানাইলাল প্রধান কর্ম্মচারীকে ব্যবসায় স্থলে রাখিয়া সেই যে বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলেন, আজ প্রায় তাহার তিন মাস হইল। এ তিন মাস কেবল শোক বিষাদের

কাটিয়াছে। পদ্মাকে লইয়া তাহারা অস্থির। পদ্মার সোদরগণ অনেকটা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু হতভাগিনীকে কে বাঁচায়? মা'র মুখ চাহিয়াই সে কোন প্রকারে আপনার অসহ্য যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টা পাইত। মুরলা ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; ভ্রাতৃ-জায়ারাও অবসর মত তাহাকে সান্ত্বনা করিত। কিন্তু হায়! সবই বিফল—তাহার আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না; ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে লাগিল।

ঠিক এই ভয়ঙ্কর অবস্থায়, তাহার সৌভাগ্য বশতঃই হউক্ এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে পদ্মা বুঝি মরিতে মরিতে বাঁচিল।

আমরা এতক্ষণ কানাইলালের স্ত্রী কাত্যায়নীর কথা কিছুই বলি নাই। এই বার তাঁহাকে পাঠকের নিকট পরিচিত করিতে হইবে। শ্রীমতী কাত্যায়নী চিররুগ্না, অত্যন্ত গর্ব্বিণী, এবং পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি কানাইলালের দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যা। বয়স অনুমান ত্রিশ। অস্বাস্থ্যের জন্য তিনি স্বামীর সহিত প্রবাসেই থাকিতেন। স্বামীর এতটা সোদরানুরাগ তাঁহার বড় ভাল লাগিত না। তিনি প্রায়ই ভর্ত্তাকে "খোঁটা" দিতেন "তোমার মত মুখ্যু আমি দেখিনি, বিষয় আশয় সমস্তই ভায়ের নামে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ, এদিকে নিজেই গাধার খাটুনি খেটে খেটে শরীরটাকে মাটী করে ফেল্লে"। কখন কখন বলিতেন, "আমারই উপর যেন তোমার ভালবাসা নাই, তাই বলে' কি মোহিনীকেও তুমি ভাল বাসনা? আপনাকে কি অমর ভেবেছ? দেখছি, শেষকালে মোহিনীকে কাঙাল করে যাবে" ইত্যাদি। কানাই বাবু সমস্তই শুনিয়া যাইতেন, কোন উত্তর দিতেন না। ভাবিতেন, সপত্নী পুত্রের জন্য এতটা চিন্তা বড় ভাল লক্ষণ নয়।

এতদিন স্বামীরই উপর গাত্র জ্বালার নির্ব্বাণ লাভ করিতে পাইতেন, কিন্তু ভাশুরের এবং যাতার মৃত্যুর পর হইতে কাত্যায়নী মাঝে মাঝে বধূদের ও পদ্মার অশান্তির কারণ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার গৃহে আসিবার কিছু দিন পরেই ঝি মহলে একটা "কাণাকাণি" আরম্ভ হইল, এবং তাহাদের বাড়ীতে ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল। মুরলাও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আচরণে বড় লজ্জিত হইত এবং হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করিত। কিন্তু, পদ্মা ছাড়া আর কাহাকেও মনের কথা বলিতে পাইত না; মোহিনী এক মাস মাত্র দেশে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল।

ইতি মধ্যে কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল ব্যবসায়ে বড় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কানাইলালকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। তিনি মনস্থ করিলেন, এবার ভার্য্যাকে গৃহে কর্ত্রীস্বরূপিণী রাখিয়া যাইবেন, কারণ, বলিতে গেলে, বধূরা এখন সকলেই অল্প বয়স্কা। কিন্তু, কাত্যায়নী কিছুতেই তথায় থাকিতে চাহেন না। নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া স্বামীকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। বিস্তর অনুযোগাদির পর অর্দ্ধ সম্মত হইয়া বলিলেন— 'যদি এবার আমার কথা মত বিষয়াদি ভাগ করিয়া লও, আমি এখানে থাকিতে পারি নতুবা নহে। এ বাড়ীতে আমার মান নাই; দাস দাসীরাও আমার পিছনে নিন্দা করে। তোমার এক রত্তি বউটাই কি কম? সে আমার কথা অগ্রাহ্যি করে, দিন রাত ওই আদুরী পদির কাছে পড়ে আছে, আমি যেন কেহই নয়।'

কানাইলাল মুরলা ও পদ্মার উপর স্বীয় বনিতার অযথা আক্রোশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। একটু অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "তোমার কাছে কি জগৎ শুদ্ধ লোক খারাপ? পদ্মার মত এমন

মেয়ে আর তোমার বৌয়ের মত এমন পুত্রবধূ কত তপস্যার ফলে পেয়েছি। আহা আজ যদি জামাইটি থাকিত!"

কাত্যায়নী। তা'ত আমি জানি, তুমি আমার অপমান দেখ্‌তে, আর আমাকে অপমান কর্‌তে চিরকাল ভালবাস। কি আমার গুণের মেয়ে গো! কি গুণেরই বউ! মরি মরি! যদি এতই এদের উপর তোমার—

কানাই। "যথেষ্ট হয়েছে; আর আমার শুনে কায নাই। এসব কথা যদি দেবেন শুনতে পায় কত না কষ্ট পাবে।" দেবেন্দ্র হরলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কাত্যায়নী এই উত্তর পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন; ফুলিতে ফুলিতে চক্ষে কাপড় দিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "যা'কে আপনার ভেবে ভাল কথা বল্‌তে গেলুম, সেই আমার শত্রু হোলো। যত খারাপ আমিই। জানে না ত ছোঁড়াটা ভিজে বেরাল! শেষে টের পাবে আমার কথা ঠিক্, কি ওর বুদ্ধি খানা ঠিক্। আমার যেমন মরণ নেই।" মুহূর্ত্ত মধ্যে দেবেন্দ্রর মধুর মুখখানি কানাইলালের মনে পড়িয়া গেল, ভ্রাতৃজায়ার শেষ করুণ অনুরোধ কাণে বাজিয়া উঠিল। "এমন পাপিষ্ঠার মুখ দেখা উচিত নয়" বলিয়া সেখান হইতে বেগে চলিয়া গেলেন।

কাত্যায়নীও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "এত রাগ থাকবে না। যদি বাপের বেটী হই, পায়ে ধরিয়ে এর প্রতিশোধ নোবো"।

মুরলা পাশের ঘরে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কানাইলাল ব্যবসায় স্থানে চলিয়া গেলেন।

যথা সময়ে পদ্মা মুরলার নিকটে এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে ঘৃণায় অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "তবে বাঁচতে হবে, যে রকম দেখ্‌চি, এই ডাইনীর হাতে দাদারা কষ্ট পাবে। আমি

থাকতে তা' হ'তে দিচ্চিনে।" পরদিন পদ্মার নেত্রে কেহ অশ্রু দেখিতে পায় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

দেবেন্দ্রের পত্নী, পদ্মার এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া মহা সন্দিহান হইল। কাল পর্য্যন্ত যে সারাদিন কাঁদিয়াছে, আজ তার আঁখি শুষ্ক, কণ্ঠ ধীর, অধরে প্রতিজ্ঞা! যদিও এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার প্রভূত আনন্দ, কিন্তু অতিশয় ইচ্ছা যে সে ইহার কারণটা জানিতে পারে। পদ্মাকে কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? আর, তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা ভালও দেখায় না, উচিত ও নয়। দুই যাতার কাছে কোন প্রকার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহারা দু'জনেও বড় বধূরই মত বিস্মিত হইয়াছিল। কাত্যায়নীকে এ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার রুচিও হইল না, সাহসও হইল না। শেষ বড় বধূ আশা করিল যদি মুরলা কিছু জানে। তাহার আশাও অপূর্ণ রহিল না।

মুরলা ত কিছুতেই বলিবে না। কত অনুরোধ মিনতির পর অতি সঙ্কোচে, ভয়বিকম্পিত অধরে সে সকল কথা বলিয়া প্রার্থনা করিল "বড় দিদি, তোমার পায়ে পড়ি এসব কথা কা'কেও বোলো না।" "বড়দিদি"র কাণ তখন এদিকে ছিল না। তাহার সকল ইন্দ্রিয় চিন্তার ভয়ঙ্কর আকার ধরিয়া কোমলহৃদয় টুকুর ভিতর মহাযুদ্ধ লাগাইয়া দিয়াছিল। নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। মনে নিদারুণ ভয়, বুঝি বা এ সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়!

একবার ভাবিল, স্বামীকে এসব শুনাইয়া কষ্ট দিবেন না। কিন্তু তাহাকে না বলিয়া থাকাও অসম্ভব। বস্তুতঃ, সেই রাত্রেই স্বামীকে

সমস্ত সংবাদ যথাযথ শুনাইল। শ্রবণান্তর দেবেন্দ্র, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াও সহজ কণ্ঠে স্ত্রীকে বলিল, "কাকিমা ত তেমন লোক নন্; বোধ হয় ছোট বৌ কি শুন্‌তে কি শুনেছে। যা'হোক তুমি ভেবো না, আর মেজবৌ বা সেজবৌকে কিছু বোলো না।" সে রাত্র তাহার অনেক দুঃস্বপনে কাটিল।

এদিকে ভর্ত্তার নিকট অপমানিতা হইয়া কাত্যায়নীর যে প্রচণ্ড কোপ হইয়াছিল তাহার বোঝাটা দুর্ভাগ্যবশতঃ হরলালের পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূদিগের উপর চতুর্গুণ বেগে পড়িল। এখন হইতে তাঁহার অন্তরের যত্ন হইল, কি সে এদের অপমান করে, কষ্ট দেয়, এবং যে প্রকারে পারে লাঞ্ছনা করে। তাহাদের প্রতি কার্য্যে ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহারা নেহাত সৎস্বভাবা নিতান্ত নিরীহ। কাত্যায়নীর ছোট বড় শত অত্যাচারেও বধুরা সর্ব্বদা নীরব থাকিত। কেবল পদ্মা নিভৃত অন্তরের ক্রোধ বহ্নিতে নিত্য ইন্ধন যোগাইতেছিল। তাহার অন্তঃকরণে একমাত্র চিন্তা অহরহঃ জাগরূক—কেমন করিয়া সংসার কণ্টকের তীক্ষ্ণ বেদনা হইতে সহোদরদিগকে রক্ষা করে।

একদিন কাত্যায়নী চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "বলি, বড় বৌ, এই যে এত গুলি ঝি চাকরে ব'সে ব'সে অন্ন ধ্বংস কচ্চে, এদেব কি দরকার? জান না ত কত কষ্টের ধন। 'ও'র ত জীবনটা খেটে খেটেই গেল! তোমাদের কি বল? পায়ের উপর পা দিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছ।"

বড় বধূ নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "তা মা! তোমার যদি ইচ্ছা হয়ত কতকগুলি লোককে বিদেয় করে দাওনা কেন। সত্যিইত আজ তাঁ'রা দু'জন আমাদের কাঁদায়ে চলে গেলেন! এখন এত লোক জনের কি দরকার?"

কাত্যায়নীকে বধূরা "মা" বলিয়া সম্বোধন করিত। কতকটা নিজ নিজ স্বামীর আদেশ মত, কতকটা তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার মানসে।

কাত্যায়নী এই উত্তরে অপ্রীত না হইয়া বলিলেন, "তুমি একবার দেবেনকে জিজ্ঞাসা কোরো তা'র কি মত হয়। আর 'ঝা'দেরও মত নিয়ো। কলিকালের বৌ অমতে একটা কায ক'রে শেষ কি গালাগালি খাব?"

বড় বধূ সলজ্জ ভাবে বলিল, "উনি বলে রেখেছেন কাকিমা যা করবেন তা'তেই তোমরা রাজী হ'য়ো। আর, ঝা'য়েদের কথা ছেড়ে দিন। তা'রা যেন আমার কথায় উঠে বসে। যেমন ঠাকুরপোরা ভরত লক্ষ্মণের মত তেমনি আমার 'ঝা'য়েরা। ঠাকুরপোরা কত না তপস্যা ক'রে এমন সব বৌ পেয়েছে।"

মিষ্ট কথায় সকলেই তুষ্ট। কাত্যায়নী বড় বধূর নিকট তেমন সুবিধা পাইলেন না। তাহার রাগ রহিল মুরলা আর পদ্মার উপর। দিনকতক পরে কাত্যায়নী পাচককে বিদায় দিলেন। সংসারে সমস্ত কার্য্যভার বধূদের উপর পড়িল।

অনুজেরা এক দিন দেবেন্দ্রের কাছে কাকির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিল। কিন্তু দেবেন্দ্র অবিচলিত ভাবে বলিল, "বাবার শেষ কথা কি ভুলিয়া গিয়াছিস্? কাকিমাকে আমরা যদি মা'র মত না দেখি, তা'হলে কি বাবার অনুরোধ অমান্য করা হ'লো না?"

সোদরদ্বয় আত্ম ঘৃণায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে নীরবে নত মস্তকে সেইখানে বসিয়া পড়িল। মনে ভাবিল, 'দাদার কি উদার হৃদয়, আমরা তাঁহার নিতান্ত অযোগ্য'। তাহারা সেই দিন হইতে আরও সহ্য করিতে শিখিল।

মুরলা প্রতিদিনই শাশুড়ীর নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও স্বভাবের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইল না। পদ্মাকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া থাকিবে? তাহার করুণ মুখখানি মুরলার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সে খালি ভাবিত ভগবানের কাছে ঠাকুরঝি কি এমন অপরাধ করিয়াছে যে তাহার এই নিদারুণ অভিশাপ! তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে পদ্মার সমস্ত যন্ত্রণা টানিয়া লইবার জন্য সতত প্রয়াস।

কিন্তু, কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কাত্যায়নী যখন দেখিলেন মুরলাকে কিছুতেই পারিয়া উঠেন না, তখন তাহাকে কটু কথায় তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। মুরলা একদিন স্পষ্ট উত্তর দিল "ঠাকুরঝির কাছ ছাড়া আমি কোথাও থাকিতে পারিব না।" আর কি রক্ষা আছে? সর্পিনী যেমন পদদলিত হইলে উদ্ধফণা হইয়া শত্রুর অঙ্গে সমস্ত বিষ ঢালিয়া দেয়, তেমনই কাত্যায়নী রোষে গর্জিয়া উঠিয়া তাঁহার বিফল প্রযত্নের সমস্ত বিষ মুরলার উপর ঢালিয়া দিলেন! "এত বড় আস্পর্দ্ধা! মুখের উপর জবাব! তবে মর্"! এই বলিয়া চকিতে হস্তস্থিত পাত্র তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। মুরলা দারুণ আঘাত পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এই শব্দে সকলে কাত্যায়নীর গৃহের দিকে "কি হয়েছে, কি হয়েছে" বলিয়া অগ্রসর হইল। পদ্মার কর্ণে মুরলার কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিবামাত্র ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। সক্রোধে কাকিকে বলিল, "তোমার কি কোন আক্কেল নাই? বুড়ো মাগী হয়ে ছোট বউটাকে কি না বাটি ছুঁড়ে মারলে? পেটের ছেলের বৌ হলে' না জানি কি কত্তে।"

প্রজ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। কাত্যায়নী ঘূর্ণিত নেত্রে বলিলেন, "জানিনুসা কার সঙ্গে কথা কইচিস্ এখনি"—

পদ্মা বাধা দিয়া বলিল, "জানি, যে আমার ভায়েদের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে তা'র সঙ্গে।"

কাত্যায়নী। এখুনি ঝেঁটিয়ে তাড়াব। তিনকুল খুইয়ে পরের ভাত খাচ্চিস্ জানিস্না?

এই গর্ব্বিত উত্তর কাহারও ভাল লাগিল না। বধূরা পদ্মাকে থামাইল না। পদ্মার মুখাগ্রেই উত্তর ছিল, "আমি কি কারুর বাপের পয়সায় ভাত খাই? কত লোকে আমার বাপের পয়সায় খাচ্চে তা' কি ভুলেছে? যদি গরজ পড়ে নিজে বেরিয়ে যাক্।"

কাত্যায়নী এই চান। নিজের ঔষধের ফল ধরিয়াছে জানিয়া অকাট্য অস্ত্র বাহির করিলেন। "আমার মরণ নাই গো" ইত্যাদি ভাষায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র বহির্ব্বাটী হইতে সোদর দ্বয়ের সহিত দ্রুত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই কি পিতার আদেশ পালনের পরিণাম? সকল জানিয়া পদ্মার উপর রাগ হইল না। তত্রাচ পদ্মাকে মৃদু ভৎসনা করিয়া বলিল, "ছি, পদ্মা; এই টুকু আর সহ্য করিতে পারলিনি।" পদ্মা এ তিরস্কার শুনিয়াও শুনিল না। সে দাদার উদার হৃদয় জানিত। সে আপনার প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্বার মনে মনে দৃঢ়তর করিল—"এ পিশাচীর হাত থেকে আমার সোণার ভায়েদের রক্ষা করিবই করিব।" অন্তরের ভালবাসা এমনি নিঃস্বার্থ, এমনি মধুর, এমনি কঠোর!

এতক্ষণ কাত্যায়নীর ক্রন্দন শব্দে গৃহ মুখরিত! দেবেন্দ্র করযোড়ে বলিল, "কাকিমা ক্ষমা কর। পদ্মা তোমারই দুঃখিনী ছোট

মেয়ে। যদি কোন দোষ করে' থাকে, তা'কে মাপ কর।" পদ্মার নাম শুনিয়া "কাকিমা" আরও উচ্চ সুর ধরিলেন!

বহু মিনতির পরও তাঁহাকে থামাইতে না পারিয়া দেবেন্দ্র বিমর্ষ বদনে ফিরিয়া গেল। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিন বধূই ও দেবেন্দ্রের অনুজগণ নীরব রহিল। কেহই কাত্যায়নীর উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না।

একে একে সে ঘর হইতে সকলে বিদায় লইলে, কাত্যায়নী কপাটে অর্গল লাগাইলেন। সে অর্গল আর কেহ খুলাইতে পারিল না। তিন দিন অনাহারে সেই কক্ষে কাত্যায়নী কাটাইলেন। তবে শুনিতে পাই, মুরলা নাকি বলিয়াছিল, ঘরে যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্য ছিল!

দেবেন্দ্র বড়ই চিন্তিত। কোন উপায় না দেখিয়া কাকাকে এই মর্ম্মে একখানি "টেলিগ্রাফ" পাঠাইল "কাকিমার বড় অসুখ। আপনি সত্বর ফিরিয়া আসুন। বিলম্ব করিবেন না।"

চতুর্থ অধ্যায়।

চারি মাস হইল কানাইলাল কর্ম্মস্থানে আসিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা ছিল কাত্যায়নীর আর মুখ দর্শন করিবেন না। কিন্তু সহসা দেবেন্দ্রের টেলিগ্রাফ পাইয়া সব উল্টাইয়া গেল। অন্তরে কত কি কুচিন্তা আসিয়া তাঁহাকে বিমর্ষ করিয়া ফেলিল। পথে কেবল ভাবিলেন কেন কাত্যায়নীকে অপমান করিয়াছিলেন, কেনই বা তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই।

গৃহে পৌছিয়াই কানাইলাল দ্বারবানের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। কিন্তু তখন তাহা খুলিবার অবসর ছিল না। দ্রুতপদে অন্তঃপুরে ছুটিলেন। স্বচক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখেন দ্বার ভিতর হইতে

রুদ্ধ। এদিকে বাড়ীতে কোন সাড়া শব্দ নাই, যেন কেহই নাই! সভয়ে তিনি ডাকিলেন "ঘরে কে?"

কাত্যায়নী তাঁহার কণ্ঠস্বরের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। অর্গল বিমুক্ত করিয়াই পুনর্ব্বার শয্যা গ্রহণ করিলেন। কানাইলাল ত অবাক্। এই কি স্ত্রীর বড় অসুখ! অথচ তাহাকে বড় মলিনা ও শীর্ণা দেখাইতেছিল। কানাইলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ? এরা সব কোথা?" কোন উত্তর নাই! আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কোনও উত্তর নাই। এরূপ অসাময়িক অভিমান কানাই-লালের ভাল লাগিল না। কাহাকেও ডাকিবার জন্য উঠিলেন।

তখন, কাত্যায়নী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "এ সংসারে আর কেন? আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি নিস্তার পাই।" ক্রমে কানাইলাল কাত্যায়নীর অপমানের বিবরণটা তাহারি মুখে হইতে শুনিলেন। তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। বুঝিলেন, তাঁহার আগমন কালে কেহ দেখা দেয় নাই কেন? মনে হইল, কাত্যায়নীর কথাই ঠিক্; দেবেন্দ্র সত্যই "ভিজে বেরাল।" অবশ্য পাঠক মনে করিবেন না যে শ্রীমতী কাত্যায়নী স্বামীকে সমস্ত সত্য কথা বলিয়াছিলেন।

কানাইলাল কম্পিত পদে দেবেন্দ্রের প্রকোষ্ঠাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পত্র খানার কথা মনে পড়াতে তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সেখানা দেবেন্দ্রের পত্র। পত্র পাঠ করিয়া জানিলেন কাত্যায়নী অনেক মিথ্যা বলিয়াছেন। দেবেন্দ্রের উপর তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ও স্নেহ ছিল। পত্রের অন্তভাগে দেখিলেন, দেবেন্দ্র তাঁহাকে 'কাকিমা'র অসুখের নাম করিয়া ফিরাইয়াছেন বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে, আর পদ্মার অপরাধের জন্যও শতবার মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াছে।

এ অবস্থায় কানাইলাল বড় বিপদে পড়িলেন। কাত্যায়নীর কাছে তখনই ফিরিয়া যাওয়া যায় না, আবার দেবেন্দ্রকে কেমন করিয়া কটু কথা বলিবেন! দাদার মুখখানাও বুঝি এই সময়ে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে একটা মৎলব স্থির করিয়া কাত্যায়নীকে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র আমার কাছে অনেক ক'রে মাপ চেয়েছে। আজ আর কিছু বলিয়া কায নাই; দু'চার দিন পরে যা' হয় একটা মীমাংসা করা যা'বে।"

কাত্যায়নীর তত প্রীতি হইল না। তবে স্বামীকে শপথ করাইয়া লইলেন, তিন দিন পরে সমস্ত বিষয় ভাগ করিয়া লইবেন।

প্রতিজ্ঞা মত, তিন দিন পরে, কানাইলাল দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "যে রকম দেখ্‌ছি তোমার কাকিমার সঙ্গে তোমাদের বনিবনাও হ'বেনা। আর আমিও বৃদ্ধ হ'য়ে পড়্‌লুম্‌, কবে মরি তা'র ঠিক্‌ নাই। আমার ইচ্ছা বিষয়টার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দি'। শেষ, আমার মৃত্যুর পর কি একটা 'কেলেঙ্কারি' হবে?"

দেবেন্দ্র অশ্রুপূরিত কণ্ঠে বলিল, 'কাকা! আমি কিছুই জানিনা। যা' ইচ্ছা হয়, করুন। এই সামান্য অপরাধ টুকু ক্ষমা করিলেন না?"

তাহার করুণ ভাষায় কানাইলালের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যেন তাঁহার সম্মুখে হরলালের ভ্রূকুটি কুটিল মুখ জাগিয়া উঠিল। আবার তৎক্ষণাৎ কাত্যায়নীর আদেশ কথা স্মরণ হইল! নিজের উপর ঘৃণাও আসিল। আবার ভাবিলেন, যাহা করিতে আসিয়াছি করিয়া যাই স্ত্রীলোকের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে!

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "দেখ দেবেন, আমিত তোমায় আলাদা ক'রে দিচ্ছিনে; যেমন আছে তেমনি থাকবে। তবে

ভবিষ্যতে কোনও গোলমাল না হয় এই অভিলাষে আমি একটা উইলের মত করে যাচ্চি' এই বলিয়া তাহার হস্তে একখানি কাগজ প্রদান করিলেন।

পদ্মা সেই খানেই ছিল। কাকার কথা শুনিয়া এবং কার্য্য দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে সেই পত্র কাড়িয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং অবজ্ঞা ভরে বলিল, "সমস্ত বিষয় আমার বাবার ; কাহারও ভাগ কর্‌বার বা হস্তগত কর্‌বার অধিকার নাই। পাই পয়সা অবধি আমার দাদারা পাইবে।"

পদ্মার রুক্ষ ভাষায় কানাইলাল অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। "তবে সমস্ত বিষয় মোহিনীর। মাসে মাসে সংসার খরচ মাত্র পাঠিয়ে দিব। মেয়ে মানুষের এত তেজ!" কানাইলাল সরোষে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। আবার ভাবিলেন "ছোঁড়াটা নেহাত ভিজে বেরাল ; তা' না হ'লে পদ্মাকে কিছু বলে না?" দেবেন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িল।

মুরলাকে পিতৃ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া কানাইলাল সস্ত্রীক সেই দিনই ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মোহিনীমোহন এসব কাণ্ডের কিছুই জানিল না। তখন তাহার শেষ পরীক্ষা বলিয়া কানাইলাল তাহাকে কিছু জানায় নাই। দেবেন্দ্রই মোহিনীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পত্র লিখিত ; কিন্তু এক খানাতেও এই গৃহ বিশৃঙ্খলের বিষয় তাহাকে কিছুই জানাইয়া কষ্ট দেয় নাই।

ইহার দুই মাস পরে মোহিনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে ফিরিল। তখন আর তাহার কাছে কোন কথা গুপ্ত রাখা বৃথা। মোহিনী

পদ্মার কাছে ব্যাপার শুনিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া মুরলার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। পদ্মার কালোচিত ব্যবহারে মোহিনী অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল।

পিতার আচরণে ব্যথিত হৃদয় মোহিনীমোহন মুরলার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে এই দু'মাসে তাহার পিতা সংসার খরচের জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছেন তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। মোহিনী স্বয়ং এই টাকা উপার্জ্জন করিয়া যত শীঘ্র পারে পিতার কাছে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু মুরলার বাসনা যে তাহার নিজের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া এখনই সে টাকা ফেরৎ পাঠায়। এই ভাবিয়া সে স্বামীকে বলিল—"আমার মতে এ টাকা গুলো আমার গহনা বন্ধক রেখে এখনই তা'দের পাঠিয়ে দেওয়া হোক্। আবার তুমি উপায় ক'রে খালাস ক'রে এনো।"

মুরলার কথা শুনিয়া মোহিনীমোহন তাহার মুখপানে প্রশংসমান চক্ষে চাহিয়া রহিল। হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সব স্থির করিয়া মোহিনী পিতাকে পত্র লিখিল!—

বাবা,

দাদাদের সহিত আপনার আচরণে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আজ যদি আমার মাতা জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। আপনি কি জ্যেষ্ঠতাতকে এত শীঘ্র ভুলিলেন? এই কি তাঁহার অসীম ভালবাসার প্রতিদান? দাদাদের বঞ্চিত করিয়া আপনি আমাকে তুচ্ছ ধনদানে সুখী করিতে অভিলাষী? তাহা যদি আশা করিয়া থাকেন, সে আশা ত্যাগ করুন। এক পয়সাও আমি গ্রহণ করিব না। যে টাকা পাঠাইয়া দাদাদের দু'মাস সাহায্য করিয়াছেন তাহা ফেরৎ পাঠাইলাম।

ভবিষ্যতে আর পাঠাইবেন না। আমি উপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইব। তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দিব না।

আমার মতে পৃথিবীর সর্ব্ব পদার্থ হইতে ধর্ম্ম বড়। আর পুরুষের মানুষ হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন। ইতি

অযোগ্য পুত্র

মোহিনী।

ইহার মধ্যে মোহিনীমোহন পিতার নিকট হইতে নিম্নপ্রদত্ত পত্র উত্তরস্বরূপ পাইল।

বৎস,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আজ আমি জানিতেছি তুমি আমার অযোগ্য পুত্র নও—তুমি যোগ্যতম। যে মোহে পড়িয়া আমি ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, দয়ায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, তোমার পত্র আমাকে সেই মোহ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। আজ পদ্মা সুন্দর, দেবেন্দ্র সুন্দর, তোমরা সকলেই সুন্দর। পদ্মা আমাকে মোহ নিদ্রা হইতে জাগাইয়াছিল, আজ তুমি আমাকে পুরুষ করিলে। আজ আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে আজ আমি পুনর্ব্বার তোমাদের—আমি নির্ব্বিকার। সত্যই, আজ আমি দেবেন্দ্র পদ্মার যোগ্য পিতৃব্য; আজ অক্ষয় মহত্ত্বে গৌরবান্বিত তোমার জনক। বাপ্ আমার আজ আমি মানুষ।

নিত্য মঙ্গল প্রার্থী

তোমার পিতা।

কাত্যায়নীর এসব কিছুই ভাল লাগিল না। পতির অকস্মাৎ ভাবান্তরে হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। কানাইলালও তাঁহার ব্যথা অপনোদন করিতে যত্ন করিলেন না। নিত্য নিগ্রহ ভোগ করা তাঁহার

পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের বিষে নিজে জর্জ্জরিত হইয়া কাত্যায়নী হঠাৎ একদিন কলেরায় প্রাণত্যাগ করিলেন। পদ্মা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল কিন্তু এ সংবাদে তাহার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। লুকাইয়া কত দিন কাঁদিয়াছিল।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম।

(৩)

শ্রীভাগবতী ভক্তির স্বরূপ এবং গুণ এক্ষণে বিবৃত করা যাইতেছে। এই ভক্তি স্বতঃই সুখরূপা, ফলানুসন্ধান রহিতা ও অপ্রতিহতা; অর্থাৎ ঐ ভক্তির সুখ দুঃখদ অন্য পদার্থের সংস্পর্শ রহিত, অর্থাৎ সংসারিক কোন বিঘ্ন বিপত্তি ইহাকে বাধা দিতে পারে না। ঐ ভগবৎ কথা শ্রবণাদি রুচি লক্ষণা ভক্তি উদিত হইলে তদ্দ্বারাই শ্রবণাদি লক্ষণ সাধন ভক্তি যোগ প্রবর্ত্তিত হয়।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ"।

অর্থাৎ শ্রীভগবানে যাহার অহৈতুকী ভক্তি জন্মে, জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত ভগবৎ পার্শ্বদরূপ দেবতাগণ সেই ভক্তের শরীরে আসিয়া অবস্থান করেন" এই ভাগবৎ শ্লোকাংশানুসারে জানা যাইতেছে যে ভগবৎ স্বরূপাদির জ্ঞান এবং তদ্‌ব্যতিরিক্ত পদার্থ মাত্রে বৈরাগ্য, ঐ ভক্তির অনুগামী হইয়া থাকে। তথাচোক্তং

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তি যোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানাঞ্চ যদহৈতুকং॥

শ্রীমদ্ভাগবত ॥১।২অ॥

যদি বলেন "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা ন্যাশকেন" অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে বেদধ্যয়ন যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং সন্ন্যাস দ্বারা ব্রাহ্মণেরা জানিতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মচারির ধর্ম্ম বেদধ্যয়ন, গৃহস্থের ধর্ম্ম যজ্ঞ এবং দান বানপ্রস্থির ধর্ম্ম তপস্যা, এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম সর্ব্বত্রানাসক্তি রূপ বৈরাগ্য। উক্ত চতুরাশ্রম বিহিত ধর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণেরা পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম যে জ্ঞানের অঙ্গ, অর্থাৎ জ্ঞান সাধন, ইহা প্রসিদ্ধ। তবে কিরূপে এই সকল আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম ভক্তির সাধন বা কারণ হয়? উপরোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারাই এই আশঙ্কার পরিহার হইয়াছে; ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে আশু অর্থাৎ শ্রবণাদির কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান মাত্রেই বৈরাগ্য এবং শুষ্ক তর্কাদির অগোচর উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবদ্বিষয়ক যে জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানের যে অনুভব তাহা এক মাত্র বেদ এবং বেদানুযায়ী শাস্ত্রের দ্বারাই পরোক্ষরূপে উদিত হইয়া, পরে ঐ শাস্ত্রোক্ত সাধনের দ্বারা ঐ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানের অপরোক্ষানুভব অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবানের স্বরূপাদি পরে বিচারিত হইবে। এক্ষণে ঐ তত্ত্বের পরিজ্ঞানে শুষ্ক তর্কাদি যে পরাহত হয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি:—

শাস্ত্রানুকুল তর্ক ব্যতিরিক্ত লৌকিক যুক্তিকেই শুষ্ক তর্ক বলা যায়। ঐ তর্ক রস স্বরূপ পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে না পারায় উহাকে শুষ্ক অর্থাৎ নীরস তর্ক বলা যায়। উক্তবিধ তর্ক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষ চতুষ্টয় দুষ্ট। সাংসারিক মনুষ্যমাত্রের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, চেষ্টা এবং ঐতিহ্য

নামক যে প্রামাণাষ্ঠক প্রসিদ্ধ আছে তদ্দ্বারা লৌকিক পদার্থ নিচয়ের তত্ত্ব কথঞ্চিৎ রূপে নির্ণীত হইলেও ঐ প্রমাণ নিচয় অলৌকিক পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞানে একেবারে অসমর্থ হয়। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং মন বুদ্ধিরূপ অন্তরিন্দ্রিয় লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের আশ্রয়। রূপ জ্ঞানের আশ্রয়, যে চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহা কাঁচ, কামলাদি রোগে অভিভূত হইলে শুক্ল নীলাদি বস্তু সকল পীতবর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয়, সুতরাং এতদ্রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাদিকে কিরূপে প্রমাণ বলা যাইতে পারে? এইরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় রোগবিশেষ দ্বারা দুষ্ট হইলে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় বিষয় পরিজ্ঞানে যে অপটুতা জন্মে, ইহারই নাম করণাপাটব। সাংসারিক মনুষ্য সকল নিয়তই ভ্রম প্রমাদের অধীন। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের যে অন্যথা প্রতীতি, তাহার নাম ভ্রম, যথা শুক্তিতে রজত ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম ইত্যাদি। পদার্থের স্বরূপানুসন্ধানে যে অনবহিতা অর্থাৎ অন্যমনস্কতা, তাহারই নাম প্রমাদ, যথা চক্ষুর অগ্রেতে রামদাস চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারা গেল না। পথে চলিতে চলিতে গর্ত্তে পতিত হওয়া ইত্যাদি প্রমাদ মূলক। লোক মাত্রই কোন প্রকার স্বার্থের বশতাপন্ন হইয়া পরবঞ্চনের যে ইচ্ছা করে, তাহারই নাম বিপ্রলিপ্সা। এই বিপ্রলিপ্সা দোষবশতঃই কোন অর্ব্বাচীন পণ্ডিত কিঞ্চিন্মাত্র ধন প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রীয় বিধির অপলাপ পূর্ব্বক স্বকপোল কল্পিত ব্যবস্থার দ্বারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তির প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বাচ্য হইতে পারে না।

অপিচ—ইন্দ্রিয়ের অতীত যে পদার্থ তাহাতে ইন্দ্রিয় জনিত প্রমাণ অকিঞ্চিৎকর। আত্মা, পরমাত্মা পরব্রহ্ম ও ভগবান মন বাক্যের অগোচর। সুতরাং লৌকিক শব্দ ও অনুমানের অবিষয়ক। যদি বলেন বেদাদি শাস্ত্র সকলও বাঙ্ময় এবং তাহাও বিশেষ বিশেষ

ব্যক্তির দ্বারাই সময় বিশেষে পরিকল্পিত হইয়াছে, অতএব তদ্দ্বারাই বা কিরূপে অলৌকিক পদার্থ নির্ণয় করিতে পারা যায়? এতদুত্তরে আমরা বলিতেছি যে, বেদাদি শাস্ত্র সকল অপৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্যাদির দ্বারা রচিত নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, শ্রীভগবানের নিশ্বাস প্রবাহিত।

সংসারাবিষ্ট মানবগণের বুদ্ধিকে অলৌকিক পদার্থে প্রবেশ করাইতে বেদাদি শাস্ত্র সকল কতকগুলি ঐকদেশিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে বেদকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াছেন, কোথাও বা নারায়ণের নিশ্বাস বলিয়াছেন। পরমেশ্বরের স্বরূপ দ্বিবিধ, যথা শব্দ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম। তন্মধ্যে শব্দ ব্রহ্মই বেদাদি শাস্ত্র, আর পরব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ লক্ষণ পরামার্থ তত্ত্ব। বেদাদি শাস্ত্র সকল যে পরমেশ্বরের ন্যায় অনাদি সিদ্ধ, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

যাহারা বেদাদি শাস্ত্র সকলকে বিশেষ বিশেষ পুরুষ দ্বারা রচিত বলিয়া কল্পনা করেন, তাহাদিগের নিকট আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে কোন কোন সময়ে কোন কোন ব্যক্তি ঐ বেদ সকল রচনা করেন? কোন কোন নাস্তিক (অবৈদিক বা বেদে অনাস্থাবান) বলেন ঋগ, বেদের বয়স চারি সহস্র বর্ষ। কঠাদি ঋষিগণই বেদের প্রণেতা। তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য এই, বেদের পরমায়ু যে চারি সহস্র বৎসর তাহার প্রমাণ কি? চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বা তৎপূর্ব্বোবর্ত্তী লোকদিকের চরিত্রাদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, তাহারা নিতান্ত অসভ্য বা বর্ব্বর ছিল। তৎকালে লিপিকরণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল না। সুতরাং তৎকালবর্ত্তী লোক মাত্রই লেখা পড়া জানিত না। যাহারা লেখা পড়া আদৌ জানিত না, তাহারা কি লৌকিক কি অলৌকিক পদার্থ মাত্রেরই বিচারে

একেবারে অনভিজ্ঞ থাকাই সম্ভবপর। তবে লোকের তদ্রূপ অজ্ঞাবস্থায় বিবিধ রাগ রাগিণী সংগঠিত এবং লৌকিক অলৌকিক পদার্থ সমূহের অত্যাশ্চর্য্য বিচার ও সিদ্ধান্ত মূলক ঋগবেদাদি শাস্ত্র সকল কাহার দ্বারা বিরচিত হইল?

শ্রীবসন্তলাল মিত্র,
শ্রীবৃন্দাবন।

বিলাতের পত্র।

তোমাদের "প্রয়াস" নিয়মিত পাইতেছি। আমি প্রয়াসকে আমার স্বদেশীয় বন্ধু জ্ঞানে প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া থাকি। যখন নিশ্চিন্ত মনে "প্রয়াস" পাঠ করি তখন মনে হয় যেন তোমাদের সঙ্গ সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু "প্রয়াসে" আমাকে লিখিতে বলা বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি আমাকে বিলাত-ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে বলিয়াছ কিন্তু সেরূপ লেখায় কোনও ফল নাই, আর গুছাইয়া লিখিবার শক্তিও আমার বড় কম,—বিশেষতঃ যাহা সাধারণে প্রকাশিত হইবে। তা'ছাড়া আমরা যেখানেই যাই না কেন কেবল চক্ষের দেখা দেখি বই ত না, অভিজ্ঞতা লাভের শক্তি কোথায়?

মনে পড়ে কি? আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক সাহেব বড় দিনের ছুটিতে দক্ষিণ ভারতে বেড়াইয়া আমাদের নিকট যখন তাঁহার সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি আমাদের এই শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশের সম্বন্ধে কেমন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন? শীতের সময় ধান কাটা শেষ হইলে পর শস্যহীন বঙ্গীয় উর্ব্বর মাঠ গুলি যে সাহেবের চক্ষে মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে তাহা

আর বিচিত্র কি—এবং তজ্জন্য বাঙ্গালীর ছেলের নিকট মহারাষ্ট্রাদি দেশের তুলনায় বঙ্গদেশকে মরুভূমি বলিতে তাঁহার আদৌ সঙ্কোচ আসে নাই। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার এই কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই তখন তিনি কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমাদের তুষ্ট করিবার নিমিত্ত অগত্যা কোন বিখ্যাত পর্য্যটক লিখিত একখানি পুস্তক হইতে বোম্বাই নগর বৃত্তান্ত শুনাইয়া আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করেন। আমাকে কি তুমি সেইরূপ বিপদে ফেলিতে চাও? একান্তই যদি না ছাড় তাহা হইলে আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে তুমি কোন বাঙ্গালি লিখিত বিলাত-ভ্রমণ পুস্তক আমার লেখা মনে করিয়া পাঠ করিও, ও আমাকে লেখার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিও।

এবার তোমাকে পত্র লিখিতে অযথা বিলম্ব হইয়াছে কারণ আমি এখানে ছিলাম না। দিন পনর হইল মিঃ 'এ' লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী তাঁহার দেশে আমাকে লইয়া যান। প্রবাসী বন্ধুদিগের মধ্যে যে মিঃ 'এ'র সহিত সর্ব্বাপেক্ষা সখ্যভাব জন্মিয়াছে তাহা তুমি পূর্ব্ব পত্রেই অবগত হইয়াছ। আমি সেখানে কয়েক দিন সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সেই সময়ে একদিন মিঃ 'এ' তাঁহার প্রতিবেশী স্যার 'টি'কে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন। স্যার 'টি' নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে তাঁহার বাটীতে আসিলে মিঃ 'এ' স্যার 'টি'র সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। স্যার 'টি' অতি উদার প্রকৃতি ও মিষ্ট ভাষী। তিনি আমার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ক কথাবার্ত্তা কন। পর দিবস স্যার 'টি' আবার মিঃ 'এ' ও আমাকে সাপারের (Supper) নিমন্ত্রণ করেন। এই দিবস সায়াহ্ণে আমার লণ্ডনে ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু মিঃ 'এ' আমাকে 'সাপারের' খাওয়ার জন্য অনুরোধ করায় অগত্যা তৎপর দিবস প্রত্যুষে লণ্ডন যাত্রা করিলাম। কিন্তু

এই অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া আমার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাই আজ তোমাকে বলিব।

মিঃ 'এ' আমাকে বিদেশী দেখিয়া সরলতার সহিত নিমন্ত্রণ রক্ষা বিষয়ক প্রচলিত প্রথা সকল প্রসঙ্গ ক্রমে আমার নিকট বলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে যথা সময়ে মিঃ 'এ' ও আমি স্যার 'টি'র সদনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। একই রূপ সজ্জায় সজ্জিত পরিচারকগণ আমাদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া লাইব্রেরী গৃহে লইয়া গেল। অভ্যস্ত প্রথা মত কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া দ্বারস্থিতা লেডি 'এফ্'কে মিঃ 'এ' মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অভিবাদন করিলেন। আমিও তাঁহার মত পিছু হটিতে গিয়া বিভ্রাটে পড়িলাম। আমার পশ্চাতে বৃদ্ধ স্যার 'টি' দাঁড়াইয়া আছেন তাহা আমি জানিতাম না। যেমন পশ্চাৎ হটিয়া লেডি 'এফ্'কে অভিবাদন করিতে যাইব অমনি বৃদ্ধ স্যার 'টি'র বাতাক্রান্ত পদাঙ্গুষ্ট মাড়াইয়া ফেলিলাম। যদিও তাঁহাকে বিলক্ষণ লাগিয়া ছিল তথাপি তিনি ধীরতার সহিত হাস্য বদনে তাহা সহ্য করিলেন। আমি কিন্তু এই প্রথম সম্ভাষণ-বিভ্রাটে বিমর্ষ হইলাম। গৃহে প্রবেশ করিবার পর স্যার 'টি' ও তাঁহার পত্নী লেডি 'এফ' যত্ন সহকারে আমাদিগকে চেয়ারে বসি তে বলিলেন; পরে স্যার 'টি' আমাকে তাঁহার পত্নী, পুত্র, ও কন্যাগণের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। পরস্পর কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। আমি প্রথমে চুপ করিয়া বসিয়া গৃহের সাজ সজ্জা দেখিতেছিলাম। যে দিকেই দেখি, সুরঞ্জিত স্বর্ণাক্ষর খোদিত 'মরক্কো লেদারে' বাঁধান গ্রন্থপূর্ণ গ্লাসকেস, বড় বড় লোকের চিত্র ও নানাবিধ আসবাবে গৃহটী পরিপূর্ণ ও সুসজ্জিত। কেবল যে গ্রীক্, লাটিন, ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদি দেখিলাম তাহা নহে বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি ও তথায় সন্নিবেশিত দেখিলাম।

একথা সেকথার পর ও প্রসঙ্গ ক্রমে সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার কথা উঠিল। আমি মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বিষয় যাহা বলিলাম দেখিলাম তাহাই স্যার 'টি'রও মতানুযায়ী হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনি যদিও সংস্কৃত জানেন না তথাপি এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ বিশেষ করিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সম্মুখের আলমারীর মধ্যে গেটের গ্রন্থাবলী দেখিয়া তাহা হইতে "শকুন্তলা" পদ্যটী পড়িতে বড় ইচ্ছা হইল এবং ঐ পুস্তকগ্রহণমানসে আসন হইতে উঠিলাম ভদ্রতার খাতিরে স্যার 'টি'ও উঠিলেন এবং পুস্তক খানি স্বয়ং পাড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি ঔৎসুকাতিশয্য বশতঃ তাঁহাকে বাধা দিয়া স্বয়ং যেমন গ্রন্থখানি পাড়িতে যাইব, স্বর্ণাক্ষর খোদিত, সুরঞ্জিত মলাট খানি আমার হস্তে রহিল এবং পুস্তকের পরিবর্ত্তে পুস্তকাকৃতি একখানা কাঠ মলাট চ্যুত হইয়া টেবিলস্থিত দোয়াতের উপর পড়িয়া গেল। এবং দোয়াতও উল্টাইয়া কালি পড়িয়া গেল স্যার 'টি' কিছু অপ্রতিভ হইলেন। আমিও যে আমার হটকারিতা নিবন্ধন কিছু বিমর্ষ হইলাম না তাহা নহে ; যাহা হউক আমাকে বিমর্ষ দেখিয়া স্যার 'টি' বলিলেন ইহাতে ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু আমি দেখিলাম টেবিলের কালি নিম্নস্থ বহুমুল্য কার্পেটের উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। সুতরাং নিকটে কিছু না পাইয়া পকেট হইতে রুমাল লইয়া টেবিলের কালি মুছিয়া ফেলিলাম ; ফলে আমার রুমাল খানি কালিতে জব্ জব্ করিতে লাগিল। কিন্তু সভ্যতার খাতিরে অগত্যা তাহাকে পকেটে স্থান দিতে হইল—জানিয়া শুনিয়া কোট্টাও মাটী করিতে লাগিলাম। এই দুর্ঘটনা শেষ হইতে না হইতে 'সাপারের' ঘণ্টা বাজিল। সকলে ভোজন গৃহে প্রবেশ করিলাম।

যদিও এই ঘটনায় আমার মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তথাপি ইহার পরেই 'সপারের' সময় হওয়াতে মনের বিমর্ষতার কিছু পরিবর্ত্তন বা হ্রাস হইল। স্যার 'টি' ও তদীয় পত্নী, সকলকে বসাইয়া আপনারাও ভোজনে বসিলেন। আমার এক পার্শ্বে মিঃ 'এ' ও অপর পার্শ্বে স্যার 'টি'র জ্যেষ্ঠ কন্যা মিস্ 'এস্' বসিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলাম এই ভোজন ব্যাপারটা বেশ হুঁশিয়ারের সহিত শেষ করিব কিন্তু সেদিন বিধি আমার প্রতি নিতান্তই বাম ছিলেন।

সকলের ন্যায় আমিও ছুরী, কাঁটা, চামচ ইত্যাদির সাহায্যে আহার করিতে লাগিলাম ; গল্পও বেশ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে মিস্ এস্ আমার ওয়েষ্ট কোটের ও চেনের সুখ্যাতি করিলেন আমি যেমন তাঁহাকে compliment দিতে যাইব আমার হাত লাগিয়া সম্মুখস্থ সুপপূর্ণ প্লেট উল্টাইয়া পেণ্টেলুনের উপর সমস্ত গরম ঝোল পড়িয়া গেল ও আমার উরুদেশ ও পা যেন ঝলসাইয়া গেল। মুখ সিঁটকাইলাম বটে কিন্তু চীৎকার করিলাম না। স্যার 'টি'র অঙ্গুলী মাড়াইলে ধীরতার সহিত তিনি তাহা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল সুতরাং উৎকট যন্ত্রণা চাপিয়া গেলাম। মিস্ 'এস্' আমার কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করিলেন বটে কিন্তু কাষ্ঠ হাঁসি হাসিয়া আমি তাহাকে ভুলাইলাম। ইহার পর চিত্ত বিভ্রম বশতঃ লবণ লইতে মরীচের গুঁড়া, শরিষার গুঁড়া লইতে লবণ লইতে লাগিলাম। আমি আমার নিবুদ্ধিতা যথাসাধ্য গোপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু ভাই কপাল যা'র মন্দ বিপদ তার পদে পদে মিস্ 'এস্' রোষ্ট করা হংস কাটিবার জন্য আমার সাহায্য চাহিলেন তখন আমার চামচে কিছু সুস্বাদু চাট্নি ছিল ; চাট্নী বড় গরম হইলেও বিস্মৃতি বশতঃ মনে করিলাম চাট্নী উদরস্থ করিয়াই মিস্ 'এস্'এর প্রার্থনা পূরণ করিব। কিন্তু চাট্নী মুখে দিবামাত্র বোধ হইল যেন তপ্তাঙ্গার মুখে

পড়িল, ফেলিতে পারি না কারণ তাহা সভ্যতাবিরুদ্ধ। অথচ না ফেলিলেও নয় সুতরাং দুই হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিলাম কিন্তু সে জ্বালা কি সহ্য করা যায়; অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বতঃই চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সকলেই আমার দুরবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন সকলেই একটা না একটা ঔষধ দিতে বলিলেন; কেহ বলিলেন জল দ্বারা জ্বালা কমিবে; কেহ অলিভ অয়েলের ব্যবস্থা করিলেন। পরিশেষে স্থির হইল যে স্পিরিটই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঔষধ। স্যার 'টি' butlerকে এক গ্লাস শেরি আনিতে বলিলেন। কিন্তু ভ্রম বশতঃই হউক অথবা ইচ্ছা করিয়াই হউক শেরির পরিবর্ত্তে একগ্লাস উগ্র ব্রাণ্ডি আমার হস্তে দিল আমিও অমনি গলাধঃকরণ করিলাম, মুখও দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। পাছে মুখ হইতে ব্রাণ্ডি বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে দুই হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিলাম; কিন্তু চাপিলে কি হইবে! নাক মুখ দিয়া ব্রাণ্ডির ফোয়ারা উঠিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। স্যার 'টি' ব্যতীত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বৃথা স্যার 'টি' সকলকে নিরস্ত হইতে বলিলেন; বৃথা বট্লারকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; আমার যন্ত্রণা কিছু মাত্রও কমিল না। অনন্যোপায় হইয়া পকেট হইতে রুমাল লইয়া মুখ মুছিতে লাগিলাম। আবার বিকট হাস্য রোল ভোজন গৃহ ভেদ করিয়া উঠিল। এবারে স্যার 'টি'ও তাহাতে যোগ দিলেন। কিন্তু সেই চিরসহিষ্ণু বৃদ্ধেরও কেন ধৈর্য্য চ্যুত হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার তখন প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিলাম ও আসিবার সময় মিঃ 'এ'র কাণে কাণে বলিয়া আসিলাম যে পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা

করিতেছি। এইরূপে ভোজন গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলাম। আসিবার সময় 'ড্রয়িং রুমে' আর্‌সিখানা আলোকে ঝক্ মক্ করিতেছিল। তাহাতে আমার মুখ মণ্ডলের ছায়া দেখিতে পাইলাম। সেই মুখ দেখিয়া আমারও হাসি আসিয়াছিল এবং বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কেন বিকট হাস্য রোল বৃদ্ধরও সহিষ্ণুতা ভঙ্গ করিয়াছিল। তোমাকে হয়ত বলিতে হইবে না যে আমি তখন অসহ্য যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া সেই রুমালের যত কালি মুখে মাখিয়া কিম্ভূত কিমাকার সাজিয়াছিলাম। তখন মনোমধ্যে আত্ম বিলাপ হইল যে—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে
সাগর লজ্জিয়া শুধু লাভ মাত্র পোড়া মুখ, দেখাব কেমনে।"

বাহিরে আসিয়া মুখ খানা ভাল করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিলাম। প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই মিঃ 'এ' বাগানে আসিয়া দেখা দিলেন। আমি তাঁহার সহিত নির্ব্বাক ছায়ার মত চলিলাম। অতি প্রত্যুষে বাটীর কেহ না জাগিতে জাগিতে মিঃ 'এ'র নিকট বিদায় লইয়া হাঁপছাড়িয়া বাঁচিলাম। পরে যথা সময়ে লণ্ডনে পৌঁছিলাম।

গোধূলী।

(৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত)

নীল আকাশ মাজে আধ শশী শোভা পায়,
ঈষৎ-গোলাপী মেঘ ঘেরিয়া রয়েছে তায়।
উচেনীচে তরঙ্গিয়া ভাসিছে শকুন সব,
চাতকেরা উড়ে উড়ে করে কিবা কলরব।
কাল মেঘে ঢাকা আছে আরক্ত রবির কায়া,
আধই সোনার আলো আধ আধ কাল ছায়া।
দিগন্তে রয়েছে ঘিরে মেঘের ধবলা গিরি,
সোনার শিখর তার দেখি আমি ফিরি ফিরি।

হোথায় যেগুনি মেঘ পরী যেন উড়ে যায়,
ছড়ায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওড়না গায়।
মগন তপন কাছে ধূমল আবরি ওঠে,
কিবে তার বুক ব'য়ে লাল লাল নদী ছোটে।
অতি স্নিগ্ধ রূপবতী প্রাচী দিগঙ্গনা রাণী
নীল বসনে কিবে ঢেকেছে আনন খানি!
বায়স বাসার দিকে ঝটপট ছুটে যায়,
পেচক কোটর থেকে এদিক উদিক চায়।

লেভেনিয়া শৈল।

সিংহল দর্শন।

(৺প্রমীলা নাগ বিরচিত)।

সিংহলের রাজধানী কলম্বো সহরের অনতিদূরে সমুদ্রতীরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত, নাম মাউণ্ট লেভেনিয়া। কথিত আছে এখানকার কোনও ভূত পূর্ব্ব গভর্ণরের পত্নীর নামে এই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। মাউণ্ট লেভেনিয়া একটী সৌন্দর্য্যময় গিরি প্রদেশ। Grand Hotel পান্থনিবাসের ত্রিতল প্রাসাদ মস্তকে লইয়া ইহার অগ্রভাগ অন্তরীপের ন্যায় সমুদ্রোপরি স্থাপিত। আশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলরাজি বারি তটে মস্তক তুলিয়া লেভেনিয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুভ্র ফেণ পুষ্পরাজি উপহার লইয়া তরঙ্গমালা নিশি দিন শৈল শিরে লুটাইয়া পড়িতেছে। সম্মুখে দিগন্তব্যাপী সুনীল সিন্ধু লেভেনিয়ার পদ প্রক্ষালন করিয়া, বহিয়া যাইতেছে। পার্শ্বে পর্ব্বততলে সুদূর ব্যাপী নারিকেল তরু বেষ্টিত বেলা ভূমি, বেলাভূমির এক পার্শ্বে সুশ্যামল তরঙ্গায়িত সমতল ভূমি। নারিকেল তরুর ছায়ার মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র শোভাময় কুঞ্জকুটীর। Grand Hotel এর সম্মুখ ভাগের এক দিকে সৈন্যগণের আবাস স্থান। অপর পার্শ্বে লেভেনিয়া ষ্টেশনে দিবারাত্র অগণিত যাত্রীদল বুকে লইয়া পর্ব্বত তল কম্পিত করিয়া, সমুদ্রের ধার দিয়া বাষ্পীয় রথ চলিয়া যায়। ইহা ভিন্ন লেভেনিয়া নিস্তব্ধ নীরব, সহরের কোলাহল বাজারের গণ্ডগোল এখানে নাই। শোভাময়ী প্রকৃতির চির আবাস ভূমি। প্রাতে সন্ধ্যায় লেভেনিয়ার ক্ষুদ্র দেহ সুসজ্জিত করিয়া প্রকৃতি অভিনব মূর্ত্তিধারণ করে। প্রাতে তরঙ্গায়িত সুনীল সিন্ধু আরও গাঢ় নীল

করিয়া উপরে সূর্য্যদেব উদীয়মান হন, নারিকেল তরু শিরে স্বর্ণ কিরণ ঝিকিমিকি করিতে থাকে, শীতল পবন ভরে ঈষদান্দোলিত পত্র রাজি একদিকে নত হইয়া যেন সমুদ্র চরণে প্রণত হইতে থাকে, সিন্ধু তখন শান্ত স্থির মূর্ত্তিতে অশ্রান্ত গতিকে বাহিয়া যান, সীমা শূন্য সুনীলবুকে দূরে দিগন্ত সীমায় সুনীলাকাশ ঢলিয়া পড়িয়াছে, সাগরের চঞ্চল তরঙ্গময় অশ্রান্তগতি, আকাশের নিথর নিষ্কম্প অলসভাব, সাম্য ও চাঞ্চল্যের এই মহান মিলন পৃথিবীকে যেন নীরবে কি শিক্ষা দান করে। নীলাকাশ ও সুনীল সাগরের মিলন স্থলে সুনিপুণ চিত্রকরের গাঢ় নীল রেখায় অঙ্কিত প্রকৃতির কি মনোহর চিত্র!

দিবাবসানে লেভেনিয়া সমুদ্র সৈকত হইতে প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর। সম্মুখে সুদূরব্যাপী মহান সমুদ্র, উপরে রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড আকাশ উভয়ের মিলন স্থলে সুদূরে সুদীর্ঘ রক্তবর্ণ মণ্ডলাকারে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে সলিল গর্ভে নামিতেছেন কি সৌন্দর্য্য! একটু, একটু, করিয়া ধীরে ধীরে স্বর্ণথালাখানি নীলজলে ডুবিয়া যায় স্বর্ণ কিরণ ঝিকিমিকি করিয়া তখনও তরঙ্গ শিরে খেলিতে থাকে; দূরে এই দৃশ্য, সম্মুখে পদতলে বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া সমুদ্রতরঙ্গ গভীর গর্জ্জনে আছাড়িয়া পড়িতেছে। এক পার্শ্বে উন্নত সমুদ্রোপরিস্থ গিরিশিরে লেভেনিয়া হোটেল ক্ষুদ্র ক্রীড়াগারের ন্যায় শোভা পাইতেছে, অপর পার্শে কলম্বো সহরের অগ্রভাগে গগণ স্পর্শী আলোক ধাম (Light house)। *

*এই বর্ণনাটী স্বর্গীয়া লেখিকার একখানি নোট বইয়ের দুইটী বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য লেখিকা ইহা মুদ্রাঙ্কনের উপযোগী করিয়া রাখিয়া যান নাই। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ দর্শন প্রসূত গদ্য কাব্য-চিত্রটী কবির রচনানুরাগিগণের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত হইল। সা-সে-স।

ফুলের সাজি।

রেখে গেছে।

আঁধারে ডুবিয়াছে
আঁখির ধ্রুব তারা
আমারে করিয়াছে
আকুল দিশে হারা।

মরত মরু ভূমে
মরম হীন বল
এখনও তারি প্রেমে
নয়ন ছল ছল

কোথা সে গেছে চলে
না জানি কোন দেশে
ঘুমায়ে ছিনু বলে
আমি গো মোহ বশে

আমারে দিয়ে ফাঁকি
মায়ার জাল কেটে
গেছে সে রেখে বাকি
ছবিটি হৃদি পটে

গানতো থেমে গেছে
এখনও তারি রেশ
স্মৃতিতে বাজিতেছে
হল না আজিও শেষ।

শুকায়ে গেছে ফুল
সুবাস শুধু তার
হয়নি আজও ভুল
পেতেছি অনিবার।

শ্রীসরোজ নাথ ঠাকুর।

অতিথি।

যৌবন-সন্ধ্যায় আজি অতিথির বেশে,
তোমার হৃদয় দ্বারে এসেছি সুন্দরি!
আনন্দ-প্লাবিত ওই প্রণয়-প্রদেশে,
চিরতৃষা-পিপাসিত প্রেমের ভিখারী;
পরশি' কুসুম বন বায়ু বহে যায়,
নীরব হিয়ার বহি' শত অভিমান,
শিহরে অবশ প্রাণ সুখের নেশায়,
মুরছি পড়িছে তায় যামিনীর তান।
এস সখি! ভিক্ষা দাও, বেলা বেড়ে ওঠে,
মরমে গুমরি উঠে মিলন ঝঙ্কার;
আজ তব হৃদি মাঝে, সব জ্বালা টুটে,
ডুবে র'ব; শুয়ে ল'ব সোহাগ পাথার;
দীনা হীনা বিমলিনা ক্ষীণা আশা লয়ে,
আসিয়াছি প্রেম তব দিবে নাকি প্রিয়ে?

শ্রীগিরিজা কুমার বসু।

গিয়াছে কোথা গো হারায়ে।

যেন গিয়াছে কোথা গো হারা'য়ে।
নিদাঘ গগণে, অরুণ কিরণে,
পিয়াস-আকুল পাপিয়ার গানে,
ঢেলে দিয়ে নিজ অবশ পরাণে,
কোন্ দূর দেশে পলা'য়ে।
নীরব নিশীথে, জোছনা রাশিতে,
আবেশ-আকুল কোকিলের গীতে,
ছেড়ে দিয়ে হৃদি,' সহসা চকিতে,
কোন্ শশী কোলে লুকায়ে।
কুসুম শয়নে, মলয় পবনে,
সুদূর আগত বাঁশরীর তানে,
গিয়াছে সেদিন, কোথায় কে জানে,
কোন্ আকাশেতে মিলায়ে।
কোন্ গিরিশিরে তটিনীর তীরে,
কবে অনুকুল ধীর বায়ুভরে,
গিয়াছে কোথায়, তরঙ্গ লহরে,
নিজ হৃদি'খানি ভাসা'য়ে।
কবে আন্ মনে, পূরব গগণে,
নীলিমা চুম্বিত প্রকৃতি চরণে,
সোহাগ জড়িত লোহিত বরণে,
পলকে পুলকে মিশা'য়ে।
শিশির শোভিত শ্যামল বিজনে,
কাননপূরিত বিহগ কূজনে,
পড়েছে আবেশে, বিটপী ব্যজনে,
কোন্ ছায়াতলে ঘুমা'য়ে।
নিঠুর মহীতে, হৃদয় নিভৃতে,
কোথাকার পাখী গোপনে পুষিতে,
সসীম হৃদয়ে, অসীমে বাঁধিতে,
গিয়াছে কোথা গো হারায়ে।

শ্রী সু—।

আশা।

ভবিষ্যের আঁধার গহ্বরে,
জ্বালি নিজ বিমল কিরণ,
চারিদিক আলোকিত করে,
আছ ধ্রুব তারার মতন।

দুঃখময় এ ভব সংসারে,
তুমিই মৃতের সঞ্জীবনী;
অবিরত স্মরিয়া তোমারে,
সুখময়ী হতেছে অবনী।

ফুলকুল কোরকের কালে,
হয় যথা অতি মনোহর,
থাকি সুখে বিপদের জালে,
তব আশে ভাসিলে অন্তর।

নেহারিলে অরুণে যেমন,
আসিবে মিহির ভাবি মনে,

ফোটে তব বিমল কিরণ,
তেমতি মায়ার আগমনে।
শ্রীকালিদাস দত্ত,
চন্দ্রকোণা।

প্রাকৃতিক শোভা।

মরি কি মধুর সাজে সেজেছে প্রকৃতি,
ছড়ায়ে কৌমুদী রাশি, হাসি নিশাপতি
ধীরে ধীরে উদিছেন গগণের গায়,
হাসিছে ধরণী দেবী বিভুর বিভায়।

সরসী সলিলে মরি পবন হিল্লোলে,
বায়ু সনে কুমুদিনী মৃদু মৃদু দোলে,
সুরূপা সুশীলা সতী অধর কম্পিত,
হাসিছে আনন্দে হেরি পতি উপস্থিত।

সরস কুসুম গুলি ফোট ফোট হেরে
ধাইছে সত্বর বায়ু পরিমল তরে,
ঢুলিছে কুসুম তাহে সৌরভের ভার
সাদরে ডাকিছে যেন প্রিয়তমে তার।

তরু শাখে বসি পিক আবেগে বিভোর
চাহিছে সুস্বর সদা কিবা সুমধুর,
বিহগ বিহঙ্গী সহ তুলিছে সুতান
গাহিতেছে প্রেমানন্দে বিভু গুণ গান।
শ্রীঅমর নাথ ঘোষ।

জীবন ফুরায়ে এল।

জীবন ফুরায়ে এল, পুরিল না আশ,
একে একে লয় হ'ল না হতে প্রকাশ।
কত আশা করেছিনু, প্রথম যৌবনে,
একটী(ও) হ'ল না পূর্ণ বুঝি এ জীবনে।
ঈশ্বরে ডাকিনি কভু, আশার কুহকে,
এল বুঝি শেষ অঙ্ক, জীবন নাটকে।
চির দিন দুঃখ গেল, সুখ না মিলিল,
সাধন না হ'ল কিছু, জীবন ফুরাল
মিছে এবে সব আশা, মিছার যৌবন,
মুহূর্ত্তের সাথী এবে পুত্র পরিজন।
তাই বলি ওরে মন সতত স্মরণ,
কর সেই ভগবানে আর্ত্তের শরণ॥
শ্রীচন্দ্র কুমার বসু।

ভুলি কেমনে।

১

হৃদয় চাহিছে তারে ভুলি কেমনে?
সে মোর পরাণ সখা মনেতে র'য়েছে আঁকা,
তাহার সে ছবিখানি ভাসে নয়নে,
সে যে-জাগিছে পরাণে, তারে ভুলি কেমনে?

২

হাসে যবে শশধর নীল গগনে,
শোভন বদন তার জাগে মনে অনিবার

মধুর পীযূষধারা ঢালে পরাণে ;
স যে–ভালবাসে মোরে, তা'রে ভুলি কেমনে

৩

ভ্রমিতে যখন যাই কুসুম বনে,
তা'র কম কোমলতা স্নেহমাখা মধুরতা
সতত উদিত হয় আমার মনে ;
সে যে–হৃদয়ের নিধি, তা'রে ভুলি কেমনে ?

৪

মধুমাসে মধুসখা লতা বিতানে
সুমধুর কুহুরবে জন-মন মোহে যবে,
তার সুধাময় কথা জাগে শ্রবণে ;
সে যে–প্রেমডোরে বাঁধা, তারে ভুলি কেমনে ?

৫

ভ্রমর গুঞ্জন যবে শুনি শ্রবণে,
তার প্রেমময় গান পরাণ মাতান তান
সুধাধারা ঢালে মোর তৃষিত প্রাণে ;
সে যে–বিষাদে সুখদ, তারে ভুলি কেমনে ?

৬

মনোহর যত কিছু হেরি নয়নে,
মাধুরী মাখিয়া তার বিতরে সৌন্দর্য্য ভার,
তারি রূপে রূপবান্ সবে ভুবনে ;
সে যে–জগতের শোভা তারে ভুলি কেমনে ?

৭

নয়ন মুদিয়া যদি বসি ধেয়ানে,
ঢল ঢল রূপ ভরা পরাণ কেমন করা
তাহার মুরতি দেখি মনো নয়নে ;
সে যে–হৃদয়েতে আঁকা তারে ভুলি কেমনে ?

৮

রজনীতে ঘুমঘোরে মোহ স্বপনে
হেরি তার রূপরাশি, অমিয়া জড়িত হাসি ;
ভোলা নাহি যায় তারে, ভুলি কেমনে ?
ভুলিব না ভুলিব না ইহ জীবনে।
সে যে–মরমে মরমে বাঁধা আমার সনে ;
তারে ভুলি কেমনে ?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মহান্তি,
কাঁথি।

প্রতিদান।

সংসার, দিলি কি শেষে এই শুভ প্রতিদান ?
কাটা'য়েছি দিবারাত, জীবনের প্রতিঘাত্
সহেছি, কতবা আর সহিবে মানব প্রাণ ?
কত দিন আঁখি জল ঝরিয়াছে অবিরল,
কত দিন ভাঙ্গা সুরে গেয়েছি দুখের গান ;
স্বরগ-সুষমা ভরা বেলাফুল মনোহরা
ধরেছি ও পদ-পাশে, ভাঙিতে তোমার মান ;
বুঝি তা'র বিনিময়ে দিলে হেন প্রতিদান !
এসেছি প্রবাসে তাই, তবুত নিভেনা–ছাই।-
প্রাণের যাতনা, শুধু করে হৃদি শতখান !
নাহিক তোমার আশা, ভুলিয়াছি ভালবাসা,
তথাপি তোমার লাগি, কাঁদে কেন এ পরাণ ?
জানিনা কবে বা হায় দিবে শুভ প্রতিদান !

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী,
আম্বালা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শোক সংবাদ।

আমরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় গত বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই বেলা তিন ঘটিকার সময় পরলোক গত হইয়াছেন। রমেশ বাবুর মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গ দেশ দুঃখিত। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে রমেশ বাবুর জন্ম হয়। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, ও ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বার বৎসর হাইকোর্টে ওকালতী করেন এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ মনোনীত হন। তিনি ১৬ বৎসর হাইকোর্টের জজ ছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে লর্ড রিপন তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে স্থায়ী ভাবে ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেসের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং সম্মতি আইনের সময় অনেক উপকার করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি "নাইট্‌" উপাধি প্রাপ্ত হন্‌। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

সত্যবাদী বালক। একটি বালক কোন সওদাগরি আপিসে চাকরী প্রার্থী হইয়া অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন "অলস লোক আমরা চাই না, তুমি পরিশ্রম করিতে ভালবাস কি ?" বালক সরল ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আজ্ঞে না মহাশয় !"

অধ্যক্ষ—তবে তোমার দ্বারা হইবে না, আমাদের একজন পরিশ্রমী লোক দরকার।

বালক—সে রকম লোক পাওয়া দুষ্কর !

অধ্যক্ষ—মোটে না, এই আজ সকালে ২০।২৫ জন আসিয়াছিল।

বালক—আপনি কিসে জানিলেন যে তাহারা পরিশ্রম করিতে কাতর নহে ?

অধ্যক্ষ—তাহাদের নিজেদের মুখে।

বালক—আমিও বলিতে পারিতাম কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নহি।

বালক এরূপ অপকট দৃঢ়তার সহিত উহা বলিল যে অধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিযুক্ত করিলেন।

***

বিবাহ কৌতুক। স্কট্‌ল্যাণ্ডে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে বর বিবাহ করিয়া নব পত্নীসহ বিবাহ বাটি ত্যাগ করিবার কালে, বরের টুপি (হ্যাট্) ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। কোনও এক বিবাহ উপলক্ষে বরের কতিপয় স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধু যাঁহারা এককালে ঐ প্রথার হাত এড়াইতে পারেন নাই, পরামর্শ করিলেন যে এইবার তাহার প্রতিশোধ লইবেন। বর কিন্তু কোন গতিকে তাঁহাদের পরামর্শ জানিতে পারিয়া নিজের হ্যাট চাকরের দ্বারা কিছু পূর্ব্বে গাড়ির ভিতর রাখাইয়া দিলেন। পরে পরামর্শ কর্ত্তার হ্যাট্‌টি পরিয়া যেমন

বাটির বাহির হইবেন অমনি চক্রান্তকারীরা তাঁহার হ্যাট্ আক্রমণ করিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল, চারিদিক হইতে হাস্যের রোল উঠিল। বর অপ্রস্তুত না হইয়া গম্ভীর ভাবে গাড়িতে উঠিলেন এবং ঐ ভাঙ্গা হ্যাট্‌টি তাঁহার আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "ওহে ক্যাম্‌বেল্ ভায়া, তোমার হ্যাট্ তুমি নাও।" এই বলিয়া নিজের হ্যাট্‌টি মাথায় দিয়া প্রস্থান করিলেন। সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল, ক্যাম্‌বেল মাথা হেঁট করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তার পর তিন চারি দিন ক্যাম্‌বেলের রাস্তায় বাহির হওয়া দায় হইয়াছিল।

***

একজন মাতাল শুঁড়ির দোকানে প্রবেশ করিবার সময় আর একজন মাতালকে দোকানের সম্মুখে অচেতন অবস্থায় পতিত দেখিতে পাইল। দোকানে প্রবেশ করিয়া সে শুঁড়িকে ঐ অচেতন অবস্থায় পতিত মাতালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল "ঐ রকমেরমাল দাও, আমি রাস্তার এধার ওধার কর্‌তে নারাজ, একেবারে এক জায়গায় গ্যাঁট্ হয়ে পড়ে থাকতে চাই।

***

ইন্‌স্‌পেক্‌টর স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা বল দেখি "দুগ্ধ উত্তম জিনিষ,—দুগ্ধ কি কারক ?"

১ম ছাত্র—"পেটের অসুখ কারক" (বালকের দুগ্ধ হজম হইত না)

ইন্‌স্‌পেক্‌টর পরবর্ত্তী ছাত্রকে বলিলেন "তুমি বলিতে পার ?"

২য় ছাত্র—বমি কারক।

৩য় ছাত্র—দই কারক।

৪র্থ ছাত্র—ক্ষীর কারক।

৫ম ছাত্র—ছানা কারক।

৬ষ্ঠ ছাত্র—সন্দেশ কারক।

৭ম ছাত্র—বল কারক।

তখন ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় "তোমাদের অবস্থা হতাশ কারক" এই বলিয়া চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

***

চতুর বালক। একটী বালক তাহার ঠাকুরদাদার কাছে গিয়া বলিল "ঠাকুরদা, একটা টাকা দাও না, একটা বাঁদর কিন্‌ব" ? রসিক ঠাকুরদাদা বলিলেন "বাঁদর ত ঘরে একটা আছে" ?

বা—কই ?

ঠাকুরদা—এই যে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

বালক কিছু মাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিল "তবে বাঁদরের খাবার কেন্‌বার জন্য একটা টাকা দাও"। ঠাকুরদাদা হাসিতে হাসিতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

***

তিন ভগ্নি। মা বড় মেয়েকে বলিলেন "রান্না ঘরের জালায় এক ঘড়া জল ভরে রাখ্‌", এবং মেজো মেয়েকে বলিলেন "উনুনে খানকতক ঘুঁটে দিয়ে আয়, নইলে এখনি নিভে যাবে"। বড় মেয়েটী পাঁচটি সন্তানের মা, মেজো মেয়েটিও বয়স্থা, তাঁহারা মাতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া বসিয়া আছেন; মা রান্না ঘরে গিয়া দেখেন উনুন জলে ভাসিতেছে। বলিলেন "একি, এ কে কর্‌লে ?" তখন তাঁহার বড় মেয়ে নিজের ছেলেদের "তোদের এই কায" বলিয়া মারিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তৃতীয়া ভগ্নী দূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, সে বলিল "দিদি, ওদের মার কেন, তুমি নিজেই ঐ কায করিয়াছ, আমি

স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" তখন মেজো বোনটি বলিয়া উঠিল "জানি, দিদি ওই রকম অন্যমনস্ক"। ছোট বোনটি হাসিতে হাসিতে বলিল "তুমি আর বল না, তুমি নিজে যে জলের জ্বালায় ঘুঁটে ঢালিয়া দিয়াছ?" সকলে দেখিল সত্য বটে, তখন ছোট বোন সদর্পে বলিল "কেমন, সেদিন আমি কুটনোর খোসার বদলে কুটনোগুলি ভুলে নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া বড় যে ঠাট্টা করিয়া ছিলে?" তাহাদের মা এই সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন "তোদের দশা কি হবে?"

***

জলীয় হাইড্রজেন। ৭ই জুন রয়েল ইন্‌স্‌টিটিউশনের অধ্যাপক ডিওয়ার (Dewar) হাইড্রজেন গ্যাস যে জলীয় আকারে পরিণত করা যাইতে পারে, কতিপয় পরীক্ষা দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছিলেন। তরল হাইড্রজেন অতি সহজে উপিয়া যায় এজন্য উহা অতি তরল বায়ু (liquid air) দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখা আবশ্যক। তিনি (liquid) জলীয় হাইড্রজেন পূর্ণ একটি নল (tube) একটা পরদার উপর রাখিয়া-দেন, চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু শীঘ্রই উহাকে বরফে পরিণত করিয়া ফেলে। আর একটি পরীক্ষায় (experiment) তিনি তরল হাইড্রজেনের মধ্যে এক খণ্ড সোলার ছিপি নিক্ষেপ করেন, উহা ডুবিয়া যায়। কারণ হাইড্রজেন সোলা অপেক্ষা হালকা। লর্ড কেলভিন্ ও সার জর্জ ষ্টোক্‌স্ অধ্যাপক ডিওয়ারের আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেন। ঐ আবিষ্কার করিতে অনেক অর্থব্যয় হইয়াছিল। যাহা হউক পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল হাইড্রজেন গ্যাস তরল করা যায় না, এখন সে ধারণা দূর হইল।

***

ক্রেতা—এই, দুধ বিক্রী ?

গোয়ালা—আজ্ঞে, হাঁ।

ক্রে—কত করে সের।

গো—আজ্ঞে তিন আনা।

ক্রে—দু আনায় দিবি।

গো—একটু দাঁড়ান, তৈয়ারি করিয়া দিতেছি।

* * *

বড়লাটের মহানুভবতা। পুনার ফারগুসন্ কলেজ দেশীয়ের দ্বারা পরিচালিত, তথাকার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র রাজনাথ পুরুষোত্তম পারঞ্জপে নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবার কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Mathematical Tripos নামক অঙ্ক শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন অর্থাৎ সিনিয়র র‍্যাঙ্‌লার (senior wrangler) হইয়াছেন। বলা বাহুল্য অঙ্ক শাস্ত্রে ইহা অপেক্ষা কঠিন্ পরীক্ষা আর নাই, অনেক ইংরাজ এমন কি বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড কেলভিন পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও সিনিয়র র‍্যাঙলার হইতে পারেন নাই। বাবু আনন্দমোহন বসু ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ইতি পূর্ব্বে দেশীয়দিগের মধ্যে র‍্যাঙলার হইয়াছেন বটে। কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে বড়লাট মহোদয় তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারির দ্বারা ফারগুসন্ কলেজের প্রিন্সিপালকে সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রে উক্ত কলেজের শিক্ষকতার ও উক্ত ছাত্রের অসাধারণ প্রতিভার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি পারঞ্জপের পিতাকেও আর একখানি পত্র লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন যে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের

লোক বলিয়া উক্ত সম্মান কিরূপ উচ্চ ও উহা লাভ করা কঠিন তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছেন ; এবং তাঁহার শাসনকালে এক জন ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথমে ঐরূপ সম্মান লাভ করাতে তিনি অপরিমিত আনন্দ লাভ করিয়াছেন, এবং ওরূপ প্রতিভাশালী পুত্রের পিতা বলিয়া পারঞ্জপের পিতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও পুত্রেরও মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। বড়লাট এলগিন বাহাদুরের শাসন সময়ে একজন বাঙ্গালি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও, কই, তিনিত ওরূপ পত্র লেখেন নাই ?

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

(১) বসুমতী; (২) প্রতিবাসী ; (৩) এডুকেশন গেজেট ; (৪) চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ ; (৫) আলোচনা ; (৬) দারোগার দপ্তর ; (৭) নব্য ভারত ; (৮) মহাভারত নাট্যকাব্য ; (৯) প্রদীপ ; (১০) মুকুল ; (১১) বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী ; (১২) The Behar News ; (১৩) সৎসঙ্গ ; (১৪) উদ্বোধন ; (১৫) সোম প্রকাশ ; (১৬) কমলা ; (১৭) অন্তঃপুর ; (১৮) কোহিনুর ; (১৯) ফরিদপুর হিতৈষিণী ; (২০) ঢাকা গেজেট ; (২১) চিকিৎসক ; (২২) The City Times ; (২৩) তত্ত্ববোধিনী ; (২৪) নির্ম্মাল্য ; (২৫) তত্ত্বমঞ্জরী ; (২৬) ঋষি ; (২৭) পুণ্য।

চিকিৎসক—মাসিক পত্র ও সমালোচনা, ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ও রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। ইহাতে এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী তিন প্রকার চিকিৎসা বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, কিন্তু ইহার আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নেহাত হোমিওপ্যাথিক Dose এর মত। আমরা "চিকিৎসকের" পশার ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

তত্ত্ব মঞ্জরী। তৃতীয় ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীম-লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" বড়ই উপাদেয় সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার অধিকাংশ কথাই জৈষ্ঠ্য

ও আষাঢ় মাসের নব্যভারতে বাহির হইয়াছে। "এক ঈশ্বরই সকলের উপাস্য" প্রবন্ধটিতে নূতন কথা না থাকিলেও উল্লেখ যোগ্য। 'মহাত্মার স্মৃতিতে' সাধু ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বিষয়ে অনেক কথা আছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পঞ্চদশ কল্প, প্রথম ভাগ ৬৭১ সংখ্যা। আমরা জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

নির্ম্মাল্য। ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা বৈশাখ। "আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি" সাধারণ পাঠকের ভাল না লাগিলেও প্রাচীন-সাহিত্য চর্চ্চাকারীদিগের ভাল লাগিবে। "পরি-চারক" একটী ক্ষুদ্র গল্প, মন্দ নহে। "পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ" প্রবন্ধটীও সুখ পাঠ্য "মহারাজ রাজ বল্লভ" ক্রমশঃ প্রকাশ্য। কবিতা গুচ্ছের মধ্যে "মোহ আঁখি" ও "ইষ্টদেবতা" উল্লেখ যোগ্য। "নির্ম্মাল্যে"র বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়।

পুণ্য—মাসিক পত্র শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা ২য় বর্ষের ৪।৫ সংখ্যা পাইয়াছি। প্রবন্ধ গুলি ভাল লাগিল। "তাম্বুরু ও ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে উক্ত মহাত্মা সাহিত্যোন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন সঙ্গীত চর্চ্চায়ও তদ্রূপ যত্নবান ছিলেন ইহা দেখান হইয়াছে; উদাহরণ স্বরূপ প্রকৃত অলাবুর পরিবর্ত্তে কাগজ নির্ম্মিত অলাবু তাম্বুরু যন্ত্রে সংযুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন কাগজ নির্ম্মিত তুম্ব শুষ্ক অলাবু তুম্বের কাছাকাছি যায়। ইহাই তাঁহার অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির পরিচারক। পুণ্যে কতকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত আছে সে গুলি পরস্পর সমান উৎকৃষ্ট নয়।

"বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি"—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত এই পুস্তকে আধুনিক বঙ্গ ভাষার প্রকৃত অবস্থা যথাযথ সমালোচিত হইয়াছে। স্বদেশ-হিতৈষী লেখকগণের এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠকরা ও লিখিবার সময় এই পুস্তক নির্দ্দিষ্ট দোষ সকল পরিহার করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমরা বারান্তরে বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে চন্দ্রনাথ বাবু বর্ণিত কতিপয় সাধারণ কথার উল্লেখ ও আলোচনা করিব এবং তৎসঙ্গে সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের নিজের বক্তব্য সন্নিবেশিত করিব।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। আগষ্ট, ১৮৯৯ সাল। অষ্টম সংখ্যা।

'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' ও 'সাহিত্য পরিষৎ'।

চন্দ্রনাথ বাবু বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল দোষ ও তাহার সংশোধনোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, লেখক মাত্রেরই সে গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা সে গুলির উল্লেখ ও আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দু'এক কথা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই—"অপরে যাহা পড়িবে, তাহাতে এমন কিছুই থাকা উচিত নহে, যদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অপরের অনিষ্ট করিবার অধিকার কাহারও নাই। * * * অতএব অপরে যাহা পড়িবে, অপরের হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লেখা কর্ত্তব্য। * * * যে সাহিত্যে বা সাহিত্যের যে সকল অংশে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়, অথবা লোক মধ্যে কুরুচি, কুপ্রবৃত্তি, কুৎসাপ্রিয়তা, ঔদ্ধত্য, অসারতা, আড়ম্বর প্রিয়তা, কপটতা প্রভৃতি অসদ্গুণের সৃষ্টি করে বা বৃদ্ধি সাধন করে তাহা সাহিত্য

নামের অযোগ্য"। শুধু উহাকে সাহিত্য নামের অযোগ্য বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে ওরূপ সাহিত্য প্রশ্রয় না পায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। "প্রয়াসে"র প্রথম সংখ্যায় কুরুচি ও কুৎসাপ্রিয়তা দোষের উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল "দেবী স্বরূপিণী ভাষাকে যে কলুষিত করে এবং ঐ দেবীকে কলুষিত ভাব প্রকাশের জন্য যে নিযুক্ত করে তাহার শাস্তি বিধান আবশ্যক। অপরাধ অতি গুরুতর, জুরির সাহায্যে ইহার বিচার আবশ্যক।" সাহিত্য পরিষৎ ইচ্ছা করিলেই সাহিত্যে জুরির স্থান অধিকার করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন, কারণ পরিষদে অনেক গণ্যমান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন।

যাহা হউক, চন্দ্রনাথ বাবুর মত পরিষদের একজন খ্যাতনামা সভ্যের যখন এ বিষয়ে মনযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন আমাদের মনে প্রতিবিধানের আশা সঞ্চার হয়। এই বিষয়ে সাহিত্য পরিষদের প্রাণপণ চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ চন্দ্রনাথ বাবু আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যত গুলি দোষ দেখাইয়াছেন, কুৎসা ও কুরুচিপ্রিয়তা অপেক্ষা কোনটীই গুরুতর নহে, এবং অপর কোনটী দ্বারাই সমাজ ও সাহিত্যের অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে না। সমাজের ভিতর দুই শ্রেণীর সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, প্রথম সংবাদ পত্র, ও দ্বিতীয় নাটকাদি। এক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের অন্ততঃ দশ পনর হাজার গ্রাহক সংখ্যা আছে, এরূপ দু'তিন খানি সংবাদপত্র এক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই সকল সংবাদ পত্রের দ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় প্রায় প্রতি সপ্তাহে ইহাতে যেরূপ ব্যক্তিগত কুৎসা প্রকাশিত হয়,

ও সহস্র সহস্র গ্রাহক, অনুগ্রাহক কর্ত্তৃক উহা যেরূপ আগ্রহের সহিত সর্ব্বাগ্রে পঠিত হয়, তাহাতে সাহিত্য ও সমাজ উভয়েরই যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। আবার প্রতি সপ্তাহে শত শত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে যেরূপ দেশের গণ্যমান্য লোকের নিন্দা ও কুরুচি পূর্ণ প্রহসনাদির অবাধে অভিনয় হইয়া আসিতেছে তাহা দ্বারাও কি সমাজ ও সাহিত্যের অনিষ্ট হইতেছে না? উহা দ্বারা যে অনিষ্ট হইতেছে ও দর্শকবৃন্দের রুচি মার্জ্জিত না হইয়া বিকৃত হইতেছে, ঐরূপ অভিনয় দেখিয়া ঘৃণার পরিবর্ত্তে ঘন ঘন করতালি ও একই অভিনয় পাঁচ বার, সাতবার পর্য্যন্ত দর্শন করাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এরূপ কুরুচি ও কুৎসাপূর্ণ সাহিত্যের অভিনয় বন্ধ করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে দেশের গণ্যমান্য লোকে বরং উহার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহার কি কোনও প্রতিকার হয় না?

প্রথম সংখ্যা প্রয়াসে সাহিত্যে জুরি স্থাপন প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পর "প্রতিবাসী"র খুলনাস্থ কোনও পত্রপ্রেরক আমাদের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং তৎপরে "সম্পাদকের দায়িত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ গুলিতে প্রতিবাসী সম্পাদক স্বয়ং এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁহার ও আমাদের উদ্দেশ্য এক হইলেও তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়ের আমরা পক্ষপাতী নহি। তিনি উক্ত দোষের শাস্তি বিধানের জন্য রাজদ্বারে আশ্রয় লইতে চান, কিন্তু আমরা সাহিত্য পরিষৎকেই জুরি মনোনীত করিয়া দোষের বিচার করাইতে চাই। সাহিত্য পরিষদে অনেক শ্রদ্ধাস্পদ সভ্য আছেন—যাঁহাদের কথা সকলে মান্য করিয়া চলিতে পারেন। মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকের কথা শুনিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। সমগ্র বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য ও শিক্ষিত সুসন্তানদিগকে লইয়া সাহিত্য-পরিষৎ

অনায়াসেই জুরির স্থান অধিকার করিতে এবং কালে French Academyর ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যতদিন না সাহিত্য-পরিষৎ ফ্রেঞ্চএকাডেমির আদর্শে গঠিত হইবে এবং ফ্রেঞ্চ-একাডেমির ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন ততদিন পরিষৎকে আমরা কেবল একটী আড়ম্বর পূর্ণ সভা বলিয়া মনে করিব। শুধু প্রাচীন পুঁথির পুনরুদ্ধারে বাঙ্গালা সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না, বর্ত্তমান সাহিত্যে অমনোযোগ করিলে চলিবে না।

চন্দ্রনাথ বাবু আরও কতকগুলি দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, ব্যাকরণ দোষ। তিনি বলেন "প্রাচীন পণ্ডিত শ্রেণীর লেখকদিগের এ দোষ ছিল না, বৃহৎ ও বহুল সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগই তাঁহাদের দোষ ছিল। আজ কালকার নব্য লেখকদিগের লেখায় ব্যাকরণ দোষ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।" একথা যথার্থ, আহার, বিহার, বেশবিন্যাস ও রীতি নীতির ন্যায় সাহিত্যেও যথেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু কেহ বলিবার নাই, আর বলিলেই বা শোনে কে? সকলকেই স্ব স্ব প্রধান! রবিবাবু লিখিলেন "প্রাণতম," তিনি সুকবি, সুলেখক ও পরিষদের সভ্য বলিয়া পরিষৎ তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিবেন না, কিন্তু রবিবাবুর অসংখ্য অনুকরণকারীদিগের মধ্যে উহার প্রয়োগ-রোগ হয়ত পরে এত কঠিন ও সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইবে, যে তখন আর কোনও ঔষধ ধরিবে না। রোগের উৎপত্তি হইতে না হইতেই উচ্ছেদ আবশ্যক।

আর একটী দোষ "যাহা তিন ছত্রে লেখা যায় তাহা টানিয়া ত্রিশ ছত্র করা হয়; যাহা ত্রিশ পৃষ্ঠায় শেষ করা উচিত, তাহা ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করাও কঠিন হয়। তিলে খাজার গুড়ও বোধ হয় এত টানা হয় না, পাঁউরুটির ময়দাও বোধ হয় এত

ফাঁপান হয় না, কুমড়া বড়ির দালও বোধ হয় এত ফেনান হয় না। সরলতারও বড় অভাব। কেহ খাঁটি মনের কথা খাঁটি কথায় কহিতেছে, অনেক স্থলে এরূপ বুঝিতে পারা যায় না।"

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "এ সকল দোষের উৎপত্তি আমাদের মনে; আমাদের মনের সংস্কার না হইলে, মনের সরলতা না জন্মিলে এ সকল দোষেরও সংস্কার হইবে না; বাঙ্গালা সাহিত্যেরও সারবত্তা বাড়িবে না। মনের সংস্কারই বড়ই কঠিন।" কিন্তু মনের সংস্কার কঠিন হইলেও আমাদের বিবেচনায় এ দোষের সংস্কার কঠিন নয়, উপযুক্ত জুরি থাকিলে ঐ দোষেরও প্রতিবিধান সহজ। চেষ্টা থাকিলে সাহিত্য পরিষৎ এ দোষেরও প্রতিবিধান করিতে সমর্থ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

চন্দ্রনাথ বাবু আরও একটী দোষ দেখাইয়াছেন, যথা গ্রাম্য ও অপভ্রংশ শব্দ ব্যবহার। শব্দেও ভাবের গ্রাম্যতাদোষের কথা ইতিপূর্ব্বে প্রয়াসে উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব বলা বাহুল্য এ বিষয়ে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। অপভ্রংশ শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি বলেন "উহাতে যে কেবল সাহিত্যের মর্য্যাদা হানি হয় এরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অপভ্রংশ ও বাগ্-ধারা (idiom) প্রচলিত থাকায় অর্থ বোধের অসুবিধা হয় এবং জাতীয় একতা বুদ্ধির উদ্রেক ও পরিবর্দ্ধনেরও ব্যাঘাত ঘটে। এক্ষণ-কার বাঙ্গালা সাহিত্য একটি সাহিত্য নহে, নানা স্থানের নানা বিশেষত্ব দূষিত বহু সাহিত্যের সমষ্টি।" তিনি বলেন "এই দোষের সংস্কার করিতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ প্রভৃতি স্থানের ভিন্ন ভিন্ন বাগ্ধারাদি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রস্তুত করা আবশ্যক। তারপর যে ধারাটী ছাড়িয়া দিলে স্বল্পতর লোকের কষ্ট, সেইটি ছাড়াই

যুক্তি সঙ্গত, যে ধারাটি ছাড়িয়া দিলে অধিকতর লোকের কষ্ট, সেইটি রাখিয়া দেওয়াই যুক্তি যুক্ত। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরী নামক পুস্তকাগারের তালিকা দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রতিবৎসর বঙ্গদেশের সমস্ত বিভাগে যত পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়, কলিকাতা হইতে তাহার আড়াই গুণেরও অধিক প্রকাশিত হয়। * * * অতএব কলিকাতার ভাষাকে এখন বঙ্গের আদর্শ ভাষা জ্ঞান করিলে রীতি ও ইতিহাস সঙ্গত কার্য্যই করা হইবে।" ঐরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়নের ভার চন্দ্রনাথ বাবু পরিষদের উপর ন্যস্ত করিতে চাহেন, আমরা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মৃত আনন্দ মোহন বড়ুয়া একা যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরিষদের সমবেত চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণ হইবে না কি?

চন্দ্রনাথ বাবু আরও একটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ইংরাজি ধরণের বাঙ্গালা। ইংরাজি শিক্ষার ফলে ইহা কতক পরিমাণে অনিবার্য্য হইলেও, সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আমাদের বিশ্বাস সাহিত্য-পরিষৎ যদি কতকগুলি আদর্শ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, যদি "করলুম," "কল্লুম" প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দ ব্যবহার করিলে, অথবা "একথাবল তৈল লইয়া" প্রভৃতির ন্যায় গ্রাম্যতাপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করিলে অথবা খাঁটি ইংরাজি ধরণে "রূপোর চামচে মুখে করিয়া কেহ জন্ম গ্রহণ করে না" এরূপ বাঙ্গালা লিখিলে, কিম্বা "প্রাণতম" প্রভৃতি যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহার করিলে তীব্র সমালোচনা করেন, তাহা হইলে দোষ গুলির সংস্কার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সাহিত্য পরিষদ এপর্য্যন্ত ভাষা বিষয়ক কোনও আদর্শ নিয়মই নির্দ্ধারণ করিয়া দেন নাই, এবং বর্ত্তমান লেখকদিগের মর্ম্মে আঘাত করিবার ভয়ে স্বাধীন ভাবে সমালোচনা করিবার সাহসও দেখাইতে পারেন নাই।

জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থ সমালোচনা পরিষদের নিয়ম বহির্ভূত; কিন্তু এই নিয়মই পরিষদের সভ্যমণ্ডলীর সংকীর্ণত্বের পরিচায়ক। সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বাঙ্গালি জাতি যে সৎকার্য্যের অনুশীলন করিতে পারে না এবং আত্মাভিমান পদদলিত করিয়া পরস্পর মিলিত হইতে জানে না উক্ত নিয়মই তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ। আবার দুই একটা ঘটনা হইতেও তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ধর্ম্মোপাসনা প্রবন্ধ পরিষদের অধিবেশন স্থলে অপর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সে অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হরপ্রসাদ বাবু সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন না। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে রাজেন্দ্রবাবু যে মন্তব্য প্রদান করেন তাহা হইতে প্রকাশ পায় যে হরপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধটী কেবল আনুমানিক বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহার মধ্যে কোথাও একটী প্রকৃত কারণ ও যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া বিচার করা হয় নাই; আর, তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা স্থলে স্থলে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট বলিয়া উহা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার অনুপযুক্ত। সেদিনকার অধিকাংশ সভ্যই রাজেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ না করিয়া বলিয়া উঠিলেন—হরপ্রসাদ বাবুর রচিত প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার কোনও বাধা পাইতে পারে না ইত্যাদি। শেষে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থিরীকৃত হয় যে উক্ত প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদকের উপর নির্ভর করা হউক এবং তিনি উহার সংশোধনাদিও প্রকাশ সম্বন্ধে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপই হইবে।

পরিষদের নিয়মানুযায়ী পরবর্ত্তী অধিবেশনে হরপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ

সম্বন্ধে যিনি যে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই সকল অভিমত লিপি বদ্ধ পূর্ব্বক সমাগত সভ্যগণের সমক্ষে পাঠ করিয়া অনুমোদন প্রার্থনা করা হইলে অনেকেই বলিয়া উঠিলেন যে হরপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে রাজেন্দ্র বাবুর অভিমত উঠাইয়া দেওয়া হউক। কারণ ইহাতে হরপ্রসাদ বাবু মনক্ষুণ্ণ হইতে পারেন এবং সেই কারণেই হয়ত পরিষদের সংশ্রবও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন; বলা বাহুল্য যে সেদিনও হরপ্রসাদ বাবু সভা মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু সেই সভাস্থ ডাঃ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রমুখ কতিপয় স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলিলেন যে যখন রাজেন্দ্র বাবু যথার্থই উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তখন উহার অপলাপ করিবার সার্থকতা কি? ইহার জন্য আমরা যদি হরপ্রসাদ বাবুর পরিষৎ ত্যাগ আশঙ্কায় বিচলিত হই, সেই সূত্রে রাজেন্দ্র বাবুরও সংশ্রব লাভ হইতে পরিষৎ বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ ভাবে সত্যের অপলাপ করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। এই তীব্রোক্তির ফলে রাজেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল।

এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে মতের একতা নাই এবং চক্ষু লজ্জার অপেক্ষা না করিয়া সত্য সমালোচনা করিবার ক্ষমতা নাই। যতদিন না পরিষৎ উক্ত দোষ সকল পরিহার করিবেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত না জীবিত গ্রন্থকার দিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া অবাধে তাঁহাদের পুস্তক সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিবেন ও আদর্শ সাহিত্যের নিয়ম সংস্থাপন করিবেন ততদিন পরিষদের দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের উপকার সম্ভাবনা নাই।

বর্ষা প্রকৃতি।

১

শ্যামাঙ্গিনী চিরস্নিগ্ধা হে পূর্ণ যৌবনা
কবিচিত্ত বিমোহিনী বরষা-প্রকৃতি,
না জানি কাহার ধ্যানে রয়েছ মগনা
উছলিত চারি ভিতে দিব্য রূপ জ্যোতিঃ;
গম্ভীরা মূরতি তব সদা ভাবময়--
যেন নব প্রসূতির পূর্ব্ব রাগ ভরা;
এ সৌন্দর্য্য রাশি হতে ফলিবে নিশ্চয়--
মধুময় শতফল মন প্রাণ হরা।
অনন্ত যৌবন শোভা পূর্ণ এ হৃদয়,
একদিন মাতৃভাবে হবে পরিণত;
দিতেছে এ শোভা রাশি তা'রি পরিচয়
পূর্ব্বাভাষ ক্ষণে ক্ষণে আননে ফলিত।
এ গম্ভীর রূপরাশি হ'লে অবসান,
লভিবে জননী সম প্রসন্ন বয়ান।

২

তোমার এ শোভাময় নিরখি' মূরতি,
মনে পড়ে অতীতের চিত্র সমুজ্জ্বল—
বসন্তের সমাগমে সে চপল মতি
পুষ্পময়ী বালিকার সহজ সরল—
নিরূপম লীলা খেলা চিত্ত সুখকর;
তখন কোকিল কণ্ঠে উঠিত রাগিণী,
এখন সে কলকণ্ঠে ভাল কেকাধ্বনি
থেকে থেকে মুখরিত করি দিগন্তর।
তখন কিশোরী ছিলে নিয়ত অস্থিরা,
বিকশিত গৌরকান্তি প্রভাত কিরণে;
এখন সে মূর্ত্তি পূর্ণ যৌবন গম্ভীরা,
আবরিত অঙ্গ শোভা জলদ বসনে।
সে হরিণ আঁখিযুগ চকিত চপল
এখন হয়েছে স্থির—কটাক্ষ প্রবল।

৩

আসিবে শরৎ যবে ওবরবয়ানে
বিকশিবে মাতৃভাব প্রসন্ন বিমল;
কবি সে পবিত্র মূর্ত্তি হেরিবে ধেয়ানে
রাজিবে বিকাশি' তাঁ'র হৃদি-শতদল।
সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধ্যান ধারণার,
গড়িয়া পূজিবে ভক্ত বঙ্গবাসী যত;
লভিবে বিমল শান্তি আনন্দ অপার,
তোমার চরণ তলে হইয়ে প্রণত।
সে শুভ সময়ে সুখে দিগঙ্গনাগণ
ঢুলাবে চামর, কাশ কুসুম রচিত,
ত্যজিয়া জলদাম্বর করিবে ধারণ,
সুনীল কৌষেয় বাস নক্ষত্র খচিত।
ভুলি হিংসা দ্বেষ লভি' তব দরশন
ভ্রাতৃভাবে সন্তানেরা হইবে মিলিত।

৪

তোমার মোহিনী মূর্ত্তি প্রকৃতি সুন্দরি,
নানা ভাবে করিয়াছ এ চিত্ত মোহিত;

কখন হেরিছি তুমি দয়াবতী নারী,
পরদুঃখে হৃদিতল সদা বিগলিত ;
কখন চামুণ্ডা মূর্ত্তি কি প্রলয়ঙ্করী ;
রণোন্মত্তা পদভরে ধরণী কম্পিত।
তুমিই বালিকা কভু কভুবা কিশোরী,
কভু ধর নিরূপমা যুবতীর বেশ ;
কভু ধর জননীর মূর্ত্তি শুভকরী
সে অপার স্নেহধার অনাদি অশেষ।
রমণীর যত গুণ তোমাতেই হেরি
রমণীর যতদশা তোমাতে প্রকাশ ;
স্নেহ দয়া প্রীতি প্রেম নিয়ত বিতরি'
রেখেছ কবিরে করি' তব চিরদাস

শ্রীরসময় লাহা।

রাজা ও রাণী—অনুশীন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গতবারে নায়ক নায়িকার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বাকি তিনটি দম্পতির কথা বলা হইলেই প্রবন্ধ শেষ হয়। "রাজা ও রাণী"র নায়ক নায়িকা-চরিত্র ভিন্ন অপর চরিত্র গুলি অতি সুন্দর ও পরিস্ফুট হইয়াছে। দেবদত্ত ও নারায়ণী, ইলা ও কুমার, চন্দ্রসেন ও রেবতী, এই কয়টী চিত্র বেশ উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, সকল গুলিই জীবন্ত ছবি বলিয়া বোধ হয়, সকল গুলিরই প্রাণ আছে। এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া কবি নিজ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা আছে বলিয়াই, তাঁহার নিকট অনেক আশা করা যায় বলিয়াই, আমরা নায়ক-নায়িকার চরিত্রে যাহা ত্রুটি মনে করিয়াছি তাহা দেখাইতে সাহস করিয়াছি ; নতুবা উহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। দেবদত্ত ও নারায়ণীর চিত্র বড় তৃপ্তিকর বড়ই স্বাভাবিক। ইহাদের প্রেমে আগ্রহাতিশয়তা নাই গভীরতা আছে। নারায়ণী মুখে বলিলেন—

"ও গো, তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মর্‌ব না সেজন্য ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।"

কিন্তু স্বামী প্রস্থানোন্মুখ হইলেই বলিতেছেন—

"হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আন। আমি এ একলা ঘরে কি করে বাস করব?"

রাজা ফিরিলেই দেবদত্তকে ফিরিতে হইবে, তাই নারায়ণী ঠাকুরের নিকট রাজার সুবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। অনেকে হয়ত ঐরূপ অবস্থায় স্বামীকে রাজার সহিত যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিত। নারায়ণীরও প্রথমে সেই ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই বলিয়াছিলেন—

"হাঁগা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধ চল্‌বে না? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ।"

কিন্তু যখন দেবদত্ত বলিলেন—

"মহারাণী কুমার সেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ কর্ত্তে দেন্‌নি।"

তখনই নারায়ণী বলিলেন—

"হাঁগা, বল কি! তা তুমি এতদিন যাওনি কেন? এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রাণীর মত অমন সতী লক্ষ্মীকে অপমান কর্‌লে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে"।

দেবদত্ত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বলত আমি থেকে যাই,"

নারায়ণী থেকে যেতে অনুরোধ করিলেন না বরং বলিলেন—

"না না তুমি যাও! আমি কি তোমাকে সত্যি থাক্‌তে বল্‌চি? ওগো তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরব না, সে জন্য ভেবনা। আমার বেশ চলে যাবে।"

অথচ একটু আগে নারায়ণী বলিয়াছেন—

"যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না তা আমি বলে রাখ্‌লুম। এই রইল তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব"।

এরূপ দুই প্রকার কথা বলার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নহে, নারায়ণীর ইচ্ছা স্বামী না যান, তাই প্রথমে অভিমান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "যেতে ইচ্ছে হয় যাও" ইত্যাদি। কিন্তু যখন দেবদত্ত বলিলেন "বলত থেকে যাই" তখন নারায়ণীর আর এককথা মনে পড়িল, দেবদত্ত কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

"রাজাকে সাহস করে দুটো ভাল কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমিত আর থাকতে পারচিনে আমি চল্লুম।"

দেবদত্ত ভিন্ন রাজার যখন প্রকৃত বন্ধু কেহ নাই, তখন নারায়ণী স্বামীকে কি বলিয়া ধরিয়া রাখেন, তাই তিনি যাইতে অনুমতি দিলেন, এবং রাজাকে শীঘ্র শীঘ্র ফিরায়ে আনিবার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিলেন। ধন্য নারায়ণী, ধন্য দেবদত্ত! এই গার্হস্থ্য প্রেম চিত্রে নভেলি ধরণের ভালবাসা নাই, romance নাই, অথচ কেমন মধুর, কত আন্তরিকতা, কত গভীরতা। দেবদত্তের গৃহিণীকে ত্যাগ করিয়া রাজার সহিত যুদ্ধে "যেতে আর পা সরেনা—নানা ছলে দেরি কর্ত্তে ইচ্ছে করে"। ব্রাহ্মণ পরে বড় দুঃখে রাজাকে বলিয়াছিলেন—

"আপাততঃ যুদ্ধ রেখে, অবিলম্বে দেশে
ফিরে চল। সত্য কথা বলি মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয়; এবার তা
পেরেছি বুঝিতে! আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে;
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ; ছোট
বড় করে না বিচার!"

দেবদত্ত শুধু ব্রাহ্মণীর জন্যই ব্যাকুল নহেন, তিনি কেবল রসিক ও প্রেমিক নহেন, অতিশয় বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তি। রাজার

দুঃখে তিনি দুঃখী, প্রজার দুঃখেতে তিনি কাতর। তোষামোদজীবির ন্যায় তিনি রাজার মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত নহেন, যাহাতে রাজার মঙ্গল হয় সেই জন্য মধ্যে মধ্যে রাজাকে অতি মধুর বা মিষ্টভাবে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত বা ভীত নহেন, তাই "স্তুপাকার রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে" মন্ত্রী আসিতেছেন দেখিয়া পলায়ন তৎপর রাজাকে বলিতেছেন—

"রাণীর রাজত্বে তুমি লওগে আশ্রয়!
ধাও অন্তঃপুরে। অসম্পূর্ণ রাজ কার্য্য
দুয়ার বাহিরে পড়ে থাক্; স্ফীত হোক্
যত যায় দিন। তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে, উর্দ্ধদিকে, দেবতার
বিচার আসন পানে!"

রাজা এ তিরস্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই বলিলেন—

"এ কি উপদেশ"?

দেবদত্ত।—না রাজন্! প্রলাপ বচন। যাও তুমি
কাল নষ্ট হয়।

হায়! রাজা দেবদত্তের উপদেশ বুঝিয়াও বুঝিলেন না কেন? আর এক স্থলে রাজা যখন বলিতেছেন—

"দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ!"

দেবদত্ত নির্ভীক চিত্তে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় উত্তর করিলেন—

"মহারাজ মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন।"

কিন্তু তথাপি রাজার চক্ষু উন্মীলিত হইল না। দেবদত্ত রাজার রাজ কার্য্যে উদাসীনতায় বিরক্ত, কিন্তু তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ নহেন,

রাজাকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও অকপট সরলতা অতিশয় প্রশংসা যোগ্য। দেবদত্ত বলিতেছেন,—

"সখা, এ হৃদয় মোর জানিও তোমারি!
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি সব অকাতরে; রোষানল
লব বক্ষ পাতি, যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।"

ধন্য দেবদত্ত, তোমার মত বন্ধু জগতে বিরল! রাজার চরিত্র দেবদত্ত যত বুঝিতেন সেরূপ আর কেহ বুঝিত না, তাই তিনি রাজার চৈত্যন্যোদয় চেষ্টা অরণ্যে ক্রন্দন জানিয়া মন্ত্রীকে—

"রাজাকে ডিঙ্গায়ে রাণীর চরণে পড়িতে"

পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে স্বয়ং রাণীর নিকট দারিদ্র্য ও অত্যাচার পীড়িত প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আবার উত্তেজিত বিদ্রোহী প্রজাদের কৌশলে শান্ত করিয়াছিলেন। দেবদত্তের প্রকৃতিও অতি সরল, আত্মগরিমা বা রাজপুরোহিত পদে বৃত হইয়া অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে, নিজের ঐ পদে অনুপযোগীতা স্মরণ করিয়া তিনি বরং লজ্জিত ও দুঃখিত। দাম্ভিকতার পরিবর্ত্তে বিনয়, নম্রতা, ও সরলতাই দেবদত্ত চরিত্রে অধিক লক্ষিত হয়। কয়জন শাস্ত্রজ্ঞানহীন পুরোহিত অম্লান বদনে বলিতে পারেন,—

"স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতে খানা,
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ"

অথবা

"শ্রুতি স্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে"

যে যত শাস্ত্র জ্ঞান হীন বরং তাহাতে তত অধিক পরিমাণে আত্ম-গরিমা দৃষ্ট হয়।

নারায়ণী সম্বন্ধে এ স্থলে আর একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নারায়ণী মিষ্টভাষিণী না হইলেও, মুখে মধু না ঝরিলেও তাঁহার হৃদয়ে অমৃত প্রস্রবণ সদাই বহিতেছে, মুখে বলিতেছেন—

"ভিখিরি জুটিয়ে আন্‌লে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর্‌ব।"

কিন্তু বাস্তবিক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে ও দেবদত্ত তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলে, অমনি নারায়ণীর স্বভাব সুলভ কোমলতা ও সহৃদয়তা উথলিয়া উঠে, অমনি বলেন—

"আহা কর কি! অতিথিকে ফেরাতে নেই; তা তুই বোস্‌, কুড়িয়ে যা কিছু আছে নিয়ে আসি।"

সহৃদয়তা গুণে নারায়ণীর নামের সার্থকতা হইয়াছে, এই জন্যই তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে। এখনকার নব্যা হৃদয়হীনা হিন্দুনারীরা, যাঁহারা পূজা আহ্নিক, অতিথি সেবা ভুলিয়া নভেল পড়া ও কার্পেটবোনাকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই মুখরা অশিক্ষিতা নারায়ণীর পদ সেবারও যোগ্যা নহেন।

কুমার ও ইলার চরিত্রও অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কুমার ও ইলার চিত্র কাব্য জগতে কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি; এই দুইখানি চিত্র দেখিতে দেখিতে নয়ন মন মুগ্ধ হইয়া যায়, চক্ষে জল আসে, হৃদয়ে কি এক করুণ রস মিশ্রিত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ধন্য কবির কল্পনা, ধন্য তাঁহার তুলিকা! বিক্রমদেব ও কুমারে কত প্রভেদ! বিক্রমদেব রাজধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ভুলিয়া দিবানিশি প্রেমের স্বপ্নে বিভোর থাকিতেই ব্যস্ত। কুমারের প্রেম sentimentality নহে, প্রকৃত প্রেম, রাজার প্রেম অপেক্ষা উহা আরও গভীর আরও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ। কারণ সুমিত্রা রাজার হস্তগত পরিণীতা পত্নী,

ইলা কুমারের বাগদত্তা পত্নী মাত্র, হৃদয় গত হইলেও হস্তগত হইতে বাকি। কিন্তু তথাপি কুমার ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ভুলেন নাই, প্রজাদের ভুলেন নাই। তাই ইলা মধুর তিরস্কার ছলে বলিতেছেন—

"যেতে হবে? কেন যেতে হ'বে যুবরাজ?
ইলারে লাগে না ভাল দুদণ্ডের বেশী,
ছিছি চঞ্চল হৃদয়?

কুমার। প্রজাগণ সবে—

ইলা। তারা কি আর আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে?

কুমারের ইলাকে দু'দণ্ডের বেশী ভাল লাগে না? হরি! হরি! কুমারের বাসনা কিরূপ শুনিতে চাও?

"সমস্ত জীবন মন
নয়ন, বচন, ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হ'য়ে। যেন আমি
আমারে ভাঙ্গিয়ে দিঁয়ে ব্যপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে! যেন মিশে রব
সুখ স্বপ্ন হয়ে ওই নয়ন পল্লবে!
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে! লাবণ্যের
মত ওই বাহু দুটি রহিবে বেড়িয়া,
মিলন সুখের মত কোমল হৃদয়ে
পশি রহিব মিলায়ে!

এত প্রেম, এত অতৃপ্ত বাসনা, তবু প্রজার জন্য কাতরতা, তবু প্রজার জন্য প্রাণের প্রাণ ইলার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে কুমার উদ্যত! কি প্রজাবৎসলতা! প্রেম, স্নেহ, বীরত্ব, ক্ষমা, ধৈর্য্য, দয়া সকল গুণই কুমারে বিদ্যমান, তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয়, বিক্রমদেব ক্ষত্রিয় নামের কলঙ্ক। আর ইলা? ইলার কথা লিখিব কি, তাহার হরিষে বিষাদের

কথা স্মরণ করিলে প্রাণ ব্যথিত হয়। প্রেমময়ী ইলার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, তাহার মূর্চ্ছা যেন আর না ভাঙ্গে। এস সকলে নীরবে, অতি সাবধানে ইলার জন্য দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলি, তপ্ত অশ্রু গায়ে লাগিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ যেন না হয়। কুমার নাই, কুমার গতপ্রাণ ইলা বাঁচিয়া কি করিবে?

চন্দ্রসেন ও রেবতী চরিত্রও কবি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই দম্পতির সহিত সেক্ষপীয়ের সিম্বেলীন্ ও তদীয় রাণীর চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। সিম্বেলীন্ যেরূপ স্ত্রৈণ, চন্দ্রসেনও ঠিক্ সেইরূপ। দুই জনেরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইচ্ছার অভাব; সিম্বেলীন্-মহিষীর নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে প্রাণপণ চেষ্টা, চন্দ্রসেন-মহিষী রেবতীরও সেই প্রতিজ্ঞা—

"—আমি তারে
দিয়েছি জনম আমি তারে সিংহাসন
দিব,—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে! নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ!

চন্দ্রসেনের যে ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারের প্রতি মমতা ছিল না এরূপ নহে, কিন্তু রেবতীর ভয়ে সে মমতা ক্রমে কাঠিন্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। চন্দ্রসেন রাক্ষসী স্বরূপিণী রেবতীর ব্যবহার দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে বলিতেছেন—

"তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের 'পরে; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে তারে বেঁধে রাখি বক্ষমাঝে;
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাত বেদনা।"

রেবতী। আন দেখি ডেকে? তার বেলা একপদ
চলে না চরণ! তোমার কেবল ইচ্ছা-
সার।"

বাস্তবিক চন্দ্রসেনের কেবল ইচ্ছাসার, ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই,এই জন্যই বলিয়াছি তাঁহার স্বাধীনও স্বতন্ত্র ইচ্ছার অভাব। ইহারই নাম সৎ ও অসতের সংগ্রাম। চন্দ্রসেনের সৎপ্রকৃতির সহিত রেবতীর অসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম ও অসৎ প্রবৃত্তির জয় রেবতী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চন্দ্রসেনকে বিক্রমদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে, কুমারকে বন্দীভাবে বিক্রমদেবের নিকট প্রেরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, কুমারই তাহার স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায়, রাজ্যারোহণের পথ হইতে কুমার রূপ কণ্টককে দূর করিতে না পারিলে নিজ পুত্রের সিংহাসন লাভের আশা নাই, তাই ঐ কণ্টক দূর করিতে রেবতী এত ব্যস্ত। চন্দ্রসেন রেবতীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছিলেন,—

"—চুপ কর, চুপ কর,
বোলো না অমন করে! কর্ত্তব্য আমার
করিব পালন; তার পর দেখা যাবে
অদৃষ্ট কি করে!"

রেবতী। তুমি কি করিতে চাও
আমি জানি তাহা! যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও! তার পর
চারি দিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য সাধন।

চন্দ্র। ছিছি রাণী, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে ঘৃণা হয় আপনার পরে
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি! আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে

সন্দেহ জনমে! কর্ত্তব্যের পথ হতে
ফিরায়োনা মোরে!

রেবতী। আমিও পালিব তবে
আপন কর্ত্তব্য। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন;
রাজা যদি না করিবে তারে কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ? * * *
আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব"। ইত্যাদি।

চন্দ্রসেন কর্ত্তব্যের পথে যাইতেছেন, রেবতী প্রাণপণে তাহাতে বাধা দিতেছে, ইহারই নাম সৎ ও অসতের সংগ্রাম। এই চিত্রই বিয়োগান্ত নাটকের মূল ঘটনা হওয়া উচিত; কিন্তু রাজা ও রাণীতে তাহা হয় নাই। চন্দ্রসেনের যখন স্বাভাবিক মমতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রবল হইল তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া বলিলেন—

"—ধিক এ মুকুট!
ধিক্ এই সিংহাসনে।

রেবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"—রাক্ষসি, পিশাচি
দূরহ দূরহ আমারে দিস্‌নে দেখা
পাপীয়সি!

তখনও রেবতী তাহাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল—

"এ রোষ রবে না চিরদিন।"

শঙ্কর ও ত্রিবেদীর কথা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

কিন্তু, উহাদের বিষয়ে অধিক কথা বলিবার নাই। এক কথায়, উহাদের চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ও প্রভুভক্ত ভৃত্য শঙ্করের তেজস্বীতা অতিশয় প্রশংসার্হ। প্রভুর ও সুমিত্রার আদেশে শঙ্করের আত্মসংযম ও নীরবে অপমান সহ্য ততোধিক প্রশংসার্হ। বিক্রমদেব শঙ্করের গুণে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

—"এর মত
হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে" ?

ত্রিবেদী বৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান হীন অথচ জ্ঞানাভিমানী, বাহিরে সরল অথচ অন্তরে গরল, ত্রিবেদীর চিত্রও বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। মানব চরিত্রজ্ঞ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেবদত্ত ত্রিবেদী চরিত্র ঠিক্ বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

"ত্রিবেদী সরল ? নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড"।

যাহা বলা হইল তাহা বিস্তৃত সমালোচনা নহে ; একখানি সুবিখ্যাত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত অনুশীলন মাত্র। "রাজা ও রাণী"র নায়ক নায়িকা চরিত্র ভিন্ন সকল চরিত্র গুলিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ভাষা ও ভাবের কথা আর নূতন করিয়া কি বলিব, রবিবাবু স্বয়ং সুকবি, সুপুরুষ, ও সুকণ্ঠ, রচনা সৌন্দর্য্যে ও ভাব মাধুর্য্যে তিনি বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে সুপরিচিত। রাজা ও রাণীতে রচনা সৌন্দর্য্য ও ভাব মাধুর্য্য প্রতি পৃষ্ঠায় যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয় ; সকল স্থান পড়িতে পড়িতে এত মুগ্ধ হইতে হয়, যে একবার দুইবার, দশবার পড়িলেও তৃপ্তি হয় না, আবার পড়িতে ইচ্ছা করে। "রাজা ও রাণী"তে ইলা ও তাহার সখিগণের যে কয়টি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে, অপর কোনও ব্যক্তি কেবল মাত্র ঐ গান কয়টি লিখিতে পারিলেই সুকবি বলিয়া

প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। ওরূপ সুন্দর ও মধুর ভাব পরিপূর্ণ গান বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস ভিন্ন অপর কোথায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। গানগুলি পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল। অনুশীলনে যে যে স্থান ভাল বুঝিতে পারি নাই আশা করি রবিবাবু যেন নিজগুণে আমাদিগকে সেই সেই স্থান বুঝাইয়া দেন। আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি তবে আমরা যে অভ্রান্ত, এরূপ কথা কখনই বলি না।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

উপবাস।

এই পৃথিবীতে প্রত্যহ কত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল ঘটনার মধ্যে আমরা দুইটী ঘটনা দেখিতে পাই; প্রথমটী কর্ম্ম অপরটী বিশ্রাম। মানবগণ শারীরিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া যথা সময়ে বিশ্রাম সুখ ভোগ করে। সর্ব্বদা বিশ্রাম বা কর্ম্ম স্বাভাবিক নহে। অনেকে বলেন যে মধ্যে মধ্যে পাকস্থলীর বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য; মধ্যে মধ্যে ভোজনে বিশ্রাম দিলে পাক যন্ত্র শিথিল হইবে না বরং নির্ম্মল হইয়া ভবিষ্যতে বিশেষ উপকার করিবে। আর্য্য ঋষিগণ সাময়িক ভোজনের নিয়ম প্রভৃতি করিয়াই কেবল ক্ষান্ত হন নাই। উহা তিথি বিশেষে ভিন্নরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য বিশেষ শাসন করিয়াছেন। তিথি বিশেষে ত্রিলোকের ব্যবস্থার ঈষৎ পরিবর্ত্তন হয়, তৎসঙ্গে আমাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। আর্য্য ঋষিগণ একাদশী তিথিতে কেবল যে ভোজন নিবারণ করিতে বলিয়াছেন তাহা নহে উপবাসেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভোজন না করিলে সাধারণতঃ উপবাস হয়

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অভুক্ত থাকিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে প্রকৃত উপবাস হয়।

পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব ভোগ বর্জ্জন করিয়া গুণের সহিত বাস করাকে উপবাস বলে। সেই গুণগুলি কি কি ও তাহার অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। দয়া—সর্ব্বদা উদাসীন, বন্ধুবর্গ মিত্র ও শত্রুতে আত্মবৎ ব্যবহারকে দয়া বলে।

২। ক্ষমা—বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক দুঃখ হইলে কোপ বা হনন না করাকে ক্ষমা বলে।

৩। অনসূয়া—পরের গুণের নাশ না করিয়া বরং পরের মন্দ গুণের প্রশংসা করা ও পরদোষে রমণ না করাকে অনসূয়া বলে।

৪। শৌচ—অখাদ্য পরিহার, সৎসংসর্গ ও স্বধর্ম্মে অবস্থানকে শৌচ বলে।

৫। অনায়াস—যে কর্ম্মে শরীরের পীড়া হয় তাহা শুভ কর্ম্ম হইলেও অধিক না করাকে অনায়াস বলে।

৬। মঙ্গল—প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্ম্মের পরিবর্জ্জন করাকে মঙ্গল বলে।

৭। অকার্পণ্য—অল্পধন থাকিলেও প্রতিদিন অদীন ভাবে যাহা কিছু দান করা যায় তাহাকে অকার্পণ্য বলে।

৮। অস্পৃহা—যথা বিহিত রূপে উপার্জ্জিত অর্থ অল্প হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা ও অপরের অর্থ কামনা না করাকে অস্পৃহা বলে।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে ভোজন না করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুণ গুলির সহিত বাস করিলে উপবাস হয়। বিলাসিতা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। সংযত চিত্ত হইয়া ঈশ্বরানুধ্যান জনিত অতুল আনন্দ ও শরীরের রক্ষা জনিত সুখ, এই দুই সুখ উপবাসের প্রত্যক্ষ ফল।

উপবাস দিনে অক্ষক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, ও মৈথুন নিষেধ। অঞ্জন রোচনা গন্ধ, পুষ্প দন্ত কাষ্ঠ, উপবাস দিনে ভোগ করিবে না। উপবাসাদি আপাত ক্লেশ জনক কার্য্য অনেকে করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা ক্ষীণ বা দুর্ব্বল নহেন। প্রত্যুত তাঁহারা বলিষ্ঠ ও নীরোগ। নিরন্তর অনশন করিয়া শরীর ক্ষীণ করিতে হইবে এমন কিছু নহে। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাময়িক অনশন করিলে শরীর লঘু হয় এবং সত্বগুণের প্রকাশ হইয়া রজঃ ও তমমল বিনষ্ট হইয়া যায়, নির্ম্মল লঘু শরীর হইলে আসনাভ্যাস হয়; পরে প্রাণ জয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। এমন কি উপবাসাদি ব্রত ভিন্ন শরীর নির্ম্মল লঘু হয় না; সুতরাং প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। বরং স্বাস্থ্য প্রবর্দ্ধিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দতা ঘটে। উপবাসাদি ব্রত আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও অন্তিমে সুখ বোধ হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মের সঞ্চয় জনক উপবাস ব্রত একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীজগৎপদ হালদার,
টালা।

নাটকের এক পৃষ্ঠা।

বেলা ও সুশীলা।

বে। তুই ভাই গরুর কাছে হলুদ, সিঁদুর, পাখা নিয়ে কি কচ্চিস্? গরু যে গুঁতোবে? ওমা গরুকে পূজা কচ্চিস্! একি রে কোথেকে শিখ্‌লি?

সু। এ মা শিখিয়ে দিয়েছে। এ তোরা করিস্ নি? ওমা সব আইবড় মেয়ে ছেলে এই সব কত্তে হয়। মা বলেন সকাল বেলা

উঠে কাপড় চোপড় ছেড়ে ফুল তুলিতে হয়; তার পর এই "গোকল" ক'ত্তে হয়। এ সব না কল্লে পাপ হয়। গোকল করে আবার "যম-পুকুর" করব। দাঁড়ানা দেখাব এখন ?

বে। আমারা ভাই সকাল উঠে ঝি কি চাকরের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি। তার পর অনেক শ্লোক মুখস্থ কত্তে হবে, তা না হলে গুরুমা বড় রাগ করেন। এই সব মুখস্থ টুখস্থ করে ভাই নাইবো; তার পর ভাত খেয়ে স্কুলে যাব। স্কুল থেকে আস্‌তে সেই ভাই পাঁচটা। তার পর এসে খেয়ে দেয়ে চুল টুল ভাল করে বেঁধে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আস্‌ব। তার পর এসে খেয়ে দেয়ে শুই। আমরা ভাই কখন্ ও সব কর্‌ব।

খে। এ সব যে সকালবেলা কত্তে হয়। সকালবেলা এই করে পান টান সাজি। যে দিন ভুলে যাই সে দিন মার কাছে বকুনি খাই। পান টান সেজে ভাই আমরা পুতুল তুতুল খেলি। মার খাওয়া দাওয়া হ'লে কোন দিন একটু আধটু পড়ান; তারপর ঘুম থেকে উঠে চুল টুল বেঁধে কাপড় চোপড় কেচে খাবার টাবার খাই। খেয়ে কোন দিন আবার পুতুল খেলি না হয় "জোড়া ঝাম" খেলি। সন্ধ্যে হলে খেয়ে দেয়ে "রূপ কথা" শুনি; সে দিন আমার ছেলের সঙ্গে নন্দিনীর মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে। বউকে ভাল একটা দিন দেখে আন্‌তে হবে।

বে। আমাদের ভাই ওসব পাঠই নেই। পড়া টড়া করে, কোন কোন দিন উল বুনি। সে দিন গুরুমা ঘর তোলা শিখিয়েছেন। আমার মা বাবা ও সব না কর্‌লে বকেন।

সু। আমার মা বাবা স্কুলে যেতে দেন না। আমি যদি বলি মা স্কুলে যাব ? তাঁ'রা রাগ করেন।

বে। তা বলে লেখা পড়া শিখবিনি ? স্কুলে যাবিনি ? আমরা কত যিশুর গান শিখিছি।

সু। মা ভাই ঐ সব শিখ্‌লে রাগ করেন। মা কোন কোন দিন বিকালে কাপড় চোপড় কাচা হলে রান্না ঘরে ডাকেন। কোন কোন দিন আমায় বলেন এইখানে বসে বসে আমার রান্না দেখ। কোন দিন আমায় রুটি লুচি বেল্‌তে বলেন। আমি ভাল পারিনে বল্‌লে মা বলেন "যা পারিস তাই কর, কর্‌তে কর্‌তে ভাল পার্‌বি একে বারে কি আমাদের মত পারবি ?

বে। আমাদের ভাই রান্না ঘরে যাবার হুকুম নাই। রান্না ঘরে গেলে সকলে রাগ করেন। অসুখ কর্‌বে আগুণ তাতে ধোঁয়া লেগে।

সু। আমি কত কি রাঁধিতে শিখিছি! লুচি, রুটি বেলা শিখিছি ; কোন কোন দিন আমি মাকে বা ল কুটনো কুটে দি। এখন আমি পান সেজে না দিলে বাবা পান খান্‌না। আর কেউ সাজ্‌লে বলেন সুশীলার পান সাজার মত কোন পান এত ভাল লাগে না।'

বে। তুই তাই কত কায শিখিছিস্‌, আমি ভাই কিছুই জানি নি।

সু। এইবার থেকে শিখিস্‌। এক দিন ভাই চড়ি ভাতি কর্‌বি ? তুই তো রাঁধতে জানিস্‌ নি—আমি রাঁধব এখন।

বে। 'চড়ি ভাতি' কাকে বলে ভাই ? চড়াই পাখিকে ভাতে দেয় ? না ভাই ও সব কর্‌বো না। কই চড়াই পাখীত কখন খাইনি ? বরং পাঁটা টাঁটা খেয়েছি, অন্য পাখী টাকী খেয়েছি, চড়াইত কখনও খাইনি ? তুই কখন পেরু খেয়েচিস্‌ ? বেশ লাগে ভাই।

সু। "চড়ি ভাতি" বুঝি চড়াই পাখি খাওয়া ? আমোদ আহ্লাদ

করে সকলে কিছু কিছু দিয়ে সব মেয়ে ছেলে মিলে বসে খাওয়া ; কোন মেয়েকে রাঁধিতে হয়। রান্না যগ্‌গির মত নয় বাড়ীর মত ও নয় ছোট খাট রান্না। কোন রান্না আধ সিদ্ধ কোনটায় হলুদ বেশী এই 'চড়ি ভাতি'। চড়াই পাখার সম্পর্ক নেই এই চাল ডাল আলু, পটল নিয়ে রান্না। তুই কত কি পাখীর নাম কল্লি পেরু কি ভাই ? কখনও শুনি নাই ত।

বে। চড়ি ভাতি কর্‌ব কিনা মাকে জিজ্ঞাসা করে এসে বলে যাব এখন। মা যদি রান্না শুনে রাগ করেন ?

সু। তুইত আর রাঁধবিনি ? তা রাগ কর্‌বে কেন ? তা যা জিজ্ঞাসা করে আয়।

বে। তবে ভাই যাই।

সমাজ কলঙ্ক।

(মৃত্যু সংশ্লিষ্ট আচার বিষয়ে)

মৃত্যুর সহিত শোকের ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক, এবং শোকের সহিত আনন্দের যে নিতান্তই বিরুদ্ধ সম্বন্ধ ইহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। জরাজীর্ণ, চিরব্যাধিগ্রস্ত, অর্থাভাবে প্রপীড়িত, বিপদজালে বিজড়িত ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে জীবনভার দুর্ব্বিষহ বোধ হইতে পারে, দুঃখ-বাদী নাস্তিক, পরলোক-বিশ্বাসী পুণ্যাত্মা, বা নির্ব্বিকার মহাজ্ঞানীর নিকট মৃত্যু শোচ্য না হইতে পারে, নরহন্তার মৃত্যুদণ্ড সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যে সমাজে মৃত্যুর ন্যায় নিরানন্দ-ময় ঘটনার সহিত আমোদ বা কদাচারের কোনরূপ সংযোগ থাকে, যে সমাজ মুমূর্ষু ব্যক্তির শেষ মুহূর্ত্তের কায়িক বা মানসিক যন্ত্রণার

অনুমাত্র অযথা বৃদ্ধি করে, সে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ যে বর্ব্বর নিষ্ঠুর অথবা হৃদয় বিহীন, এ বিষয়ে বোধ হয় সভ্য সমাজে মত দ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু বলিতে সঙ্কোচও হয় দুঃখও আসে যে আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে এইরূপ নীতি ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য অহরহঃ সংসাধিত হইতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিনা এবং প্রতীকারেরও কোন চেষ্টা করি না। ঘরের কথা বাহির করার ন্যায় অপ্রীতিকর কার্য্য আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই অতীব লজ্জাকর বিষয় প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

দুরারোগ্য বা সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির রোগমুক্তি বা পাপ-শান্তির উদ্দেশে বঙ্গসমাজে বহুকাল হইতে প্রায়শ্চিত্ত প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতই হউক, বা কালের দোষেই হউক, অথবা প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান অন্যান্য অঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া অনেক সময়ে, কেবল মাত্র জনৈক যাজক ব্রাহ্মণকে, নিয়ন্তার সহিত মধ্যস্থতার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থদানে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই হউক, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের ফলাফল সম্বন্ধে বিশ্বাস বা এই অনুষ্ঠানের প্রতি আস্থার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। আর রোগীর মতামতের অপেক্ষা না করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত না হইলে শববাহকেরা মৃতদেহ স্পর্শ করিতে আপত্তি উত্থাপন করিবে, কেবল এইমাত্র আশঙ্কায়, মৃত্যু আসন্নপ্রায় হইলেই অধিকাংশ স্থলে, এই ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে বলিয়া এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটী পূর্ব্বানুষ্ঠান বলিয়াই জন-সাধারণের নিকট বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের নাম উচ্চারিত হইলেই পীড়িত ব্যক্তি যে শ্মশানের চিতাগ্নিশয্যা তাহার মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান দেখিবে এবং সংসারে মায়া বন্ধন জন্য দরদরিত

ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া জীবন্মৃত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু তখন পীড়িত ব্যক্তির মনঃক্লেশ নিরাকরণ অপেক্ষা, তাহার দেহটীকে প্রায়শ্চিত্তরূপ ডিস্ইন্‌ফেক্‌শন্ ব্যবস্থা করিয়া শববাহক-দিগের স্পর্শ যোগ্য করাই অধিকতর কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনগণ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন! রোগীর যমযন্ত্রণা দিবস বা ঘটিকা কয়েক পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইলেই বা ক্ষতি কি? এখন সমগ্র সভ্য জগৎ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অতি পাষণ্ডেরও মরণ-যাতনা অত্যল্পতম কাল স্থায়ী করিবার জন্য ব্যগ্র, আর আমরা লোকাচার বা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের প্রিয়তম জনগণের প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহি, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে! আর যখন এই প্রায়শ্চিত্ত বা ডিস্ইন্‌ফেক্‌শন্ কার্য্যে দ্বিগুণ মূল্য দানের প্রলোভন দেখাইলেই, মৃত্যুর পরে উক্তকার্য্যকারী ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টচিত্তে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তখন এই অনুষ্ঠানে আস্থাহীন মমূর্ষু ব্যক্তিগণের কণ্টকময় পীড়িত শয্যা অধিকতর কণ্টকিত করা নিতান্তই অনাবশ্যকীয় পাশবাচার বলিয়া বোধ হয়। এবং যাহারা ধর্ম্মাচরণের পবিত্র নাম কলুষিত করিয়া, এই নির্দ্দয়ানুষ্ঠানে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাহাদের যেন স্মরণ থাকে যে পরজগতে যদি কেহ পাপাচরণের দণ্ড-বিধান-কর্ত্তা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট তাহাদের এই শোচনীয় পরামর্শ দান জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

প্রাচীন বয়স্ক মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণকে স্বজ্ঞানে তীরস্থ করিবার যে প্রথা আছে, তাহাও এক্ষণে অনেক স্থলে পীড়িতদিগের শেষ যন্ত্রণা পরিবর্দ্ধনের একটী নিষ্ঠুর উপায় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রাণ প্রবীণ ব্যক্তিগণ অন্তিম সময়ে সংসার-কোলাহল-পরিশূন্য পতিতপাবনী জাহ্নবী-তীরে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত ভগবৎ-

চিন্তায় যাপন করিবার ইচ্ছা সাগ্রহে ও আনন্দ চিত্তে প্রকাশ করিতেন। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে এক্ষণে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের ন্যায় ভাগীরথীর পূতনীরে অবগাহন করিয়া জগজ্জননীর পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহত্যাগাভিলাষী জনগণের সংখ্যা অতীব বিরল হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে সংসারমায়াবদ্ধ বিষয়ী ব্যক্তিগণ অধিকাংশ স্থলেই জীবিতাবস্থায় আবাস ভবন হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। গঙ্গাবাস করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহবা নাস্তিকতা অপবাদ ভয়ে মনের কষ্ট মনেই গোপন রাখিয়া নিরুত্তর থাকেন, কেহ বা আত্মসংযমে অপারক হইয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পীড়িত শয্যা অশ্রুসিক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের অন্তরে তখন "বৃদ্ধকে ঘরে মারিয়াছে" এই ভাবী লোকাপবাদ ভীতিই একমাত্র চিন্তা। তাঁহারা পীড়িতের নিষেধ বাক্যকে মতিভ্রান্তের প্রলাপ স্থির করিয়া, তাঁহার অস্ফুট বিলাপাশ্রুর প্রতি দৃকপাত না করিয়া সেই ব্যাধিক্লিষ্ট স্পর্শমাত্রসহনাক্ষম, অস্থিকঙ্কালাবশিষ্ট দেহ হইতে, হয়ত পথিমধ্যে প্রাণবায়ু বাহির করাইয়া দেন, নতুবা নানাবিধ অভাব পরিপূর্ণ সুস্থ ব্যক্তিরও বাসের অনুপযোগী, (কলিকাতায় জন কোলাহল পরিবেষ্টিত) কোন একটী গৃহে লইয়া গিয়া পীড়িতের অবশিষ্ট দিবস বা মুহূর্ত্ত গুলিকে সংক্ষেপ করিয়া আনেন। আবার তীরস্থ ব্যক্তিকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, ঘটনাক্রমে গঙ্গাবাসী পীড়িতদেহে আরোগ্য চিহ্ন লক্ষিত হইলে, কোন কোন নরপশুরা তাঁহার "পাট" করে। অর্থাৎ স্নান ও পীড়াবর্দ্ধক আহারাদি করাইয়া তাঁহার অচিরমৃত্যুর ব্যবস্থা করে!!! আততায়ীকে হত্যা করিলে তাহার দণ্ড মৃত্যু, কিন্তু নিরপরাধ আত্মীয় স্বজনের যাহারা এরূপ অপমৃত্যুর ব্যবস্থা

করে তাহাদের কি শাস্তি নাই ? যাহারা লোকাপবাদ ভয়ে বা লোকাচারের বশীভূত হইয়া আপনাদের পিতা, পিতামহের মৃত্যু যন্ত্রণার বৃদ্ধি করে, বা জীবনের শেষ সময়ে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আনয়ন করে তাহাদের, ও যে সমাজ এই নিষ্ঠুর আচরণকে প্রশ্রয় দান করে, সে সমাজের মঙ্গল অসম্ভব।

তাহার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। কবি বলেন শ্মশান অতি পবিত্রস্থান; শ্মশানে আসিলে অতি পাষণ্ডেরও মনে ধর্ম্মভীতি উপস্থিত হয়। কথাটী সর্ব্ববাদী সম্মত, কিন্তু পাঠকের যদি কলিকাতার শ্মশান ঘাটদ্বয়ে (অন্যত্রের অবস্থা আমরা সবিশেষ অবগত নহি) গতিবিধি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ঐ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করিবেন। আজ কাল সুরামত্ত নরপিশাচদিগের অট্টহাস্য, নৃত্যগীত, এবং পাশবাচারে শ্মশান ভূমি এরূপ কলুষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যে দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং ব্যথিত হইতে হয়। মনে হয় সুরা মানবকে পশুত্বে পরিণত করে ইহাইত জানিতাম; কিন্তু এ—কি! এই হিন্দুকুল কলঙ্কেরা ত পশু নয়,—পশুদেরও স্বজাতীয় মৃতের প্রতি সহানুভূতি আছে, ইহারা যে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত কোন জীব!

আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এক্ষণে শববাহন কার্য্যে, অতি নিকটাত্মীয় বা পরমবন্ধু ব্যতীত অন্য কেহ সহজে অগ্রসর হয়েন না। আর যদি বা কেহ হয়েন, আমাদের অধিকতর দুর্ভাগ্য যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই প্রধান প্রলোভন মদ্যপানলাভ। যদি মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ মতিস্থির রাখিয়া, দাহ কার্য্য সমাপ্তির পর শেষোক্ত মহাত্মাগণের পুরস্কারাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা যদি তাঁহারা শোকবিহ্বল বা কৃতজ্ঞতাভারে প্রপীড়িত হইয়া উঁহাদের অনুরোধ সৎকারের পূর্ব্বেই রক্ষা করেন, অথবা যদি মৃত ব্যক্তির পুরুষাত্মীয়ের

অভাবে উক্ত মহাত্মারাই দাহ ক্রিয়ার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হয়েন তবেই প্রতুল।" হয় ত মৃতদেহ অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় চিতাশয্যায় শয়ান রহিল, আর ঐ মহাপুরুষদের মধ্যে কেহবা ধরণী পৃষ্ঠে লম্বমান হইলেন, কেহবা অকথ্য কুকথ্য ভাষায় আপনাদের সহৃদয়তার পরিচয় দিতে লাগিলেন, আর কেহবা অচিরাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সঙ্গীদিগকে জগতের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তার স্বরে গান ধরিলেন "শেষের সে দিন মন" ইত্যাদি।

মদ্যপায়ীদিগের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে অনুপযোগী যদি কোন স্থান পৃথিবীতে থাকে, তাহা এই চিতাধুমে প্রধুমিত শ্মশান ভূমি। অথচ তাহারা যে কেন এই স্থানে আসিয়া তাহাদের বীভৎস আমোদে মত্ত হয় তাহা আমাদের বোধ শক্তির বহির্ভূত। শোকতাপজনিত অন্তর্দাহের তীব্র যন্ত্রণা, কোন কোন দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি সুরার মত্ততায় নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাদের পক্ষে ত সে যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, কারণ অপ্রমত্ত অবস্থাতেই ইহারা শব সম্মুখে, এরূপ নিতান্ত অসঙ্গত হাস্যরসোদ্দীপক কথোপকথনের স্বাভাবিক ভাবে অবতারণা করিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়, এবং দাহ কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিবার জন্য, বা অকারণে চিতাশায়িত মৃতদেহকে এরূপ নির্ব্বিকার বা নির্দ্দয় ভাবে সঞ্চালন ও আঘাতাদি করে, যে তাহা দেখিয়া মনে হয়, ইহারা গঙ্গাপুত্রের কার্য্যেরই একমাত্র উপযোগী। একেত প্রিয়জনের দেহ হইতে জীবনালোক নির্ব্বাপিত হইলেই তাহাকে অস্পৃশ্য বা ঘৃণ্য পদার্থের ন্যায়, গোময়াদি সিঞ্চনে বাটী হইতে বিদায় দান করা একটী কষ্টকর ব্যাপার, তাহার পর শান্তির শীতল ক্রোড়ে চিরনিদ্রাগত প্রিয়জনকে চিতার উত্তপ্ত কাষ্ঠ শয্যায় শয়ান অবলোকন করা আমাদের চর্ম্মচক্ষের আর একটী পীড়াদায়ক

কার্য্য, ইহার উপর দগ্ধগাত্র শবের প্রতি জঘন্য ব্যবহারে ঐ দৃশ্য ভীষণতর করিলে যে আমাদের মর্ম্মক্ষত কিরূপ লবণাক্ত করা হয় তাহা হৃদয়বান পাঠক মাত্রেই অনুভব করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞানাভিমানী হিন্দু সমাজ যে তাঁহাদের শ্মশান ভূমির পবিত্রতা মদ্যপদিগের পৈশাচিক আচরণে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও, প্রতিবিধান বিষয়ে নিশ্চেষ্ট, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

পরিশেষে আদ্যশ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় সন্তান সন্ততির দেবার্চ্চনা, তদুপলক্ষে দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে দান ও ভোজন, এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সমবেদক আত্মীয় বন্ধুগণের সম্মিলন ও আত্মীয়তা পরিবর্দ্ধনের জন্য একত্র ভোজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ পবিত্র এবং নিরানন্দময় অনুষ্ঠানেও অপবিত্রতা এবং ঘৃণিত ভাব প্রবেশ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মৃত্যুর সহিত আমোদের এরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে উভয়ের একত্রকল্পনা বীভৎস রসের উৎপাদক। কিন্তু কোন পুত্রপৌত্রবান প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু সমাচারে, "ওহে একটা শ্রাদ্ধ পাকিয়াছে" রূপ সহাস্য-বদন-নিস্থৃত বাক্য শ্রবণগোচর করা আমাদের দৈনিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; আর কোন সামান্য রূপ সঙ্গতিপন্ন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিরও মৃত্যু হইলে তাঁহার শোক বিধুরা বিধবা পত্নী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠদিগের, শ্রাদ্ধের অন্যান্য অনুষ্ঠান সংক্ষেপ বা বিবর্জ্জিত করিয়া আপনাদের চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহারের প্রীতচিত্তে আয়োজন করা যে অতীব নিন্দনীয় কার্য্য, ইহা আমাদের ভ্রমেও মনে আসে না। হায়! আমাদের মিষ্টান্ন-বুভুক্ষা কি এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ইহার অনুরোধে আমরা মনুষ্যত্ব একেবারে বিস্মৃতির জলে ভাসাইয়া দিয়াছি!

একক্ষণে সভারোহণ ব্যাপারটির উল্লেখ করিলেই আমাদের ব্যক্তব্যের শেষ হয়'। যদি কোন হৃদয়বান বিদেশীয় ব্যক্তি আমাদের কোন সমারোহ শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হন, এবং সেই কামিনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি-মুখরিত প্রাঙ্গণে, উৎফুল্ল নেত্রে শত শত বালক যুবা বৃদ্ধকে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা প্রাঙ্গণশোভা রূপসীগণের নয়ন-বিমোহন হাব ভাব ও বিলোল কটাক্ষে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উপবিষ্ট দেখেন, তিনি নিঃসন্দেহ মনে করিবেন যে ইহা বিবাহ কিম্বা আর কোন আনন্দোৎ-সব সভা। তাঁহাকে যদি বলা যায় যে ইহা আনন্দোৎসব নহে, কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শোক সভা, তিনি বিস্মিত হইবেন। আর যদি তাঁহাকে ঐ অপ্সরিগণ সমাজের কোন শ্রেণীভুক্তা তাহার প্রকৃত পরিচয় দানকরা যায়, তাহা হইলে, ঐ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মনে কুচিন্তার অভাব, গীতগুলি হরিনাম কীর্ত্তন, ইত্যাদি কোনরূপ ওজর আপত্তিতে কর্ণ-পাত না করিয়া, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে এই সমাজের ন্যায় নীচ ও অপবিত্র সমাজ সভ্য জগতে আর নাই। পাঠক আসুন আমরাও সেই ধিক্কার বাক্যের প্রতিশব্দ পরস্পরে গলাধঃকরণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

বিষম দম্পতী।

১

পত্নী সদা ছোট হয়
পতি বড় নিঃসংশয়
বয়স ও আকৃতিতে বটে ;
বিপরীত মোর ভালে
বয়সেও ছোট হ'লে
পত্নী মোর লম্বা, আমি বেঁটে।

২

এ আমার বড় দুঃখ
সংসারে নাহিক সুখ
যত মন্দ আমারই ঘটে ;
সেই "সার" সংসারেতে
আমি "সং" তা'র হাতে
তাহারি হুকুমে খাঁরি খেটে ;
কারণ সে লম্বা, আমি বেঁটে।

৩

যদি বা সে ভালবেসে
চায় মুখ পানে হেসে
তাহাতেও তৃপ্তি নাই মোটে ;
শতধিক্ বিধাতায়
নাগাল না পেনু হায়,
চুমিতে সে মিশি মাখা ঠোঁটে
কারণ সে লম্বা, আমি বেঁটে।

৪

আছে তার গলগণ্ড
সেই মোর সুধাভাণ্ড
কায়ক্লেশে তথা মুখ ওঠে ;
মনু সাধ মিটাইতে
চুমি তাই আচম্বিতে
দুগ্ধ স্বাদ ঘোলে যথা মেটে ;
কারণ সে লম্বা, আমি বেঁটে।

৫

যখন বচসা হয়
সেই সদা লভে জয়
কাঁপি তার তাড়নার চোটে ;
কথা কই মৃদু স্বরে
সে চেঁচায় বড় জোরে
জয় ঢাক যেন বেজে ওঠে ;
কারণ সে লম্বা, আমি বেঁটে।

৬

সে যেন গো প্রভু মম
আমি ক্রীতদাস সম
ভয়ে ভয়ে থাকি পাছে চটে ;
ঝাঁটা ধরে অদ্যাবধি
বাড়ীতে আসিতে যদি
ভুলে কভু রাত হয়ে ওঠে
কারণ সে লম্বা আমি বেঁটে।

৭

মোরে দেন বাসি পান
নিজে সদ্য-সাজা খান
আমিই সাজিয়া দিই বটে ;
যদি কোন কথা বলি
তেড়ে আসে বঁটি তুলি
এমনই বুদ্ধি তার ঘটে ;
কারণ সে লম্বা, আমি বেঁটে।

৮

সে যদি মরিতে চায়
আপদ চুকিয়া যায়
দিই দড়ি কলসি নিকটে ;
দেখে দেখে তার গুণ
ইচ্ছা হয় করি খুন্
তেমন যে বাগ্ নাহি জোটে ;
কারণ সে লম্বা, আমি বেঁটে।

৯

বলিতে যে করে ভয়
যদি লম্বা ক'রে দেয়
শুনিয়া সে প্রহারের চোটে ;
গুমুরে ফাটিছে বুক
এ মিলনে কোথা সুখ
জীবন যেতেছে বৃথা কেটে :
কারণ সে লম্বা, আমি বেঁটে।

বি-শ্রীবেঁটে কবি।

শেষ-প্রতিমা।

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন মানুষ এক প্রকার মূর্খ ছিল ; অর্থাৎ তাহারা সময়ের সিকি অংশ অর্থোপার্জ্জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া অবশিষ্ট কাল বৃথা নষ্ট করিত। সেই সময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক তন্তুবায় বাস করিত। তাহাদিগকে পল্লীর সকলে ভাল বাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত।

তন্তুবায়ের একটি পুত্র ছিল। সকলে তাহাকে অপদার্থ জ্ঞান করিত এবং তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশ দুর্ভেদ্য কালমেঘ সমাচ্ছন্ন বলিয়া সকলে এক প্রকার স্থির করিয়াছিল। যদি সে কখন জ্ঞানী ব্যক্তির সন্নিধানে উপস্থিত হইত তাহা হইলে সে নীরব থাকিত ; অথবা বাক্যালাপ কালে সে শ্রোতৃবর্গকে স্বীয় অশোধনীয় মূর্খত্বের প্রমাণ দিতে ত্রুটি করিত না। কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে বিপরীত ভাবে দেখিত। তাহার সঙ্গিগণের মধ্যে কেহই উহার ন্যায় উচ্চ

হাসিতে, অধিক সুরাপান অথবা প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিত না। এই সকল কারণে সঙ্গিদিগের নিকট সে সমধিক সমাদৃত হইত।

পুত্রকে জাতীয় ব্যবসা শিখাইবার এবং সৎপ্রকৃতি বিশিষ্ট করিবার জন্য তাহার প্রশ্রয়দাতা পিতার শত অনুরোধ এবং স্নেহময়ী জননীর অজস্র অশ্রুজল বৃথা হইয়াছিল। বালক এ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিল।

অবশেষে যখন তাহার পিতামাতার সমগ্র অবেদন বৃথা হইল সেই সময় হঠাৎ তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। যদিও সে তাহার অভ্যাস গুলি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বৃথা আমোদ আহ্লাদ ব্যতীত যে আর কিছু আছে সকলে এতদিনে তাহা বুঝিয়াছিল। তখন হইতে প্রতি রজনী সে তাহার বন্ধুদিগের সহিত কৌতুকে কাটাইত বটে কিন্তু দিবসে সে কখনও কাহারও সহিত মিশিত না। সেই সময় হইতে তাহাকে বাড়ীর পশ্চাতে একটি অশ্বশালার মধ্যে দিবসের সমস্ত অংশটুকু কাটাইতে দেখা যাইত।

কিছু দিন এইরূপে গত হইলে একদিন বালকের মাতা পুত্রের শয়ন-ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সেটিকে দেখিতে লাগিলেন; পরে উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

বৃদ্ধা ঘরের ধূলা পরিষ্কার করিতে করিতে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন "হায়! আমার সেই ছেলে?"

কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিবেশিগণ সেইরূপ অসংখ্য মৃত্তিকা মূর্ত্তি তন্তুবায়ের বাড়ীর নিকট হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

(২)

ঘটনাক্রমে একদিন সেই প্রদেশের জমিদার দরিদ্র তন্তুবায়ের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তন্তুবায়ের পূর্ব্ববাক্যানুযায়ী ফুলকাটা 'সামিয়ানার' নমুনা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

ভূস্বামী কুটিরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভগ্ন প্রতিমার একটি ক্ষুদ্র অংশ দেখিতে পাইয়া সেটিকে কুড়াইয়া লইলেন; এবং যত্নপূর্ব্বক উহা পরীক্ষা করিয়া বৃদ্ধকে উহার উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধ দুঃখের সহিত সহিত মাথা নাড়িতে নাড়িতে জানাইল যে উহা তাহার অপদার্থ পুত্রের কার্য্য। ভূস্বামী তাহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যুবক তৎক্ষণাৎ তথায় আনীত হইল। তিনি যুবককে এক পার্শ্বে লইয়া গেলেন। তখন উভয়ের মধ্যে অনেক ক্ষণ আলাপ চলিতে লাগিল। তৎপরে তিনি যুবকের সহিত অশ্ব-শালায় গমন করিলেন।

ভূস্বামী যুবককে প্রতিমা গঠন কার্য্যে প্রতিভা সম্পন্ন জানিতে পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি শীঘ্র এমন একটি লোকের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিবেন যাহার সাহায্যে যুবকের ভাস্কর-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন হইবে।

সেই সময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটি নগরে একজন খ্যাতনামা ভাস্কর বাস করিতেন। এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত অত্যধিক পরিমাণে কাঁপিত; এবং তিনি হস্তস্থিত 'বাটালী'কে কৃষ্ণ প্রস্তর খণ্ডের উপর ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু যৌবনকালে মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ড হইতে তিনি এমনি চমৎকার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন যে, কথিত আছে, সমস্ত ভারত-

বর্ষে তাঁহার কার্য্যের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হইত না। তাঁহার প্রস্তুত কার্য্য অধিক ছিল না বটে, কিন্তু তাহারা এরূপ সুন্দর ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, যে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত সেই বিস্মিত হইত। সেই প্রতিমাগুলি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এবং সমপরিমিত দৈহিক গঠনের দ্বারা যত দূর না দর্শক গণের চিত্ত বিনোদন করিতে পারিত, কেবল একমাত্র মুখের চমৎকার ভাবের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হইত। কারণ উহা মনোবৃত্তি উত্তেজনার নক্সা স্বরূপ হইয়া মানবের অন্তঃকরণে আঘাত করিত। ইহার দ্বারাই তিনি অন্যান্য চিত্রকরদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে একবার তাঁহার হস্তগঠিত প্রস্তর মূর্ত্তি সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত সে কখনই তাহা-দিগের হাস্য, ভ্রূকুটি, প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘৃণা প্রভৃতি যদ্দ্বারা তাহারা অনুপ্রাণিত হইত সেই ভাব ভুলিতে পারিত না। স্বাভাবিক মূর্ত্তি গঠনে তাঁহার এতাধিক শক্তি ছিল বলিয়া তিনি সকলের নিকট "ভাস্করাচার্য্য" নামে পরিচিত ছিলেন।

(৩)

পৌষ মাসের দারুণ শীতে এক দিন প্রাতঃকালে তন্তুবায় পুত্র অশ্বশালা মধ্যে একটি প্রতিমা কর্দ্দমসিক্ত করিতেছিল। যুবকের বদনে গত রজনীর কলঙ্কের দাগ তখনও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় নাই। নিদ্রাবেশে তাহার চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে মুদিত হইয়া আসিতেছিল। যুবক ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ উন্মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রভাত বায়ু ধীরে ধীরে তাহার ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল; কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণ কেশগুলি যুবকের মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। যুবক ত্বরায় আপনাকে সুস্থ বোধ করিল এবং পুনরায় প্রতিমাকে কর্দ্দমসিক্ত করিতে লাগিল।

যুবক ইতিপূর্ব্বে একজন ভাস্করের সহিত তাহাদিগের জমিদারের দ্বারা পরিচিত হইয়াছিল। এবং তাহারই সাহায্যে সে ইচ্ছানুযায়ী মূর্ত্তি সকলের নক্সা করিতে শিখিয়াছিল। তখন ঐ কার্য্যে এরূপ নিবিষ্ট চিত্ত হইয়াছিল যে সে সময় জনৈক ব্যক্তির আগমন সে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আগন্তুক দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ভাবে যুবকের মূর্ত্তিগঠনে একাগ্রতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

আগন্তুক দেখিতে লম্বাকৃতি। সুউচ্চ ভ্রূযুগলের শুভ্র কেশগুচ্ছ বার্দ্ধক্যের প্রমাণ দিতেছিল; এবং সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় লোমযুক্ত ভ্রূর নিম্ন হইতে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ এক খানি হরিদ্বর্ণ 'বালাপোষে' আবৃত; এবং দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ এক গাছি স্থূল যষ্ঠি ছিল।

"বালক, তোমার শিক্ষক কে?" অবশেষে বৃদ্ধ এই কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল।

যুবক চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু ফিরাইল এবং ধীর ভাবে প্রশ্নকারীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল "ভাস্কর অনন্তরাও।"

আগন্তুক পুনরায় বলিল "কিন্তু তোমার কার্য্য অনন্তরায়ের শিক্ষা-প্রণালীর মত নহে!"

যুবক উত্তর করিল "আজ্ঞে না; বস্তুতঃ তাহা নহে। যদিও অনন্তরাও আমার শিক্ষা-গুরু কিন্তু আমি অন্য একজনের অধিকতর ভক্ত।

"সে কে?"

যুবক উত্তর করিল "ভাস্করাচার্য্য।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া যুবকের হস্ত হইতে সেই ক্ষুদ্র প্রতিমাটি

গ্রহণ করিল। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে তুমি কোন বিষয় লইয়া কার্য্য করিতেছ?"

যুবক উত্তর করিল "পুণ্য।"

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল। তৎপরে মূর্ত্তিটিকে আলোর নিকট ধরিয়া বলিল "ইহার কাট মন্দ হয় নাই বটে, কিন্তু তুমি চক্ষে ও ভ্রূযুগলে বক্রভাব এবং নাসিকা ও ওষ্ঠদ্বয়ে গর্ব্বিত ভাব পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছ। ইহা সম্পূর্ণ নায়িকার উপযুক্ত হইয়াছে। বৎস, যদি তুমি শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে এরূপে হইবে না।" এই বলিয়া বৃদ্ধ হস্তস্থিত যষ্ঠির আঘাতে উহাকে চূর্ণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল।

যুবক অধীর ভাবে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিমা ধ্বংশকারীর মুখ প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনিই কি ভাস্করাচার্য্য!"

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ বলিল "লোকে আমাকে ঐরূপ বলিয়া থাকে বটে। তোমার আলমারির মধ্যে আমি কতকগুলি আদর্শ মূর্ত্তি দেখিতেছি। একে একে তুমি আমাকে সব গুলি দেখাও। যদি উহার মধ্যে এমন একটি মূর্ত্তি থাকে যাহা প্রশংসার যোগ্য তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও আমি তোমাকে আমার একমাত্র শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিব এবং ভবিষ্যতে তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে।"

আনন্দে যুবকের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

৪

যুবক তৎক্ষণাৎ অপর একটি মূর্ত্তি আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে ধরিল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বিষয় কি?"

যুবক উত্তর করিল "প্রেম।"

বৃদ্ধ বলিল "তুমি একটি আধুনিক পছন্দ করিয়াছ। তোমার উদ্দেশ্য কি ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি, পুত্র পিতার প্রতি, কিম্বা মানব মানবের প্রতি তাহাদিগের ভালবাসা প্রকাশ করা?"

যুবক বলিল "না, ইহা আত্মীয় আত্মীয়ের প্রতি অথবা মানব মানবের প্রতি তাহাদিগের ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য নহে।"

বৃদ্ধ বলিল "তবে ইহা প্রেম নহে! যদি তুমি ইহার নাম 'মোহ' রাখিতে তাহা হইলে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইত; এবং তোমার ইহা একান্ত উচিত ছিল।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ উহাকেও চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

তৎপরে যখন যুবক একে একে তাহার কল্পনাজাত সমস্ত আদর্শ মূর্ত্তি বৃদ্ধের নিকট ধরিতে লাগিল এবং একটির পর একটি সকল গুলিই প্রবীণ ভাস্করাচার্য্যের নির্দ্দয় যষ্টির আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন যুবক ভগ্ন মূর্ত্তি সকলের মধ্যে অধোবদনে হস্তদ্বয় যুক্তভাবে বক্ষোপরি রাখিয়া দণ্ডায়মান রহিল।

সেই সময় বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "কিহে, সমস্ত শেষ হইল নাকি? তুমি কি আমাকে সমস্তই দেখাইয়াছ?"

যুবক নির্ব্বাক। বড় বড় অশ্রুজল একে একে তাহার চক্ষু হইতে ভগ্ন মূর্ত্তি সকলের উপর পড়িতেছিল। তখন নিরাশার কালছায়া তাহার মুখ মণ্ডলে লক্ষিত হইতেছিল। বৃদ্ধ এতক্ষণ তাহাকে মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "বৎস! তুমি কি আমাকে সমস্তই দেখাইয়াছ?"

যুবক ভগ্ন কণ্ঠে বলিল "কেবল একটি মাত্র বাকী।" এই বলিয়া সে একটী সিন্দুকের নিকট গমন করিল; তার পর ধীরে ধীরে তন্মধ্য হইতে একটি মূর্ত্তি বাহির করিয়া আনিয়া বৃদ্ধের নিকট রাখিল।

এই শেষ উপহারটি একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। উহার শারীরিক গঠন সুন্দর এবং সমপরিমিত—অত্যধিক স্থূল কিম্বা অতিশয় ক্ষীণ নহে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল গোল এবং হস্তপদ ছোট ও মানান সই। কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উহার মুখের ভাব বড় সুন্দর ভাবে গঠিত। কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণ চুলগুলি সযত্নে পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত। ভ্রূযুগল অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছিল ; এবং উহা এতাধিক উচ্চতা প্রাপ্ত হয় নাই যাহাতে সৌন্দর্য্যের সীমা অতিক্রম করে ; অথবা এরূপ নিম্নভাবাপন্ন ছিল না যদ্দ্বারা উহা বুদ্ধিমত্তার হীনতা প্রকাশ করে। নাসিকা, কর্ণ, চিবুক নিখুঁত ভাবে খোদিত হইয়াছিল এবং ওষ্ঠ ও চক্ষুদ্বয়—হায় কে তাহা বর্ণনা করিতে পারে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে যুবক তাহার যাবতীয় গুণপনা এই স্ত্রীমূর্ত্তিতেই পরিস্ফুট করিয়াছিল।

(৫)

বৃদ্ধ ভাস্করাচার্য্য মূর্ত্তিটিকে অনেক অবধি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিল। সে উহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কখন আলোকে কখন ছায়ায় ধরিয়া দেখিতেছিল। তৎপরে সহাস্য বদনে বলিল "বৎস! তুমি আমাকে যত গুলি মূর্ত্তি দেখাইয়াছ তন্মধ্যে এইটি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ; কারণ ইহাতে তুমি মানব জীবনের একটি অতি ভয়ঙ্কর ছায়ার যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছ। ইহার শরীরগত সৌন্দর্য্য মানবের চিত্তাকর্ষণ করিবে ; ঈষৎ বিভিন্ন ওষ্ঠদ্বয় তাহার শুষ্ক হৃদয়ে আনন্দ বিলাইবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করিতেছে ; কিন্তু ঐ হাস্য, তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা! দেখিলে বোধ হয় যেন জলদেবী পদতলে হতভাগ্য নাবিককে ডুবিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। ইহার সমস্ত চাতুরী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৎস, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই! আমি তোমাকে ইহার নামের জন্য অনুরোধ করিব

না। কারণ নির্জীব মূর্ত্তি নীরব ভাষায় নিজ প্রবঞ্চনার পরিচয় দিতেছে।

"না! না! না!" যুবক উন্মত্তভাবে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "না তা নয়। হা ভগবান্! প্রবঞ্চনা, অমন কথা বলিবেন না!"

বৃদ্ধ ভাস্করাচার্য্য ভ্রূকুটি পূর্ব্বক বলিল "মূর্খ! তুমি পুণ্যকে নায়িকার ছাঁচে ঢালিয়াছ। পুত্রোচিত ত্যাগস্বীকার দেখাইবার ছলনায় প্রেমিকার বদন সাধারণ মানবের আকারে গঠন করিয়া জননীকে প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে; এবং এখানে তোমার ইহা ব্যতীত আর কি? প্রবঞ্চনা—নিশ্চয় প্রবঞ্চনা!"

যুবক ধীরে ধীরে বলিল "আমি এখনও ইহার কোন নাম দিই নাই। কিন্তু প্রভু! আমার নিবেদন শুনুন—অনেক দিন হইতে আমি এই ক্ষুদ্র পরিত্যক্ত অশ্বশালা মধ্যে কায করিতেছি। আপনি যে সকল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন এতদিন আমি উহাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। ঐগুলি আমার কল্পনা-প্রসূত; এবং উহাদিগকে আমি নানাকারে গড়িয়াছিলাম। উহারা অসম্পূর্ণ ছিল; কারণ আপনি আমাকে ইহাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এইটি—এইটি উহাদিগের সমতুল্য নহে। যাহাকে একদিন আমি ভবানী-মন্দিরে দেখিয়াছিলাম ইহা সেই জীবন্ত প্রতিমার নিখুঁত ছায়া! সেদিন আমাদের চারি চক্ষে সম্মিলন হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে ক্ষণিক। তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাহার সহিত কোনও বাক্যালাপ হয় নাই। যদিও তাহার নাম আমার নিকট অজ্ঞাত কিন্তু তদবধি সে আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছে। সেই অবধি তাহার মুখ সর্ব্বদা আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। যখন দিবসের কার্য্যে ব্যস্ত থাকি তখন মনে হয় সে যেন পার্শ্বে রহিয়াছে। রাত্রে নিদ্রা যাইলে সে স্বপ্নে দেখা দেয়; সে সময় তাহার সহিত আমার কত কথা হয়! সে সময় আমাকে সম্মুখে

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইয়া দেয়; এবং বলে যে ঐখানে আমার আশা সফল হইবে। কিন্তু হায়! আমি কিছু দেখিতে পাইনা। যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখন তাহার মধুর হাসি আমার হৃদয়ে বল আনিয়া দেয়। তাহার নিকট আমার কিছুই গোপনীয় নাই; আমার মূর্খতা এবং জ্ঞান সে সকলই জানে। আমি তাহার ছায়াকে ভালবাসি এবং জীবন্ত প্রতিমার অন্বেষণ করি।"

বৃদ্ধ বলিল "যদি তুমি সেই স্ত্রীলোককে পুনরায় দেখিতে পাইতে তাহা হইলে যাহাকে একদিন তুমি কল্পনার মোহময় চক্ষে দেখিয়াছিলে তাহা অপেক্ষা তাহার এই নির্জীব ছায়াকে দেখিয়া অধিকতর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতে। তুমি বলিলে তাহার নিকট তোমার কিছুই গোপনীয় নাই। কিন্তু সেও কি তোমাকে সেইরূপ ভাবে দেখিয়া থাকে?"

যুবক বলিল "হায়, না; যদিও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিয়া বোধ হইয়াছিল সেও দুঃখ এবং নিরাশায় কবলিত হইয়াছে। মনে হইয়াছিল যেন তাহারও জীবন আমার ন্যায় কেবল মাত্র একটি পরিমিত দিবসের সূর্য্যকিরণ এবং তাহার গাঢ় অন্ধকার ছায়া মাত্র।"

বৃদ্ধ সস্নেহে বলিলেন "বৎস! তোমার কাল্পনিক দেবী তোমাকে সত্যই জানাইয়াছিল; কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেও সময়ের কতকাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা ঘোর তমসাচ্ছন্ন।* যে এখন উজ্জ্বল আলোকরাশি মধ্যে ক্রীড়া কৌতুকে রত রহিয়াছে, তাহার সহিত ভবিষ্যতে মিলিত হইবার আশা অতি অল্প। তোমার গঠিত মূর্ত্তির জীবন্ত পদার্থ তোমার নিমিত্ত নহে।"

যুবক আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি আপনি তাহাকে জানেন'?"

বৃদ্ধ বলিল "আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি এবং তাহাকে ভালরূপ জানি। কিন্তু বেশ জানিও সে কথনই তোমার সহিত তাহার ভাগ্য সংশ্লিষ্ট করিতে সম্মত হইবে না।"

যুবক চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "কেন সে সম্মত হইবে না? আমি কি যুবক নহি? আমার হৃদয় কি উচ্চাভিলাষ শূন্য এবং প্রেম-বর্জ্জিত? এ সকল কি তাহাকে সুখী করিতে পারিবে না?"

"ইহাই যথেষ্ট নহে; সে তোমার হইবে না। ইহা"—বৃদ্ধ ভাস্করাচার্য্য প্রতিমায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ইহা তোমার পক্ষে আকাশ কুসুম।"

যুবক উদাস কণ্ঠে বলিল "তবে কি আমার সকল আশাই বৃথা?"

"নাও হইতে পারে! কিন্তু সে তাহাই বিবেচনা করিবে। বৎস, তোমার পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত; তোমাকে একাকী ঐপথে বিচরণ করিতে হইবে।"

(৬)

যুবক কতক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল "এতক্ষণে বুঝিলাম আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রভু! আমি এখন উহার কোন নাম দিব না। অজ্ঞাত নামে সে আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিতেছিল; অজ্ঞাত নামেই উহার ধ্বংস হইবে। আমি তাহার নির্জ্জীব প্রতিমাকে কথনই 'প্রবঞ্চনা' নামে কলঙ্কিত করিতে পারিব না।"

এই বলিয়া যুবক এক গাছি লাঠি উঠাইয়া লইয়া প্রতিমা ভাঙ্গিতে

উদ্যত হইল; কিন্তু বৃদ্ধের কঠিন হস্ত তাহাকে তৎক্ষণাৎ তৎকার্য্য হইতে বিরত করিল।

বৃদ্ধ বলিল "থাম! ইহা তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। এখন কেবল মাত্র তোমার ইহাকে নাম দিবার বাকী আছে, তাহা হইলেই তুমি জগতে বিখ্যাত হইবে।"

যুবক উদাস নয়নে তাহার শেষ প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে নিরাশার কৃষ্ণ ছায়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। অজ্ঞাতে তাহার হাত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল।

যুবক বলিল "আপনি ঠিক্ বলিয়াছেন; কিন্তু জগত কখনও জানিতে পারিবে না যে ইহা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। আমি ইহাকে মর্ম্মরের কঠিন আবরণ মধ্যে আবৃত করিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিব; এবং আজ হইতে ইহা আমার নিকট অধিকতর পবিত্রভাবে গৃহীত হইবে। আমি ইহার জীবন্ত প্রতিমাকে কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম; কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। এবং যাহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাকে নষ্ট করিব না। মর্ম্মর প্রস্তরের মধ্যে উহা স্থান প্রাপ্ত হইবে—ঐ শেষ প্রতিমা হায় আমার যৌবনের স্বপ্ন-রাণী!"

তৎপরে বাটালী এবং মুদ্গর লইয়া সে প্রতিমার মূলদেশে একটি নাম খোদিত করিল। ইহা শেষ হইলে যুবক টুলের উপর দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ ভাস্করাচার্য্য এতক্ষণ যুবকের কার্য্য দেখিতেছিল। পরে ধীরে ধীরে মূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইয়া যুবকের প্রদত্ত নাম পাঠ করিল।

"অদৃষ্ট!"

বৃদ্ধ ধীরপদে যাইয়া ক্রন্দন পরায়ণ যুবকের মস্তক হস্ত দ্বারা স্পর্শ

করিল; এবং উন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া সে বাহিরে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। বোধ হইল যেন দূর দূর অতীতে গিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ ভাস্করাচার্য্য তখন ঈষৎ হাসিল। কিন্তু সে হাসি আনন্দ অথবা ক্লেশ-জনিত নহে।

তৎপরে বৃদ্ধ ভূতলস্থিত ভগ্নমূর্ত্তি সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "বৎস! যদিও তোমার শিখিবার অনেক বাকী আছে, তথাপি ইহার দ্বারা—তোমার এই শেষ-প্রতিমার দ্বারা—আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি বৃদ্ধ ভাস্করাচার্য্যের শিষ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

কালিদাস প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাকবি কালিদাস যে অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন নিম্ন-লিখিত কথাটি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ভোজ নামে কোন বিখ্যাত নৃপতির সভায় কতকগুলি শ্রুতিধর ছিলেন। ইঁহারা যে প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে। তবে ইঁহাদের স্মরণ শক্তি অতি তীক্ষ্ণতা বশতঃ ইঁহারা যাহা শুনিতেন তাহাই তৎক্ষণাৎ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এজন্য ভোজরাজ এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ আমার সভায় উপনীত হইয়া নূতন কবিতা শুনাইবেন তিনি লক্ষ মুদ্রা পাইবেন। এই পারিতোষিক লাভ মানসে অনেক পণ্ডিত দেশ বিদেশ হইতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেমন শ্লোক আবৃত্তি করি-তেন অমনি সভার পণ্ডিতেরা ইহা আবৃত্তি করিতে থাকিত এবং পুরাতন শ্লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিত। সুতরাং নবাগত পণ্ডিতেরা

পারিতোষিকের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ম্লান মুখে বিদায় গ্রহণ করিতেন। কালিদাস ভোজনৃপতির এইরূপ চাতুরীর কথা শুনিয়া উক্ত নৃপতির রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজসভায় উপনীত হইয়া অন্যান্য শ্লোক আবৃত্তির পর নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন, যথা,—

> স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
> পিতা তে মে গৃহিতা নবনবতি যুতা রত্ন কোটির্ম্মদীয়া।
> তাং ত্বং মে দেহী তুর্ণং সকলবুধজনৈঃ জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
> নো বা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতমিত্তিদেহি লক্ষং ততো মে॥"

অর্থাৎ, ভোজনরপতি! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি ত্রিভুবন বিজয়ী, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। আপনার পিতা আমার নিকট হইতে ৯৯ কোটী স্বুবর্ণ মুদ্রা লইয়াছিলেন। অতএব শীঘ্র আপনি তাহা আমাকে অর্পণ করুন। আর আগনার সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতেরাই একথা অবগত আছেন। যদি তাঁহারা একথা না জানেন তবে আমি একটী নূতন কবিতা বলিয়াছি ইহার জন্য আমাকে অন্ততঃ লক্ষমুদ্রা প্রদান করুন।"

সভাস্থ পণ্ডিতেরা কালিদাসের শ্লোক শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন দুই দিকেই বিপদ। ভোজনৃপতি ঋণী ইহা বলিলে বিপদ। আবার ইহা নূতন শ্লোক বলিলে নৃপতির কালিদাসকে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ দিতে হইবে। অবশেষে তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে কালিদাস নূতন শ্লোক রচনা করিয়াছেন। কালিদাস ভোজনৃপতির নিকট হইতে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে কালিদাস ভোজনৃপতির সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে অতি সামান্য কথায় পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর কালিদাসের ধীশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক অন্য বিবরণের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

মহাকবি কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিভাত। তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই সুমধুর শব্দবিন্যাস, সুন্দর উপমা ও চমৎকার স্বভাব-বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাঁহার সামান্য শ্লোক গুলিও শ্রুতি সুখকর ও আড়ম্বর শূন্য; নিম্নে কয়েকটী শ্লোক দেওয়া গেল।

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর কোশলা॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং।
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

পাঠক দেখিবেন যে প্রত্যেক পংক্তির প্রথম অক্ষরগুলি লইলে 'যরইন' পদ নিষ্পন্ন হয়।

কালিদাসকে এমন একটী শ্লোক রচনা করিতে বলা হয় যাহার শেষ চরণে "সিন্দুর বিন্দু বিধবা ললাটে" হইবে অথচ প্রত্যেক পদটী যেন এক একটী প্রশ্নের উত্তর হয়। কালিদাস মূহূর্ত্ত মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন। যথা :—

"কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং ?
কা রৌতি দীনা মধু যামিনীষু ?
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশ ?
সিন্দুর বিন্দু বিধবা ললাটে॥"

অর্থ। বরবর্ণিনীগণের লালাটে কি শোভা পায়? উত্তর—সিন্দুর বিন্দু।
বসন্ত যামিনীতে কোন্ স্ত্রীলোক রোদন করে ? উত্তর--বিধবা।
মহাদেব চন্দ্রকে কোথায় ধারণ করেন? উত্তর—ললাটে।

আবার সকল উত্তরগুলি মিলিত হইলে "সিন্দুর বিন্দু বিধবা ললাটে" হইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় এইরূপ কবিতা যুদ্ধে কালিদাস সর্ব্বদাই জয়ী হইতেন।

অতঃপর দ্ব্যর্থ শ্লোক। কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে ইহার উদাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে।

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।"

পিতরৌ অর্থে পিতা মাতা পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর। আবার পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ অর্থাৎ হর ও হরি বুঝাইতে পারে।

কালিদাসের যমক রচনা অতি উত্তম। তৎপ্রণীত নলোদয় গ্রন্থে তিনি শব্দালঙ্কারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যমক রচনা কতকাংশে শ্রুতিকটু হওয়া সম্ভব। তাঁহার রচনা শ্রুতিকটু হয় নাই। বরঞ্চ স্থানে স্থানে শ্রুতি মধুর হইয়াছে। নিম্নে দুই একটী উদাহরণ দেওয়া গেল—

"শশিনা সমহা সমহা নগরে জনতা সমহা সমহাস্তামুদং।
অতিভাসুর যাসুর যাব্যহরদ্ব্যতশেৎ পুরযাসুরযাগমপি॥"
ন সমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

শ্রুতিবোধক নামক গ্রন্থে তিনি ছন্দ সকলের লক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও শ্রুতি সুখকর। তিনি সেই গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

"ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে।
তমহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধম বিস্তরম্" ।

বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থখানি শ্রবণ করিবা মাত্রই ছন্দ সকলের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। অর্থ বুঝিতে কষ্ট বোধ হয় না। ভট্টিকাব্যের ন্যায় দুরূহ শব্দ ও কষ্ট কল্পনা ইহাতে নাই। ইহাই কালিদাসের রচনার বিশেষ গুণ।

কালিদাসের শ্লোক শুনিতে যে অত্যন্ত মধুর লাগে তাহা আর উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যিনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রভৃতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তিনিই পূর্ব্বোক্ত কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

কালিদাসের উপমা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কালিদাসের উপমা বিষয়ে এই রূপ কথিত আছে—

"উপমা কালিদাসস্য, ভারবেঃ অর্থ গৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং, মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥

তিনি সংক্ষেপে এরূপ উপমা সঙ্কলন করেন, যে তাঁহার উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যদিও তাঁহার উপমার বিষয় গুলি লোক সিদ্ধ, তথাপি তাহাতে কোনও রূপ দোষ লক্ষিত হয় না। তিনি তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যের উমা চরিত্র সৃষ্টির বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বোপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন
যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না
দেকস্থ সৌন্দর্য্যাদিদৃক্ষয়েব॥"

অর্থাৎ "বোধ হয়, বিশ্ব স্রষ্টা একাধারে অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য সমাবেশ দর্শন করিবার মানসেই (পদ্ম, চন্দ্র প্রভৃতি) যাবতীয় উপমা-দ্রব্য (তদীয় শরীরের) যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন"।

বোধ হয় কালিদাসও উপমা সঙ্কলন কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বসাইয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট উপমা থাকায় যেন মণি-কাঞ্চনের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহার উপমা

গুলি কেবল বাছিয়া বাছিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলে সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় ও রচনার মাধুর্য্য নষ্ট হয়। আরও সে গুলি এত অধিক যে এস্থলে দেওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক গ্রন্থেই ভুরি ভুরি উপমা পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

ফুলের সাজি।

অতীত-স্মৃতি

অতীতের স্মৃতি উঠিতেছে মনে,
পাগল করিছে পরাণ মোর;
কুমুদ যেমন চন্দ্রমা বিহনে
নয়নে সতত ঝরিছে লোর।

সহিতে না পারি দুঃসহ যাতনা,
তাহার বিহনে সব আঁধার!
কি যেন কি ছিল কি যেন কি নাই;
এখনো হৃদয়ে স্মৃতি তাহার।

ভাবি নিরজনে বসিয়া যখন;
কে যেন হৃদয়ে উদয় হয়;
দেখিতে দেখিতে বিদ্যুতের গতি,
সে যেন আবার কোথা লুকায়।

সেই একদিন গিয়াছে এখন
আসিবে না তাহা ফিরিয়া আর;
অভাগা কেবল কাঁদিতেই আছে,
বহিতে বিফল জীবন ভার।

কোথা সে এখন গিয়াছে চলিয়া,
স্মৃতি তা'র জাগে মানস পটে;
সেই রূপরাশি থাকিয়া থাকিয়া,
এখনও মম হৃদয়ে ফোটে।

এখনো তাহার সুধাময় বাণী,
শ্রবণে আমার পরশে যেন;
সকলি চলিয়া গিয়াছে তাহার,
স্মৃতি টুকু এবে না যায় কেন।

যেদিন শ্মশানে করিয়াছে ছাই,
মম হৃদয়ের হৃদয়-ধনে;
সেই দিন হ'তে সেজেছি সন্ন্যাসী
বিসর্জ্জিয়া সুখ সংসার সনে॥

শ্রীচন্দ্র কুমার বসু।

শুধু।

শুধু, পরাণে তোমার, চাহিয়া দেখিব
 কত প্রেম লেখা আছে ;
আমি, লইব না কিছু, বিলাইয়া যাব
 হৃদয় তোমার কাছে ; [এসেছি
আমি, কাঁদা'তে আসিনি, কাঁদিতে
 রোদন করিয়া যাব ;
আর, জনমের মত, স্মৃতিটী তোমার,
 হৃদয়ে গাঁথিয়া লব।
আমি, আঁধার হইতে, আলোকের মাঝে
 আসিয়া পড়েছি ভুলে,
তুমি, দুটো কথা কয়ে, বারেক চাহিলে
 আবার যাইব চলে।
আমি, বহুদিন পরে, বলিতে এসেছি
 আকুল মরম-কথা,
শুনিতে আসিনি, সোহাগের গীত,
 আসিনি'ক দিতে ব্যথা !
শুধু, তৃষিত হিয়ার, উচ্ছ্বাস শত
 করিবারে অবসান ;
ব্যথাময় বুকে, রয়েছি দাঁড়া'য়ে
 লয়ে যাও এসে প্রাণ।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

নিরাশায়।

১

অনন্ত বিস্তৃত মহাসাগরের তীরে
 ম্লান দিবা আসিছে নিবিয়া,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী নামে সন্ধ্যা ধীরে
 অন্ধকার অঞ্চলে বাঁধিয়া !

২

ক্ষুদ্র তরণীরপরে বসিয়া একেলা—
 যেতে হবে দূর পরপারে,
করাল মৃত্যুর মত নাচে উর্ম্মিমালা
 আমারে ঘেরিয়া চারিধারে।

আশে পাশে শ্বাস ফেলে উন্মত্ত পবন
 মরণের বারতা বহিয়া,
মাথার উপর নাচে বিজলী ভীষণ—
 দুরু দুরু কেঁপে উঠে হিয়া !

মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে অনন্ত গগণ-
 মাতিয়াছে প্রলয়ে সংসার !
এমহা সাগর বুকে অকাল মরণ
 জ্বালায়েছে চিতা নিরাশার !

দূরে দূরে অতিদূরে জলধি সীমায়
 বুঝি কেহ জ্বালিয়াছে আলো !
তাও বুঝি নিবে যায় একটী ঝঞ্ঝায়-
 অন্ধকার হতেছে ঘোরালো !

ফেনিল তরঙ্গ'পরে চরম চেষ্টায়
 ছুটে তরি করি প্রাণপণ
বিক্ষুব্ধ ঝটিকা বেগে ছিঁড়ে গেছে হায়
 তরণীর জীবন প্রস্থন।

তিমির দোলায় চড়ি' নিখিল অম্বর
আসিয়াছে নিকটে নামিয়া;
তুষার শীতল শ্বাস ফেলিছে সাগর
অট্টহাসি হৃদয়ে মাখিয়া।

৮

উন্মত্ত দৈত্যের মত, আছাড়ি' দুকুল
ছুটে আসে তরঙ্গ ভীষণ!
আজি বুঝি সারা বিশ্ব হইবে নির্ম্মূল!
রহিবে না মেদিনী গগণ।

৯

পশ্চাতে রহিল পড়ি সুখের ভবন
চলিয়াছি অজ্ঞাত আঁধারে;
চারি ধারে সীমা হীন ব্যথিত রোদন
নিবে গেছে দীপ পরপারে।

১০

ভবিষ্যৎ কি যে আছে কে বলিতে পারে
অভাগার অদৃষ্ট গগণে!
কে বলিবে তরি মম যাবে পরপারে
বাঞ্ছিত সে অমর কাননে!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ,
কালীঘাট।

দেখি কেন দেখিনা তাহায়?

দেখি দেখি তবু কেন দেখিনা তাহায়?
প্রণয় যে ধীরে ধীরে প্রাণে মিশে যায়!
নবীন নীরদ কোলে, দামিনী যখন খেলে
হেরি তারে দুলে দুলে মিটি মিটি চায়।
আবার মেঘের পাশে লুকায়ে কখন হাসে
ভালবাসা প্রাণ যেন জুড়াইয়া দেয়।

বারিধির কূলে আসি, হেরি যবে পূর্ণশশী
তাহার কোলেতে বসি শরীর দোলায়।
দেখি আর ওথা তা'য়,মোর পানে যেন ধায়
কি যেন প্রাণের কথা কবে এ আশায়!

নিশাতে তারকাচয়, যখন ফুটিয়া রয়
পরাণ ভরিয়া যায় প্রেমের প্রভায়,
বাজায় প্রাণের তার,শুনি যেন গীতি তা'র
কই তুমি? যেই বলি অমনি লুকায়।

উদ্যানে ফুটিলে ফুল, চুম্বনে মধুপকুল
হ'য়ে যবে প্রেমাকুল গুন্‌গুন্ গায়;
অতৃপ্ত নয়ন জলে, সেই ছবি সদা খেলে.
ধরি যত আশা করি ভেসে ভেসে যায়।

যে সময় তরঙ্গিণী, কুল কুল করি ধ্বনি
বহে রঙ্গে আমি গণি ভঙ্গ সমুদয়; [দায়
কি ভঙ্গিতে তা'র সহ, প্রাণ মোর করি'
প্রাণ ছবি চলি' যায় ফিরিয়া না চায়।

যখন হৃদয় পটে, তাহার সে রূপ ফোটে
প্রাণ যেন যায় ছুটে মিশিতে তাহায়।
মিশিবে মিশিবে করে,অমনি তা শূন্য হেরে
শূন্য পানে চেয়ে ডাকে আয় চাঁদ আয়!
দেখি কেন দেখিনা তাহায়?

শ্রীপুলিন বিহারী ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্র নাথ

ভারতীর প্রিয় পুত্র তুমি!
কল্পনা মুরলী ধ'রে
কড়ি ও কোমল সুরে
কি সঙ্গীত গাহিতেছে আপনার মনে?
মানসী প্রতিভা বলে
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
যে অমৃত ঢালিতেছে বল কোথা পেলে?
ক্ষুদ্র মতি বালিকার
ভক্তি মাখা উপহার
লইবে কি কবিবর প্রসন্ন অন্তরে?

শ্রীমতী চঞ্চলাবালা দাসী।

বিদায়।

ম্লান মুখে দিনমণি পড়িছে ঢলিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ নীলাকাশ কাঁদিয়া কাঁদিয়া;
কি যেন করুণ স্বর,
ভাসিছে পবন 'পর,
কেমন রোদন ধ্বনি বাজিতেছে কাণে,
কেন এত ব্যাকুলতা আমার পরাণে।
তারা গুলি গুটি গুটি,
উঠিতেছে ফুটি ফুটি,
ব্যথিত হৃদির যেন লুকায়িত কথা,
নভঃ হইতে ধীরি ধীরি আসিতেছে হেথা
মধুর সাঁঝের আলো,
কেন নাহি লাগে ভাল,
সুন্দরী-প্রকৃতি যেন শোকের বসন পরি,
চলিছে আপন মনে চাহেনা পিছনে ফিরি।
টস্ টস্ টস্ করে,
পাতা হ'তে পড়ে ঝরে,
তরু 'পরে পক্ষীগুলি শূন্য মনে চায়,
কি যেন অব্যক্ত স্বরে বিষাদ জানায়।
কল্ কল কল ধ্বনি,
কেন আজি নাহি শুনি,
চঞ্চল তরঙ্গ গুলি নাহি খেলে আর,
বিষাদেতে অবসন্ন দেহ সবাকার।
একি! বাতুলের প্রায়,
কেন করি হায় হায়;
যা ছিল সকলি আছে নাহিক কেবল,
আমার প্রাণের আলো, তাই হীনবল।
তাই দেখি কাঁদে তারা,
সকলে কাঁদিয়া সারা,
আকুল পারাণ তাই শান্তি নাহি পায়,
নিরাশ হইয়া শুধু করে হায় হায়।
মন্দ মন্দ সমীরণ,
বহিতেছে অনুক্ষণ,
যেন কোন মরমের গোপনীয় কথা,
চুপি চুপি বলে যায় প্রাণে দিয়ে ব্যথা।
সুনীল গগণোপরি,
কাহার মুরতি হেরি,
যেন কি সে বলিতেছে ফিরায়ে বদন,
শূন্য পথে মিশে গেল হ'লোনা শ্রবণ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

ঈশ্বরোদ্দেশে।

তোমার চরণে আমার হৃদয়
যেন সদা ডুবে থাকে,
টলে না হে যেন চঞ্চল হৃদয়
কিবা সুখে কিবা দুঃখে।

সংসার বিভব পুত্র পরিজন
পাইয়া বিষয় সম্পদে ;
স্নেহ দয়া মায়া পেয়ে ভালবাসা
ভুলিনা হে যেন শ্রীপদে।

নীচে কত নীচে ঘোর অন্ধকার,
রয়েছি হে আমি পড়িয়া,
কেমনে পাইব ও চরণ যুগ
তোল নাথ মোরে ধরিয়া।

আর কাঁদায়োনা, দয়া করে নাথ
নিয়ে এস মোরে আলোকে ;
তোমারে হৃদয়ে রাখিব যতনে
নাচিব হৃদয়-পুলকে।

তবু যদি পুনঃ পঙ্কে ডুবে যাই
কভু যদি ভুলি তোমারে ;
হাত বাড়াইয়া তোমার কোলেতে
তুলিয়া লইও আমারে।

শ্রীমতি মৃণালিনী বসু।

আহা স্নেহময়ী জননী আমার
শোধিতে তোমার স্নেহের ধার
কভু কি পেরেছে কেহ ধরায়।

কি বিমল জ্যোতিঃ বদন মণ্ডলে
স্নেহময় ভাব নয়নেতে খেলে
মধুরতা যেন সদা হেলে দুলে
মায়ার বন্ধন সদা দেখায়।

বচনে অমিয় স্পর্শে কোমলতা
নয়নের জ্যোতিঃ অসীম মমতা
অতীব স্বর্গীয় ছায়া সরলতা
পূর্ণ যে তোমার কোমল হৃদে।

ওমা ! স্নেহময়ী জননী আমার
এতেক মমতা স্মরিয়া তোমার
বল বল সাধ নাহি চায় কা'র
দিতে গো অঞ্জলি কমল পদে।

এসমা জননী হৃদয়ে আমার
শত ফোঁটা যদি রক্ত কলিজার
দিতে পারি তব পদে উপহার
তবুকি হৃদয় তৃপ্তি পাবে।

তোমারে পুজিতে কি সাধ্য আমার
কি সাধ্য বুঝিতে করুণা তোমার
পুজিব দিয়ে মা নয়ন অসার
দর বিগলিত বহিয়া যাবে।

তোমারে পুজিতে আমি যে ভিখারী
যদি গো জননী পুজিবারে পারি
দিয়া প্রবাহিত নয়নের বারি
হৃদয়ের ভক্তি চরণে ঢালি।
মনের বাসনা এতে কি মিটিবে
এতে কি হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে
অধমা দুহিতা দেবীকে পুজিবে
কিবা দিয়া পদে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি
শ্রীমতী কৃষ্ণসোহাগিনী দাসী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

রৌপ্য পদক। সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত অমর নাথ ঘোষকে "সাহিত্যের উপকারিতা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করায় 'প্যারিচরণ সরকার পদক' দেওয়া হইয়াছে। বাবু রামহরি ভড় বি, এল্, ও পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, মহোদয়গণ প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

***

জজ।—তোমার কি বক্তব্য আছে?
বাদী—হুজুর ও আমায় 'গরু' বলিয়াছে।
জজ—তুমি কি প্রতীকার চাও?
বা—আজ্ঞে ক্ষতি পূরণ ২৫৲ টাকা
জজ—এত কেন?
বা—হুজুর, আজকাল গরুর দাম চড়িয়া গিয়াছে

***

পিতা (ভর্ৎসনাচ্ছলে)—ভুতো, তোর ইস্কুলের রিপোর্ট দেখে মর্ম্মাহত হয়েছি; ক্লাসে মোটে ত্রিশ জন ছেলে, তুমি কি না সকলের নীচে! ছি, ছি, ছি, কি লজ্জার কথা, তোর মনে একটু ঘৃণা হয় না।

পুত্র। বাবা, আরও লজ্জার কথা হ'ত।

পি। কিসে।

পুত্র।, যদি ক্লাসে আরও বেশী ছেলে থাকৃত!

***

বালিকার রচনা। একটি অষ্টম বর্ষীয় ইংরাজ বালিকা "বালক" সম্বন্ধে যে রচনা লিখিয়াছিল নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। "বালকেরা পুরুষ মানুষ—যাহারা এখনও তাহাদের বাপেদের মত বড় হয় নাই, এবং বালিকারা মেয়ে মানুষ যাহারা শীঘ্রই তাহাদের মায়াদের মত হয়। মেয়ে মানুষের আগে পুরুষ মানুষের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর যখন সর্ব্বপ্রথমে এ্যাডামকে (Adam) সৃষ্টি করেন, তখন তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন "এবার যদি চেষ্টা করি তাহা হইলে আরও ভাল জীব সৃষ্টি করিতে পারি।" ইহার পরেই "ইভ" সৃষ্ট হইল। ঈশ্বর এডাাম্ অপেক্ষা ইভকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে সেই অবধি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক সৃষ্ট হইতে লাগিল। বালকেরা বড় দুষ্ট। আমি যাহা মনে করিতাম তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত বালক আছে তাহার অর্দ্ধেককে বালিকায় ও বাকি অর্দ্ধেককে পুতুলে পরিণত করিতাম, বালক মোটে থাকিতে দিতাম না। আমার বাবা এত ভাল যে আমার বোধ হয় যখন তিনি ছোট বালক ছিলেন তখন নিশ্চয়ই বালিকা ছিলেন"।

***

প্রণয়িণী। তুমি কি ক'য়ে বুঝলে যে তুমি আমায় ভালবাস? কই আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি না?

প্রণয়ী। তোমার এখনও অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, আমি ইতিপূর্ব্বে

বারচল্লিস ভাল বাসিয়াছি, ভালবাসার প্রত্যেক লক্ষণ আমি খুব ভাল রকম বুঝতে পারি।

***

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী। ক্যাসেল্‌স্ ম্যাগাজিনে মিসেস্ হ্যারো উইলিয়াম্‌স্ লিখিয়াছেন যে লেডি হেলেন ডিন্‌সেণ্ট নিঃসন্দেহ ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। ইনি আর্ল্ অব্ ফিভারস্যামের দুহিতা এবং এডগার ভিনসেণ্টের পত্নী। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার বিবাহ হয় এখন ইহার বয়স ৩৩ বৎসর। ইহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই।

কিন্তু অন্য একখানি বিলাতী পত্রে প্রকাশ যে এনিড্ উইল্‌সন্ ইংলণ্ডের মধ্যে রূপসী শ্রেষ্ঠ। সেসিল হোটেলে এবং বল নাচে যখন সর্ব্বপ্রথম মিস্ উইলসনের অভ্যুদয় হয় তখন সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। রাজন্যবর্গ ডিউক্, আর্ল্ প্রভৃতি বিলাতের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহারা শত শত সুন্দরী রমণী দেখিয়াছেন, তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে মিস্ উলসনের মত সুন্দরী কখনও দেখেন নাই। তাঁহার আগমনে বলনাচ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রমণীরা সচরাচর আপনাদিগের অপেক্ষা অন্য রমণীকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, কিন্তু এস্থলে ঈর্ষা ভুলিয়া উপস্থিত রমণীরা সকলেই এক বাক্যে মিস্ উইলসনের রূপের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা ভাল "সার্টিফিকেট" আর কি হইতে পারে? চিত্রকরেরাও তাঁহাকে বিলাতের আদর্শ রমণী বলিয়া থাকেন। ডাচেসেরা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত, কত লর্ড ও ক্রোরপতি তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত, এমন কি

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য লালায়িত। মিস্‌উইলসন্, চার্লস্ হেনরি উইল্‌সন নামক পার্লামেণ্টের জনৈক সভ্য ও ক্রোরপতির কন্যা।

* * *

পুত্র—বাবা, কমলালেবু বেচতে যাচ্চে, দুটো পয়সা দাওনা না, কিন্‌বো ?

পিতা। আহম্মক, যা কমলা লেবুওয়ালাকে ভেঙ্‌চোগে যা, তা হ'লে একটা ছুঁড়ে মারতে পারে।

* * *

অভিনেত্রী—(ক্রুদ্ধভাবে) প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার অভিনয় অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়া তুমিই না আমার অভিনয়ের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলে ?

সমালোচক—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) হ্যাঁ-অ্যাঁ তোমায় তখন এত সুন্দর দেখাইতেছিল যে ওরূপ অবস্থায় তোমায় কোনও মনুষ্য প্রত্যাখান করিতে পারে, তাহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল।" অভিনেত্রীর ক্রোধ কম্পিত অধরে মৃদুহাসি দেখা দিল।

* * *

জলমগ্ন প্রাণীর প্রাণদানের উপায়। সামান্য ঘটনাই অনেক বড় বড় আবিষ্কারের মূল। সম্প্রতি ম্যান্‌স্‌ফিস্‌ড্ নামক জনৈক ইংরাজ রাজ মিস্ত্রি কতকগুলি মৎস্য পূর্ব্বরাত্রে সিদ্ধ করিয়া পরদিন উহা জরাইবার মানসে লবণ মাখাইতে উদ্যত হইতেছে এমন সময় ঐ মৎস্যের পাত্রের জলে একটা মৃত নীল মক্ষিকা দেখিতে পাইয়া "রোস্ তোকেও লবণ চাপা দিই" বলিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিল। দুই তিন মিনিট পরে হঠাৎ সে দেখিল ঐ মক্ষিকাটি নড়িতেছে এবং একটু

পরে উড়িয়া জানালায় গিয়া বসিল। তখন ম্যান্স্ফিল্ড ভাবিল বোধ হয় লবণে ঢাকা রাখিবার জন্যই উহা বাঁচিয়া উঠিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে একটা পোকা (veetle) দুই ঘণ্টা জলে ডুবাইয়া রাখিল, যখন দেখিল উহা মরিয়াছে তখন উহার উপর লবণ চাপা দিল। কি আশ্চর্য্য দুই তিন মিনিটের মধ্যে উহা বাঁচিয়া উঠিল। আরও কয়েকটি পোকা, ইন্দুর, ক্রমে নিজ পালিত বিড়াল ও কুকুর শাবকের উপর উক্ত পরীক্ষা হইল। প্রত্যেককেই দুই ঘণ্টা কাল জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং লবণ ঢাকা দিবার পর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বাঁচিয়া ছিল, কুকুরের বেলা আরও পনের মিনিট অধিক ও কিছু বেশী পরিমাণে লবণ লাগিয়া ছিল। ম্যান্স্ফিল্ড ডাক্তারদিগের মনুষ্যের উপর উক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিয়াছে। আমাদের মধ্যে দু' একজন মাছি ও আরশুলার উপর ঐ পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সকলেরই উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

***

রামগতি বাবু কাণে একটু কম শুনেন। সে দিন রামগতি বাবু বাড়ি আসিতেছেন এমন সময় তাঁহার একজন বন্ধু আসিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনার স্ত্রী অনুগ্রহ ক'রে আমার স্ত্রীকে কাল দেখিতে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ আছি জানিবেন।" রামগতি বাবু ভাল শুনিতে না পাইয়া উত্তর করিলেন "আমি সেজন্য বড়ই দুঃখিত; আজ বাড়ি যাইয়াই তাহাকে শিকলিতে বাঁধিয়া রাখিব ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না ঘটে সে বিষয়ে আমি যত্নবান থাকিব।' বন্ধু উত্তর শুনিয়া অবাক্। টীকা—রামগতিবাবুর একটি কুকুর ছিল উহার দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোককে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত।

***

খোকা। মা, এবার থেকে বৃষ্টির দিন আমি আর ইস্কুলে যাব না।

মাতা। কেন জল কাদায় পথে কষ্ট হয় কি?

খোকা। তা কেন, জল কাদায় ত ছুটি পাব ব'লে ইচ্ছে ক'রে মাখি, সে জন্য নয়। বিষ্টির দিন কেউ আসে না আমাকেই সব পড়া বল্‌তে হয়, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

মা। কেন মাষ্টার মিন্‌সের কি আক্কেল নাই, যারা আসে না তা'দের হ'য়ে নিজে পড়া বল্‌তে পারে না; কচি ছেলেটাকে সব পড়া জিজ্ঞেস কর্‌তে হয় হয়? তুই আর যাস্‌নে।

***

১ম বন্ধু। ওহে ভায়া, ছাতাটা কত দিয়ে কিন্‌লে?

২য় বন্ধু। তা জানিনা, আমি যখন একা কিনি তখন দোকানে কেহ ছিল না।

***

পিতা। (খোকার প্রতি) শুন্‌লেম্ তুমি বড় হয়েছ, সেজন্য নাকি তোমার মা'র কাছে আজ বেতও খেয়েছ?

খোকা। মা'র কড়া কড়া নিয়ম, আমি যদি আগে জান্‌তেম যে মা ইস্কুল মাষ্টারদের মত বেত মারবেন তা'হ'লে তোমায় কখন মা'কে বে ক'রতে দিতাম না।

***

গুলীখোরের খেদ।—এক গুলিখোর স্নান করিবার জন্য লাল দিঘীতে নামিয়াছে। ইত্যবসরে তুই জন কনষ্টেবল তাহাকে দেখিয়া তুই দিক হইতে তুইজনে তাহার হাত ধরিয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে পুলিশের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। গুলিখোর আশ্চর্য্য হইয়া

জিজ্ঞাসা করিল "কি বাবা! অপরাধ কি" কনষ্টেবলদ্বয় রুলের গুঁতো লাগাইতে লাগাইতে কহিল "চল্ বে চল্" তখন গুলিখোর বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া বলিল "কি বাবা! এক রত্তি ঝিনুক খোলার মত পুকুর করে এতদূর বেয়াদবি—বেঁচে থাকুক বাবা ভগীরথ তা'র পায়ের ধূলা খাই। কোথা গোস্পদ আর কোথা গঙ্গাসাগর; দেদার নাও দেদার খাও। এ কিনা কেবল "হট্" আর "হট্"

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

(১) বসুমতী; (২) প্রতিবাসী; (৩) এডুকেশন গেজেট; (৪) চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ; (৫) আলোচনা; (৬) সঞ্জীবনী; (৭) নব্য ভারত; (৮) মহাভারত নাট্যকাব্য; (৯) প্রদীপ; (১০) মুকুল; (১১) বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী; (১২) The Behar News; (১৩) সৎসঙ্গ; (১৪) উদ্বোধন; (১৫) সোম প্রকাশ; (১৬) কমলা; (১৭) অন্তঃপুর; (১৮) পুর্ণিমা; (১৯) ফরিদপুর হিতৈষিণী; (২০) ঢাকা গেজেট; (২১) চিকিৎসক; (২২) The City Times; (২৩) তত্ত্ববোধিনী; (২৪) নির্ম্মাল্য; (২৫) তত্ত্বমঞ্জরী; (২৬) ঋষি; (২৭) পুণ্য; (২৮) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; (২৯) বিকাশ।

ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী—শ্রীযুক্ত পি, এম, বাক্‌চি মহাশয়ের "ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা" দুই খণ্ড আমরা উপহার পাইয়াছি। গ্রন্থখানি যে অতি উপাদেয় হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে পঞ্জিকার নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই অতি বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে তাহা ছাড়া কলিকাতা ও মফঃস্বলের জানিবার সকল বিষয়ই অতি বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ প্রচলনের চেষ্টা এই প্রথম হইলেও বাক্‌চি মহাশয়ের প্রয়াস যে সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে তাহা সকলেই

এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। যাহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহাদিগের পক্ষে এই ডাইরেক্টরী খানি একটি অমূল্য রত্ন। থ্যাকার কোম্পানির ডাইরেক্টরীর প্রায় অধিকাংশ বিষয়ই ইহাতে আছে অথচ মূল্য অতি সুলভ। এরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিলে আমরা সুখী হইব।

জীবন সন্দর্ভ—শ্রীরাম চন্দ্র সিংহ প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এই পুস্তকে কুড়িটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ গুলি উপদেশ পূর্ণ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশেষ পাঠোপযোগী। আমরা এই পুস্তক খানিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইতে দেখিলে সুখী হইব। নমুনা স্বরূপ কতক গুলি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা গেল, ইহা হইতেই পুস্তকের উপযোগীতার উপলব্ধি হইতে পারে, যথা—মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পরীক্ষা ও শিক্ষা, জ্ঞান ও বিশ্বাস, প্রেম ও সেবা, কৃতজ্ঞতা, সুনীতি, সুফল ইত্যাদি।

বিকাশ—মাসিক পত্র (১ম খণ্ড বৈশাখ হইতে শ্রাবণ) ভিক্টোরিয়া পাঠ সমিতির সাহিত্য সমালোচণী সভা হইতে প্রকাশিত। ১ম সংখ্যার উদ্দেশ্য পাঠে জানা গেল যে কয়েকটী উৎসাহশীল যুবকের বিশেষ চেষ্টায় বিকাশের প্রকাশ। সুতরাং রচনা গুলি নূতন লেখকগণের লেখনী প্রসূত, তাই বলিয়া প্রবন্ধ গুলি মন্দ নহে। বিকাশের ক্রমবিকাশ দেখিলে আমরা সুখী হইব।

পূর্ণিমা—মাসিকপত্রিকা, ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা (আষাঢ়) বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত। পদ্য প্রবন্ধের মধ্যে "কলির মেয়ে" ভাল লাগিল ; পদ্য প্রবন্ধগুলিই একজাতীয় এক ধরণের। "আকাশ-কুসুম" প্রবন্ধে লেখক নানা বৃথা বাগাড়ম্বরের পর মোটামুটি রূপে টেলিগ্রামের নিয়মানুসারে এক স্থান হইতে অপর স্থানে ছবির নকল পাঠাইবার নূতন প্রণালী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া পরে অপ্রসাঙ্গিকরূপে যোগ বলের কথা উত্থাপন দ্বারা শুদ্ধ ধর্ম্মের ভাণ প্রকাশ করিয়াছেন সাত বৎসরের পরিচালিত পত্রিকায় এইরূপ প্রবন্ধ সমূহের আবির্ভাব কি বিস্ময়কর নহে।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ।　　সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ সাল।　　নবম সংখ্যা।

ধূমকেতু।*

১

এই যে উঠেছে ধূমকেতু;
কে বলেরে অমঙ্গল-হেতু;
কি মহান্ শুভ্র পুচ্ছ
গ্রহ তারা করি' তুচ্ছ
ওড়ে যেন বিজয়ের কেতু।

২

ওই শুখ তারার মতন
মুখ-প্রভা প্রশান্ত কেমন!
যদিও আবৃত কায়া
কেমন উদার ছায়া
মুখেই প্রকাশ পায় মানুষ যেমন।

৩

এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়;
অন্য দিকে অরুণ উদয়
মধ্যে কেতু দীপ্তমান্
মহামনা তেজীয়ান্
স্বগৌরবে দাঁড়াইয়া রয়।

৪

ডুবে যা'বে ক্ষণকাল পরে
তপনের কিরণ-সাগরে;
এখনো মুখেতে হাসি
অন্তরে আনন্দ রাশি,
মহতের মন নাহি মরে।

* স্বর্গীয় বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের রচিত এই কবিতাটি ও আর যে কয়েকটি কবিতা ইতিপূর্ব্বে "প্রয়াসে" প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি কবিবরের একখানি অপ্রকাশিত খণ্ডকাব্য "মায়াদেবী" হইতে গৃহীত। কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই শুনিয়া প্রীত হইবেন, যে "সারদা মঙ্গল" প্রণেতা অমর কবির সমগ্র প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্রগণের প্রশংসণীয় উৎসাহে ও উদ্যোগে অচিরেই সুরম্য আকারে প্রকাশিত হইবে।

সা-সে-স।

৫

স্নেহেতে চাঁদের পানে চায়,
যেন আলিঙ্গন দিতে যায় ;
পূর্ব্বদিক পানে চেয়ে
যেন মহানিধি পেয়ে
আনন্দে আপনি চ'লে যায়।

৬

ধায় তিমি ধরার সাগরে ;
মহাশূন্য অনন্ত অম্বরে,
ধেয়ে ধেয়ে অবিরত
বলহে দেখিলে কত
মহান্ বাড়বানল প্রজ্বলিত দিগ্‌দিগন্তরে।

৭

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্র দ্বীপ
স্বভাবের সুধার প্রদীপ
তেজস্বী মনের কাছে
স্নেহ যেন ফুটে আছে
হর্ষভরে করে দীপ্ দীপ্।

৮

বল কত তোমার মতন
ধায় ধূমকেতু অগণন।
পথের ঠিকানা নাই,
তা'রি কাছে ছুটে যাই
পাই যা'রে মনের মতন।

৯

তুমি এক প্রেমের পাগল,
আপনার ভাবে ঢল ঢল,
কে তোমায় ভালবাসে
কে তোমায় উপহাসে
ভ্রূক্ষেপ নাই সে সকল।

১০

পতঙ্গের পাগল পরাণ
অনা'সে অনলে ত্যজে প্রাণ ;
তপনের কাছে তুমি
তাই কি এসেছ ভাই !
বিধির কি এমনি বিধান।

১১

আসিয়াছ বহুদিন পরে
ধরণীরে দেখিবার তরে,
আনন্দে ভগিনী তব
করেন মঙ্গলোৎসব
দিকে দিকে পাখী গান করে

১২

কুসুমের সৌরভ লইয়া
সমীরণ চলেছে ধাইয়া,
চঞ্চল চাতক সব
করি' করি' কলরব
ছুটিয়াছে উন্মত্ত হইয়া।

১৩

চলেছে বকের মালা
নীলাকাশ করি' আলা
করিবারে ব্যজন তোমার,
নীরদ দিয়েছে দেখা
আবরিতে রবি রেখা
ওই কিবে আসে পায় পায়!

১৪

ঘেরে আছে দিগঙ্গনাগণ;
ফিরে সব প্রফুল্ল আনন,
কেমন হরষ ভরে
তোমারে বরণ করে।
মাঝে তুমি কেতু বিমোহন!

১৫

মানুষে জানেনা তব মান
চিরকালই অমঙ্গল জ্ঞান,
এমন সুন্দর রূপ
করিয়াছে কি বিরূপ!
হৃদি-হীন মিছে বুদ্ধিমান্।

১৬

আজো আছে পশুদের দলে,
পরস্পরে সভ্যভব্য বলে,
নিজের পেটের দায়
অন্যকে ধরিয়া খায়,
সবে একা চায় ভূ-মণ্ডলে।

১৭

রাজা আর রাজ-অনুচর
বিষম কঠোর স্বার্থপর,
কেবল নিজের তরে
নিদারুণ কর্ম্ম করে
বাধাইয়া দারুণ সমর।

১৮

পরের দেশেতে ঢুকে
পরের ছেলের বুকে
মারে সুখে আগুনের গুলি;
কেনরে কি দোষ তোর
করিয়াছে রে পামর?
মানুষ, মানুষে যাও ভুলি?

১৯

এ পশুত্বে বীরত্বের নামে
আজো সবে পূজে ধরাধামে!
ভীষণ রক্তের নদী
বহিতেছে নিরবধি,
রাক্ষসেরা মেতেছে সংগ্রামে।

২০

কতই অর্থের নাশ
কতই হৃদয়-হ্রাস,
বুদ্ধির বিষম অপচয়!
তবু স্বার্থ সাধিবারে
মানুষে মানুষ মারে
পরদুঃখে অন্ধ দুরাশয়।

২১

চারিদিকে হাহাকার
শ্রবণে পশেনা তাঁ'র
বজ্রকালা পাহাড় পাথর,
অতি ধীর বীর ইনি
বিশ্বজয়ী বিশ্বজিনি
প্রজার শোকেতে কেন হবেন কাতর?

২২

যুগান্তরে লোক সবে
শুনিয়া অবাক্ হবে

মানুষে করিত বধ মানুষের প্রাণ,
মুখে তারা ভাই ভাই
মনে মনে প্রীতি নাই,
কারো প্রতি কারো নাই আন্তরিক টান

২৩

শতকে দু'এক জন
দেবতার মত মন
পুণ্যের প্রভায় রাজে আনন মণ্ডল;
পরের প্রাণের তরে
প্রাণ দেয় অকাতরে
পরের মঙ্গলে দেখে আপন মঙ্গল।

২৪

হদ্দ আট জন আর
কনিষ্ঠ সে দেবতার
প্রাণের মধুর জ্যো'স্না ফুটেছে অধরে;
সদাই অনন্দে রয়
সংসারে সংসারী হয়
ভুলেও কখন কারো মন্দ নাহি করে।

২৫

বাকি যে নব্বুই জন
তমোগুণে অচেতন
পূর্ব্ব জন্মে ছিল বন-মানুষ বানর,
স্বভাব রয়েছে তাই
কেবল লাঙ্গুল নাই,
আহার বিহারপটু আসল বর্ব্বর।

২৬

কি আর দেখিবে তুমি
মানবের জন্মভূমি!
দেখেছ কতই পৃথ্বী কত পুণ্যালোক;
বিহরে দেবতা সব
মূর্ত্তি মহা অভিনব,
মহান্ পবিত্র প্রাণ, অভয় অশোক।

২৭

নাজানি এ নীলাকাশে
কতই স্বরগ হাসে,
কতই ফুটিয়া আছে তারকার ফুলবন;
যাও ভাই মন-সুখে
বিচর ব্যোমের বুকে
দেখগে, দেখেনি যাহা মানব-নয়ন!

১২ আশ্বিন, পূর্ণিমা ১২৮৯।

নাট্য-শিল্প প্রসঙ্গ।

মানব জীবনে এক একটী দিন এরূপ উজ্জ্বল থাকে, যে তাহাদের তুলনায় অপরাপর দিনগুলি মসীমলিন বলিয়া বোধ হয়। শত শত দিন আসে যায় কিন্তু সে দিনের ঘটনা আমরা ভুলি না। লেখকের

প্রথম নাট্যাভিনয় দর্শনের দিনটী এইরূপ সুখময় দিনের অন্যতম। সে বহু বৎসরের কথা, তখন লেখক বাল্যবয়স অতিক্রম করে নাই। সে রজনীতে পরলোকগত বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বঙ্গরঙ্গভূমিতে দুর্গেশ-নন্দিনীর অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়, দৃশ্যপট, সঙ্গীত প্রভৃতি এত সুন্দর হইয়াছিল, অথবা লেখকের বিশ্লেষণ-সমালোচন-শক্তি বর্জ্জিত বাল্য অন্তরে এত ভাল লাগিয়াছিল, যে সেই প্রথম অভিনয় দর্শনের সহিত একটী অব্যক্ত কুহেলিকা মাখা স্বপ্নময়ী স্মৃতি লেখকের হৃদয়ে চিরতরে বিজড়িত হইয়া আছে। কিন্তু হায়! মানবের ভাগ্যে অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ অতি অল্পই ঘটে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে দিন বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশ-নন্দিনী পুস্তকখানি প্রথম পাঠ করিলাম, সে দিন হইতে, বাল্যকালের সেই সুখস্মৃতির সহিত একটী অসুখকর ভাবও সংযোজিত হইয়া গেল। মনের এই দুরবস্থা, ঘটাইবার কারণ বঙ্গরঙ্গালয়ে অভিনীত দুর্গেশ-নন্দিনী নাটকের নাট্যকার, এবং তৎকর্ত্তৃক উপন্যাসের শেষ ভাগের অবনতিকর পরিবর্ত্তন।

পাঠক একবার দুর্গেশ-নন্দিনী পুস্তকের উপসংহার ভাগটী স্মরণ করুন। আয়েষা তাঁহার জীবন সর্ব্বস্বকে চিরদিনের জন্য পরকরগত হইতে দেখিয়া আসিয়া আপনার সুখভস্ম-সমাকীর্ণ শ্মশান-হৃদয় লইয়া একাকিনী নিস্তব্ধ নিশীথে নিজ শয়ন কক্ষের মুক্তবাতায়নপথে দণ্ডায়মানা। তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিজ হস্তস্থিত গরলাধার অঙ্গুরীয়ের উপর। তাঁহার হৃদয়ে কি ভীষণ নৈরাশ্যবহ্নি জ্বলিতেছিল এবং তাহা অচিরে নির্ব্বাপিত করা কত সহজ, তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। কিন্তু এই ভাবনার সহিত আর একটী চিন্তা হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে নৈরাশ্য এবং যন্ত্রণাজাল ভেদ করিয়া, তাঁহার মানস পথে উদিত হইল,—জগৎ সিংহ তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনিয়া কি মনে

করিবেন ? যদি তিনি কারণ অনুমান করিয়া হৃদয়ে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যথা পান ! পলক মধ্যে আয়েষার সমস্ত স্বার্থ-চিন্তা ভাসিয়া গেল। তিনি অঙ্গুরীয়টীকে দুর্গ পরিখার জলে নিক্ষেপ করিয়া আশু-শান্তি-চিকীর্ষু হৃদয়কে প্রলোভন জাল হইতে মুক্ত করিলেন, এবং সেই শতখণ্ডে ক্ষতবিক্ষত পরিক্লিষ্ট হৃদয়ের অসহ্য যাতনা আজীবন ভোগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আয়েষাকে যে অবস্থায় রাখিয়া গ্রন্থকার উপন্যাসের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, তদপেক্ষা করুণরসোদ্দীপক চিত্র আমাদের ধারণায় আসে না। কিন্তু এই উন্নত অথচ প্রাণস্পর্শী বেদনাদায়ক চিত্রের, নাট্যশালায় কিরূপ পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছিলাম ! দেখিয়াছিলাম বিমলা জলে ডুবিল, আয়েষা নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল, এবং ওসমান্‌ও আয়েষার মৃতদেহের উপর পড়িয়া তাঁহার সহগামী হইল ; এইরূপে উপন্যাসকার যে কয়জনকে সুখলাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, নাট্যকার তাঁহাদিগকে নিজ নিজ দুঃখের চিরাবসান করাইলেন। বিমলা এবং ওসমানের পরিণাম সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু কিছু বলিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। নাট্যকার বোধ হয় ইহা অসম্পূর্ণ বোধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি অমর চিত্রকরের চিত্রে তাঁহার স্থূল তুলিকা স্পর্শ করিয়া আপনার দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বিমলা ও ওসমান সম্বন্ধে তাঁহার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আয়েষা সম্বন্ধে তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আয়েষার উন্নত চরিত্রে দুর্ব্বলতার আরোপ দেখিয়া কাহার হৃদয় না ব্যথিত হইবে !

প্রাচীন কাল হইতে দেশীয় সাহিত্যে বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত (tragedy) নাটকের অস্তিত্ব ছিল না, মিলনান্ত বা সুখান্ত (comedy) না হইলে নাটকের অঙ্গ ভঙ্গ হইত। এখনও যাত্রায় দুর্য্যোধনের

উরুভঙ্গের পালা হইলে তাহার অন্তে রাধাকৃষ্ণের মিলন চাই! নাটকের উপসংহারে মিলন বা সুখ-সংঘটন-স্পৃহা বোধ হয় এই ধর্ম্ম-প্রাণ দেশে জনসাধারণকে সুখবাদী ও আশাবাদী করিবার জন্য উপজাত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যভাগে মর্ম্মভেদী দুঃখ বা চির-বিচ্ছেদের চিত্র প্রদর্শন করিয়া প্রাচীন লেখকগণ, তাঁহাদের নাটককে মিলনান্ত বা সুখান্ত করিবার নিয়মটীর অসারত্ব আপনারাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখ না হইলে মানব অন্তরের গভীর নিগূঢ় এবং শ্রেষ্ঠতম প্রদেশ উন্মুক্ত হয় না, শোকোচ্ছ্বাস আনন্দধ্বনি অপেক্ষা হৃদয়কে প্রবলতর বেগে উদ্বেলিত করে, এবং সুখ হইতে দুঃখের চিত্র মানস ফলকে অধিককাল স্থায়ী হয়, ইহা আমাদের দেশের প্রাচীন লেখকগণ যে অবিদিত ছিলেন এরূপ নহে। রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় শোক রসাত্মক কাব্য জগতের আর কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। "উত্তর চরিত" পাঠ করিতে করিতে কোন্ সহৃদয় পাঠক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন! প্রাচীন লেখকেরা জানিতেন যে প্রকৃতির কৌমুদী-বিধৌত হাস্যোৎফুল্ল বদনে যেরূপ সৌন্দর্য্য আছে, তাঁহার তমসাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাবাত-ভ্রূকুটী-কুঞ্চিত মুখমণ্ডলেও তদ্রূপ বা ততোধিক বিমোহিনী শক্তি আছে। অথচ জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত নাটকের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য সাহিত্য আমাদের বিয়োগান্ত নাটকের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছে, সুতরাং ঘটনাবলী শোক-বিজড়িত হইলেও যে নাটকের অন্তে মিলন বা সুখ সংঘটন করিতে হইবে, দেশীয় প্রাচীন-সাহিত্যের এ নিয়ম প্রতিপালন করিতে এক্ষণে আমরা প্রস্তুত নহি। এই জন্য নাটক বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত করিতে এক্ষণে বঙ্গীয় নাট্যকার মাত্রেই উন্মুখ। কিন্তু বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত নাটকে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যে সে লেখকের কায

নহে। ঘাতক, আত্মঘাতী বা যমরাজের উপর বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত নাটকের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, এবং বিষ, রজ্জু, ছুরিকা বা কলস না হইলে যে নাটকের পরিসমাপ্তি হৃদয় বিদারক হয় না, এরূপ কোন নিয়ম নাই। প্রতীচ্য দেশের সর্ব্বোচ্চ নাট্যকার তাঁহার শ্রেষ্ঠতম বিয়োগান্ত নাটকে হত্যা বা অপমৃত্যুর সমাবেশ করিয়াছেন বলিয়া এই সত্বগুণাদর্শ দেশেও তাহা অনুকরণ করিতেই হইবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। করুণ রসের উদ্দীপনই বিয়োগান্ত নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যে কোন উপায় এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবে তাহাই বিয়োগান্ত নাটকের উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হত্যা বা মৃত্যু, সময় ও অবস্থা ভেদে করুণরসাত্মক না হইয়া বিসদৃশ রসের উদ্দীপক হইতে পারে ইহা নাট্যকারের স্মরণ রাখা উচিত।

তিলোত্তমা জগৎসিংহের মিলন সত্বেও বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশ-নন্দিনী একখানি করুণরসাত্মক পুস্তক; ইংরাজি ভাষায় ইহাকে একখানি উচ্চ দরের ট্র্যাজিডি বলা যাইতে পারে। বীরেন্দ্র সিংহ ও কৎলুখাঁর হত্যা এবং বিমলার বৈধব্য ঘটনার জন্য দুর্গেশনন্দিনী ট্র্যাজিডি নহে, ওস্‌মানের প্রণয়তৃষ্ণার অতৃপ্তির জন্যও ইহাকে ট্র্যাজিডির উচ্চাসনে বসাইতে বলিতেছি না, দেবীস্বরূপিণী নবাবকুমারী আয়েষার সর্ব্বত্যাগী নিরাশ প্রণয়ই এই ট্র্যাজিডির কেন্দ্রস্থল এবং তাঁহার প্রেম পূজায় আত্মবলিদানেই এই ট্র্যাজিডির পরিসমাপ্তি। প্রিয়তমের বিন্দুমাত্র সম্ভাবিত মনো-বেদনার কারণ হইবার আশঙ্কায় প্রেমময়ীর আজীবন শত-বৃশ্চিক-দংশিত হৃদয়ের দহন সহ্য করিবার সংকল্পই প্রকৃত ট্র্যাজিডি। কিন্তু রঙ্গভূমির নাট্যাকার (বিভিন্ন নাট্যাশালায় এক্ষণে দুর্গেশনন্দিনীর নানারূপ উপসংহার করা হইয়া থাকে; আমরা সে গুলির কথা কিছু বলিতেছি না) বঙ্কিম বাবুর ট্র্যাজিডির এই উচ্চ

ভাবের সম্পূর্ণরূপ ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। আয়েষাকে আত্মঘাতিনী করিয়া বিমলা ও ওসমানকেও সেই পথে প্রেরণ করিয়া, নাট্যকার আমাদের মতে দুর্গেশ-নন্দিনীকে ট্র্যাজিডি না করিয়া দেশীয় পূর্ব্ব প্রথানুসারে কমিডির দিকেই লইয়া গিয়াছেন। বীরেন্দ্র সিংহ ও বিমলার এবং ওস্‌মান ও আয়েষার মরণের পরপারে মিলন!

হয়ত নাট্যকার বলিবেন যে নাট্যশালা জনসাধারণের জন্য এবং জনসাধারণ মার্জ্জিত রুচি সমালোচকের চক্ষে অভিনয় দেখে না। সেই জন্য নাট্যকারকে জনসাধারণের বোধ শক্তি ও মনস্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং তিনি সকল বিষয়ে আপনার ইচ্ছা বা রুচিমত কার্য্য করিতে পারেন না। এক ভাবে দেখিলে এ কথার সমীচীনতা স্বীকার্য্য। নাট্যকার কুলতিলক সেক্‌সপীয়রও জনসাধারণের বিশ্বাস ও শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অতুলনীয় নাটকাবলীতে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, যাহাদের অস্তিত্বের অন্য কোন কারণে, তাঁহার দিব্যালোক-প্রদীপ্ত হৃদয়ের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না। সেক্‌সপীয়রের সর্ব্বতত্ত্বদর্শী প্রতিভাস্ফুরিত অন্তরে, যে প্রেতযোনির অস্তিত্ব, এবং অশরীরী অবস্থাতেও তাহাদের মানব দেহের বিচিত্র কারুকার্য্যময় বাক্‌যন্ত্রের বিকৃত অনুকরণ ক্ষমতায় বিশ্বাস, স্থান পাইত, একথা সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকেরা স্বীকার করেন না। অথচ তাঁহার শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর নাটকগুলিতে আমরা প্রেত ডাকিনীর আবির্ভাব ও কথোপকথন এবং অন্যান্য অনৈসর্গিক ঘটনার (ম্যাক্‌বেথে শূন্যে রক্তাক্ত ছুরিকা) সমাবেশ দেখিতে পাই। যদিও ঘটনা ঘনীভূত হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই সকল অলৌকিক ঘটনা গুলির প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, সে গুলি নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ভীতি, দুরাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি উত্তেজিত মনোবৃত্তি-প্রসূত, তথাপি তাঁহার

সমকালীন জনসাধারণের অমূলক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই যে অমর কবি তাঁহার গ্রন্থে সেই সকল অতিপ্রকৃত ঘটনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণের মনোরঞ্জন নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য হইলেও, নাট্যকারগণের স্মরণ রাখা উচিত যে জনসাধারণের রুচি মার্জ্জিত এবং উন্নত করিবার ভারও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত। আর যথন জনসাধারণের মনস্তুষ্টির উপযোগী অন্তঃসারহীন নাটক নাটিকা প্রহসনে দেশ প্লাবিত হইতেছে, তথন, যে দুই একটী অসামান্য প্রতিভাশালী সাহিত্য-শিল্পির রচনা-গৌরবে আজ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, জগতের সাহিত্যের এক পার্শ্বে স্থান পাইবার উচ্চ আশা করিতেছে, সেই সকল সূক্ষ্ম রচনায় লোক রঞ্জনের জন্য তাঁহাদের স্থূল হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে; আর যদিও করেন তাহা হইলে প্রণত মস্তকে এবং অতি সাবধানে করা উচিত। এই দায়িত্ব-জ্ঞানের এবং নাটক রচনায় উচ্চ শিক্ষার অভাব আধুনিক নাট্যকারদিগের মধ্যে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী পুরাতন কাহিনীর উত্থাপন করিয়া এত কথা বলিলাম।

নাট্যাচার্য্যগণের আর একটী ত্রুটী বড়ই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে; সেটী প্রকৃত নাট্য-শিল্প বিরোধী। আমরা একথানি উচ্চ শ্রেণীর নাটকাভিনয় হইতে তাহার উদাহরণ দিব। পাঠক একবার নীলদর্পণের সেই দৃশ্যটী স্মরণ করুন, যে দৃশ্যে সাবিত্রী,—করুণতম হৃদয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির আদর্শ গৃহিণী, সাবিত্রী,—নৃশংস অত্যাচারীর নিদারুণ মর্ম্মাঘাতে উন্মাদিনী হইয়া, তাঁহার নয়ন-পুত্তলী বালিকা পুত্রবধূ "সরলতা"কে পদতলে কণ্ঠ নিষ্পীড়িত করিয়া হত্যা করিতেছেন। রঙ্গমঞ্চের সেই লোমহর্ষণ বীভৎস দৃশ্যটী পাঠকের

মনে পড়ে কি? ঐ দৃশ্যটী নাট্যশালার পটান্তরালে হওয়া উচিত ছিল। ওরূপ দৃশ্য হৃদয়বান দর্শকের চক্ষে অসহনীয় এবং উহা উচ্চ শ্রেণীর নাট্য-শিল্পের গুরুতর বিরোধী। নীলদর্পণ পুস্তককে দৃশ্য নাটক না ভাবিয়া কেবলমাত্র পাঠের জন্য লিখিত পুস্তক, অর্থাৎ শ্রব্য গ্রন্থ ভাবে বিবেচনা করিলে ঐ ঘটনা-সমাবেশ জনিত অপরাধ হইতে গ্রন্থকারকে কোনরূপে মুক্ত করা যাইলেও যাইতে পারে; কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য প্রবল ও নির্দ্দয় অত্যাচারীর পাশব উৎপীড়নের বিষময় ফলের জলন্ত চিত্র প্রদর্শন, এবং সেই উদ্দেশ্য এ ঘটনায় বিশেষরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা নীলদর্পণ নাটককে রঙ্গমঞ্চে অপরিবর্ত্তিত ভাবে আবির্ভূত করেন সেই নাট্যাচার্য্যগণের রুচি বা নাট্য-শিল্প জ্ঞান সম্বন্ধে ঐ উক্তি কোন ক্রমে প্রযুজ্য নহে। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপ ভয়াবহ ঘটনার মনশ্চক্ষে কল্পনা একরূপ আর চর্ম্মচক্ষে দর্শন অন্যরূপ। শ্রোতাগণের মধ্যে যদি কেহ বধির থাকেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, শ্রবণশক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষণের জন্য তাঁহাদের কর্ণমূলে দুন্দুভিনিনাদ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঐ ঘটনাটী পট-পশ্চাতে সংসাধিত করিতে নাট্যাচার্য্যগণের বিশেষ কোনরূপ উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইত না। হয়ত নাট্যাচার্য্যগণ আমাদিগকে ওথেলো কর্তৃক নিরপরাধিনী ডেস্‌ডিমোনার শোকাবহ ও আতঙ্কপ্রদ হত্যাব্যাপারটী স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন 'ঐদৃশ্যটী কি পাশ্চাত্য নাট্যশালায় পট-পশ্চাতে লুক্কাইত রাখা হয়?' আমাদের উত্তর, পাশ্চাত্য নাট্যশালায় যেরূপই হউক উহা নাট্য-শিল্পের ঘোরতর বিরোধী এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। নৃশংস প্রবলের হস্ত হইতে নিরপরাধ দুর্ব্বলকে রক্ষা, আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা, পাষণ্ডদলন, প্রভৃতি স্থলবিশেষে ঘটনা

নাটকোচিত করিবার জন্য, রঙ্গমঞ্চে হত্যা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু প্রেম, সহানুভূতি, করুণার পাত্র, নিরীহ ব্যক্তির শোচনীয় হত্যা, বা গর্ভবতী স্ত্রীর উদরে সাংঘাতিক মুষ্ট্যাঘাত রূপ বীভৎস পাশবাচার রঙ্গমঞ্চে যত কম উপস্থিত করা হয়, ততই ভাল। আমরা নৈতিক ভাবে এ বিষয়টী আলোচনা করিতেছি না, নাট্য-শিল্প সম্বন্ধেই বলিতেছি। নৈতিক ভাবে দেখিলে হত্যা বা নির্দ্দয়াচার মাত্রই, কুশিক্ষাপ্রদ বলিয়া রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি নাট্য-শালা ধর্ম্ম মন্দির নহে, এবং নাটকগুলিকে বিশুদ্ধ নীতি পুস্তকে পরিণত করিতে বলা, আর জনশূন্য কাষ্ঠাসন সম্মুখে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করা বোধ হয়, একই কথা। কিন্তু অভিনয় কার্য্যকে শিল্পভাবে দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি যে হত্যা বা নিষ্ঠুরাচারের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। নরশোণিত লোলুপ পিশাচকে নিহত হইতে দেখিলে দর্শকের মনে, হত্যাদর্শনের সহিত স্বাভাবিক ভাবে জড়িত যে সকল সুকোমল মনোবৃত্তি প্রবল বেগে উত্তেজিত হয়, হত ব্যক্তির পাপাচার স্মরণে তাহার প্রতি দর্শকের জাতক্রোধ বা শাস্তিবিধানেচ্ছা প্রভৃতি অন্যান্য প্রবলতর মনোবৃত্তির সহিত সংঘর্ষে সেগুলি প্রতিহত হইতে পারে; কিন্তু প্রীতি, প্রেম, পবিত্রতা বা কোমলতাধার কোন কোন নিরীহ ব্যক্তিকে অযথা হত হইতে দেখিলে আমাদের হৃদয়ের কোমল, করুণ ও শ্রেষ্ঠ তন্ত্রীগুলি অতি প্রচণ্ড ভাবে ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, অথচ সে গুলিকে প্রকৃতিস্থ করিবার উপযোগী হৃদয়-তন্ত্রীতে বিপরীত আঘাতের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং অত্যুজ্জ্বল বর্ণরাগে স্থূল তুলিকায় রঞ্জিত চিত্রের ন্যায় তাহা কলানুরাগীর চক্ষে অতীব পীড়াদায়ক বলিয়া বোধ হয়। ডেস্‌ডি-মোনা বা সরলতার হত্যা এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত; দর্শকগণ

জড়ত্ব বা পশুত্ব প্রাপ্ত না হইলে তাহাদের সে দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব। যে দর্শকগণ, রঙ্গমঞ্চের সমস্ত দৃশ্যই অলীক, এই ভাবটী মনোমধ্যে সতত জাগরূক রাখিয়া নির্ব্বিকার ভাবে অভিনয় দর্শন করেন, এবং যে নাট্যশালায় অভিনয়ের কৃত্রিমতা জাজ্বল্যমান আমাদের বক্তব্য তাহাদের উদ্দেশে নহে, কারণ তাহাদের উভয়েরই কার্য্য বিড়ম্বনা মাত্র।

আর এক প্রকার মার্জ্জিতরুচি-বিরুদ্ধ ঘটনা, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োদ্দেশে লিখিত নাটক সমূহে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে দৃশ্য চক্ষুষ্মান দর্শকের নয়ন-পথে আসিলেই তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে সেইরূপ দৃশ্য দেখাইবার জন্য দর্শকের লোচনাভ্যন্তরে বারবার অঙ্গুলি প্রদান, ভীতি, রোষ, ক্ষোভ প্রভৃতি 'প্রবল মনোবৃত্তি সকলকে অতীব গভীর বা অস্বাভাবিক ভাবে উদ্রেক, যে সকল ঘটনা অতি সংক্ষেপে বর্ণন বা পলক মধ্যে সংসাধিত হওয়া কর্ত্তব্য, সেই সকল ঘটনা নিষ্প্রয়োজন-যুগব্যাপী আড়ম্বর ও সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসের সহিত দর্শকের চর্ম্মচক্ষু সম্মুখে উপস্থিত করিয়া নাট্যকার তাঁহার শিল্পাজ্ঞতার পরিচয় দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ "বিজয় বসন্ত" নাটকের মশান দৃশ্যে জল্লাদ বেশী বলবন্তসিংহের নিকট হননব্যপদেশে আনীত বিজয় ও বসন্তের পুনঃপুনঃ সকরুণ কাতরোক্তি ও বলবন্তের তর্জ্জন গর্জ্জন ব্যাপারটী পাঠক একবার স্মরণ করুন। মিড়, মোচড়, মূর্চ্ছনা ও কোমলাঘাত বর্জ্জিত করিয়া সেতারের তন্ত্রীগুলিতে পরতে পরতে একই পর্য্যায় পৌনঃপুনিক ভাবে তীব্র ঝঙ্কার করিলে যেরূপ সুরজ্ঞ শ্রোতার কর্ণে কর্কশ শ্রুত হয়, সেইরূপ বীভৎস বা শোকাবহ ঘটনার বহ্বাড়ম্বর নাট্যামোদীর অন্তরে বিরক্তির উদ্রেক করে। করুণ-রসোৎপাদক চিত্র, জড়মস্তিষ্ক দর্শকের ধারণায় স্থায়ীরূপে প্রবিষ্ট

করাইয়া অশ্রুত্যাগ-দর্শন আশায় অস্বাভাবিক বা সুদীর্ঘ করিলে বোধ-শক্তিশালী দর্শকের অন্তরে বিভিন্ন রসের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা অন্যান্য অপকৃষ্ট নাটক হইতে অধিকতর উপযোগী উদাহরণ উদ্ধৃত না করিয়া বিজয় বসন্ত নাটকের উল্লেখ করিলাম, তাহার কারণ এই নাটকের প্রণেতা একজন সুশিক্ষিত লেখক, শ্রেষ্ঠশ্রেণীর অভিনেতা এবং বহুদর্শী নাট্যশালাধ্যক্ষ। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি যে শিল্পের এই প্রথম স্তরের নিয়মে অনভিজ্ঞ একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিও জানিয়া শুনিয়া যে শিল্প-সৌন্দর্য্যের এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করেন ইহাই শোচনীয়।

আমরা নাট্যশিল্প অপব্যবহারের তিন প্রকার উদাহরণ প্রদান করিলাম। প্রথম,—উৎকৃষ্ট পুস্তকের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন সময়ে উন্নত ভাবের অবনতি সাধন; দ্বিতীয়,—নাটকের যে সকল অংশ নেপথ্যে সংঘটন হওয়া বিধেয়, তাহা দর্শকের চর্ম্মচক্ষু সমক্ষে উপনীত করা। তৃতীয়,—যে সকল ঘটনা নাটকে অতি অল্প সময়ে বা সংক্ষেপে সংসাধিত হওয়া উচিত, তাহা আড়ম্বর পরিপূর্ণ ও সুদীর্ঘকালব্যাপী করা। এই সকল শিল্প-বিগর্হিত ক্রটী নাট্যকারের ক্ষমতা বা সুশিক্ষার অভাব বশতঃ, নাট্যাচার্য্যের শিল্পাজ্ঞতা নিবন্ধন, অথবা লোকরঞ্জনার্থ হইয়া থাকে। যত দিন না নাট্যশালাধ্যক্ষগণ কেবল মাত্র লোকরঞ্জন উদ্দেশ্য পরিহার করিয়া প্রকৃত নাট্য-শিল্পের উন্নতি কল্পে বদ্ধপরিকর হয়েন ততদিন, তাঁহাদের অর্থাগমের ব্যাঘাত না হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালা শিক্ষিত সমাজে দুরবস্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আমরা অভিনয়-সৌন্দর্য্য বিনষ্টকারী আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। এইটী অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি বিশেষের স্থলাভিষিক্ত হইবার আকৃতিগত বা শিক্ষার অভাব জনিত

অনুপযোগীতা। কোন একটী রঙ্গমঞ্চে আমরা দৃশ্যপট পরিচ্ছদ প্রভৃতি'এত পরিপাটী হইতে লক্ষ্য করিয়াছি, যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অথচ এরূপ শ্রেষ্ঠ-শ্রেণীর নাট্যশালাতেও দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ে সময়ে আদর্শ সৌন্দর্য্যাধার নায়ক নায়িকা স্থলে, দুইটী খর্ব্বাকৃতি মেদপিণ্ড (এ দোষ কৃত্রিম বর্ণরাগে বা সাজ সজ্জায় ঢাকিবার নহে) আবির্ভাব হইয়া, দর্শকের সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি-বাসনায় হস্তোত্তোলিত সুমিষ্ট পানীয় ভাণ্ডে কুইনাইন কণা নিক্ষেপ করে। নাট্যোল্লিখিত সুন্দর সুন্দরী নির্ব্বাচনের সময় অভিনেতা অভিনেত্রীর গাত্রবর্ণ অপেক্ষা মেদাতিশয্য, খর্ব্বতা প্রভৃতি যে সকল দোষ কৃত্রিম উপায়ে প্রচ্ছন্ন রাখিবার নহে, সে গুলির উপর অধিতকর দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ নাট্যশালায় হয়ত নায়ক নায়িকা অভিনয় কার্য্যে পারদর্শী হইলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বক্ষ্যমাণ নাট্যশালার আদর্শ অতি উচ্চ; সুতরাং সেখানে আমরা আরও কিছু অধিক প্রত্যাশা করি। যাহা হউক কুৎসিৎকে দর্শকের কল্পনা-চক্ষু সাহায্যে সুন্দর করিয়া লইয়া দেখিবার জন্য, প্রবীণকে, উপযুক্ত কৃত্রিম প্রতিবিধান না লইয়া, নবীন বেশে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন, প্রভৃতি বয়স ও আকারগত বৈষম্যের প্রতি অশিক্ষিত দর্শকেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে সে বিষয়ের উত্থাপন না করিয়া আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীগণের শিক্ষাগত অনুপযোগীতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

অভিনয়ের একটী প্রধান উদ্দেশ্য দৃষ্টি, শ্রুতি প্রভৃতির সহযোগে দর্শকের চিত্ত বিভ্রম উৎপাদন। দৃশ্যপট পরিচ্ছদ প্রভৃতি নাট্যশালার উপকরণগুলি যত জমকাল না হউক, সে গুলি যে পরিমাণে এই চিত্তবিভ্রম কার্য্যের সহায়তা করে তাহারা ততই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত

হয়। এই উদ্দেশে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ হইতে জাতি অবস্থা ও কালের ভেদাভেদ না করিয়া রাজা ও বাদসাহকে একরূপ মখমল জরিমণ্ডিত পোষাকে আবির্ভূত করিবার প্রথা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। দৃশ্যপট সমাবেশ বিষয়েও এই নিয়মানুযায়ী অনেক পরিবর্ত্তন বা উন্নতি ঘটিয়াছে। এবং প্রতিভার অভাবে অভিনয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে অপারগ হইলেও, অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রীই এক্ষণে গ্যালারীর করতালি প্রত্যাশায়, সময় ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বীররসের অবতারণা করিবার অনুরাগ পরিহার করিয়াছেন। সকলেই অভিনয় স্বভাবিক করিতে যথা সাধ্য যত্ন এবং সেই যত্ন প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন,—উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গের চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদন। কিন্তু শিক্ষার উন্নতির সহিত এই চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদন কার্য্য ক্রমশই কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিহিত হইলেই সাহেব সজ্জা সম্পূর্ণ হইত, কিন্তু এক্ষণে গাত্র চর্ম্ম ও কেশাদি শ্বেতাঙ্গের অবিকল অনুকরণে রঞ্জিত করিলেও যদি অভিনেতার স্বর বা ভাবভঙ্গি বা কথোপকথনে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি শিক্ষিত শ্রোতার চিত্ত-বিভ্রম কার্য্যে অপারগ হয়েন। কোন একটী থিয়েটারে এই সাহেবসজ্জা কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেও অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চে শেষোক্ত ক্রটী প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। নাট্য-শালাধ্যক্ষগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইংরাজী ভাষায় অশিক্ষিত লোককে সাহেব বা মেম সাজাইয়া ইংরাজিতে বাক্যালাপ করাইবার দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, এরূপ স্থলে বিকৃত হিন্দুস্থানী বা সাহেবী-বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করাই ভাল। যদি আকবর বাদসাহের সভায় কোন গায়ককে উপনীত করিয়া তাহাকে সঙ্গীত কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, আর অভিনেতা যদি ধ্রুপদ অঙ্গে অশিক্ষিত হয়েন, তাহা হইলে

গায়ককে কোন কাল্পনিক নামে অভিহিত করাই কর্ত্তব্য। কারণ তিনি যদি তানসেন নাম ধারণ করিয়া, রঙ্গমঞ্চে স্বীয় গুণপণা প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ অবস্থায় ধ্রুপদ অঙ্গে অনভ্যস্ত স্বরে, সমের দিকে সশঙ্কিত দৃষ্টি রাখিয়া, অনুকারী পক্ষীর ন্যায় দুই একটী ঝাঁপতাল বা চৌতাল লয়ের গীত গান করেন, তাহা হইলে তিনি সঙ্গীতাভিজ্ঞদিগের নিকট নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হইবেন। শ্রোতাগণ রঙ্গমঞ্চের তানসেনের নিকট কলাবতী রাগিণী বা বসন্ত রাগের আলাপ প্রত্যাশা করেন না; কিম্বা তিনি ধামারের "বাঁট" বা "অতীত" ও "অনাঘাত" করিয়া বাদকের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সূচনা করেন ইহাও আমাদের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ইতিহাসাভিজ্ঞ ও সঙ্গীত-কলানুরাগী শ্রোতাগণের চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদন করিতে হইলে তাঁহার ধ্রুপদ অঙ্গে শিক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা তিনি শ্রোতার অন্তরে প্রীতির পরিবর্ত্তে হাস্য-রসের উদ্রেক করিয়া অভিনয় সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবেন। কোন রঙ্গমঞ্চে এরূপ ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে দুই একটী নাট্যশালা নাট্যশিল্পের উচ্চাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী, তাহাদের উদ্দেশেই আমাদের এই ক্ষুদ্র সমালোচনাটী লিখিত হইল। কারণ অনেক নাট্যালয়ে, অভিনয় কার্য্যে, সাধারণ অশিক্ষিত দর্শকেরও বোধগম্য ইহাপেক্ষা গুরুতর দোষ প্রচুর পরিমাণে এবং পদে পদে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আর সে সমুদয়ের অস্তিত্বে, উল্লিখিত ভ্রম প্রমাদ গুলি নিরাকরণ করা, শতগ্রন্থি বস্ত্রে চিকণের কারুকার্য্য করার ন্যায় হইবে।

নাট্যশালার অভিনয়োদ্দেশে রচিত রুচিবিরুদ্ধ প্রহসনাদির বিষয় গত মে সংখ্যার "প্রয়াসে" আলোচিত হইয়াছে; এবং অন্তঃসারহীন, অতিরঞ্জিত বা অস্বাভাবিক নাটক নাটিকাদির অভিনয় সম্বন্ধেও

আলোচনা করা আমরা নিস্প্রয়োজন বিবেচনা করি। কারণ যদিও বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম নাট্যশালা হইতে অতি নিকৃষ্ট নাট্যশালা পর্য্যন্ত এরূপ পুস্তকের প্রশ্রয় দানে তুল্য রূপে অপরাধী, এবং যদিও জনসাধারণ এই পুস্তকের অভিনয় দর্শনে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আপনাদের কুশিক্ষা বা শিক্ষার অভাবের অহরহ পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এই শোচনীয় বিষয় এরূপ সর্ব্বজানিত ও বহুআলোচিত যে উহার উথাপন করিলে আমাদের উপর পুনরুক্তি দোষারোপ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আমাদের এক মাত্র আশা ও বিশ্বাস যে রঙ্গালয়ের ও জনসাধারণের সমাদর বা পৃষ্ঠপোষণ সত্বেও ঐ সকল জঘন্য বা নিকৃষ্ট পুস্তকাবলী, তুল্যরূপ অন্তঃসারহীন জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইবে। কালের বিচার অখণ্ডনীয়। কাল সমসাময়িক জন সাধারণের ন্যায় বাহ্য চাকচিক্যে ভ্রান্ত বা বিমোহিত হইয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় না। তবে বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল পুস্তকাভিনয় যে জনসাধারণের বিকৃতরুচি অধিকতর বিকৃত করিয়া সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সে বিষয়ে নাট্যশালাধ্যক্ষগণ কৃপাদৃষ্টি না করিলে আমরা নিতান্তই নিরুপায়।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

সাধারণ শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আধুনিক শিক্ষার যখন আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি কিছুই দেখা যাইতেছে না তখন আর আমাদের দেশে উন্নতি কিসে দেখা যাইবে? জীর্ণ শীর্ণ দেহ এবং ভীরু মন লইয়া কে কবে দেশের উন্নতি

সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে? ঔষধ খাইয়া কেবল বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব, ঔষধ খাইয়া পরিশ্রম করা সম্ভব নহে। কার্য্যের অভাবে, কায়িক পরিশ্রমের অভাবে আমাদের দেশের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, সমূহ অবনতি হইয়াছে। আজ যদি ইউরোপীয় বণিক্ স্বদেশজাত দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয়, কাল আমাদের উলঙ্গ হইয়া বনের ফল মূল খাইয়া থাকিতে হইবে। দেশে কুমার নাই, কামার নাই, তাঁতি নাই, মিস্ত্রী নাই যে দুদিনও আমরা ঘরের জিনিস ব্যবহার করিয়া দাঁড়াইতে পারি। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে লোকে দেখিতে পায় না যে আমাদের দেশে কি চলিতে পারে, কিরূপে উন্নতি হইতে পারে, কি আছে, কি নাই। উন্নতি বলিলেই ইহারা বুঝে বিলাতী ঢং চালান। বাগান করিতে হইলে তাহাতে জুঁই, বেল, প্রভৃতি ফুল গাছ থাকিবে না, বাড়ী করিতে হইলে তাহার উঠান থাকিবে না, জলকষ্ট দূর করিতে হইলে পুকুর বুজাইয়া কল বসাইতে হইবে, হাঁড়ি কলসী তৈয়ার করিতে হইলে বা কাপড় বুনিতে হইলে বৃহৎ কারখানা খুলিতে হইবে ইহাই লোকে বুঝে। টাকা দিবার ব্যবস্থা করিলেই দুই শত তাঁতি নিজ ঘরে বসিয়া আহ্লাদের সহিত কাপড় বুনিয়া যোগাইতে পারে, কিন্তু তাহা যুক্তি সঙ্গত না ভাবিয়া হাউস খুলিয়া চেয়ার টেবিল সাজাইয়া স্ক্রীন টাঙ্গাইয়া তুলা বিলাতে পাঠাইয়া কাপড় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করা সুবিধা বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ সুবিধা সকল বিষয়েই বিবেচনা করিয়া আমাদের কার্য্যের ফল এই হইয়াছে যে সামান্য অন্ন বস্ত্রের জন্য বিদেশী বণিকের হস্তে নির্ভর করিতে হইয়াছে। পরের জিনিস লইয়া নিজের উন্নতি দেখাইতে জগতে আমাদের দোসর নাই। ইংরাজ সজ্জায় বাবু

সাজিলেই, ইংরাজ সজ্জায় গৃহ সাজাইলেই, ইংরাজ সজ্জায় মাঠ ঘাট সাজাইলেই সভ্য ও উন্নতি জাতি হয় না। ইংরাজ রেলপথ করিয়াছে এবং আমাদিগকে গরু বাছুরের ন্যায় বোঝাই করিয়া এক দিনে কাশী বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী উন্নত হই নাই। ইংরাজ টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আপীষ করিয়াছে বলিয়া আমরা দূরদেশাবস্থ আত্মীয় স্বজনের সংবাদ এক পয়সা খরচ করিলে পাই, তাহা বলিয়া আমাদের উন্নতির কিছু পরিচয় পাওয়া গেল না। দেশের হিতসাধন করিতে হইলে যেরূপ কষ্ট সহিষ্ণু, দৃঢ়, সাহসী, স্বধর্ম্মানুগত ও স্বদেশ বৎসল হওয়া কর্ত্তব্য তাহার কিছু যদি আমরা শিখিতে পারি তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের কি হীন অবস্থা রহিয়াছে। বাঙ্গালীর নির্ম্মিত বলিয়া এমন কোন নূতন জিনিষ বাঙ্গালাতে নাই! আমাদের এমন অমার্জ্জিত বুদ্ধি যে ইংরাজেরা যে প্রকারে কল কারখানা চালাইয়া থাকে তাহা আমরা প্রত্যহ চোখে দেখিয়াও নিজে চালাইতে পারি না। এ হতভাগ্য জাতি যাহাতে হাত দেয় তাহাই কেমন শ্রীহীন ও ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। কি রেলওয়ে, কি দেশেলাইয়ের কল, কি কাপড়ের ব্যবসা, কিছুতেই শ্রীবৃদ্ধি হয় না। নূতন কারখানা সৃষ্টি করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করা দূরে থাকুক ইংরাজ নির্ম্মিত রেলগাড়ী ও জাহাজ চড়িয়া এক স্থানের উদ্বৃত্ত দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া ব্যবসা করিতেও ভুলিয়া গিয়াছি! দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হইলে দ্রব্যাদি সস্তা হইয়া থাকে। ইউরোপে এত উন্নত প্রণালীতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় যে স্বভাবিক রকমে কখনও তৎ পরিমাণে উৎপন্ন হয় না; আক হইতে যে চিনি হয় তাহার এক চামচে লইলে যত মিষ্টি হয় ইউরোপে কয়লা হইতে যে চিনি হইতেছে তাহার দুই চারিটি দানাতে তত মিষ্টি হয়! এই

শোধোক্ত চিনি আবার দামেও সস্তা। এই জন্যই ইউরোপ উন্নত বলিয়া গর্ব্ব করে। কিন্তু আমাদের দেশের উন্নতি (!) হইয়া দ্রব্যাদির পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে রেলপথ না থাকায় মালপত্র চালান দিবার মহা অসুবিধা হইত সুতরাং এক জায়গায় সস্তা অপর জায়গায় মহার্ঘ ছিল। এখন রাস্তা ঘাটের সুবিধা হইয়া কোথায় সব জায়গাতেই সস্তা হইবে, তাহা না হইয়া যেখানে সস্তা ছিল সেখানেও মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে আট আনা মন চাউল বিক্রয় হইত; এখন অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী হইয়া কোথায় চারি আনা বা ছয় আনা হইবে তাহা না হইয়া ছয় টাকা হইয়াছে! এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনেকেই বলিয়া থাকেন রপ্তানী। যদি মূল্য বৃদ্ধির এক মাত্র কারণ রপ্তানীই হয় তাহা হইলে আমাদের দেশীয় জুতা ও জামার দর বাড়িয়া গেল কেন? পূর্ব্বে আমাদের দেশের ভদ্র লোকেরা বার্ণিস করা বা কালজুতা পরিতে পাইতেন না এবং সেলাই করা চোগা চাপকান প্রভৃতি গায়ে দিতেন না এ কথা বোধ হয় কেহ বলিবেন না। কিন্তু তখন দশ, বার আনা বা এক টাকায় ভাল জুতা পাওয়া যাইত এবং জামার সেলাইয়ের দর দুই, চারি আনা মাত্র ছিল। সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে মূল্য বৃদ্ধির কারণ রপ্তানী নহে; উহা ব্যবসায়ীর অভাব। দেশে খরচ হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই রপ্তানী হয়। এখন দেশের খরচের মত জিনিষ কাহার কাছে থাকে; তাহা কিছু আর দেশের সকল লোকে নিজ নিজ প্রয়োজন মত একেবারে সম্বৎসরের জন্য কিনিয়া রাখে না; তাহা দেশের ব্যবসায়ীদের নিকটই থাকে। কিন্তু দেশে যত সংখ্যক ব্যবসায়ী থাকিলে প্রয়োজন মত দ্রব্য দেশেতেই থাকে তত যদি ব্যবসায়ী না থাকে তাহা হইলে খরচের জিনিষ অবধি বিদেশে

চালান হইয়া যাইবে। এইরূপে খরচের জিনিষ একবার বিদেশে চলিয়া যাইলে দুই কারণে মূল্য বৃদ্ধি হয়। প্রথমতঃ বিদেশ হইতে আনাইতে হয় বলিয়া দাম বাড়িয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ দেশীয় ব্যবসায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় যে কয়জন দেশীয় ব্যবসায়ী থাকে তাহারা বিদেশীয় আমদানী দ্রব্যের সহিত সমান দাম লইয়া বিক্রয় করে। যাহা হউক, এইরূপে আমাদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যই বিদেশ হইতে লইতে হয় এবং যাহা কিছু দেশে উৎপন্ন হয় তাহাও বিদেশী বণিকের হাত ফের করিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশের এই অবস্থাকে আমরা উন্নত অবস্থা বলিতে চাহি!!

তবে কি এই ৬৫ বৎসর ধরিয়া যে আমরা এক অতি সমৃদ্ধিশালী ও সুসভ্য জাতির বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া আসিলাম তাহা সকলই ব্যর্থ হইল? না একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। যত দূর আশা করা হইয়া ছিল ততদূর হয় নাই। বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এখন দেশে শতকরা ১৩জন করিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া থাকে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এই ৬৫ বৎসরে গড়ে ৫ বৎসরে শতকরা ১জন করিয়া বাড়িয়াছে। এই অল্প সংখ্যার মধ্যে প্রকৃত বিদ্বানের ভাগ অতি সামান্য—সর্ব্বশুদ্ধ ১০০জন হয় কি, না, সন্দেহ। দেশের মধ্যে যখন শতকরা ৮৫জন বিদ্যা শিক্ষা করে না, এবং যে কয়জন করে তাহারা চাকুরী বা ওকালতী করায় দেশের ধন বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে না, তখন কাযেই বলিতে হইবে যে আধুনিক শিক্ষার ফলে দেশের কিছুই উন্নতি হয় নাই। হইতে পারে আমরা অতিশয় স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন সেই জন্য আমরা শিখিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জাতির সন্তান হইয়া আমাদের বুদ্ধি এত স্থূল হইতে পারে না যে আমরা

কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি না। তবে পূর্ব্ব পুরুষের মার্জ্জিত বুদ্ধি বৃত্তি চর্চ্চা অভাবে আমরা কিঞ্চিৎ জড়তা প্রাপ্ত হইতে পারি; তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, আমরা তাহা না হইতে পারি। কিন্তু কোন বন্য ও সম্পূর্ণ বর্ব্বর জাতির সমান যে আমাদের বুদ্ধি জড়-ভাবাপন্ন তাহা নহে। অনেক অজ্ঞ ইউরোপীয় লোকের মতে আমরা অসভ্য ও বর্ব্বর জাতি তাহারা জানে যে আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম জানি না; সহরে বাস করিতে জানি না; ধর্ম্মের সূক্ষ্মভাব জ্ঞাত নহি; সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা কিছুই জানি না; যখন সভ্য জাতির ন্যায় আমরা কাপড় পরি না, যখন সভ্য জাতির ন্যায় আমরা মদ্য মাংস সহকারে ভোজন সমাপন করি না, যখন আমরা জিম্‌নাষ্টিক না করিয়া কুস্তি করি, যখন আমরা ঘরের ভিতর বদ্ধ হইয়া গরম জলে স্নান না করিয়া পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করি, যখন আমরা দৃশ্যমান কাগজ কলমের লেখার পরিবর্ত্তে অদৃশ্য ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য, বিবাহ সম্পন্ন করিয়া থাকি, যখন আমরা বিবাহ সূত্র ছিন্ন করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি, তখন কাযেই আমরা অসভ্য। কিন্তু এইরূপ গায়ের জোরে যদি কেহ আমাদের অসভ্য বলিতে চাহে তাহাতে আমাদের ক্ষতি কিছুই হইবে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে যেখানকার লোকের বাহ্যিক কীর্ত্তি কলাপ ইউরোপের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখনও অটল ভাবে বিরাজ করিতেছে যেখানে অবিনশ্বর মানব বুদ্ধির উৎকর্ষতা, যাহা ভারতের ন্যায় পৃথিবীর কোথাও সাধিত হয় নাই, তাহা যে ইতিমধ্যে লোপ পাইবে বা পাইতে পারে তাহা একেবারে অসম্ভব। বিশেষতঃ ভারতের ন্যায় দেশে লোকের স্থূল বুদ্ধি হইতে পারে না, কারণ যেখানে নানা প্রকার

রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজ বিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব যুগে যুগে উপস্থিত হইতেছে সেখানে লোকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মনোবৃত্তি সকলের চর্চ্চা করিতে বাধ্য হয়। অতএব আমাদের বুদ্ধির দোষে কিছু শিক্ষার দোষে ঘটে নাই।

কি দোষে যে শিক্ষা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহা কবি রামপ্রসাদ বেশ বলিয়া গিয়াছেন—"মন তুমি কৃষি কায জান না। এমন মানব জমী রইল পতিত আবাদ কল্লে ফল্‌ত সোণা।" আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে; এখানেও কৃষি কায জানা নাই বলিয়া সোণা ফলে নাই। আবাদ করিতে হইলে জমীর গুণ জানা চাই। কাবুলে পেস্তা ফলে বলিয়া বাঙ্গালাতে পেস্তা গাছ পুতিলে পেস্তা ফলিবে না। কিন্তু সেইরূপ তৈলাক্ত পদার্থ বাঙ্গালায় অন্য রকমে প্রচুর পাওয়া যায় ইহা নারিকেল। যে বাঙ্গালার জমীর গুণ জানে সে কখনই বাঙ্গালাতে পেস্তা ফলাইবার জন্য মাথা ঘামাইবে না, কিন্তু তদ্রূপ উপকারী নারিকেল ফলাইতে সমধিক যত্নবান হইবে। অর্থাৎ যাহা এক দেশে জন্মায় তাহা যথাযথ উঠিয়া অপর দেশে লইয়া গেলে তেমন জন্মায় না। যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথা ইংলণ্ডে আছে তাহা এখানে যথাযথ চলে না। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে তাহা এখানেও চেষ্টা করায় আশানুরূপ ফল ফলে নাই। সেখানকার বিশ্ব বিদ্যালয়ের কেমন সতেজ, সবল ও মহাবীর্য্যসম্পন্ন ছাত্র আর সেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের এখানে কিরূপ ভীরু, রুগ্ন, ও অন্তঃসার-শূন্য ছাত্র। অনেকের ধারণা আছে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে টুকু শিখান হইয়া থাকে সেটুকু সুফল ফলিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন যে সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, পদার্থ বিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রভৃতি যাহা আমরা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে শিখি তাহাতে ঐ সকল

বিষয়ে আমাদের যথার্থ পাণ্ডিত্য জন্মায়। কিন্তু ইহাদের জানা উচিত যে পাণ্ডিত্য কেবল চাকুরী করিলে বা অপরের মত বলিতে পারিলেই হইল না, নিজের কিছু দেখান চাই। বাঙ্গালায় পেস্তা জন্মায় না বলিয়া পেস্তা গাছ পুতিয়া তাহাতে পেস্তা ঝুলাইয়া দিলেই যেমন পেস্তা ফলান হইল না তেমনি এখানকার লোকেদের খানকতক করিয়া ইংরাজী পুস্তক পাঠ করাইলেই ইংরাজী সভ্যতা শিখান হইল না। যদিও অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এক জায়গার জিনিষ আর এক জায়গায় উৎপাদিত হইতে পারে, কিন্তু অতি নিকৃষ্ট রকমের হইবে, এবং তাহার উপকারিতাই বা কি? আমরা যদি ইংরাজী সভ্যতা প্রাপ্ত হই তাহা হইলে বড় জোর না হয় আমরা ফিরিঙ্গী হইয়া যাইব। যদি ফিরিঙ্গী হই তাহা হইলে ইংরাজ সমাজের কি উপকার হইতে পারে? আমরা যাহা লিখিব তাহা ইংরাজের লেখা বলিয়া খাঁটি ইংরাজেরা আদর করিবে না; আমরা যাহা সমাজে চলিত বলিয়া ধরিব খাঁটি ইংরাজেরা তাহা ধরিবে না। এইরূপে যদি আমরা ইংরাজ সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পাই তাহা হইলে সে সমাজের যাহা সদাচার, উৎকৃষ্ট গুণ, তাহা আমরা কিছুই পাইব না; সেই সমাজের ঘৃণিত ও দয়ার পাত্র হইয়া থাকিব। হিন্দু সমাজে যেমন মুচি, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরা থাকে, ইংরাজ সমাজেও আমরা সেইরূপ থাকিব। কেবল এক মাত্র প্রভেদ হইতে পারে মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরা হিন্দু সমাজে উচ্চ শিক্ষা পায় না, আমরা কিন্তু ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, ডিগ্রী পাইব। কিন্তু ফল উভয়ই সমান। একজন মুচি শিক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণের পদ আকাঙ্ক্ষা করিলে যেমন সে অপদস্থ হইয়া থাকে তেমনি আমরা যদি এম, এ হইয়া এক জন ইংরাজ এম, এ,র সমান বলিয়া চলিতে চাহি তাহা হইলে আমরাও

তদ্রূপ উপহাসাস্পদ হইব। বড় জোর আমাদের শিক্ষা দেখিয়া ইংরাজ বলিতে পারে যে বেশ শিখিয়াছে, কিন্তু কখনও কোন ইংরাজ আমাদের নিকট কিছু শিখিতে আসিবে না। তাহারা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে যে ঠিক যেন ইংরাজের মত পড়িতে পারে কিন্তু আমরা যদি ইংরাজের মত লিখিতে যাই, আমরা যদি হ্যামিল্টনের ফিলজফির উপর জনষ্টুয়ার্টমিলের ন্যায় সমালোচনা করিতে যাই তাহা হইলে কেহ বা হাসিবে কেহ বা গালিবর্ষণ করিবে। যে শিক্ষার ফল এইরূপ তাহা যে ভাষাতেই শিখান হউক না কেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে পরিত্যজ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ।

ভূতের বাড়ী।

কয়েক মাস গত হইল একদিন আমি লক্ষ্ণৌএ একটি বন্ধুর বাড়ীতে বৈকালিক চা পানের পর গল্প করিতেছিলাম। আমি ও আমার বন্ধু ব্যতীত উভয়ের পরিচিত আরও কয়েকটি ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা গল্প করিতেছি এমন সময় সেখানে আর একটি ভদ্রলোক মোটা আলষ্টারে আবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী অচিরাৎ আগন্তুককে তাঁহার একজন অনেক দিনের বন্ধু বলিয়া চিনিলেন এবং পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর আমাদের সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোক একজন উচ্চ শিক্ষিত বিলাত প্রত্যাগত দার্শনিক—নাম মিঃ দে (B. A. Ph. D.) ক্রমে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট আলাপে বুঝিলাম যে তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাঁহার পুস্তকার্জ্জিত জ্ঞানাপেক্ষা বহুদর্শন জনিত জ্ঞান

কোন অংশে ন্যূন ছিল না। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং এত কৌতুক ও বিপদজনক ঘটনা প্রিয় যে সেরূপ আজ কাল শিক্ষিত যুবক মণ্ডলীতে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার সহিত বাক্যালাপে বুঝিলাম যে তিনি অতি সৎ, অমায়িক এবং সত্যপ্রিয়। যাহা হউক আমাদের কথোপকথনের স্রোত ক্রমে বিষয়ান্তর হইতে অপদেবতার অস্তিত্বের দিকে ফিরিল। মিঃ দে জিজ্ঞাসা করিলেন "যখন আপনারা ভূতের কথা তুলিলেন, আপনারা কেহ কি স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন?" অবশ্য আমরা কেহ স্বচক্ষে দেখি নাই স্বীকার করিলাম, কিন্তু ভূত-যোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ অবগত আছি ইহাও বলিলাম।

"ছিঃ" মিঃ দে ঘৃণার সহিত বলিলেন "ছিঃ! আপনারা শোনা কথার উপর নির্ভর করিতেছেন; কিন্তু আমি জীবন্ত মূর্ত্তিমান ভূতের কথা বলিতে পারি যাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া আমরা উপস্থিত তর্ক ছাড়িয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে ভূতের কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম, কারণ আমরা কেহই সে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ দর্শকের নিকট হইতে ভূতের কথা শুনি নাই।

মিঃ দে আমাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য মৃদু হাসিতে বলিতে লাগিলেনঃ—

*"ইং ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি অযোধ্যায় একটী প্রসিদ্ধ তালুকদারের বিষয়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া কাশীধাম হইতে যাত্রা করিলাম। রেলে আক্‌বারপুর (O. &. R. Ry.) ষ্টেসন পৌঁছিয়া

* এই ঘটনাটি অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সহযোগী "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক প্রমাণ দিতে পারেন, এবং ইচ্ছা করিলে যে কেহ তৎকথিত ঠিকানায় যাইয়া ভূত দর্শনের সাধ মিটাইতে পারেন।

সেখান হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল পাকা রাস্তা দিয়া আমাকে হস্তী-পৃষ্ঠে যাইতে হয়। অপরাহ্নে আমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম এবং অবিলম্বে আমার প্রভু রাজাবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজাবাহাদুর আমাকে সবিশেষ যত্ন এবং সমাদর করিলেন এবং যাহাতে তাহার নিকট আমার অবস্থান সুখকর হয় এজন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টাও দেখিলাম। আমার বাসস্থান পছন্দ করিয়া লইবার জন্য তাঁহার কতিপয় কর্ম্মচারীর প্রতি আমাকে কয়েকটি বাড়ী দেখাইতে আদেশ করিলেন। আমিও একে একে সকল গুলিই দেখিলাম কিন্তু একটিও পছন্দ হইল না। রাজ-কর্ম্মচারীরা আমার নৈরাশ ভাব দেখিয়া পরস্পর কি চুপি চুপি বলাবলি করিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে বলিল যে সেই গ্রাম হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল দূরে একটি বাঙ্গলো আছে তাহা আমার পছন্দসই হইতে পারে। কথিত বাঙ্গলোটি একজন নীলকর সাহেবের ছিল; সে রাজার একজন আত্মীয়কে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদে আমার বিষণ্ণ অন্তঃকরণ একটু প্রফুল্ল হইল, এবং আমি বরাবর রাজ সন্নিধানে গমন করিয়া নীলকরের বাঙ্গলোটিতে বাসের জন্য প্রার্থনা করিলাম। এই প্রার্থনায় রাজার মুখে চকিতের ন্যায় একটু চিন্তা দেখা দিল এবং পরক্ষণে তাঁহার কর্ম্মচারীদের প্রতি একটি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিলেন "হাঁ বাঙ্গলো আছে বটে কিন্তু আপনার সেখানে সুবিধা হইবে না, আর সে এখান হইতে অনেক দূর, নির্জ্জন এবং খোলা মাঠের উপর"।

আমি বলিলাম যত নির্জ্জন হয় আমার ততই ভাল। আর এস্থান দেখিতে পাইলে আমি সুবিধা হইবে কিনা বুঝিতে পারি।

রা। না, সে আর কষ্ট করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। সেখানে আপনার বাস করা হইবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন, সেটির কি একেবারেই বাসের অযোগ্য ভগ্নাবস্থা" ?

"না, না, তা নয়" বলিয়া রাজা যেন কি বলিবেন ভাবিয়া পাইতেছে না। তারপর একটু থামিয়াই বলিলেন "সেখানে আমি কাহাকেও এক রাত্রের জন্য বাস করিতে বলিতে পারি না, বিশেষ আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং আমার ম্যানেজার, আপনার ত কথাই নাই।"

জানি না আমার তখন কি দুর্ম্মতি হইয়াছিল, আমি তথাপি প্রশ্ন করিতে ছাড়ি নাই—"কেন" ?

রাজার কথায় একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল তিনি বলিলেন "ঐ বাঙ্গালাতে ভূত আছে এবং একরাত্র সেখানে বাস করিলে আর জীবন্ত বাহির হওয়া যায় না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া চক্ষুবিস্ফারিত করিলাম। ভূতযোনিতে আমার যেরূপ অবিশ্বাস, অপর কেহ ঐ কথা বলিলে আমি হাসিয়াই উড়াইয়া দিতাম; কিন্তু প্রভুর সম্মুখে হাসি চাপিয়া, গম্ভীর হইয়া বলিলাম "যদি তাহাই আপনার অসম্মতির একমাত্র কারণ হয়, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক বাড়ীটি খুলাইয়া আমার বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিন, মহারাজা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার নিকট কোন ভূত আসিবে না, কারণ আমি ভূতের অস্তিত্ব একেবারে বিশ্বাস করি না।"

আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অনেকক্ষণ পরে রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মত হইলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি পদব্রজেই বাঙ্গলো দখল করিতে চলিলাম। পথে আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য, যাহাকে আমি কাশী হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, নিকটে কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা করিয়া আসিবার জন্য অনুমতি চাহিলে আমি তাহাকে বলিয়াদিলাম আচ্ছা তুমি যাও

কিন্তু যত শীঘ্র পার ফিরিয়া আসিও। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা পৌঁছিলাম। বহির্দ্বার পার হইয়া কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া আমরা একটি ঘরে প্রবেশ করিলাম। এখানে রাজার অনুচরেরা আমাদের অভ্যর্থনা করিল এবং মাঝের হলের ভিতর লইয়া গেল। এই ঘরের মধ্যস্থলে একখানি চারপেয়ের উপর আমার শয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তন্নিকটে একখানি চেয়ার ও একটি ছোট টেবিল স্থাপিত ছিল; আর আমার শয্যার পশ্চাতে দেয়ালের নিকট আমার বিছানা পোর্টমেণ্ট প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছিল। সে সময় বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া বাঙ্গলোটির চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না, কিন্তু পরদিন প্রাতে সমস্ত দেখিয়াছিলাম। বাঙ্গলোর মধ্যস্থলে হল। এইটি সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রশস্ত গৃহ, ইহার চতুষ্পার্শ্বে চারিটি ঘর আছে। সম্মুখ ও পশ্চাতের ঘর দুটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। হলের ভিতর দিকে মোট আটটি দরজা আছে, বড় ঘর গুলির তিনটি করিয়া এবং ছোট ঘর দুটির একটি করিয়া। আমি ঘরের ভিতর আসিয়া দেখিলাম সকল দ্বার গুলিই বন্ধ কেবল যেটি দিয়া প্রবেশ করিয়াছি সেইটি খোলা। সেই দরজার দিকে সম্মুখ করিয়া টেবিলের পার্শ্বে আমি চেয়ারের উপর বসিলাম। রাজার লোকেরা আমার আহারের যোগাড় করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

বাঙ্গলোয় দুটিমাত্র কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল, একটি হলের ভিতর এবং দ্বিতীয়টি হলের সম্মুখের পথের ঘরের ভিতর। হলের আলোটি তত উজ্জ্বল নয় দেখিয়া আমি পোর্টমেণ্টের ভিতর হইতে একটি বাতি বাহির করিয়া, টেবিলের উপর জ্বালিয়া দিলাম এবং লেখার সরঞ্জাম বাহির করিয়া কার্য্যাদি সম্বন্ধে আমার ভ্রাতাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। ইতিমধ্যে রাজার লোকেরা আসিয়া আমার

খাবার ঘরের কোনে রাখিয়া বিদায়ের জন্য সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। আমার চাকর ফিরিলে যেন তাহাকে এই খানেই পাঠাইয়া দেয় এই আদেশ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলাম। এই লোকগুলির ভাবে দেখিলাম যেন তাহারা এখান হইতে যাইতে পারিলেই বাঁচে। এ বাড়ীর যেরূপ বদনাম তাহাতে ইহা আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল না। তাহারা চলিয়া গেলে আমি পত্র লিখিতে লাগিলাম। লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় দেখিলাম আমার বামদিকের ঘরের দরজাটি খানিকটা খুলিয়া গেল এবং সেই সময় আমি ঐ দিকে চাহিয়া থাকাতে, কাল কোট পরা একটি হাত যেন স্পষ্টই দেখিলাম। অবশ্য হাতটি পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল যেন রাত্রে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই ঘরে কেহ লুকাইয়া আছে। আমি সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তৎক্ষণাৎ বাতিটি লইয়া সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঘর একেবারে শূন্য, মানুষত দূরের কথা পশু পক্ষী এমন কি একটি কুটি কাঠি পর্য্যন্তও নাই। আরও আশ্চর্য্য সে ঘরের দ্বিতীয় দ্বার নাই, কেবল ছাদের একটু নিম্নে দেয়ালে আলো আসিবার জন্য দুটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, তাহাও আবার ঘনসন্নিবিষ্ট লৌহ রেলিং দ্বারা আবদ্ধ।

আমার মন বড় চঞ্চল হইল। কাল কোটাবৃত হাত খানি আমি বাতির উজ্জ্বল আলোকে অন্ততঃ পাঁচ সেকেণ্ড কাল স্পষ্টই দেখিয়াছি। তবে ইহা কি? এই প্রশ্ন স্বঃতই আমার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। মনে মনে মীমাংসা করিলাম হাওয়াতে দরজা খুলিয়া গিয়া থাকিবে, কিন্তু হাওয়া কই? তখনও যেরূপ এখনও সেইরূপ বিন্দুমাত্র বায়ু সঞ্চালন নাই। যাহা হউক দরজাটি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া পত্রখানি শেষ করিবার জন্য চেয়ারে আসিয়া বসিলাম।

লিখিতে লিখিতে বারম্বার সেই দ্বারের দিকে চাহিতেছি, যেন আবার কি নূতন দৃশ্য নয়ন গোচর হইবে। চিত্ত বড় চঞ্চল হইতেছে বলিয়া শেষ কয়েক ছত্র কি লিখিব ভাবিয়া পাইতেছিনা। এইরূপ ভাবে প্রায় কুড়ি মিনিট অতিবাহিত হইল। আমি পত্রে নাম সই করিতে যাইতেছি, ইতিমধ্যে একবার দরজার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিলাম, দেখি দুটি কপাট খুলিয়া গিয়াছে এবং পায়জামা ও কাল কোর্ত্তা পরা সাদা পাগ্‌ড়ি বাঁধা এক মূর্ত্তি বাহির হইল এবং আমার দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অবনত মস্তকে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া সসম্মানে তিনটি কুর্ণিশ করিয়া তৎপরে ক্ষিপ্রপদে পুনরায় ঘরের ভিতর গিয়া অদৃশ্য হইল।

এই মূর্ত্তির বুকে একখান পিতলের চাপরাশ ছিল কিন্তু ইহার মুখের দিকে চাহিয়াই আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়াছিল। মুখ যেন রক্তহীন ভাব শূন্য শবের মুখের ন্যায়, কি ভয়ানক মূর্ত্তি! এই চাপরাশী অদৃশ্য হইলে আমার শঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইল। রাজার বার বার নিষেধ বচন মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল এবং আমি যে সম্পূর্ণ বিপদ-সঙ্কুল স্থানে একাকী বাস করিতেছি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমার চাকরটি পর্য্যন্ত এখনও ফেরে নাই। মনে মনে তাহাকে বিশেষ শিক্ষা দিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। একবার মনে হইল এখান হইতে পলাইয়া যাই, কিন্তু ভাবিলাম এত গর্ব্ব করিয়া শেষে পলাইলেই বা রাজা কি মনে করিবেন আর এখান হইতে ১॥০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাজার লোকদের এত রাত্রে জাগাইতে হইবে; তাহাদের নাম জানি না কোথায় থাকে তাহাও জানি না। পলায়ন করা হইবে না, যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটুক, এই খানেই রাত্রি যাপন করা স্থির করিলাম।

এখন প্রায় মধ্যরাত্র; আমার খাবার যেখানে রাখিয়া গিয়াছিল

সেই স্থানেই অভুক্ত পড়িয়া আছে। খাওয়া পরের কথা ভয়ে একেবারে আমার ক্ষুধার লোপ পাইয়াছে। জানি না আরও কত কি অমানুষিক কাণ্ড ঘটিবে, এই ভাবিতেছি আর সেই চেয়ারে বসিয়া উন্মুক্ত দ্বারের দিকে দেখিতেছি। মনে করিলাম আর একবার সেই ঘরে গিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করি, দেওয়ালে বা মেঝেতে কোনও গুপ্তদ্বার আছে কিনা যদ্দারা মনুষ্য শক্তি আমার ভয়োৎপাদন করিতেছে। কিন্তু মনে হইল যে দেওয়াল এবং ঘরের মেঝে অতি পরিষ্কার দেখিয়াছি এমন কি একটি দাগ পর্য্যন্ত নাই। আরও, এই চাপরাশীর মুখ যে সকল সন্দেহ দূর করিয়াছে, সে মুখ কি কোন জীবন্ত মনুষ্যের হইতে পারে?

শীঘ্রই আমার এ সকল সন্দেহ দূর হইল। আমি দরজার দিকে একবার চাহিয়াছি আর সাদাসাড়ী পরিধানা একটি স্ত্রীমূর্ত্তি ঘরের ভিতর হইতে বরাবর হল পার হইয়া আমার টেবিলের সম্মুখে আসিল এবং আমার দিকে ফিরিয়া অতি দীন ভাবে মস্তক অবনত করিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইল। আমার মনে হইল যে সে কিছু বলিবে। কিন্তু প্রায় পাঁচ মিনিট কাল সেই ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার আকৃতিতে উচ্চ বংশীয়া হিন্দু মহিলা বলিয়া বোধ হইল। মুখ অবনত থাকায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না কিন্তু তথাপি তাহার মুখে সেই ভাব হীন শবচ্ছায়া যেন স্পষ্টই লক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু এখানকার ছত্রিয় মহিলারা যেরূপ হলুদ মাখিয়া থাকে সেরূপ বলিয়া ততটা রক্ত-হীন বোধ হইল না। যাহা হউক এই ললনামূর্ত্তির মুখশ্রী যে অতিশয় সুন্দর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার যেন বেশ বোধ হইতে লাগিল স্ত্রীলোকটি কিছু বলি বলি করিয়া লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। আমিও তিন চারিবার জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়াস করিলাম কিন্তু

বাক্ সরিল না। আমার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে এবং জিহ্বা যেন তালুদেশে লাগিয়া রহিয়াছে। কথা কহিব কি এক মুহূর্ত্তের জন্য এই স্ত্রীমূর্ত্তি হইতে আমার চক্ষু অপসারিত করিতে পারি নাই। প্রায় পাঁচ মিনিট এই ভাবে থাকিয়া স্ত্রীলোকটি সেই ঘরের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টি করিল এবং ত্বরিতপদে সেই দরজার ভিতর হইতে কি যেন হাতে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল। এই মূর্ত্তি দ্বয়ের এই বিশেষত্ব লক্ষ করিলাম যে ইহারা যাইবার বা আসিবার কালে অতি দ্রুতপদে অথচ নিঃশব্দে ভ্রমণ করে। যাহা হউক স্ত্রীলোকটি কি হাতে করিয়া ফিরিল; এবং—এখনও বলিতে শরীর কণ্টকিত হইতেছে—আমার টেবিলের নিকট আসিয়া একটি সদ্য প্রসূত অপরিণত ভ্রূণ ধুপ্ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। টেবিল কাঁপিয়া উঠিল আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম; আর শব্দত কানে শুনিয়াছি। আমার শরীরের প্রতিলোম সোজা হইয়া উঠিল। আমি চেয়ার ধরিয়া অর্দ্ধ-উত্থিত হইলাম; কিন্তু তৎক্ষণাৎ (বোধ করি ১০।১২ সেকেণ্ড মধ্যে) শিশু এবং রমণী আমার সম্মুখ হইতে যুগপৎ অদৃশ্য হইয়া গেল—ঠিক যেন দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেল। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে সেই অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় থাকিয়া আমি দৃঢ় মুষ্টিতে চেয়ার খানি ধরিয়া আছি, আর শূন্য মনে যেন কলের পুতুলের প্রায় সেই ঘর পানে চাহিয়া আছি। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম জানি না কিন্তু পুনরায় দেখিলাম সেই চাপরাশী মূর্ত্তি আসিতেছে। আমার যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে কিন্তু মনে মনে খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া আছি। চাপরাশী আসিয়া দক্ষিণ হস্তে আমার টেবিলের বাতিটি উঠাইয়া লইল এবং সম্মুখের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আমাকে বাম হস্ত সঞ্চালনে যেন অনুগমন করিতে বলিল।

আমি মনে করিলাম যদি ইহার সঙ্গে যাই তবে হয়ত কোনও স্থানে লইয়া গিয়া আমার প্রাণ সংহার করিবে। আবার মনে হইল যে এতাবৎ ইহারা আমার কোনও অনিষ্ট করে নাই, বরং অতি কাতর এবং বশ্যতার ভাব দেখাইয়া আসিতেছে অতএব যদি ইহার আজ্ঞামত কার্য্য না করি তবে রুষ্ট হইয়া এই খানেই আমার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। এই চিন্তা গুলি বিদ্যুৎ বেগে মনে উদয় হইল এবং তাহার আজ্ঞাপালন শ্রেয়ঃ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। সে ক্রমে দরজা ও পরে পথের ঘর পার হইয়া প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চারি দিক বিধৌত। বাহিরের নৈশ সমীরণ স্পর্শে আমার মস্তিষ্ক সুশীতল হইল। দেহে একটু যেন বল ও মনে সাহস দেখা দিল। যাহহিউক চাপরাশীরূপী ভূত কএক পদ গিয়া প্রকাণ্ড একটি কাঁটাল বৃক্ষের তলে উপস্থিত হইল এবং বাতিটি মাটিতে রাখিয়া কাতর ভাবে বৃক্ষোপরি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমায় দেখাইতে লাগিল; আবার বৃক্ষতলের মৃত্তিকা নখ দ্বারা আঁচড়াইতে লাগিল। ভাবে বুঝিলাম যেন এই গাছের উপরে এবং মৃত্তিকা তলে প্রোথিত কোনও বিশেষ রহস্য গুপ্ত আছে।

অতঃপর চাপরাশী বাঙ্গলোর ভিতরে ফিরিয়া গেল। আমি সেই শশীকিরণ বিভাসিত, শ্যামদুর্ব্বা মণ্ডিত প্রাঙ্গণে বসিয়া কতক্ষণে প্রভাত হইবে ভাবিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এইভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম জানি না কিন্তু নিকটে মনুষ্যস্বর শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, চাহিয়া দেখি চারজন গুণ্ডাকৃতি পুরুষ দীর্ঘ লগুড় হস্তে আমাকে সেলাম করিতেছে। আমি কথা কহিবার অগ্রে তাহারা বলিল যে রাজার হুকুমে তাহারা বাঙ্গলোর চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতেছে। কিন্তু

হুজুরকে এই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জানিতে আসিয়াছে যে কোনও ভয় পাইয়াছি কিনা। তাহাদের মিথ্যা কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাহারা রাজার লোক সত্য, এবং বাঙ্গলোতে পাহারা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে সত্য কিন্তু দারুণ ভয় প্রযুক্ত তাহারা দূরে কোনও স্থানে নিরাপদে রাত্রিযাপন করিয়া এই মাত্র আসিতেছে।

এখন ভোর হইয়াছে। আমি তাহাদের সাহসের প্রশংসা করিয়া বলিলাম যে আমি কিছু ভয় পাই নাই তবে ঘরের ভিতর গরম হওয়াতে হাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছি মাত্র।

যাহা হউক এই রাত্রের ঘটনা আমি সেখানে কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই এমন কি রাজাকেও কিছু জানিতে দিই নাই। বলা বাহুল্য দূরত্ব ইত্যাদির ওজর করিয়া সেই দিনই আমি বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলাম।

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া থাকিতে থাকিতে কালে এই বাঙ্গলোর নিম্ন লিখিত রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিয়াছিলাম :—

নীলকর সাহেব চলিয়া গেলে পর বাঙ্গালাটি স্থানীয় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের দখলে আসে। একটি বৃদ্ধা তাহার পুত্র ও পুত্রবধু লইয়া এই পরিবার গঠিত। পুত্রের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়াতে তাহার যুবতী স্ত্রী একটি চাপরাশীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে গর্ভবতী হয়। কারাগারেই যুবক এ সংবাদের আভাষ পাইয়াছিল এবং কারামুক্ত হইয়া স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করিয়া সে প্রথমেই পদাঘাতে গর্ভবতী স্ত্রীকে বিনষ্ট করে এবং তৎপরে সেই চাকরকেও হত্যা করিয়া দেহ দুটা কাঁটাল গাছের তলায় পুতিয়া রাখে। তৎকালে ইহাদের কোনও অনুসন্ধান হয় নাই। লোকে মনে করিল উভয়ে পলায়ন

করিয়াছে। পুত্র ও তাহার মাতার মৃত্যুর পরে এই ঘটনার আর কেহ সাক্ষ্য রহিল না। কেবল গুপ্ত পাপীদের প্রেতাত্মা আসিয়া বাঙ্গলায় নিশাযাপন কারীকে এই শোচনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করায়।

হজ্‌মি গুলি।

সে দিন কোন বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার্থ আহারটাও কিছু গুরুতর রকমের হইয়াছিল; অবশ্য তাহাতে সে সময়ে মুখ কিম্বা উদর বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বাড়িতে আসিলে পর পাকস্থলী অভিমান করিয়া বসিল, কিছুতেই সেই সমস্ত গুরু আহার্য্য পরিপাক করিতে সম্মত হইল না, হুট হাট, গুড় গুড়, কোঁ কোঁ প্রভৃতি নানাবিধ গজ্‌ গজ্‌ ধ্বনি আরম্ভ করিল, অনেক কাকুতি মিনতিতেও থামিল না। তখন পিসি, নিজ কৌটা হইতে সরিষা পরিমাণ অহিফেন আনিয়া উহা সেবন করিতে পরামর্শ দিলেন। আফিম্‌ সেবনের অল্পক্ষণ পরেই আরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর কৃপালাভ করিলাম, কিন্তু যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তৎবৃত্তান্তই নিম্নে বর্ণিত হইল।

দেখিলাম বঙ্কিমবাবু বার্‌কোস্‌ মাথায় করিয়া হজ্‌মি গুলি বিক্রয় করিতে করিতে পথে যাইতেছেন। দীনবন্ধু মিত্র বাড়ীর রকে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। বঙ্কিম বাবুকে হজ্‌মিগুলি বিক্রয় করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে বঙ্কিম, এ নূতন ব্যবসা ধরিলে কবে থেকে?" বঙ্কিম বাবু বলিলেন "আগে তোমার হুঁকাটা একবার দাও, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা শুখিয়ে গেছে অথচ এক পয়সাও

বিক্রয় হইল না।” তখন মাথার বার্‌কোস্ রকে নামাইয়া, দীনবন্ধু বাবুর পার্শ্বে উপবেসন করিয়া তামাকু সেবনান্তে শরীর স্নিগ্ধ হইলে বঙ্কিম বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন “ভাই দীনবন্ধু, অনেক দুঃখে অদ্য এই ব্যবসা ধরিয়াছি। দেখিলাম বাঙ্গালা দেশে অজীর্ণ রোগ অত্যন্ত প্রবল। সেই জন্যই বাঙ্গালি জাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালি আহারে অত্যন্ত মজ্‌বুত, কিন্তু হজম করিবার শক্তি একেবারেই নাই। এই দেখনা তুমি “সধবার একাদশী” অমন উপাদেয় Satire লিখিলে কাহারও হজম্ হইল না, রাশি রাশি প্রহসন বমন করিতে লাগিল কিন্তু উহা এত দুর্গন্ধময় যে চোক, কান, নাক বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। তুমি সমাজের একখানি প্রকৃত চিত্র আঁকিলে, উদ্দেশ্য সমাজের দোষ দেখাইয়া তাহার সংস্কার করা, অন্যান্য চিত্রকরেরা সমাজের বিকৃত চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে যত রকম আজগুবি গেঁজেলি, অশ্লীলতা ও গালাগালি সম্ভব সমস্তই সন্নিবেশিত হইল। তুমি এক বাঙ্গালকে আসরে নামাইয়াছ দেখিয়া তাহারাও বাঙ্গাল এক-চেটে করিয়া ফেলিল। কেহ বা নিজে মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার হইতে না পারিয়া সমস্ত কমিশনরদিগকে গালি আরম্ভ করিল, দেশের গণ্য মান্য লোকেরাও তাহাদের কাছে পার পাইলেন না। ব্রাহ্ম সমাজের ত কথাই নাই, ব্রাহ্মদের গালাগালি দিতে না পারিলে প্রহসন একেবারেই চলিবে না।”

দীনবন্ধু। তুমি ত বাঙ্গালও নও, ব্রাহ্মও নও, তবে তোমার এত মাথা ব্যাথা কেন?

বঙ্কিম। মাথা ব্যাথা এই জন্য যে ঐরূপ গালাগালিতে লোক্‌সান ভিন্ন লাভ নাই। একেইত বাঙ্গালিদের মধ্যে একতার অত্যন্ত অভাব তাহার উপর ওরূপ সাম্প্রদায়িকতা থাকিলে কোন কালে একতা

হইবে বলিয়া বোধ হয় না। একতার অভাবে বাঙ্গালি যৌথ কারবার করিতে পারে না, যৌথ কারবার ও স্বাধীন ব্যবসা না থাকিলে কেবল কেরাণিগিরি বা ডেপুটিগিরি করিয়া কোনও জাতির এ পর্য্যন্ত উন্নতি হয় নাই হইবেও না। জাপান দেখিতে দেখিতে কিরূপ উন্নতি লাভ করিল বল দেখি? বাঙ্গালি Political Economy (অর্থনীতি) ও ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিতে পারে কিন্তু হজম্ করিতে পারে না। তাহা হইলে আজ তাহাদের এত দুর্দ্দশা হইত না, এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সত্বেও অদ্য সভ্য জগতের নিকট এত হেয় হইত না।

দীন। আমার এক কথা আছে, স্বাধীন জাতি না হইলে স্বাধীন ব্যবসা অসম্ভব।

বঙ্কিম। বড়ই ভুল, কেন মাড়োয়ারী, পার্শি বা মহারাষ্ট্রীয়েরা কি স্বাধীন জাতি? তবে বোম্বাই প্রদেশে ৪০।৪৫ টা কাপড়ের কল আছে, ক্ষুদ্র নাগপুর সহরে ৩টি আছে, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালায় ঐরূপ কয়টা কল আছে? তা নয়, আসল কথা আমরা অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি এবং ইতিহাসের দৃষ্টান্তগুলি হজম করিতে পারি না। দেখনা কেন, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর কত বি, এ, এম্, এ বাহির হইয়াছে, কিন্তু পঠদ্দশায় তাহারা যে সকল উপাদেয় সামগ্রী গিলিল অজীর্ণতা দোষে কার্য্যক্ষেত্রে তদ্দ্বারা কোনও উপকারই হইল না। স্বাধীন ব্যবসাত বাঙ্গালির দ্বারা হয় নাই, হইতেও অনেক বিলম্ব। স্বাধীন চিন্তাও বাঙ্গালি শিখে নাই, তাহার প্রমাণ বাঙ্গালা সাহিত্যে আশানুরূপ বিজ্ঞান ও দার্শনিক আলোচনার অভাব। ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শন বিজ্ঞানই আজিও অধঃপতিত ভারতভূমিকে পাশ্চাত্য জগতের নিকট গৌরবান্বিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে চলিবে

না, পুরাতন তত্ত্বের পুনরুদ্ধার ও নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা আলোচনা আবশ্যক। পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় আমরা সমগ্র জগতের মধু আহরণ করিতে শিখি নাই। আমরা বিলাতি পোষাক, বিলাতি আহার, বিলাতি আচার ব্যবহার ও বিলাতি সাহিত্য ও এদেশে চালাইতেছি; কিন্তু বিলাতি বিজ্ঞানের বহুল প্রচার করিতে বা তদ্দ্বারা বিশেষ লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালি যে নূতন আবিষ্কারে সক্ষম জগদীশ বসু তাহার প্রমাণ। কিন্তু দেশের শতকরা ৯৯ জনকে জিজ্ঞাসা কর জগদীশ বসু কোন্ আবিষ্কারের জন্য জগদ্বিখ্যাত কেহই বলিতে পারিবে না। বাঙ্গালা ভাষায় উহা বুঝাইবার উপায় না থাকায় উহা কেহ বুঝিতে পারিবে না, যতদিন না বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বুঝান যাইবে ততদিন জন সাধারণের উহা হৃদয়ঙ্গম করিবার কোনও উপায় নাই, এবং ততদিন বিজ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ফল হইবে না, কারণ উহা হজম হইবে না।

দীনবন্ধু। একেবারে কিছু সকল জিনিষ হজম্ হয় না ক্রমে ক্রমে হইবে।

বঙ্কিম। সকল জিনিষ কেন, একটা জিনিষও যে হজম্ হয় না। বিজ্ঞান ছাড়িয়া দর্শন ধর। আমরা সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ও অরিষ্টটল্ প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত দার্শনিকদিগের নাম করিয়া যাইতে পারি, এবং তাঁহাদের অভিমতও কতক কতক জানা আছে, কিন্তু যাহা সংস্কৃতে বা ইংরাজিতে পাঠ করি তাহা বাঙ্গালাতে বুঝাইতে পারি না। ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থও আমাদের হজম হয় না। ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ বা উপদেশাদি সরল মাতৃ ভাষায় বুঝাইতে না পারিলে তদ্দ্বারা কোনও লাভই নাই। ইংরাজের বাইবেল যে সে ইংরাজ বুঝিতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত কাহারও বুঝিবার যো নাই।

কাজেই বড় একটা হজম হয় না। আমার "ধর্ম্মতত্ত্ব" বা "কৃষ্ণচরিত্র" তত দুরূহ না হইলেও "দুর্গেশনন্দিনীর"ই অধিক আদর।

দীনবন্ধু। সে কথা ঠিক্, তুমি ঐ সব বই না লিখিয়া আরও দু' একখানা নভেল লিখিলে ভাল হইত।

বঙ্কিম। নাটক নভেল ত আজ কাল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু তাহাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় কোথায়? তোমার নীলদর্পণ এবং আরও এক আধ খানি নাটক ব্যতীত সেক্ষপীরের নাটকের ন্যায় একখানিও নাটক বাঙ্গালায় নাই বলিলে হয়। নভেলের কথা আর কি বলিব, আমার এখন নিজেরই অনুতাপ হয় কি কুক্ষণে বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল লিখিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম উহাতে ঘরে ঘরে সুধাময় ফল ফলিবে, কিন্তু এখন দেখিতেছি বিষময় ফল ফলিতেছে। এখন দেখিতেছি অনেক কুলবধূ স্বামীর উপর অভিমান করিয়া আত্মহত্যা করিতে শিখিয়াছে, কোন কোন বালবিধবা আবার রোহিণীর যুক্তির দোহাই দিয়া কুলত্যাগিনী হইতেছে। ইহাতে আমার দোষ কি বল, লোকে হজম করিতে পারিল না। দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখাইতে গিয়াছিলাম কিন্তু উহাও কেহ হজম করিতে পারিল না। তাই নিজ কৃত দোষের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হজ্‌মি গুলি বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছি।

দীন। তুমি একেবারে হতাশ হইতেছ কেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে তা' বোধ হয় অস্বীকার কর না। এই দেখ না তোমার নিজের দ্বারাই বাঙ্গালা ভাষার কত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তুমি ত বাঙ্গালার সার ওয়াল্‌টার্ স্কট্ হইয়াছ, ইহা কি কম গৌরবের কথা। আবার দেখ মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্‌টন্, নবীন সেন বায়রণ, হেমচন্দ্র

টেনিসন, রবীন্দ্র শেলি ! এতেও বল বাঙ্গালিরা যা শিখে তা হজম করিতে পারে না ?

বঙ্কিম। একটা কথা বলি শোন, রাগ করিও না সেক্ষপীয়রে পড়িয়াছ ত ("Comparisons are odious") তুলনা দোষাবহ এক কথায় হঠাৎ কাহারও সহিত কাহারও তুলনা করিও না। এই যে তুমি আমাকে Sir Walter Scott বলিলে, ইহাতে আমার মনে মনে একটু আনন্দ হয় বটে, কিন্তু যখন ভাবি আমার সমস্ত উপন্যাস গুলি একত্র করিলে স্কটের দুই তিন খানি পুস্তকেরও অধিক হয় না, তখন ঐরূপ গৌরবান্বিত নামে অভিহিত হইলে নিজের অকিঞ্চিৎকরতা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই। তুমি আর আর যাঁহাদের নাম করিলে তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু অনিষ্টও হইয়াছে। মাইকেলের লেখা সম্যক্ হজম্ করিতে না পারিয়া এখন স্কুলের বালক পর্য্যন্ত (Blank verse) অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা কয়, ইহাতে কোন গোলযোগ নাই, মিলের জন্য ভাবিতে হয় না, কি মজা ! যাহাকে তুমি শেলি বলিলে সেই রবীন্দ্র একজন সুকবি বটে কিন্তু শেলির ন্যায় তাঁহার একটি মহৎ দোষ আছে—অপরিস্ফুটতা, কিন্তু "একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দু" একথা মানিলে রবীন্দ্রের দোষ মার্জ্জনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রের কবিতাও হজম হয় কই ? আজকাল রবীন্দ্রের শিষ্য অগণ্য কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নগণ্য। অনেকে ইচ্ছা করিয়া যাহাতে অর্থ পরিস্ফুট না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান, আবার এমন কথা বলিয়াও তর্ক করিয়া থাকেন যে "অপরিস্ফুটতাই" উৎকৃষ্ট কবিতার লক্ষণ। কিন্তু বাস্তবিক উহা গরহজমের লক্ষণ। রবীন্দ্রের ভাব ও ভাষা তাহাদের অভাব, রবীন্দ্রের লেখাও তাহারা ভাল রকম হজম করিতে শিখে

নাই। আর এক কথা, শুধু পদ্যের উন্নতি হইলেই সাহিত্যের উন্নতি হইল না। তুমি যেমন কতকগুলি ইংরাজি নাম বলিলে, আমিও না হয় বলি, বাঙ্গালায় এডিসন, ডিকেন্‌স্‌, থ্যাকারে, ডিকুইন্‌সি, সুইফ্‌ট্‌, কার্লাইল, এমারসন্‌, ম্যাথিউ আরনল্ড্‌, এলিসন্‌, ফ্লাউড, মিল, হার্বার্ট স্পেন্‌সার, হাক্‌স্‌লে, টীন্‌ডেল, নিউটন প্রভৃতি কোথায়? সেক্ষপীরই বা কোথায়? জানত ইংলণ্ডে সেক্ষপীরই কাব্য জগতে আর নিউটন্‌ বিজ্ঞান জগতে কিরূপ যুগান্তর ঘটাইয়াছে। বাঙ্গালার সেরূপ যুগান্তর ঘটিয়াছে কি?

দীন। হবে, হবে, ক্রমশঃ হবে।

বঙ্কিম। যাহাতে হয় সেই জন্যই ত আমি হজ্‌মিগুলি বিক্রয় করিতেছি, এস তুমিও আরম্ভ কর; ইহাই দেশোন্নতির একমাত্র উপায়, দেশের লোকের হজম শক্তি একেবারেই নাই।

দীন। একেবারেই নাই একথা ঠিক নহে, দুএকটি জিনিষ আমরা খুব হজম করিতে পারি, যথা গালাগালি। দেখ না কেন আমরা ঘরে বাহিরে গালি খাই তবু চোক ফোটে না। হ্যাট্‌ কোট পরে ফিরিঙ্গি সেজে ইংরাজের গালি খাই, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া উহা একেবারে হজম করিয়া বসি; বরং কেহ "সাহেব" না বলিয়া "বাবু" বলিয়া ডাকিলে একেবারে চটিয়া যাই। ইংরাজ ও অপরাপর সভ্যজাতিরা আমাদের অকর্ম্মণ্য বলিয়া গালি দেয়; সে গুলি আমরা হজম করিতে পারি। মোট কথা গালাগালিটা বাঙ্গালির হজম হয় ভাল।

বঙ্কিম। তা যদি বল্লে, আরও দুএকটি হজম হয় যেমন কেহ শরীরপুষ্টিকারী দুধ হজম করিতে পারে না, অথচ বিকট কট্‌কটে ও ঝুরি ভাজা হজম করিতে পারে, সেইরূপ আমরাও অনেক অখাদ্য

হজম করিতে পারি। এই ধর টাকা, এটি আমাদের বিলক্ষণ হজম করিবার ক্ষমতা আছে। কেহ যদি একজনের নিকট বিশ্বাস করিয়া কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিল, দিন কতক পরে সে ব্যক্তি ঠিক উহা হজম করিয়া বসিল, হাকিমি করিয়া আমায় এ জ্ঞান জন্মিয়াছে। সম্পাদকের কার্য্য করিয়াও আমার জ্ঞান হইয়াছে যে গ্রাহকগণের ভিতর অনেকে মূল্য হজম করিতে বেশ পটু ; কেহ কেহ আবার এক বৎসর মূল্য দিয়া ৪।৫ বৎসর আর কথাটি কন না, তাগিদের উপর তাগিদ্ গেলে শেষে বিরক্ত হইয়া নাম কাটিয়া দিতে বলেন, না হয় বলেন "বাঙ্গালা কাগজ পড়িতেছি এই তোমার এবং বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট সৌভাগ্য, মূল্য চাহিতে লজ্জা হয় না" ? আহা! সম্পাদকের কি ধৃষ্টতা! হের মাতৃভাষা পড়িয়া তাঁহারা যে বহুমূল্য সময় নষ্ট করেন তজ্জন্য সম্পাদকের উচিত তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ করা। তাই এই সকল দেখিয়াই ত অনেক দুঃখে হজ্‌মিগুলি বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছি, এস তুমিও বিক্রয় কর।

তখন দীনবন্ধু বাবু রসিকতা সহ চিৎকার করিয়া বলিলেন "জারেক্কা লেমো, বেল মোরব্বা, হজ্‌মিগুলি"। এ চিৎকারে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

বাদশার আম্র আস্বাদন।

১

বাদশা উজীরে ডাকি' দিলেন আদেশ—
"দুনিয়ায় খুঁজে খুঁজে, আন দ্রব্য মনে বুঝে
রসনা হইবে তৃপ্ত খাইতে সরেস,
বয়স যেতেছে বাড়ি' পেকে গেল লম্বা দাড়ী
দাঁত গুলা নড় বড়ে খেতে বড় ক্লেশ,
আনিবে এমন খাদ্য, খেলে তৃপ্তি পাব সদ্য
চিবা'তে না হয় যেন মনে রেখো বেশ,
করিও না বেশী দেরি, ফিরিবে সত্বর করি'
ছ'মাস সময় দিনু বুঝ সবিশেষ;
ঘটিবে অন্যথা হ'লে বিপদ অশেষ।"

২

শিরে ধরি' বাদশার আদেশ উজীর,
বিষম বিপদ ভয়ে, দেশ হ'তে দেশান্তরে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে হইল হাজির—
বঙ্গে মালদহ দেশে ; ভাবিলেন তথা বসে
আজিও হ'লনা হায় কিছুরই স্থির ;
আম্রফল হেথাকার, যোগ্য বটে রসনার
বাদশাহ ভুলিতে পারে খেলে এক চির ;
নিয়ে যেতে পচে যাবে, আমসত্ব শক্ত হবে
বুড়া দাঁতে টেনে ছেঁড়া শক্তির বাহির ;
এ দিকে সময় যায় কি করি ফিকির।

৩

ভেবে ভেবে উজীরের খুলে গেল মাথা ;
করি আম্র বিশ্লেষণ, না জানি কি পেলে ধন
বদনে কুটিল হাসি, ঘুচি' মনোব্যথা।
ছয় মাস পরিহরি, যাইলেন দেশে ফিরি'
দাঁড়াইলা রিক্ত করে বাদসাহ যথা।
বাদশাহ কহিল হেরি, "শুধু হাতে এলে ফিরি
বিপদ ঘটিবে তব জান আছে কথা ;
এখনি জানিও স্থির, লইব তোমার শির
যখন আদেশ মোর করেছ অন্যথা।"
নিবেদিল মন্ত্রি তবে করি' হেঁট মাথা—

৪

"সবুরে ফলে যে মেওয়া আছেত নজির।"
এত বলি' ভৃত্যে ডাকি, উজীর কহিল হাঁকি'—
"তেঁতুল ও আঁব আদা করহ হাজির ;
তা'র সহ নিয়ে এস, খানিক চিনির রস
শুনিয়া বাদসাহ হন হাসিয়া অধীর।
উজীর কহিল তবে, "এখনই তৃপ্ত হ'বে
আস্বাদি' অপূর্ব্ব রস—অরি অরুচির।"
হ'লে দ্রব্য আহরণ, সে তিনের সংমিশ্রণ
করিয়া সে রস লয়ে মাথায় উজীর,
বাদশার দাড়ী ধরি' হইয়া গম্ভীর।

৫

সেই রস মাখা দাড়ী করিয়া ধারণ
তুলে দিয়া বাদশা-মুখে, উজীর কহিল "সুখে
কর এ অপূর্ব্ব আম্র রস আস্বাদন।"
করি' সেই রসাস্বাদ, বাদশার পূরিল সাধ
দ্রুতপদে করিলেন অন্দরে গমন—
যথায় বেগম বসি', বাদশাহ তথা পশি',
গুঁজিয়া দিলেন দাড়ী ধরিয়া বদন,
কহিলেন "প্রিয়ে চুষে, সব রস লও শুষে
উজীর এনেছে ঘুরি' ভারত ভুবন
ছিড় নাক দাড়ি কিন্তু করিতে লেহন।

বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিত্যাগ।

অধুনা ভারতবর্ষে প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের যতদূর বিভিন্ন বিভিন্ন মত বা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ আর কুত্রাপি

দৃষ্ট হয় না। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার বিষয় উল্লিখিত আছে। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই তেত্রিশ কোটি ভাবের উপাসকও আছেন। তাহার উপর আবার সাকার, নিরাকার, বৌদ্ধ। তবে সংখ্যা তুলনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প, আবার কোন সম্প্রদায়ের অধিক, কিন্তু প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের চির-বিবাদ ; সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অপর সকলের নিন্দা ও কুৎসা করিতে কোন মতে কুণ্ঠিত নহেন। কথিত আছে যে এক সময়ে শাক্তগণের প্রতি বৈষ্ণবদিগের এমন বিদ্বেষ ছিল যে লিখিবার নিমিত্ত কালির প্রয়োজন হইলে কেহ কেহ কালী নাম মুখে না আনিয়া হিন্দি ভাষায় সেহাই চাহিতেন। কাটার পরিবর্ত্তে বনান বলিতেন। বিল্বপত্রকে তের্কড়ক্কার পাতা বলিতেন। শাক্তেরাও বলিতেন যে, বৈষ্ণবেরা নাকের উপরে যে তিলক ধারণ করে তদ্দ্বারা হাড়িকাট আঁকিয়া উহাতে ছাগ বলি দিয়া মাকে উহারা গোপনে পরিতোষ করে। ঝুলির ভিতর মাংস লুকাইয়া রাখে ইত্যাদি। আনন্দের বিষয় যে এ সকল অসঙ্গত ব্যবহার এখন গল্প কথার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। এতটা ভ্রম আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। স্বধর্ম্মাচরণ আর অপরের ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক বিদ্বেষের সহিত একার্থবোধক নাই। যাঁহারা পর ধর্ম্মের মধ্যে তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের সম্বন্ধে উপযোগীতা দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিতে পারেন না, তাঁহারাও অন্ততঃ উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন—শুনিয়াছি যখন পরমবৈষ্ণব লালা বাবু নৌকা যোগে ৺কাশীধামের সম্মুখ দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন সে সময়ে পাছে শিবতীর্থ ৺কাশীধাম দেখিতে হয় সেইজন্য তিনি কাশীর দিকে নৌকার পর্দ্দা ফেলিয়া দিতে বলেন। বৃন্দাবনে লালাবাবুর পাহাড়

হইতে পড়িয়া মৃত্যু হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত অনেকেরই বিশ্বাস যে ৺কাশীর অবমাননা করাতেই ঐরূপ ঘটিয়াছিল।

সিদ্ধ রামপ্রসাদ সেন সকলের নিকট একমাত্র কালী উপাসক বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তিনি কালী, কৃষ্ণ, এবং শিব সকলই এক বলিয়াই অন্তরে দেখিতে পাইতেন, তিনি একটী গীতে বলিয়াছেন—

মন করোনা দ্বেষা দ্বেষী।
যদি হবিরে কৈবল্যবাসী।
রামরূপে ধর ধনু কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
শিবরূপে ধর শিঙ্গা কালীরূপে ধর অসি।

আবার কমলাকান্তের একটী গীতে আছে—

জাননারে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া ময়ুর পুচ্ছ শোভিত তায়;
কখন পার্ব্বতী কখন শ্রীমতী কখন জানকী হয়।
যেরূপে যেজন করেরে সাধন, সেইরূপে তার মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমলেকামিনী হয় উদয়।

টালা দামিন্যায় (বৰ্দ্ধমান জিলার দক্ষিণভাগে) কবিকঙ্কন ৺মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী বংশীয়দিগের বাড়ীতে কবিবরের যে নিজের পূজ্য পিত্তল নির্ম্মিত ইষ্ট মূর্ত্তি আছে তাহার একদিকে কালীমূর্ত্তি অপর দিকে কৃষ্ণমূর্ত্তি। কোন্ দিক সম্মুখ কোন্ দিক পিছন কিছুই স্থির করিবার উপায় নাই। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও লিখিত আছে;—

"একদেব নানা মূর্ত্তি হইল মহাশয়।
হেম হ'তে বস্তুতঃ কুণ্ডল ভিন্ন নয়।"

অন্নদামঙ্গলে হরিহরের অভেদত্ব সম্বন্ধে ব্যাসদেবের উপলক্ষে অনেক কথাই আছে। ফলতঃ সাধারণ বাঙ্গালীকে এ বিষয়ে শিক্ষা-

দিবার জন্য সেই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত চেষ্টা চলিতেছে। শাস্ত্রবাক্যের ভাষান্তর করিয়াই যে কবি ও সাধকগণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা শাস্ত্রদর্শী মাত্রেই বুঝেন।

মহাপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে লিখিত হইয়াছে;—

"প্রভবোঽহঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ পরিপালকঃ।
তথবা ন স্বতন্ত্রোঽহং ভক্তাধীনোদিবানিশম্॥
গোলকে বাথ বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজঞ্চ চতুর্ভুজম্।
রূপমাত্রামিদং সর্ব্বং প্রাণমে ভক্ত সন্নিধৌ॥

অর্থাৎ আমি সকলের প্রভু নিয়ামক এবং পরিপালক হইলেও স্বাধীন নহি; কারণ আমি সততই ভক্তের অধীন। আমি গোলক অথবা বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজ, অথবা চতুর্ভুজ যে মূর্ত্তিতেই থাকিনা কেন সে সমস্তই আমার রূপ মাত্র, আমার প্রাণ কিন্তু ভক্তের নিকটেই থাকে। গীতায় আছেঃ—

যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপেই দর্শন দিয়া থাকি, হে পৃথা পুত্র অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্ব প্রকারেই আমার পথই অনুসরণ করিয়া থাকে।

আবার আর এক স্থলে আছে—

সৌরশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেবতে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা॥
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিঃকিল।

অর্থাৎ বৃষ্টির জল, যেদিক দিয়াই গমন করুক না কেন, অবশেষে যেমন সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ, সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এবং শাক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি (পরমার্থতঃ) এক

হইয়াও লীলার জন্য নানারূপ নাম ধারণ করিয়া পঞ্চ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতেভেদং সনরোমূঢ় দুর্ম্মতিঃ॥
দেবীবিষ্ণু শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ শিব যেরূপ দুর্গাও সেইরূপ, যিনিই দুর্গা তিনিই বিষ্ণু, এবিষয়ে যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান করে সে অতি মূঢ় এবং দুর্ম্মতি। শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতির অভেদ ভাবনা করিবে; ভেদকারী রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে; ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ যাঁহার যে আপন কুলধর্ম্ম তিনি তাহা ভক্তিভাবে পালন করুন; অপরের বিদ্বেষ করিবেন না। যে নামই দাও আর যে ভাবেই ভাব, ভাবিবার জিনিষত সেই এক।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন পত্তনাদি নির্ম্মাতা ব্যক্তি তাহার উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ মন মধ্যেই পত্তনাদির কল্পনা করেন, এবং তাহার সমুদয় ব্যবস্থাও মন মধ্যে অঙ্কিত করেন, পরে সেই সকল কাল্পনিক বিষয়গুলিকে কার্য্যে পরিণত করেন। বিশ্বনির্ম্মাতা শ্রীভগবানও জগৎ কার্য্যের পূর্ব্বে জগতের নাম রূপাদি ও যথাযথ ব্যবস্থাদি মন মধ্যে কল্পনা করিয়া বিশ্ব-সৃষ্টির অনতিপূর্ব্বেই সেই গুলিকে অগ্রে প্রকটন করেন। তাহাই বেদাদি শাস্ত্র। প্রসঙ্গাধীন সংক্ষেপ

রূপে বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, কেন না তাহা না বলিলে বেদাদি শাস্ত্র যে ঈশ্বর প্রণীত তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

বিশ্ব সৃষ্টির ক্রম এই যে সত্ত্ব, রজ, তম গুণের যে সাম্যাবস্থা, অর্থাৎ ক্ষোভ রহিত ক্রিয়াশূন্য অব্যক্ত সূক্ষ্মাবস্থা ইহারই নাম প্রকৃতি বা প্রধান। অনাদিবদ্ধ জীবের অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা বশতঃ তদীয় চেষ্টারূপ কালশক্তির দ্বারা ঐ প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হন, অর্থাৎ গুণ সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণ তারতম্য রূপ বিষমাবস্থাকে ধারণ করেন। ভগবানের প্রেরণায় সমষ্টি জীব চৈতন্য রূপ পুরুষের যোগে ঐ প্রকৃতি হইতে বিশ্বাঙ্কুর স্বরূপ মহতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। যথা

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩ স্ক॥ ২৬ অ। ১৮ শ্লোঃ।

জীব সমষ্টি অনাদি সিদ্ধ, অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু নহে, তাহাই পরম পুরুষের বীর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জীব সমষ্টি চিদংশ বলিয়া প্রলয়কালে চিদর্ণব পূর্ণ চৈতন্যে বিলীন থাকে, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহাই চিৎ ছায়ারূপা প্রকৃতিতে সংযোজিত হইয়া প্রকাশ বহুল ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রকাশ করে। ঐ মহত্তত্ত্ব জীবসমষ্টির চিত্ত স্বরূপ। উহা অতিশয় স্বচ্ছ, শান্ত ও সত্ত্ব গুণ প্রধান এবং শ্রীভগবৎ প্রতিবিম্বের গ্রাহক।

ভগবানের বীর্য্য (চিদাত্মা) হইতে উৎপন্ন হইয়া ঐ মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তি প্রধান অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারের মধ্যে ও উপাস্য দেব আছেন, যিনি সঙ্কর্ষণাখ্য সহস্রশীর্ষ পুরুষ, যাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সাক্ষাৎ অনন্ত দেব বলিয়া থাকেন। পঞ্চ ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মন এই

অহঙ্কারের কার্য্য স্বরূপ। আর এই অহঙ্কারের দেবতা রূপে কর্তৃত্ব এবং ইন্দ্রিয় রূপে করণত্ব, ও ভূতরূপে কার্য্যত্ব, এবং শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব ঐ অহঙ্কারে বিদ্যমান আছে। এই অহঙ্কার তিন প্রকার যথা বৈকারিক, তৈজস, এবং তামস।

বৈকারিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখ হইলে, তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই মনের সঙ্কল্প (চিন্তা) এবং বিকল্প (বিশেষ চিন্তা) দ্বারা কামের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ কামরূপা বৃত্তিই মনের লক্ষণ। মনের দ্বারা কোন বিষয়ের মিমাংসা বা সিদ্ধান্ত হয় না, কেবল চিন্তন মাত্রই উহার কার্য্য। তত্ত্বজ্ঞেরা এই মনস্তত্ত্বকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ বলিয়া জানেন এবং যোগীরা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে পারেন।

তৈজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধি তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। ইহা দ্রব্য স্ফুরণরূপ জ্ঞান, ও বিজ্ঞান স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহরূপ ও বটে। অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব ব্যতিরেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন বিষয়েই প্রবর্ত্ত হইতে সমর্থ হয় না। এই বুদ্ধির বৃত্তি ভেদে সংশয় (সন্দেহ) বিপর্য্যাস (মিথ্যা জ্ঞান), নিশ্চয় (প্রমাণ জ্ঞান), স্মৃতি এবং নিদ্রা এই পাঁচটি বুদ্ধির ধর্ম্ম। যথা—

সংশয়োঽথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেবচ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩ স্ক। ২৬ অ।

শ্রীপাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্রে ও বুদ্ধিবৃত্তির এই পাঁচ প্রকার লক্ষণ বর্ণিত আছে যথা

"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ।"

পাতঞ্জল দর্শন। সমাধিপাদ॥

তন্মধ্যে প্রমাণ-বৃত্তি তিন প্রকার যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও

আগম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগ হইবার পরেই যে মনোমধ্যে তৎবস্তুর স্বরূপ বোধক বৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম "প্রত্যক্ষ।" এক বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তৎ সহচর অন্য অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতি হইলে, যেমন ধূম প্রত্যক্ষের পর তৎ সহচর বহ্নির প্রতীতি, তাহা "অনুমান।" এবং বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিবার পর তদবাক্য বোধক পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে তাহা "আগম।" বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, কোন বস্তুর স্বরূপ দর্শনে অন্যথা প্রতীতির নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রম। যথা রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম ইত্যাদি। বিকল্প—বস্তু নাই, অথচ শব্দের প্রভাবে মনোবৃত্তি জন্মে, ইহারই নাম "বিকল্প," যথা "আকাশ কুসুম।" নিদ্রা এক প্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশ স্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই "নিদ্রা" বলা যায়। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থ ই নিদ্রাবৃত্তির আলম্বন। স্মৃতিঃ, বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণ বৃত্তিতে আরূঢ় হইলে, তাহার সংস্কার থাকিয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা কিছু অনুভব করা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সংস্কার সমুৎপন্ন সেই সকল মনোবৃত্তির নাম "স্মরণ।"

মহত্তত্ত্বের স্বরূপ চিত্ত, অহঙ্কার, এবং ঐ অহঙ্কার সম্ভূত মনস্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই চারিটী অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগতের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, এবং বৃত্তি ভেদে চারিটী অন্তরেন্দ্রিয়ের কার্য্য ও পরস্পর বিভিন্ন।

শ্রীবসন্ত লাল মিত্র।
শ্রীবৃন্দাবন।

ফুলের সাজি।

বলেন্দ্র নাথ *

উষার আলোক সম পবিত্র উদার
পেলব রচনা-পুষ্প লয়ে অমরার
এসেছিলে দেব-কবি! মরত ধরায়
সাজা'তে ভারতী-বপু নূতন শোভায়;
প্রীতি শুভ্র মনোরম ভাবের সৌরভে,
নূতন জীবন-ফুল্ল ভাষার গৌরবে,
নিপুণ যতনে তুমি তরুণ বয়সে
পূজিলে জননী-পদ কত না হরষে।
মাধব কুসুম শোভা তব "মাধবিকা,"
"শ্রাবণী" সুস্নিগ্ধা যথা নীরদ মালিকা
দিগন্ত প্রসারী—শ্যামা—শ্রাবণ দিবার,
"চিত্র ও কাব্যে"র নব সৌন্দর্য্য অপার—
সবে মিলি' সৃজিয়াছে আজি—বিরহিণী-
তোমারি প্রতিভা-লক্ষ্মী দীনা বিষাদিনী;
সে মূর্ত্তি নেহারি' চক্ষু ভরি' আসে জলে—
হায় মাতঃ! বঙ্গভূমি! নাহি তোর হেন
পুত্র কোলে!

সায়ংকাল।

১

সন্ধ্যা আগমনে, যত জীবগণে,
যায় নিকেতনে, বিরাম তরে;
রবির গমন, করি দরশন,
হ'য়ে উচাটন, পদ্মিনী মরে।

২

বৃক্ষপত্রগণ, করি শন্ শন্,
দুলিছে কেমন, পবন ভরে;
যেন পত্রগণ, করিছে ব্যজন,
তাঁহারি চরণ, তুষিতে তাঁরে।

৩

দেখি সায়ংকাল, যতেক রাখাল,
লয়ে গরু-পাল, ভবনে ফিরে;
শশাঙ্ক কেমন, বিমল কিরণ,
করে বরিষণ, আকাশ'পরে

কর নিরীক্ষণ, ক্রমে তারাগণ;
উঠিল কেমন, ঐ নভো ভালে
দেখি তারাগণে, হেন হয় মনে,
যেন কোন জনে, প্রদীপ জ্বালে।

শ্রীহরেন্দ্র কুমার মজুমদার।

উষার প্রতি।

রজনী-চরম-যামে হে বরসুন্দরি!
সিক্ত বেণী এলাইয়া অনবগুণ্ঠিতা
স্নেহময়ী মা'র মত হে প্রেম গঠিতা!
নিখিল বিশ্বের জীব চির যুগ ধরি'
জাগাইছ অনুদিন; হে মৃগ-নয়নে!
তোমারি শ্রীঅঙ্গবাসে গন্ধবহ ধায়,
শিহরি' কুসুমময়ী প্রকৃতির কায়;

* মৃত্যু:—৩রা ভাদ্র, ১৩০৬; প্রত্যূষে।

ছন্দময়ী ধরা তব অঙ্গ-সঞ্চারণে।
চরণ নূপুর ধ্বনি শুনিয়া তোমার
বিহঙ্গম মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গম পারা
চাহিয়া তোমারি পানে গায় আত্মহারা—
মোহিনী রাগিণী যেন কণ্ঠে বসুধার।
পুলকিত নরনারী তব দরশনে
প্রণমি' মঙ্গলময়ে লভিতে মার্জ্জনা,
পাঠাইছে নিত্য তাঁ'রে ভকতি-অর্চ্চনা;
বহিছ তাহাই তুমি অকুণ্ঠিত মনে
প্রীতিভরে অকাতরে মর্ত্ত্যজন লাগি'
বিশ্বজাগরণ পূর্ব্বে চিরদিন জাগি'।
কহ দেবি! এ ভকতে এমনি মধুর,
এমনি কি স্নেহময়, এমনি মোহন,
এমনি সারল্য ধারা অন্তর তোমার
রহিবে অনন্ত কাল আজিকে যেমন?
অচাপল্যে তব দেবি! না করি প্রত্যয়,
যদি বা ব্যথিয়া থাকি অন্তর কোমল,
মার্জ্জনা করগো মোরে। বল দেবি! বল,
অজ্ঞাত কি তব হায়, এ কবি কি নয়
দীন মর্ত্ত্যবাসী নর মরণ বিজিত,
ধরণীর তাপক্লিষ্ট, অতৃপ্ত বাসনা,
মরণ-ভ্রূকুটি-অঙ্কে নিয়ত কম্পিত?
অনিরুদ্ধ প্রিয়তমা! হে দেব অঙ্গনা!
রহিবে ত তুমি দেবি! চির নর-জয়ী,
আসিবে ধরায় নিত্য ত্রিদিব ছাড়িয়া
মন্দাকিনী স্নানপূতা চিরশোভাময়ী,
জাগা'তে অবনী-সুপ্তি এমনি করিয়া।
মুগ্ধ নেত্রে কেন হায়! রহেছ চাহিয়া
এই ভকতের পানে আপনা ভুলিয়া?
তোমারি সন্ধানে ওই পূরব দুয়ারে,
ত্রিলোক উজল করি, নীলাম্বর-পারে
হের দেবি, আসিতেছে তরুণ তপন।
ভুলিওনা ভকতেরে মানস-রঞ্জিনি!
মুখরিত কর্ণে মোর মঞ্জীর কিঙ্কিনী,
অঙ্গের কুসুম গন্ধে মুগ্ধ, বিচেতন,
দরশ-বিহ্বল।

হে নিখিল বিমোহিনি!
হে নির্ম্মল উষে! সর্ব্ব সুখ রাজি জিনি'
শুভ নেত্রে তব পরিপূর্ণ সুখ খানি—
সে আনন্দ লাভে আজি বহু ভাগ্যমানি।"

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

দলিতা কমল।

হায় সেই একদিন!
যে দিন সরসী জলে,
ফুটে ছিল শতদলে,
রূপেতে আলোকি বিশ্ব, অস্ফুট নলিন্।
সেই একদিন আর এই একদিন।
হায় সেই একদিন!
সেদিন সরম ভুলি
পাতার ঘোমটা তুলি,
দুলিত মলয় স্পর্শে বদন নবীন।
সেই একদিন আর এই একদিন।

হায় সেই একদিন !
তরুণ অরুণ পানে,
একান্ত আকুল প্রাণে,
চাহিয়া চাহিয়া যবে পোহাইত দিন ।
সেই একদিন আর এই একদিন ।

হায় ! সেই একদিন ।
মধুর সুরভী তরে
মধুপ মধু ঝঙ্কারে
আসিত মধুর আশে হয়ে জ্ঞান হীন ।
সেই একদিন আর এই একদিন ।

হায় ! সেই একদিন ।
হইয়া পাগল পারা,
সুধাংশু সুধার ধারা,
ঢালিত রজত ধারে মুছায়ে মলিন ।
সেই একদিন আর এই একদিন ।

হায় ! সেই একদিন ।
কলকণ্ঠ মধুমাসে
সরসী পুলিনে এসে,
শুনাত মধুর গীত বাজাইয়া বীণ ।
সেই একদিন আর এই একদিন ।

হায় সেই একদিন ।
মরাল সাঁতারি ধীরে
সোহাগে চিবুক ধ'রে
আদরে জানায়ে যেত মমতা অসীম ।
সেই একদিন আর এই একদিন ।

হায় ! সেই একদিন ।
মেঘ হ'তে হাসি মুখে
শিহরিয়া তব বুকে
রূপসী বিজলী সখী হইত গো লীন ।
সেই একদিন আর এই একদিন ।

আর সেই একদিন ।
আছে কি স্মরণে আজ
যেদিন মরম মাঝ
ঢালিলে অমিয় ভ্রমে গরল অসীম ।
সেই একদিন আর এই একদিন ।

বৈশাখের শুভ্র রজনীতে ।
পঙ্ক হতে পঙ্কজেরে
তুলিয়া সস্নেহ করে
ধরিল বুকের মাঝে কত আঁদরেতে ।
সে আদর সে সোহাগ,
নরের সে অনুরাগ,
শোভে না, সে শোভে শুধু দেব হৃদয়েতে ।

তার পরে কত ভালবাসা ।
ভুলিলে শৈশব স্মৃতি
পেয়ে তা'র স্নেহ প্রীতি
হরষে পুরালে শত জনমের আশা ।
প্রণয়ের মধু জ্যোছনায়
ঢেলে দিয়ে মন প্রাণ
শুনিলে সে প্রেম গান
শুনিলে প্রেমের বীণা ভরা মমতায় ।

মানবের তপ্ত বক্ষঃস্থলে ।
শুকাল কোমল দল,
ঝরিল নয়ন জল,
মিটিল প্রণয় মধু ঝরিয়া অকালে ।

মিটিল হৃদয় আশ আবেশ বিহ্বল।
নেহারিয়া ম্লান শতদল।
বক্ষঃ হতে ভূমিতলে
অযতনে দূরে ফেলে
যতনে পরিল গলে নবীন মৃণাল।
আজও তার আছে কোমলতা।
স্নিগ্ধরূপে মুগ্ধমন
গুণ গ্রাহী কয়জন
কে বোঝে দলিতা শুষ্ক হৃদয়ের ব্যথা!
কিসে আর ফিরিবে সে স্নেহ?
নাহি রূপ নাহি গন্ধ
যাহাতে হইবে অন্ধ
নাহি সে যৌবন যাহে তৃপ্ত হবে দেহ।
বনে তুমি ফুটেছিলে জলে।
কেন বল এসে হেথা
জাগালে হৃদয় ব্যথা
মানবে হৃদয় দিয়ে কি ফল লভিলে?
কেন আজ দীর্ঘশ্বাস কাঁদিছ ভূতলে?
আর যত অস্ফুট কমলে।
চেতাইও বাঁচায়ো মুকুলে।
যেন আর আত্মদানে
কুহকী মানব সনে
না মজে ভাসিতে শেষে নয়নের জলে।
স্বরগের মরীচিকা নরকের ভুলে।
বলে ওগো দলিত নলিন্।
আমার ও ছিল গো একদিন।
আমিও বুকের পরে
শোভিতাম প্রেম ভরে
আজ আমি পদতলে ধুলায় মলিন।
চিনিয়া হৃদয় দিও তোমরা নলিন।"
সুখে কার যায় চিরদিন?
একদিন ছিল সে তোমার
ছিলে তুমি তারি কণ্ঠহার [নলিন্।
আজ, সেই স্মৃতি বুকে লয়ে ব্যথিতা
স্মর সেই একদিন আর এই একদিন।
হৃদয়ে লইয়া আকুলতা।
নয়নেতে অশ্রু ল'য়ে
তা'রি পানে থাক চেয়ে
সে তোমার—তোমারি সে হৃদয় দেবতা
উপেক্ষায় মুছে নাক হৃদি পবিত্রতা।

শ্রীমতী সরসীবালা।

শান্তি।

অবস শরীরে পড়েছে ঘুমায়ে
ক্লান্ত দেহখানি নিয়ে;
ঘুরে সারা বেলা জগতের কাযে
জগতের পানে চেয়ে।
স্বরগ সান্ত্বনা এসেছে নামিয়া
জুড়াতে তাপিত মন;
স্বরগ সঙ্গীত বাজিছে শ্রবণে
করি মধু বরিষণ।
বিকচ কুসুমে কীটের মতন
দুখ নাহি হৃদি জ্বালাতে,

জ্বালাতে হৃদয় মাহিক দুরাশা
দুঃখময় এই মরতে।
অনন্ত নিদ্রায় হয়েছে নিদ্রিত
আজ এই ঘুম ভাঙ্গাবে কে?
শান্তি সরোবরে জীবন পিপাসা
পিয়ে মিটাইয়েছে সুখে।
দিবস যামিনী যেতেছে কাটিয়া
রজনী হইছে ভোর;
ফুটিছে তারকা মিশিছে আকাশে
ভাঙ্গেনা ঘুমের ঘোর
কুসুম সুবাসে চাঁদের কিরণে
হৃদি তার আর জাগে না,
শান্তি সরবরে গিয়াছে মিশিয়া
ক্ষুদ্র হরষ-কণা।

কুমারী।

দেখা দিও।

শান্তির অকূল নিধি, আঁখিজল রূপে
দেখা দিও মোরে প্রভু হৃদয় দেবতা
পাপের তমসা মাঝে, আলোকণা মত,
এসে নাথ জুড়াইও মরমের ব্যথা।
সংসার মরুভূ মাঝে, বারি বিন্দু বেশে
সেবকের তৃষা দূর করিও তোমার;
মোহের পঙ্কিল পথে জ্ঞানরূপে এসে
আলোকিত করো দেব পরাণ আমার,
চঞ্চল হৃদয়ে নাথ ধৈর্য্যরূপ ধরি'
অনন্ত মহিমা তব করিও প্রকাশ,
জ্যোতিঃহীন মানসেতে বিভা বেশে আসি
তোমার বিমল করে রেখো বাঁরমাস,
নয়ন মুদিবে যবে, নিবিড় আঁধারে
দীনে প্রভু! কোল পেতে লয়ো তব দ্বারে

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

গান।

কেন মা কাঁদাও শ্যামা যদি মুছাবেনা আঁখি
আমি কাঁদিয়ে মরিলে কিমা তুমি তাহে হবে সুখী
কে মুছাবে আঁখি ধারা তুমি না মুছালে তারা
ভাই বন্ধু সুত দারা এরা নয় মা দুখের দুঃখী।

শ্রীসরোজনাথ ঠাকুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শোক সংবাদ।

রমেশচন্দ্রের চিতা নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই ভারতের আর একটি রত্ন খসিয়াছে। প্রজ্ঞানিধি দেবপ্রতিম, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহোদয় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টা ১০ মিনিটের সময় পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি ১৮২৬ খৃঃ অব্দের ২৬এ ভাদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে তিনি শিক্ষক হইয়া মেদিনীপুরে গমন করেন। ১৮৬৬ খৃঃ তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতের বহু স্থানে পর্য্যটন করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বৈদ্যনাথে বাস করেন। তিনি তাঁহার নৈসর্গিক উদারতা, অমায়িকতা, ও চরিত্রবলে সকল সম্প্রদায়েরই ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। কি দেশ হিতৈষীতায়, কি সমাজ সংস্কারে, কি ধর্ম্মানুরাগে, সকল বিষয়েই তাঁহার ন্যায় লোক এদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিষয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি, প্যারিচরণ সরকার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতির সহপাঠী ছিলেন। দেশের সকল সদনুষ্ঠানেরই তিনি প্রাণ ছিলেন। দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের, তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা কখনও পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

লম্বা দাড়ি। মার্সেয়েস্ নগরে এক কর্ম্মকার বাস করে; তাহার দাড়ি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। ঐ ব্যক্তির বয়স ৭৪ বৎসর। যখন তাহার বয়স ১৪ বৎসর তখনই তাহার দাড়ি ছয় ইঞ্চি লম্বা ছিল, এখন তাহার দাড়ি ১০ ফিট ১০ ইঞ্চি, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি নিজে যত লম্বা তাহার দাড়ি তাহার দিগুণ লম্বা যখন সে চলে তখন তাহার দাড়ি গুড়াইয়া বগলে করিয়া লইয়া যায়।

* * *

লম্বা সৈনিক পুরুষ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অধীনে যত সৈনিক কর্ম্মচারী আছে, তম্মধ্যে কাপ্তেন অস্ওয়াল্ড আমিস্ সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা, ইঁহার দৈর্ঘ্য ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি অর্থাৎ চার হাতের কিছু উপর। রুসিয়ার অধিপতির এক ভ্রাতা (সহোদর ভ্রাতা নহে) আছেন তাঁহার নাম Grand Duke Dmitri Konstantinovitch তাঁহার দৈর্ঘ্য ৬ ফিট ৭ ইঞ্চি। কোনও হোটেলে ইঁহার শয্যা মিলে না। তিনি ভ্রমণ কালে নিজের জন্য একখানি ফরমাসি খাটিয়া সঙ্গে লইয়া যান। কর্ণেল ভঁ প্লাস্কো, জর্ম্মণির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা কর্ম্মচারী, ইঁহার দৈর্ঘ ৬ ফিট ৬ ইঞ্চি।

* * *

চোরের ভদ্রতা। গুলিখোর রোজ রাত্রে গরম ভাত নহিলে খাইতে পারে না! বৌ ঠাকরুণ প্রত্যহ বড়ই কষ্ট পান, কিন্তু গুলিখুরি আবদার নীরবে সহ্য করেন। সেদিন বিড়াল ভ্রমে কর্ত্তা বেগুণ পোড়াটির বোঁটা ধরিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, আহারে বড় কষ্ট হইয়াছিল। আজ বেশ রন্ধন হইয়াছে। গুলিখোর ভাত খাইতে খাইতে তক্তাপোষের নীচে নজর করিয়া দেখিল একজন লোক লুকাইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রাণে ভয় হইল যে এব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর। শরীর দুর্ব্বল

বলিয়া তাড়াহুড়া না করিয়া কিরূপে এই চোরের হস্তে পরিত্রাণ পায় এই মতলব খাটাইতে লাগিল।

আহারান্তে কর্ত্তা তক্তাপোষের উপর বসিয়া পান চিবাইতেছেন আর ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া তামাক টানিতেছেন—তাঁহার মতে তিনি বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতেছেন। গিন্নী কর্ত্তার পাতে বসিয়াই আহার সমাপন করিয়া শয়ন দিল।

চোর সব চুপচাপ দেখিয়া, আস্তে আস্তে তক্তাপোষের কোনে উচু হইয়া দাঁড়াইল, দেখিল মাগী ঘুমে অসাড়, মিন্সে জাগিয়া বসিয়া আছে। আবার নীচু হইতে গেলে পাছে জানিতে পারে এই জন্য সটান দেওয়ালের সহিত মিশাইয়া দাঁড়াইয়া গুলিখোরের নিদ্রার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গুলিখোর দেখিয়াও যেন কিছু দেখে নাই এই ভাবে পূর্ব্ববৎ তামাক টানিতেছে, আর পান চিবাইতে চিবাইতে মধ্যে মধ্যে পানের পিক্ থুঃ থুঃ করিয়া চোরের গায় ফেলিতেছে। গুলিখোরের হাতে একডিবা পান, আর গুলিখুরি পিক্ প্রতিবারে প্রায় এক ছটাক পরিমাণ চোরের গায়ে বর্ষণ হইতে লাগিল।

ডিবার পান ফুরাইলে গুলিখোর গৃহিণীর গা ঠেলিয়া পান চাহিল। গৃহিণী অবজ্ঞা সূচক অস্ফুট আওয়াজ দিতে লাগিল। পিক্ ফুরাইয়া আসিল অথচ গৃহিণীর কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইবার অন্য উপায় না দেখিয়া তাহার মুখে ফুস্ ফুস্ করিয়া তামাকের ধোঁয়া দিতে লাগিল, এবং—বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে—অন্য মনস্কে তাহার শশিলাঞ্ছিত বদন মণ্ডলে মুখের শেষ ছটাকে ছিপ্‌টি ফেলিয়া দিল। বদন রক্তোৎপলের ন্যায় শোভাধারণ করিল গৃহিণী তড়াক করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং গুলিখোরের অসময়ে অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া সপ্তম

রাগিণীতে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। প্রতিবেশীগণ সঙ্গীত স্বরে স্তব্ধ হইল আর সঙ্গে সঙ্গে তালের শব্দ পাইয়া ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া তাড়াতাড়ি দরজা ভাঙ্গিয়া গুলিখোর দম্পতীর ঘরে প্রবেশ করিল। গুলিখোর এতক্ষণে উত্তম অবসর বুঝিয়া তার স্বরে বলিতে লাগিল।

"মহাশয়গণ আপনারা ইহার বিচার করুণ। আমার বিবাহিতা স্ত্রী হইয়া কিনা সামান্য একটু পানের পিক দিয়াছি বলিয়া পাড়ার লোক জড় করিল আর, (চোরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই এক ভদ্রলোকের গায় সন্ধ্যা হইতে অনবরত পানের পিক ফেলিতেছি কিন্তু মুখে একটি রা নাই কেমন নীরবে সহ্য করিতেছে।" প্রতিবেশীরা এই অদ্ভুত চেহারার ভদ্রলোকের বিষয় সবিশেষ বিবেচনা এবং বন্দোবস্ত করিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি চোরকুল আর গুলিখোর কুলের বাড়ী প্রবেশ করে না।

* * *

উপস্থিত বুদ্ধি। এক ঠাকুর মহাশয় শিষ্য বাটী হইতে পাঁঠা সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি বাটী যাইবার জন্ত রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া আপনার একখানি টিকিট ক্রয় করিলেন। ব্রাহ্মণ পাঁঠাটি লইয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময় কোন রেলকর্ম্মচারী আসিয়া পাঁঠার টিকিট দেখিতে চাহিল। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন ১৫ সের জিনিষ বিনা মাশুলে লইয়া যাইবার হুকুম আছে। তাহাতে রেলকর্ম্মচারী কহিল "এসকল জীবন্ত জানওয়ারের পৃথক মাশুল দিতে হইবে" বলিয়া ব্রাহ্মণের পাঁঠাটি নামাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ অগত্যা ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া কালীমাতার উদ্দেশে পাঁঠাটি বলি দিয়া আবার পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে বসিলেন। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার পরিদর্শনে আসিলে ব্রাহ্মণ বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি

দেখাইতে লাগিলেন। কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

* *

শ্যালকের আত্মাভিমান। শ্রীযুক্ত ফল্লা বাবুর নাম অনেক দূর পর্য্যন্ত বিদিত। তাঁহাকে জানে না এমন লোক নাই। ফল্লা বাবুর এক শ্যালক আছেন তাঁহার মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে। কথায় কথায় তিনি বলিয়া থাকেন "আমায় চেন না আমি অমুক বাবুর শ্যালা" একদিন এই কথায় কোন লোক হাস্য করিয়া কহিলেন "মহাশয় আপনি শালা হইয়াই যখন এত অহঙ্কার করিতেছেন তখন ভগ্নিপতি হইলে যে কি করিতেন তাহা বলিতে পারি না।" তাঁহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমায় জান না—ফল্লা বাবুর শ্যালা অপরের ভগ্নিপতির সমান।"

* *

কেন পড়েনা। ক্রেতা—ওহে বাপু, তুমি আচ্ছা লোকত। তুমি সেই ময়না পাখীটা বিক্রি করবার সময় আমাকে বলে দিলে, যে এটা যা শুনবে তাই বলবে। কিন্তু পড়িয়ে পড়িয়ে ত আমার মুখে ফেণা উঠে গেল, পাখীটা হাঁ ও করে না হুঁ ও করে না।

পাখীওয়ালা।—এজ্ঞে হ্যাঁ আমি ত বলেছিলুম পাখীটা যা শুনবে তাই পড়বে। তবে কথাটা কি জানেন হুজুর, পাখীটা কিছুই শুনতে পায় না—বদ্ধ কালা।

* * *

লেখকের ভুল। মাসিক পত্র সম্পাদক—মহাশয় আপনি বড় ভুল করেছেন; আপনার সাহিত্য সেবা না করে কবিরাজি চর্চ্চা করা উচিত ছিল।

লেখক।—কেন বলুন দেখি?

সম্পাদক।—আপনার লেখা গুলাকে লোকে ঔষধের ন্যায় গ্রহণ করে।

* * *

হাকিমি টোট্‌কা। বিছা, বোল্‌তা বা ভিম্‌রুল দংশনে। লাল দেশলাই জলের সহিত ঘসিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে।

শ্বেত প্রদরের অব্যর্থ মহৌষধ। একখণ্ড কাঁটালি কলার মধ্যে পারাবতের টাট্‌কা গরম বিষ্ঠা পুরিয়া রোগীকে তিন দিবস প্রাতে সেবন করাইবে।

* * *

পূজার বাজারে। জুতাওয়ালারা সাইন বোর্ড দিল "অপর স্থানে ঠকিতে যাইবেন না, এই দোকানে আসুন।"

* * *

স্বতঃ সিদ্ধ। প্রত্যেক টাকযুক্ত মনুষ্যের বিশ্বাস যে তাহার মস্তিষ্ক বড় কার্য্যক্ষম।

* * *

শিক্ষিতা কুমারী।—মা, তবে কি আমি বানর হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি।

মা।—হয়েচ বৈ কি, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কারণ তোমার পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষদের আমি দেখি নাই।

* * *

মহারাণীর মুকুট ধারণ। আমাদের মহারাণীর লক্ষ লক্ষ সমুকুট ছবি দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি দিবারাত্রই মাথায়

মুকুট পরিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার সমস্ত রাজত্বকালের মধ্যে তিনি কুড়িবারের অধিক মুকুট ধারণ করেন নাই।

* * *

পারসিউস্ ও এনড্রোমিডা। কলিকাতায় মিনার্ভা থিয়াটারের ড্রপ সিন্ (পট) অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু ঐ ছবি কোন গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। প্রাচীন গ্রীক্ মাইথলজি বা পৌরাণিক ইতিবৃত্তের যে ঘটনা অবলম্বনে উহা চিত্রিত হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। ইথিওপিয়ার রাজা সিফিউসের এক কন্যা ছিল, তাহার নাম এনড্রোমিডা। এনড্রো-মিডার মাতা ক্যাসিওপিয়া স্বীয় দুহিতার সৌন্দর্য্যের অতিশয় গর্ব্ব করিতেন এবং বলিতেন যে জলদেবীগণ অপেক্ষা তাঁহার কন্যা সুন্দরী। ইহাতে জলদেবতা নেপচুন কুপিত হইয়া উক্ত রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য এক ভীষণ জলজন্তু (Sea-monster) প্রেরণ করেন। পরে দৈববাণী হয় যদি এনড্রোমিডাকে ঐ জন্তুর নিকট উৎসর্গ করা হয়, তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা হইবে। সিফিউস্ অগত্যা স্বীয় দুহিতাকে এক পাহাড়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। পারসিউস্ তদবস্থায় এনড্রোমিডাকে দেখিতে পাইয়া ঐ জন্তুকে বিনাশ করেন ও এনড্রোমিডাকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। পারসিউস্ গ্রীক দেবাদিদেব জুপিটারের পুত্র।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ।　　অক্টোবর, ১৮৯৯ সাল।　　দশম সংখ্যা।

পতিতা।

১

হের ওই অভাগিনী নারী,
তুচ্ছগণি জীবন বন্ধন।
না ভাবিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে,
জলে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।

২

ধর তারে সুকুমার করে,
তোল তারে পরম যতনে।
কৃশাঙ্গিনী ক্ষীণাতনুখানি,
বিকাশিতা তরুণ যৌবনে।

৩

হের তার সজল বসন
প্রতি অঙ্গে গেছে জড়াইয়া।
উঠিতেছে পড়িতেছে কত,
ঢেউগুলি ঢলিয়া ঢলিয়া।
এখনই লও ঘৃণা ভুলে,
সকরুণ প্রেমে তারে তুলে।

৪

হেলা করি ছুঁয়োনা ও দেহ,
উদারতা শুধু কথা নয়;
দোষ ভুলে ভাব তার ব্যথা,
থাকে যদি মানব হৃদয়।
রমণী সুলভ পবিত্রতা,
এখন ও দেহে বিরাজিতা।

৫

তীক্ষ্ণদৃষ্টে চেয়োনা চেয়োনা,
আত্মনাশ ভাবিয়া উহার।
অনুচিত অশিষ্ট হলেও,
ত্যজেছে সে অপমান ভার।
মৃত্যু নিয়ে গিয়েছে সকল,
রেখে গেছে সুষমা কেবল।

৬

যদিও সে বিপথ গামিনী,
তথাপি সে অবলা যে হায়।

আহা দাও মুছায়ে অধর,
মুখ ব'য়ে সলিল গড়ায়।

৭

বেঁধে দাও শিথিল কবরী,
স্থকেশিনী আহা ওই নারী।
লভেছিলা জনম কোথায়
বুঝে দেখ বিস্মিত হিয়ায়।

৮

কেবা এর ছিল পিতা, মাতা,
কেবা এর ছিল ভাই বোন।
অথবা কি ছিল প্রিয়তম,
কেহ এর হৃদয়ের ধন ?

৯

হায়, হায়, কোথায় করুণা
মানবের উদার পরাণ ?
এত বড় এ নগর মাঝে,
কেহ কি দেয়নি তারে স্থান।

১০

পিতা মাতা কিবা ভাই বোন
সবে গেছে স্নেহ মায়া ভুলে,
প্রণয় যে দারুণ আঘাতে,
স্বর্গ হতে পতিত ভূতলে।
বিধাতার মহান্ বিধান,
বিপথে যে করিল প্রয়াণ।

১১

প্রতি গেহে শত দীপ মালা,
ছায়া তার কাঁপে নদী জলে।
অসহায়া দুঃখিনী অবলা,
সেতু'পরি ঘোর নিশাকালে।
দাঁড়াইয়া ছিল শূন্য মনে,
একদৃষ্টে উদাস নয়নে।

১২

শিশির শীতল বায়ু বহি।
কাঁপাইল প্রতি অঙ্গ তার,
নহে কালজল—নদী বুকে
নাচিয়া যে ঢালে অন্ধকার।
আপন জীবন গাথা স্মরি।'
ঝাঁপ দিতে গেল মত্ত হয়ে,
মরণের অজানিত দেশে।
পশিবারে প্রফুল্ল হৃদয়ে ;
হোক না যেখানে সেই স্থান
ধরা হতে লভিবারে ত্রাণ।

১৩

কোনদিকে না চাহিয়া সে
ডুবিল যে অসীম সাহসে।
তখন তটিনী কূলে কূলে,
কেঁপেছিল শত ঢেউ তুলে।
এছবি আঁকিয়া সেও মনে,
ভেবে দেখ মরমে মরমে।
অপবিত্র পুরুষ সকল,
পার যদি মাখ ভব তবে
আর পানকর হোথাকার জল।

১৪

ধর তাঁরে সুকুমার করে,
তোল তারে পরম যতনে।
কৃশাঙ্গিনী ক্ষীনা তনু খানি
বিকাশিতা তরুণ যৌবনে।

১৫

করুণ হৃদয়ে সন্তর্পণে,
প্রতি অঙ্গ না হতে কঠিন,
সুরচিত করি'—ঢেকে দাও
খোলা দুটী আঁখি দৃষ্টিহীন।

১৬

স্থির দৃষ্টি অহো কি ভীষণ
ভেদিয়া আবিল আবরণে
নিরাশার শেষ দৃষ্টি ওই,
চেয়ে ছিল ভবিষ্যের পানে।

১৭

অধীর হইয়া অপমানে,
মরেছে সে আঁধার পরাণে।
পাশব আচার নিদারুণ,
জ্বেলে ছিল মত্ততা আগুণ
তার চির শান্তির মাঝারে;
ধীর চিত্তে দাও যোগ ক'রে
বুকে তার হাত দুই খানি
ধ্যান মগ্না যেমন যোগিনী।

১৮

ক্ষীণ মন হীন আচরণ
যেন সে বলিছে অকপটে
পাপভার করিয়া অর্পণ
মুক্তি তরে বিধির নিকটে।

শ্রীরসময় লাহা

প্যারিচরণ সরকার।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্যারি বাবুর সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ তাহা হইতে সঙ্কলিত হইল। আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহের জন্য আমরা গুরুদাস বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

গুরুদাস বাবু যখন হেয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়েন—তখনকার কোনও ঘটনা অবশ্য তাঁহার মনে নাই কিন্তু এটা দেখিতেন যে সকলে প্যারিবাবুকে আন্তরিক ভক্তি করিত।

তাঁহাকে যে সকলে আন্তরিক ভক্তি করিত তাহার একটী দৃষ্টান্ত গুরুদাস বাবু দেন। তখন ইনি পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন।

জন কয়েক বড় লোকের ছেলে সেই সময়ে ঐ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়। তাহাদের মধ্যে ১ জনের বয়স শ্রেণীর তুলনায় কিছু বেশী হইয়াছিল, প্রায় বিংশতি বৎসর। সে ক্লাসে ভয়ানক গোলমাল করিত এবং সকলকে বিরক্ত করিত। দুষ্কর্ম্মেও সে সর্ব্বত্র অগ্রণী ছিল। একদিন তাহার উপর কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া তদানীন্তন শিক্ষক নন্দবাবু তাহাকে বলেন 'You must stand up'. তাহাতে সে বলে 'মহাশয়! একেতো আমাদের এ ক্লাসে পড়িতেই লজ্জা করে, তার উপর আবার দাঁড়াইতে পারিব না।' নন্দবাবু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হেড মাষ্টার প্যারিবাবুর নিকট এই বিষয় বলিতে যান। যখন নন্দবাবু ক্লাস হইতে বাহির হন, তখন সেই ছেলেটী 'এবার মুস্কিল কল্লে' কয়েকবার এইরূপ বলে।

প্যারিবাবু আসিয়াই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'Well, why have you offended your Master? Why have you not carried out his order?' তখন সেই বালকটি আমতা আমতা করিতে লাগিল। প্যারিবাবু বলিলেন 'I can't listen to you until you obey his order;' তিনি এমন ভাবে ইহা বলিলেন যে সে বালক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল এবার তো দাঁড়াইয়াছি, এখন বসিতে বলুন'; তাহাতে প্যারি বাবু বলেন, 'It is not for me to recall his order, your master will do what he thinks fit;' কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় নন্দ বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া যান যেন তিনি তাহাকে বসিতে বলেন। গুরুদাস বাবু বলেন আর কেহ বলিলে সেই বালক হয়তো স্কুল ছাড়িয়া

চলিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ কখনো অমান্য করিতে সাহসী হইত না, তিনিও কিছুতেই হটিতেন না, সর্ব্বদা স্থির, ধীর ভাবে থাকিতেন। এ সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর নিজের কথা এই, 'He was never put out, he was always calm, cool, and collected.'

আর একদিনকার একটী ঘটনা এইরূপ। একটী শিক্ষক বড় Strict disciplinarian অর্থাৎ বিশেষ ভাবে নিয়মের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে নিরূপিত সময়ের পর ১৫ মিনিটের মধ্যে আসিলেও তিনি ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তার বেশী দেরী হইলে কোনও ছাত্রকে স্বীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। একদিন প্যারিবাবু দেখিলেন কতকগুলি ছাত্র মাঠে বেড়াইতেছে। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইয়া ছিল বলিয়া তাহাদের শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে ক্লাসে যাইতে দেন নাই। প্যারি বাবু বলিলেন 'তোমাদের কি কারণে দেরী হইয়াছিল, তাহা তোমাদের শিক্ষক মহাশয়কে জানাইয়াছিলে?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, কিন্তু তিনি সে সকল গ্রাহ্য করেন নাই।' প্যারি বাবু তাহাদিগকে ক্লাসে যাইতে বলেন, ও একটী Slip পাঠান, তাহাতে লেখা ছিল 'Pray, do not stretch your cord too tight, it may break. অবশ্য ছাত্ররা এই Slipএর বিষয় প্রথমে কিছু জানিত না। 'গুরুদাস বাবু বলেন, শিক্ষক মহাশয় তাহা ছিঁড়িয়া সেই ঘরেই ফেলিয়াছিলেন। উহারা পরে ছিন্ন খণ্ড গুলি একত্র করিয়া পাঠ করিতে তবে জানিতে পারেন যে তাহাতে ঐরূপ লেখা ছিল। ছাত্রদিগের জানিত ভাবে তিনি শিক্ষকগণকে কখনও কিছু বলিতেন না।

আর একটী ঘটনার বিষয় বলিতেছি। একটী ধনী লোকের সন্তান বই চুরি করিত। সে যে চুরির মতলবে ঐরূপ করিত এমন নহে, তবে তার কি রকম একটা কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রথমে ক্লাসে দুইবার বই চুরি হয়, তখন কেহ উক্ত বালক চুরি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তৃতীয় বার ধরা পড়ায় সকলেই বুঝিতে পারিল পূর্ব্বেও সেই কর্ম্ম উহারই দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। তাহার শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয় তাহাকে স্কুল হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে মানস (Expulsion) করেন। প্যারি বাবু সকল অবগত হইয়া বলেন যে তার বয়স অল্প অতএব সে 'Past redemption' অর্থাৎ সংশোধনের সীমা বহির্ভূত ছিল না। তিনি কেবল তাহাকে নীচের ক্লাসে নামাইয়া দেন। পরে মাষ্টাররা তাহার চরিত্র ভাল বলিলে সে আবার স্বীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

এই সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় ছাত্রেরা ও শিক্ষকেরা সকলেই তাঁহাকে কিরূপ ভক্তি করিত। এবং তিনিও ছাত্রদিগের জন্য কতদূর পরিশ্রম করিতেন।

তার পরে গুরুদাস বাবু প্রথম শ্রেণীর কথা বলেন। সেই সময় হইতে প্যারি বাবুর সহিত উঁহারা সংশ্লিষ্ট হন। তিনি ঐ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ব্যাকরণ ও Principles of Arithmetic and Algebra এই সকল পড়াইতেন। গুরুদাস বাবু বলেন 'Mode of teaching,' অর্থাৎ শিক্ষাদিবার প্রণালী অত সুন্দর কোনও লোকের তিনি দেখেন নাই।

গুরুদাস বাবু ছাত্রদিগকে Exercise দিবার বিশেষ পক্ষপাতী; তিনি বলেন এ বিষয়ে Senate ও অন্যান্য স্থানে তিনি অনেক

বলিয়াছেন। Exercise হইতে যে কত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা উনি প্রথম প্যারি বাবুর শিক্ষা প্রণালী হইতেই জানিতে পারেন। উহাদের সময় এইরূপ Routine ছিল।

সোমবার—ইংরাজী রচনা, স্কুলে বসিয়া করিতে হইত। মঙ্গলবার—মানচিত্র বাটী হইতে আঁকিয়া লইয়া যাইতে হইত, বুধবার শেষ দুই ঘণ্টা, ছেলেদের পঠিত নহে অথচ তাহারা বুঝিতে পারে এরূপ কোনও পুস্তক হইতে কোন একটী গল্প পাঠ করিতেন। একটী ভাল গল্প প্রথমে তিনি পড়িয়া যাইতেন। তারপর তিনি যাহা বলিলেন, ছাত্রদিগকে তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে দিতেন, এবং তাহা হইতে তাহারা কি নীতি সঙ্কলন করিল তাহাও লিখিতে দিতেন। নীতিটি তিনি প্রথমে পড়িতেন না। দেখিতেন ছাত্ররা গল্পের ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় কি না। গুরুদাস বাবু বলেন তাঁহার ঐরূপ সুযুক্তি পূর্ণ গল্প বাছিবার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। ঠিক্ ছেলেরা যেরূপ বুঝিতে পারে তেমনটী দিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর ছাত্ররা যদি তাহা লিখিয়া শেষ না করিতে পারিত তিনি তাহাদিগকে আরও এক ঘণ্টা সময় দিয়া যাইতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর তিনি চলিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু ছাত্রদিগের সততার উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল, যে তিনি কোনও লোক রাখিয়া যাইতেন না। কেবল ছাত্রদিগের লেখা হইলে, সকল গুলি একত্রে তাঁহার বাটীতে দিয়া আসিবার জন্য একজন লোক বসাইয়া রাখিতেন। ছাত্ররাও কখনও প্যারি বাবুকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিত না। এই সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর নিজের কথা এই 'He was never deceived'। কখনো কখনো বা তিনি ছোট Dialogue পড়িতেন। তাঁহার পড়িবার সুন্দর ক্ষমতা ছিল।

বৃহস্পতিবার ছিল বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদ।

শুক্রবার......ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ।

শনিবার ... .ইতিহাস, Principles of Arithmetic and Algebra'

গুরুদাস বাবু বলেন 'The beauty of the thing lies here.' প্রতি সপ্তাহে তিনটী করিয়া Exercise স্বয়ং দেখিতেন, ক্লাসে ছেলেও ছিল মন্দ নয়, প্রায় ৬০। ৭০ জন ; অথচ কাহারও সামান্য ভুল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ; বিশেষ ধরণের ভুল গুলির পাশে চিহ্ন দিতেন। প্যারি বাবু একখানি রেজেষ্টারীতে প্রত্যেক ছাত্রের নম্বর লিখিয়া রাখিতেন আর বলিতেন, 'Something will depend upon the results of these exercises.'

তখন বৃত্তির প্রথা এরূপ ছিলনা। হেয়ার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা জড়াইয়া যে প্রথম হইত তাহাকেই সর্ব্ব প্রথম বলিয়া ধরা হইত, গুরুদাস বাবু এইরূপ হন। তাঁহার সহপাঠী বাবু শিবচন্দ্র চাট্যার্জ্জি, যিনি ইদানীং মজফারপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু উকীল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হন বটে কিন্তু দুয়ে জড়াইলে বাবু হরগোপাল সরকার ২য় হন। ইনি এখন ঠাকুরবাড়ীতে অধ্যাপনা করেন। প্যারিবাবু বলেন গুরুদাস বাবু ও হর গোপাল বাবুই বৃত্তি পাইবেন। তদানীন্তন ডিরেক্টর Young সাহেবের এ বিষয়ে মত ভেদ ছিল। প্যারিবাবু Young সাহেবকে গিয়া বলেন যে গুরুদাস বাবু ও হর গোপাল বাবু এই দুই জনকে যেন স্কলারসিপ (বৃত্তি) দেওয়া হয়। সেই বৎসর প্রথম বিভাগে ছয়জন ছাত্র হেয়ারস্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ হয়। সেই সময়ে এইরূপ ফল প্রায় হইত না। এই ফল হইবার কারণ সম্বন্ধে প্যারি বাবু Young সাহেবকে এইরূপ বলেন 'It is solely due to the regularity of the exercises I gave

them and if you do not attach any importance to these 'exercises, you must not hold me responsible for the result in the Colootolah Branch School (Hare school). Young সাহেব অবশেষে প্যারিবাবুর মতেই মত দেন।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় ইউরোপীয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে কতদূর সম্মান করিতেন।

এইবার তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রণালী বিষয়ে কিছু বিবৃত করিব।

সেই সময়ে যে ইংরাজী এণ্ট্রান্স কোর্স ছিল, তাহার সবে মাত্র দুই খানি অর্থ পুস্তক বাহির হইয়াছিল। একখানি প্যারিবাবুর, দ্বিতীয় খানি, Doveton Collegeএর তদানিন্তন অধ্যাপক Rambert সাহেবের। প্যারিবাবু পুস্তক যাহাতে দরিদ্র ছাত্রেরা পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে পারে সেই জন্য তাহার মূল্য আট আনা মাত্র ধার্য্য করিয়াছিলেন। একখানি ইংরাজী এণ্ট্রেন্স কোর্সের অর্থ পুস্তকের মূল্য আট আনা। এখন ইহা গল্প বলিয়া মনে হয়। অথচ Rambert সাহেবের পুস্তক অপেক্ষা প্যারিবাবুর পুস্তক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল একথা সকলেই স্বীকার করেন। গুরুদাস বাবুদের সময় বিখ্যাত ইংরাজ কবি 'Samuel Rogers'এর Italy নামক কাব্য First Arts পরীক্ষার একখানি কোর্স ছিল। তাহাতে বিস্তর Allusion ছিল। সেই সময়ের Cathedral Mission Collegeএর অধ্যক্ষ Barter সাহেব একজন অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। এমন কি তিনি পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে সেই পুস্তকে উল্লিখিত Allusion যথাযথ রূপে বলিতে পারিতেন না। ছাত্রেরা বলিত মহাশয় হিন্দু কলেজের প্রফেসার এইরূপ বলিয়াছেন—তিনি সেই সকল দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এমন কি এক

দিন তিনি বাস্তবিকই প্যারিবাবুর নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। এবং জিজ্ঞাসা করেন তিনি কোথা হইতে সেই সকল Allusion বাহির করেন এবং কিরূপে? সাহেব যখন এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন প্যারিবাবু আর কি করেন বিনীত ভাবে বলেন "আমি দেখিয়া শুনিয়া সেই সব ঠিক্ করিয়া লই"। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময় অধুনা অধিকাংশ শিক্ষকই যেমন করেন তিনি সেইরূপ শুধু কোন কথার প্রতিবাক্য বা কোনও ভাবের অসম্পূর্ণ তাৎপর্য্য দিয়াই নিবৃত্ত হইতেন না। যাহাতে ছাত্রেরা সুন্দররূপে প্রত্যেক কথার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তিনি এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেন।

গুরুদাস বাবুদের সময় 'Herschel's Discourse on Natural Philosophy' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পড়িতে হইয়াছিল। তাহাতে এক স্থানে এইরূপ লেখা ছিল 'Modern Chemistry has gone too far to assert that matter consists of ultimate molecules or atoms,' এইটী তিনি এত সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন যে সকলেই বলে সেইটী আর কোনও বিদ্যালয়ে অত ভাল করিয়া পড়ান হয় নাই। অধিকন্তু গুরুদাস বাবু বলেন যে তিনি যখন F. A.তে Chemistry পড়েন তখন দেখেন যে সে সকল কথা প্যারিবাবু পূর্ব্বেই অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্যারিবাবুর সর্ব্ব বিষয়ে কিরূপ অদ্ভূত ব্যুৎপত্তি ছিল তাহা ইহা হইতেই উত্তমরূপে প্রতীয়মান হইবে। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ত পড়াইতেনই, ইহা ব্যতীত অঙ্কশাস্ত্রও অধ্যাপণা করিতেন, এবং উপরি উক্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায় বিজ্ঞানেও তাঁহার কি চমৎকার জ্ঞান ছিল।

শুধু ইহাই নহে। তিনি যেরূপ মানচিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন

তাহা বিস্ময়কর। ছাত্রদিগকে প্রত্যহ এক খানি করিয়া মানচিত্র আঁকিতে দিতেন। সে সকল রং করিয়া ও বাঁধাইয়া ক্লাসেও ভূগোল পাঠের সময় ব্যবহৃত হইত। মানচিত্র অঙ্কণ করিবার উপযোগী কাগজ প্যারিবাবুই সকলকে দিতেন। গুরুদাস বাবুর দ্বারা রচিত ও লিখিত এবং উঁহার সহপাঠি পার্ব্বতীপ্রসন্ন বাবুর অঙ্কিত এক খানি ভারত বর্ষের মানচিত্র নাকি বহু কাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল। এখন আছে কিনা বলিতে পারিনা। তাহাতে রীতিমত ছাপার অক্ষরে গুরুদাস বাবু 'Society for the Diffsion of useful knowledge' এর মানচিত্রে যত নগর ছিল সব লিখিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবু বলেন তিনি এখনও ছাপার হরফে বেশ লিখিতে পারেন। উল্লিখিত মানচিত্রখানি উনি June মাসে আরম্ভ করেন ও ৬পুজার সময় উহা সমাপ্ত হয়।

গুরুদাস বাবু আমাদিগকে তিন খানি মানচিত্র দেখাইলেন; একখানি ভারতবর্ষের, দ্বিতীয় খানি আসিয়া মহাদেশের ও তৃতীয় খানি প্রাচীন ইতালির। প্রথম দুই খানি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের অঙ্কিত, তৃতীয় খানি তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্তবাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্কিত। সেই গুলি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। দুই হাত দূর হইতে তাহা অবিকল মুদ্রিত মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা ঐ গুলির চিত্রনৈপুণ্যে চমৎকৃত হইয়াছি। অথচ তাহা বিলাতী মানচিত্র দেখিয়া অঙ্কিত হইয়াছে মাত্র, তাহার উপর কাগজ রাখিয়া নহে। গুরুদাস বাবু পুত্রদিগকে ঐ সকল আঁকিতে শিখাইয়াছেন। আমরা ঐ গুলির প্রশংসা করাতে গুরুদাস বাবু বলেন 'But the credit is due to Peari Babu.'

গুরুদাস বাবুকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি প্যারি বাবুকে

কখনও পরিহাস রসিকতা করিতেদেখিয়াছেন কি না। তাহাতে তিনি বলেন যে প্যারিবাবু সাধারণতঃ Serious mood of mind অর্থাৎ গম্ভীর ভাবে থাকিতেন। তবে তিনি যে কখনও রহস্য করিতেন না তাহা নয়।

একদিন প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা থ্যাকার, স্পিঙ্ক কোম্পানীর দোকান হইতে একখানি বিল আসে। তিনি হিসাব করিয়া গিরীশ বাবুকে সেই হিসাব দেখিতে দিয়া বলেন, 'ইহা Speculative Arithmetic নহে, ইহাতে ভুল হইলে যে কিছু নম্বর কম হইবে তাহা নহে, It means so many rupees, annas, pies.'

আর গুরুদাস বাবু বলেন 'His seriousness was never repulsive, there was sweetness about it, which attracted love and esteem rather than awe and fear.'

একদিন কেবল একজন ছেলে 'Herschel বড় শক্ত, উহা যাহাতে উঠিয়া যায় আপনি সেই বিষয়ে লিখুন' প্যারিবাবুকে ইত্যাদি প্রকার কথা বলায় তিনি বলিয়াছিলেন Well, why this complaining spirit in you?—তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যে এরূপ বলিয়াছিলেন তাহা নহে তবে একটু 'Offended' অর্থাৎ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

ছেলেদের এইরূপ ধারণা ছিল যে প্যারিবাবুর কথা শুনিতেই হইবে। তিনিও ছেলেদের অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—আর তিনি তাহাদের সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন তাহা অতি উচ্চ। যথা সময়ে তিনি সকল কার্য্য করিতেন। আর কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন না করিয়া পরিত্যাগ করিতেন না; এতদ্ সম্বন্ধে গুরুদাস বাবু বলেন 'Thoroughness was his motto.'

তাঁহার একটী ছোট Library ছিল। সেইখানে ছেলেদের

যাইয়া পুস্তকাদি পড়িতে বলিতেন। সে সময়ে অতি অল্প লোকেই পুস্তক ক্রয় করিত। এখন যেমন প্রত্যেক পাড়ায় অন্ততঃ একজনের নিকটেও ২।৪ খানা পুস্তক পাওয়া যায়, তখন সেরূপ ছিল না। তিনি ছেলেদের হাতে চাবি দিয়া যাইতেন। গুরুদাস বাবু প্রভৃতি সেখানে যাইয়া প্রত্যহ অনেক পুস্তক পড়িয়া আসিতেন। তিনি Penny Encyclopœdia হইতে ভাল ভাল বিষয়ে প্রবন্ধ পড়িয়া সকলকে শুনাইতেন। বোর্ডে ছবি অাঁকিয়া ছাত্রদিগকে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। Library তে আন্দাজ ২০।২৫ জন ছাত্র আসিত। তাঁহার নিকট পড়িলে Boarding systemএর কাজ হইত। গুরুদাস বাবু বলেন তাঁহারা Libraryতে যাইয়া ঐ যে এক ঘণ্টা কাল পড়িয়া আসিতেন, উহাতে তাঁহাদের প্রভূত উপকার দর্শাইয়াছিল।

গুরুদাস বাবু বলেন তিনি এত সুন্দর ভাবে পড়াইতেন যে ছেলেদের মনে সমস্ত গাঁথা হইয়া থাকিত। গুরুদাস বাবু তো এতদিন হইল তাঁহার কাছে পড়িয়াছেন (৪০ বৎসর অতীত) তথাপি তিনি প্রতি সপ্তাহে তাঁহার বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিতে পারেন। আর তাঁহার স্বর এতমৃদু, কোমল, অথচ প্রাণস্পর্শী ছিল যে তাঁহার প্রত্যেক কথা হৃদয়ে আঘাত করিত।

এইবার তাঁহার অতুল কীর্ত্তি 'মাদক নিবারণী সভার' কথা কিঞ্চিৎ বলিব। গুরুদাস বাবু বলেন তখন এইরূপ সভা করা ঠিক সময়োপ-যোগীই হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বক্তা রামগোপাল ঘোষ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যশঃ প্রভায় তখন সমগ্র বঙ্গ উদ্ভাসিত কিন্তু তাঁহারা মদ্যপায়ী ছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া এই কুঅভ্যাসেরও অনুকরণ করিতে পারিত।

যে দিন ঐ সভার প্রথম অধিবেশন হয়, সে দিন গুরুদাস বাবু

প্রভৃতি উহাতে উপস্থিত ছিলেন। তখন গুরুদাস বাবু এম, এ, পড়েন। সেই সভায় মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সভাপতি হইবার কথা ছিল কিন্তু তাঁহার বিলম্ব হওয়ায় American Baptist missionary Rev. C. H. A. Dall সাহেব সভাপতিত্বে বরিত হন। সেই সভায় Woodroff সাহেব ও কেশব বাবু বক্তৃতা করেন। কিন্তু উড্রো সাহেবের বক্তৃতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত থাকিলেও বক্তৃতা করেন নাই।

গুরুদাস বাবুর মতে ঐ সভায় অনেক ফল লাভ হইয়াছিল। মদ্যপের সংখ্যা তো হ্রাস হইয়াছিলই ইহা ব্যতীত, গুরুদাস বাবুর নিজের কথা এই 'It set the tide of Public opinion against intemperance.'

নীলমণি বাবুর সহিত প্যারি বাবুর একবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হয়। তাহাতে তিনি বলেন 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না কারণ দেশের সকল লোকের এখনও মানসিক উৎকর্ষ প্রকৃষ্টরূপে লাভ হয় নাই। একজন চাষাকে যদি বল ঈশ্বর নিরাকার, সেতো তোমায় মারিতে আসিবে'।

তিনি একাগ্রতা সহকারে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। দারুণ গ্রীষ্মেও পাখা ব্যতিরেকে তিনি বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না। এত একাগ্রতার সহিত তিনি অধ্যয়ন কার্য্য করিতেন। আর তাঁহার স্বভাব সর্ব্বদা স্থির ছিল। তাঁহার ভিতর আড়ম্বর বা দাম্ভিকতার লেশমাত্রও আভাব ছিল না।

গুরুদাস বাবুকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। Entrance Examination এর যখন দশদিন মাত্র বাকী আছে তখন গুরুদাস বাবু

পীড়িত থাকা হেতু তাঁহার Receipt খানি আনিতে একটী লোক পাঠান। তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া প্যারি বাবু গুরুদাস বাবুকে এক খানি পত্র লেখেন। তাহাতে গুরুদাস বাবু যাহাতে সত্বর আরোগ্য লাভ করেন সেই বিষয়ে তিনি ঈশ্বর সান্নিধ্যে নিয়ত প্রার্থনা করেন ইত্যাদি প্রকার লিখিত ছিল। গুরুদাস বাবু বলেন উহা এরূপ মিষ্ট ভাবে ও কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে লিখিত হইয়াছিল যে তাহা পাঠ করিয়া উনি রোগের যাতনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ছাত্রদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অধুনা বিরল।

পূর্ব্বে কোন উকীল হাইকোর্টে ভর্ত্তি হইতে গেলে শুধু শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সাধারণ সার্টিফিকেটের পর 'I know nothing against his character' এইরূপ লিখিলেই হইত।* কিন্তু গুরুদাস বাবুদের সময় হইতে নিয়ম হয় যে 'I know that he is of good character' এইরূপ অর্থাৎ 'আমি জানি যে এই ছাত্রের চরিত্র নির্ম্মল' লিখিতে হইবে। গুরুদাস বাবু সাটক্লিফ (Sutcliffe) সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট (Certificate) আনিতে গেলে, 'আমিতো তোমার ঘরের কথা জানি না' সাটক্লিফ সাহেব এই-রূপ বলেন। তবে Sutcliff সাহেব এই কথাও বলিয়াছিলেন যে ওইরূপ Certificate দিতে, 'I have no objection,' এবং Why don't you try to get one from your own countrymen ? আর তিনি স্বয়ংই বলেন Why don't you go to Pyari Babu কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুও সেই সময় ওকালতীতে ভর্ত্তি হইতে যান। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে Certificate লন। গুরুদাস বাবু প্যারি বাবুর নিকট যাইতেই তিনি ঐরূপ Certificate দিতে সম্মত হন। কেবল

জিজ্ঞাসা করেন 'উহা কে দেখিবে ?' কারণ যদি উঁহার কথা না থাকে তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে। গুরুদাস বাবু বলিলেন Trevor সাহেব—যিনি তখন English Departmentএর কর্ত্তা ছিলেন —শুনিয়া প্যারি বাবু হৃষ্টচিত্তে Certificate দিলেন। Trevor সাহেব বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়েই প্যারিবাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে।

তিনি পায়জামা, চাপকান, ও সাদা কাপড়ের চুনট করা সোলার পাগড়ী মাথায় দিয়া প্রত্যহ পদব্রজে চোরবাগান হইতে Sutcliffe সাহেবের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে আসিতেন। একদিন কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি একখানা গাড়ী করেন না কেন ? উত্তরে তিনি বলেন যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ বৃথা অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন কি ? ইহা ব্যতীত উহাতে শরীরের পেশী সকলের পরিচালনা হইয়া শরীরেরও যথেষ্ট উপকার হয়।

প্যারিবাবু গুরুদাস বাবুর অত্যুজ্জল ছাত্রজীবনের শেষ এবং তাঁহার হাইকোর্টের উকীল হওয়া পর্য্যন্ত দেখিয়া গিয়াছেন। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তো দেখিতেন তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র দেশের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের অত্যুচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাবতীয় সদ্‌গুণে বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

কলিকাতার ফিরিওয়ালা।

আমি গরিবের ছেলে। তেমন বিদ্যাবুদ্ধি নাই, চেহারা দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, পাঠক ত আর তোমার বিবাহ

সম্বন্ধ স্থির করিতে বসেন নাই, তবে অত রূপ বর্ণনা করিতেছ কেন? আমি উত্তর দিব না, চুপ্ করিয়া থাকিব। যদি মৌনই সম্মতির লক্ষণ হয় আমার আপত্তি নাই।

আমার একটি কায চাই। আমার গ্রামস্থ বন্ধু বলিলেন পল্লীগ্রাম অপেক্ষা যদি তুমি একবার কলিকাতায় যাইতে পার তোমার আর চাকরীর ভাবনা থাকিবে না। আমি একটু হাসিলাম। বন্ধুবর বুঝিলেন যে তাঁহার সুযুক্তি পূর্ণ উত্তরটি আমার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া ওষ্ঠাধর বিচ্ছেদ পূর্ব্বক দুই একটি অমার্জ্জিত দন্তপংক্তি দেখাইল। কিন্তু আমার হাসিবার কারণ—কায অর্থাৎ কর্ম্ম অর্থে অনায়াসে সকলে চাকরী বুঝিয়া থাকে। নীলকমলের সময় হইতেই এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছে। চাকরী যে কর্ম্ম তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কর্ম্ম বলিলেই কি চাকরী বুঝাইবে? অহো! আমাদের কি অধোগতি। সে যাহা হউক আমি একটি চাকরী চাই ইহা সত্য। অতএব বন্ধুর কথা শিরোধার্য্য করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

আমার একজন দূর আত্মীয় কলিকাতায় থাকেন। তাঁহারই বাড়ী থাকিয়া কায কর্ম্মের চেষ্টা দেখিব স্থির করিলাম। আমি খাঁটি পল্লীগ্রামের লোক। আমার চেহারা দেখিলেই কেমন লোকের সুড়সুড়ি লাগে, তাহারা অমনি একটু হাঁসিয়া ফেলে। যাহা হউক কলিকাতায় আত্মীয়ের বাসায় জামাই আদরে প্রথমদিন সেবা দিলাম। আত্মীয়কে আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন আজ কাল চাকরীর বাজার বড় খারাপ। পরে জানিলাম আজকাল কেন, চিরকালই সকলে সকল কর্ম্মপ্রার্থীকে দ্বিধাশূন্য হইয়া প্রথমে ঐ উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া আমার অন্তঃকরণটা একটু চঞ্চল হইল। ভাবিলাম বন্ধু বলিয়াছিল কলিকাতায় চাকরী খুব সুলভ

হয়ত সম্প্রতি বাজার চড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের হাটে অমন কতদিন সুতার বা নীলের বাজার হঠাৎ চড়িয়া গিয়া থাকে।৹ এত শীঘ্র বাজার চড়িবে এজন্য অদৃষ্টকে ধিকার দিলাম, কিন্তু একবারে হতাশ হইলাম না। মনে করিলাম এইখানে থাকিয়া সহরের চাল চলন শিখিয়া লই। পরে সহরের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে আর চাকরী পাইবার কষ্ট থাকিবে না। পর দিবস আহারাদির পর আর চিরঅভ্যস্থ একটু নিদ্রা না দিয়াই অমনি রাস্তায় বাহির হইলাম। পাছে হারাইয়া যাই এজন্য বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া লইলাম, আর আমায় সহর দেখাইয়া দিবে বলিয়া আত্মীয়ের অনুমতিক্রমে রায় মহাশয় নামে তাঁহার সরকারকে সঙ্গে লইলাম। রায় মহাশয় নিরীহ প্রাচীন লোক। অনেকদিন হইতে আমার আত্মীয়ের সংসারে আছেন৹ তিনি বড় অমায়িক লোক, আমার সহিত বেশ মনের মিল হইল।

আমরা দুই একটি মোড় পার হইয়াই একটি লোক দেখিলাম তারস্বরে 'কর্ম্মোও' বলিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। আমি তাহার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াই রায় মহাশয়ের গা টিপিলাম। রায় মহাশয় উঃ কিও! বলিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম দেখিতেছ না যে জন্য আমার কলিকাতায় আসা তাহাই ওই বৃদ্ধ সাধিয়া বেড়াই-তেছে। রায় মহাশয় ফ্যাল্ ২ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে হাজির হইলাম এবং মিনতি করিয়া বলিলাম বাপুহে আমি ত কর্ম্মের জন্য লালাইত, আমায় একটি কর্ম্ম দিতে পার? বৃদ্ধ হয় কানে কম শুনে, নতুবা আমায় পল্লীগ্রামের লোক দেখিয়া তামাসা করিয়া বলিল 'এজ্ঞে কতটা ছ্যাঁড়া দেখি?' আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রায় মহাশয়ের দিকে চাহিলাম,

দেখিলাম তিনি হাঁসিয়াই খুন। প্রকৃতিস্থ হইয়া রায় মহাশয় বলিলেন আরে পাগল কর কি ? ওযে রিপুকর্ম্মওয়ালা ওর কাছে কি কর্ম্ম মেলে ? ও লোকের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে মাত্র। গরিবের ছেলে তেমন বিদ্যা বুদ্ধি নাই, আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে ইনি রিপুত্যাগ করিয়া আমার মত লোক্‌কে কর্ম্ম ফেরে ফেলিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ? যাহা হউক আমি রায় মহাশয়ের কাছে ফিরিওয়ালা চিনিলাম। তিনি শিখাইয়া দিলেন যে যাহারা রাস্তায় হাঁকিয়া যায় তারা ফিরিওয়ালা। কিন্তু অনেকদূর হাঁটিয়াও ফিরিওয়ালা কি বলে তাহা বুঝিলাম না। তাহাদের অনেককে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইল কিন্তু যে ভাষায় তাহারা চীৎকার করে তাহার ক খ ও শিখিলাম না।

চোঁ করিয়া কানের কাছদিয়া 'শান্ শান্' করিয়া একজন সাঁপের মন্ত্র বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আমি বুঝিলাম ইনি একজন ফিরি-ওয়ালা, কাঁধে একটা বড় চাকা দেখিয়া ভাবিলাম গাড়ীবিক্রী করিতেছে। আমার এক খান ছোট ভাঙ্গা ছাগলের গাড়ীর বরাত ছিল ; ইহার দর কত রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন ও অস্ত্রশান দিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওরা তত স্পষ্টবক্তা না হইলেও হাতের জিনিষ দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য রায় মহাশয়ের প্রতি কথায় আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে।

একব্যক্তি চেঙ্গারি মাথায় করিয়া 'চেঁড়েচাই' হাঁকিতেছে। আমার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে রায় মহাশয়কে এক পয়সার চিঁড়ে কিনিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন নিকটে চিঁড়ে পাওয়া যায় না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি ফিরিওয়ালার মাথায় এক চেঙ্গারি চিঁড়ে ছিল, এমন কি কামিনী ধানের চিঁড়ের গন্ধ পর্য্যন্তও পাইলাম। আর রায় মহাশয় কিনা একটি পয়সার মমতা করিয়া অনায়াসে আমায়

বলিলেন চিঁড়ে নিকটে পাওয়া যায় না! রায় মহাশয় আরও কএক বার এইরূপে আমায় ভুলাইয়াছিলেন বেশ জানি। এক জন লোক স্পষ্ট করিয়া 'চিনি আছে, সুজি আছে জল নেই' হাঁকিয়া গেল, আর পরক্ষণেই আমি জিজ্ঞাসা করিলে রায় মহাশয় অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিলেন ওসব কিছুই ওর কাছে নাই। কেন. সত্য বলিলেইত হইত, আমি না হয় দেশে লইয়া যাইবার জন্য সেরখানেক চিনি ও পাঁচ পোয়াটাক সুজি কিনিয়া রাখিতাম। আর যদি বল ফিরিওয়ালারা মিথ্যাবাদী তাহাদের নিকট যাহা থাকে সর্ব্বদা তাহা সত্য বলে না। তাই বা কেমন—ওমা মিথ্যাকথা ভাবিতেছি মাত্র অমনি একমাগী "থ্যাংরা নেবে গো" বলিয়া ত্বাড়া করিয়া আসিল। দেখিলাম সত্য সত্যই মাথায় একবোঝা। "না না" করিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলাম আর একটু হইলেই আমাকে সম্মার্জ্জনি গছাইয়াছিল। ইহারা কি মনের কথা বুঝিতে পারে? ঝাঁটাওয়ালী ব্যতীত আরও দুই একটি মহিলা ফিরিওয়ালী দেখিলাম। বোধ হইল ইহারা ছদ্মবেশী ঋষিপত্নী। আমি পল্লীগ্রামের লোক হইলেই বা; অগ্নি কি কখনও ভস্মাবৃত থাকে? ইহাদের নিঃস্বার্থ বিক্রয় প্রণালী দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম, রায় মহাশয়কে আর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় নাই। ইহার আর জানিবার আছে কি? স্ত্রীলোক বলিয়া যাইতেছে "বাত ভালো করি ব্যথা ভালো করি" আহা! বলদেখি অসার খলু এসংসারে কে কাহার ব্যথা ভাল করে? বাত ব্যাধি যে ভাল হয় না তাহার প্রমাণ আমাদের নিজ গ্রাম হইতেই এককুড়ি সংগ্রহ করিতে পারি। এ স্ত্রীলোক বাত এবং ব্যথা ভাল করে আরও ইনি বলিতেছেন "দাঁতের পোকা বার করি, শিঙ্গে ফোঁকাতে পারি"। অর্থাৎ সামান্য দাঁতের পোকার যন্ত্রনা হইতে একেবারে ভবযন্ত্রনা দূর করিয়া দিতে পারেন।

একি সাধারণ স্ত্রীলোকের কায? স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও সম্যক জ্ঞাত নহেন, রায় মহাশয়কে আর কি জিজ্ঞাসা করিব।

যেমন দেবচরিত্র আছে তেমনি আবার অধম অবতারও ফিরিওয়ালাদের মধ্যে অভাব নাই। এই দেখুন না এক পাপিষ্ঠ "রুটিবিষ্" অর্থাৎ রুটির সহিত বিষ মাখাইয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহাও ভবযন্ত্রনা লাঘবের একটি উপায় বটে, কিন্তু কি নিকৃষ্ট উপায়।

পাপিষ্ঠ বিক্রিওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কথাই কয় না। তাহাদের মাথামুণ্ড কি যে পন্য দ্রব্য, আমি সারা সহর ভ্রমণের জ্ঞান লাভ করিয়াও তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয়ের যদি জানা থাকে বলিয়া দিবেন।—একজন লোক একখানি কাঁশী (নাকি সুরে বারানসীর চলিত কথা) একখণ্ড কাষ্ঠ সহযোগে থন্ থঁন্ ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজাইয়া চলিয়াছে, মুখে রা টি পর্য্যন্ত নাই কিন্তু শব্দে দেহ শিহরিত, কর্ণ বিদারিত, মাথা রিরীকৃত। ভদ্র লোকের দুই প্রহরের সময় পথের ধারের ঘরে একটু স্থির হইয়া ঘুমাইবার যোটি নাই। কেনযে সুখসুপ্তি ব্যাঘাতের জন্য কলিকাতার লোকে এই বাক্‌হীনবিক্রিওয়ালাদের মাথাভাঙ্গিয়া বাগার্থ প্রতিপত্তি জন্মাইয়া দেয় না ইহাই আশ্চর্য্য। পূজা বাড়ীতে বলিদানের সময় এক একটি লোক এইরূপ বাদ্যকরে, তাহারা কি বিক্রয় করে এবার দেশে গিয়া অনায়াসেই সন্ধান লইব। অথবা ইহারা বলিদানের পূর্ব্বাহ্নিক মাঙ্গল্যবাদ্যে লোকের কল্যান সাধন করিয়া বেড়াইতেছে।

বোবা ফিরিওয়ালাদের মধ্যে কাহারও হস্তে একতাড়া চাবী দেখিয়াছি। তাহারা অনবরত সেই বৃহদ্‌গুচ্ছ ঝম্ ঝম্ করিয়া অকারণ পথিকের মন খারাপ করিয়া দেয়।

আর এক শ্রেণীর চীৎকারের অর্থবোধের জন্য টিকাকার

প্রয়োজন। আমার ন্যায় বিদেশীয়ের সম্মুখ দিয়া যদি ডাকিয়া যায় "ব্রেশ্" কানের ভিতর দিয়া মরমে গো পশিলেও বলুন দেখি আমি কি বুঝিলাম? ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ফিরিওয়ালার মুখ পানে চাহিলাম। সেও থম্কিয়া দাঁড়াইল এদিক ওদিক তাকাইয়া আবার শুনাইল "ব্রেএশ্" আমিও বুঝিলাম বেশ্।

আমি অর্থসংঘটন করিতেছি আর একজন হাঁকিল "উওঘোটি"। দেখিলাম হাতে ঘটি নাই অথচ থাকিয়া থাকিয়া "ও ঘোটি" করিতেছে, কাযেই আমার মনে হইল এ ঘটিচোর। সহরের কায়দা সমস্তই, এখানে বুঝি চোরেরা হাঁকাহাঁকি করিয়া চুরি করে। ইনি কিসের চোর তাই চীৎকার করিয়া জানাইতেছেন। ইহাদের অপেক্ষা বড়দরের চোরেরা "ঘটিবাটি-গাড়ু-পিল্সুজ" সরাইবার কথাও বলিয়া যায় শুনিয়াছি। সহরে দুইএকদিন ঘুরিয়াই এই সকল ফিরিওয়ালার ধাত মারিয়া দিয়াছি। এই জ্ঞানবৃদ্ধি নিশ্চয়ই পরে আমাকে চাকরী-লাভে বিশেষ সহায়তা করিবে।

ফিরিওয়ালাদের একটী স্বতন্ত্র সুরজ্ঞান আছে। এক বরফ-ওয়ালাই দশরকম সুর বাহির করিতে পারে। একটু শিক্ষালাভ হইলেই কাহারও বেশ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায় যথা, "সকের জলপান ঘুগ্নিদানা। চিনের বাদাম নকল দানা॥" আমি অক্ষর গণিয়া দেখিয়াছি দুই চরণে সমান মিল আছে। অর্দ্ধশিক্ষিত ফিরিওয়ালাও অনেক যথা, "পাকা পেঁপে, কচি শশা" ওয়ালা। লোকটি বেশ দুটি চরণ ঠিক করিয়াছে কিন্তু তাহার মিল্ জ্ঞান নাই। কচিশশার সহিত কি কখনও পাকা পেঁপে মেলে? যদি কচিই তাহার বিক্রেয় হয় তবে তাহার সহিত আর একটি কচি মিলাইয়া দিগ—অথবা পাকায় পাকায়। শিক্ষিত ফিরিওয়ালাদের মধ্যে "জারে কালেমো বেল

মোরব্বা হজ্‌মীগুলি কাসুন্দি কুলের আচার” যাহারা ফিরি করে তাহারা বড় মূর্খ। একেতো উচ্চারণেই দোষ। তা নাহয় স্বীকার করিলাম যাহারা কাসুন্দি কুলের আচার বিক্রয় করে তাহাদের মুখে লালার আধিক্য প্রযুক্ত তত স্পষ্ট কথা বাহির হয় না, কিন্তু এতগুলি দ্রব্য লইয়া মিল্ করিয়া বিক্রয় করিতে পারে না কি? দুই স্ত্রীতে অথবা দুই ভাইতে যেন মিল হয় না, তাই বলিয়াই কি এতগুলো শব্দ এলোমেলো বকিয়া যাইতে হইবে। কেন বলুক না—‘জারে কালেমো বেল্। মোরব্বা হজ্‌মী শেল্। কুল কাসুন্দি গেল্॥

“সকের জলপান সাড়ে বত্রিশ ভাজা” ওয়ালা বড় সত্যবাদী। তাহার একটি ভাজা অসম্পূর্ণ বলিয়া সে কথনও তেত্রিশভাজা হাঁকে না। হায়, পৃথিবী যদি এইরূপ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিপূর্ণ হইত।

এখানকার ফিরিওয়ালাদের কাছে প্রায় সকল জিনিষই পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফিরিওয়ালারা ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের বিক্রেয় দুই একটি জিনিষের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়। আর যাহাদের সঞ্চয় অধিক তাহারা কত জিনিষের নাম ধরিয়া চীৎকার করিবে? মহদন্তঃকরণের লক্ষণই অল্পভাষী। এইরূপ একটি বড় ফিরিওয়ালা প্রায় “বিক্রি” বলিয়া ডাকে। কি যে বিক্রয়ার্থ আছে খুলিয়া বলিল না। কিন্তু যাহারা রতন চিনিল তাহারা বুঝিল ইহার নিকট সংসারের অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ আছে।

বিক্রিওয়ালারা সকল ভাষাতেই বিক্রয় করিয়া থাকে। যে যে ভাষাবিদ্ সে সেই দ্রব্য কেনে যথা, ভারতবর্ষীয় আয়না বেচিতে অসিলে কুলকামিনীরাই কিনিবেন। ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া Indian Mirror বলিয়া বেচিলে আবার আপিষের বাবুরা কেনেন। ইংরাজীতে ‘ষ্টেটস্‌ম্যান্’ আসিলে বাবুসাহেব চা খাইতে খাইতে

হাত বাড়াইবেন। কিন্তু তর্জ্জমা করিয়া রাজনীতিজ্ঞ বলিলে কেহই ঘেঁসিবেন না।

আমার বিবেচনায় এখানকার সকলেই ফিরিওয়ালা। যে ভাল করিয়া ফিরি করিতে পারে তাহার খরিদ্দার অনেক লাভও যথেষ্ট। যে একার্য্যে অপারগ বা অপটু তাহার প্রচুর উত্তম দ্রব্য সত্ত্বেও খরিদ্দার নাই। এক জন কালেজে পড়িয়া অনেক বিদ্যার্জ্জন করিয়াছে, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বেশ দখল আছে, কিন্তু সে ভাল ফিরিওয়ালা নহে বলিয়া খাঁটি সোনার পরিবর্ত্তে তাহার সামান্য দুপয়সা রোজগার হয় না। অপর এক জন মূর্খ তাহার মূর্খতা ফিরি করিয়া বেশ দু পয়সা ক্ষৌরি করিতেছে। রায় মহাশয় বলেন ইহার খুব কপাল জোর; আমি বলি ইহার খুব গলার জোর। জোর গলায় যাহা তুমি বলিয়া যাওনা কেন লোকে তোমায় আদর করিয়া ডাকিবে। আবার তাহার সহিত যদি একটু নূতনত্ব মিসাইয়া রকমারি করিতে পার তোমার আর ভাবনা থাকিবে না। একটা ফিরিওয়ালি দৃষ্টান্ত দিয়াই দেখাই।

এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলে ঘরে কিছু নাই, অথচ ১০ টার ভিতর বাজার করিয়া আহার আবশ্যক, নচেৎ পিত্ত পড়িবে। তুমি যদি ভাল ফিরিওয়ালা হও তোমার ভাবনা কি? গামছা কাঁধে করিয়া বিকৃত স্বরে সপ্তমে বলিয়া যাও "গুওর ব্যাটাশালা"। দুই পা না যাইতে যাইতে কোন বড় লোকের অন্দর হইতে ঝি আস্তেব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া তোমায় ডাকিবে ও "কুয়োর ঘটি তোলা"। তুমি একটু চাল চালিলেই দেখিবে তাহাদের তেল মাখিয়া তাহাদের ঘরে স্নান করিয়া আটটি পয়সা ট্যাঁকে করিয়া বাজারের দিকে যাইতেছ।

আমি কতবার ফিরিওয়ালা বলিলাম। ইহাতে পাঠক মহাশয়

বোধ হয় পাঠক মহাশয় রুষ্ট হইতেছেন, কারণ কলিকাতায় এক কথা বেশীবার ব্যবহার করা কুরুচি অথবা পাগলামির পরিচায়ক। পাঠকের নিকট পৌঁছিবার আগে অক্ষর সংযোজক (কম্পোজিটর নাম ধারী ছাপাখানার অন্যতম ভূত) এক দফে নীরবে চটিয়াছেন। এখন ইহার বদলে অপর কথা ব্যবহার করিবার প্রশস্ত সময়। ফিরিওয়ালার কর্ম্মভেদে অনেকগুলি নামান্তর আছে তাহা আমি স্বজ্ঞানে শিখিয়াছি। যাহারা জুড়ি গাড়ী বাড়ী ইত্যাদি ফিরিকরে তাহাদিগকে দালাল বলে। যাহারা বরকন্যা ফিরিকরে তাহারা ঘটক। যাহারা বাক্যসুধা ফিরি করে তাহারা কথক। যাহারা বাক্যবাণ ফিরি করে তাহারা চাটুকার। যাহারা চাকরীর চেষ্টায় ফেরে তাহারা উমেদার—যেমন সম্প্রতি আমি একজন।

এতদুর আসিয়া আমার আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমাতে ফিরিওয়ালাতে অভেদাত্মা জ্ঞান জন্মিল। এখনও চাকরী জুটিতেছে না কেন ?

প্রয়াসে 'চাকরীর বিজ্ঞাপন' বাহির হইয়াছিল। আত্মীয়ের অজ্ঞাতে রায় মহাশয়ের উত্তেজনায় একটা দরখাস্ত করিয়াছিলাম কিন্তু আমার এত এলেম-সত্ত্বেও শুনিলাম আমার অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি আবেদন করিয়াছেন ; তন্মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতার শ্বশুর ও তাঁহার স্ত্রীর বন্ধুর স্বামী যাহাদিগকে সুপারিস করিয়াছেন তাহারাই চাকরীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্বরূপ সম্প্রতি শিক্ষানবিশী করিতেছেন। যদি অতঃপর একজন ফিরিওয়ালা তত্ত্ববিদ্ আবশ্যক হয় রায় মহাশয়ের কেয়ারে আমায় লিখিবেন আমি বেকার আছি। আর এতটা লিখিয়া আপনাদের পাতা পুরাইয়া উপকার করিলাম তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধার্থে আমায় মাসে মাসে এক খানি করিয়া 'প্রয়াস' পাঠাইবেন। ইহা আমার আইন অনুসারে প্রাপ্য। অলমিতি।

সাধারণ শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জাতীয় শিক্ষা জাতীয় ভাষায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। এখনকার যে ছাত্রবৃত্তি মাইনর প্রভৃতি প্রাইমারি স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কোন ফল হয় না। কারণ বাঙ্গালাভাষা বলিয়া যেটুকু সুবিধা হইত তাহা পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্বে হইতে পারে নাই। ৮। ১০ বৎসর বয়স্ক বালক কথনই জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত প্রভৃতি উৎকট বিষয় সকল শিক্ষা করিতে সমর্থ নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গালীরা কেবল মুখস্থ বিদ্যায় পটু। কিন্তু তাঁহারা দেখেন না যে কেন তাহারা মুখস্থ করে। যথন তাহারা বাঙ্গালা বই পড়ে তথন বিষয়ের গুরুত্ব বশতঃ বুঝিতে না পারিয়া কেবল মুখস্থ করে, আর যথন ইংরাজী বই পড়ে তথন ইংরাজী কথায় না বলিলে কেহ বিদ্বান বলিবে না বলিয়া বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ইংরাজী কথা মুখস্থ করিতে বাধ্য হয়। যাহা হউক এইরূপে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ায় কোন ফল হইবে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনে বল সঞ্চার। মনে বল থাকিলে মানুষ শত বাধা অতিক্রম করিয়া উন্নতি করিতে পারে। বাহিরের কার্য্য কেবল অন্তরের তেজ পরিচায়ক মাত্র। বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া যেমন তাহা সাধারণের অনুপযোগী হইয়া বহুল প্রচার হয় নাই, তেমনি তাহা আন্তরিক সাহস জন্মাইতে পারে নাই। কারণ প্রথমে নিজ ভাষায় বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া যতটা পরিপক্কমতি হইলে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার ক্ষমতা জন্মায় আমাদের ততটা না হওয়ায় ইংরাজী কথাবার্ত্তা আমাদের মুখে তেমনি শোভা পায় যেমন দাঁড়কাকের

পুচ্ছে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইয়াছিল। পদে পদে লাঞ্ছিত হইলে কাহারও মন সতেজ থাকে না, সদা ম্রিয়মাণ থাকিয়া ক্রমে হীনবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া যায়।

ইংরাজী সভ্যতা প্রণোদিত উন্নতি গুলি লাভ করিতে হইলে ইংরাজী কথা শিখিলে চলিবে না, ইংরাজী প্রথা শিখিতে হইবে। ইংরাজের প্রধান বল ইংরাজীভাষা। ইংরাজ যতদিন লাটীন গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় কথা কহিতে চেষ্টা করিত ততদিন ইংরাজের জোর হয় নাই; যেদিন হইতে ইংরাজীতে সভ্য সমাজে কথা কহিতে শিখিয়াছে সেইদিন হইতেই ইংরাজ বলবান হইয়াছে। ভাষাই জাতীয় পার্থক্য পরিচায়ক। বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা ভাষায় কথা না কহে, না লেখে, তাহা হইলে তাহার বাঙ্গালিত্ব কোথায় রহিল? আমি দশ রকম ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারিলেও আমার গৌরব বাঙ্গলা লেখার উপর নির্ভর করিবে, কারণ বাঙ্গালা আমার নিজের জিনিষ। মাইকেল মধুসূদন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার ইংরাজী লেখা ইংরাজেরও অনুকরণীয় ছিল; কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইংরাজ সমাজে কেহ তাঁহার নাম ভ্রমেও মনে আনে না কিন্তু বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহাকে চেনে ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে কেন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়াও উচিত নহে। কারণ উভয় ভাষার পক্ষেই এই মহৎ আপত্তি আছে যে তাহারা স্বাধীন চিন্তার উৎপত্তিতে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মায়। যদিও সংস্কৃতের সহিত ইংরাজীর তুলনা হইতে পারে না, কারণ সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা করিলে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতি

ও আবিষ্কার প্রভৃতি শিক্ষার পক্ষে কিছু ব্যাঘাত জন্মিতে পারিত মাত্র কিন্তু ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, ক্রিয়া কলাপ, এবং নিজের ভাষা পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। হইতে পারে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ায় অনেক অধম শ্রেণীর লোক লেখা পড়া শিখিয়াছে যাহারা সংস্কৃত চাল বজায় থাকিলে (সংস্কৃত শিক্ষা করিতে গেলেই সংস্কৃত চাল আপনিই চলিত) লেখা পড়া হয় ত শিক্ষা করিতে পারিত না। কিন্তু তাহাতে দেশের উপকার কি হইয়াছে? তাঁতি, কুমার, কামার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা লেখা পড়া শিখিয়া স্বস্ব জাতীয় ব্যবসায়ের কি কিছু মাত্র উন্নতি করিতে পারিয়াছে? উল্টে ত ঐ সকল ব্যবসায় একেবারে লোপ পাইয়া যাইতেছে। তাঁতিরা ইংরাজী শিখিয়া আপীসে চাকুরী করিতে বা আদালতে ওকালতী করিতে না গিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিদের মত উন্নত প্রকারে কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিলে কি তাহাদের মানের কিছু খর্ব্বতা হইত বা তাহাদের অর্থের কিছু অনটন হইত? কুমারেরা রাণীগঞ্জের পটারি ওয়ার্কের মত কারখানা খুলিলে ভাল হইত, না তাহারা ইঞ্জীনিয়ার হইয়া সেখানে বড় চাকুরী করিতেছে তাহা ভাল? অবশ্য ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া কোন ব্রাহ্মণেতর জাতি কখনও ইহা মনে করে নাই যে যে সকল শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে তাহারা বঞ্চিত ছিল সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা আপন আপন অবস্থা উন্নত করিবে। কিন্তু যদি ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা পাইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল প্রকৃত ভাবে উন্নত না হইয়া থাকে এবং ভারতবাসী জনসাধারণের ইউরোপীয় উন্নতি লাভ করিবার পক্ষে ইংরাজী ভাষার বিশেষ আবশ্যক না থাকে তাহা হইলে ইংরাজী ও আমাদের নিকট সংস্কৃতের ন্যায় মৃত ভাষা

বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ উভয় ভাষাই আমাদের আয়ত্তাধীন নহে।

সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিলে এবং ইংরাজী ভাষাও এদেশের লোকের পক্ষে অনুপযুক্ত স্থির হইলে অবশেষে স্বদেশীয় ভাষাই বাকি পড়ে। স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার বিপক্ষে কি কি যুক্তি দর্শান হইয়াছিল তাহা বলা যায় না কিন্তু ইহা বোধ হয় নিশ্চয় উত্থাপন করা হইয়াছিল যে যদি বাঙ্গালী বাঙ্গলাতে, হিন্দুস্থানী হিন্দিতে, মহারাষ্ট্রীয় মহারাষ্ট্রিতে দ্রাবিড়ী তৈলঙ্গীতে, লেখা পড়া শেখে তাহা হইলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত কথোপকথন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা কাযের আপত্তি নহে। যদি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় নিজ নিজ উন্নতি দেখাইয়া অপর সাধারণের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে এক এক অন্তর্জাতীয় (international) আইনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে ভারত বাসীরাই বা না পারিবে কেন? বিশেষতঃ ঘরের উন্নতি করিয়া তবে পরের উন্নতির দিকে দেখা উচিত। দ্রাবিড়ীতে ও হিন্দুস্থানীতে কিসে মিলিবে তাহার ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি, কিন্তু এদিকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালী ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া যাইতেছে। শিক্ষিতের কথা অশিক্ষিত উড়াইয়া দেয়, অশিক্ষিতের কথা শিক্ষিত ঘৃণা করে।

দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার বিপক্ষে আর এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে সকল ইউরোপীয় উন্নতি শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তদ্বিষয়ে বাঙ্গালাভাষায় পুস্তক নাই। কিন্তু এ আপত্তিও অন্তঃসারশূন্য। এদেশের সর্ব্ব সাধারণের জন্য উপযোগী করিয়া যখন ইংরাজী পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল, তখন কি ইংরাজী পুস্তক

হইতে উন্নত ভাব গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক লেখা হইত না? পুস্তকাভাবে শিক্ষা স্থগিত থাকিত না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'চরিতাবলী' 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি পুস্তক ইহার উদাহরণ স্থল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাতীয় উন্নতি করিতে চাহিলে জাতীয় ভাষার উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা না করিলে আমাদের কি কি দোষ আছে, কি কি অভাব আছে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না। ইংলণ্ডবাসীদের যা অভাব তাহার বিষয়ই কেবল ইংরাজীতে আলোচিত হয় সুতরাং আমরা যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিতে যাই তাহা হইলে তাহাদের অভাব দেখিয়াই লিখিতে হইবে আমাদের অভাব দেখিয়া নহে। হিন্দু সমাজ সংস্কারের ন্যায় অনেক বিষয় আছে যাহাতে ইংরাজ সমাজের আদৌ সহানুভূতি নাই এবং থাকিতে পারে না, তাহা ইংরাজীভাষায় লিখিলে দেশের হাজার করা এক জন লোকের পাঠোপযোগী হইবে, সুতরাং তাহাতে কোন কাযের সুবিধা হয় না। এই নিমিত্ত জাতীয় ভাষার প্রচলন একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষার কুফল হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে ইংরাজী ছাঁদে টেক্‌নিকাল স্কুল, আর্টস্কুল ভেটেরিনারি স্কুল প্রভৃতি নানাবিধ স্কুল স্থাপন করিয়া নানাবিধ ইংরাজী পুস্তক পড়াইলে চলিবে না, যে হেতু এসকল প্রকার স্কুলের ছাত্রেরা পরে কেবল চাকুরী অন্বেষণ করিবেই করিবে। নিজের ভাষায় শিক্ষা না পাওয়াতেই এই দোষ জন্মিতেছে। এই হেতু স্বস্ব দেশীয় ভাষায় যাহাতে সাধারণ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য; ইংরাজী ভাষাকে গৌণ ভাষা (second language) এবং দেশীয় ভাষাকে মুখ্য ভাষা করিয়া

শিক্ষা ও পরীক্ষা সমস্তই দেশীয় ভাষায় হওয়া উচিত। এতদর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও আসামী, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি ও উর্দ্দু, বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল, তৈলঙ্গী ও ব্রহ্ম ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষা করা হউক। বি, এ, ডিগ্রি অবধি কেবল ইংরাজী সাহিত্য মাত্র ইংরাজী ভাষায় পড়ান হউক অন্য সকল বিষয়ই দেশীয় ভাষায় শেখান হউক। তবে এম, এ, আ'ইন, এবং ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ান ও পরীক্ষা ইংরাজিতে যেমন হইতেছে তেমনি হইতে পারে।

আধুনিক শিক্ষার সমস্ত দোষ যে কেবল দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিলেই যাইবে তাহা নহে। বিশ্ববিদালয়ের সংস্কারের সহিত বিদ্যালয় গুলির সংস্কারও আবশ্যক; আধুনিক বিদ্যালয় প্রথার প্রধান দোষ এই যে ইহাতে ছাত্রগণের প্রকৃত তত্ত্বাবধারণ করা অসম্ভব। শিক্ষা অর্থে পুস্তক পাঠ নহে, পুস্তকনিহিত উপদেশানুযায়ী কার্য্য বুঝায়। নম্রতা বিষয়ক অনেক পুস্তক পাঠ করিলেই শিক্ষা হয় না ব্যবহারে নম্রতা দেখাইলেই শিক্ষার পরিচয় দেওয়া হয়। এই প্রকারে উপদেশানুযায়ী কার্য্য শিক্ষার পক্ষে আধুনিক বিদ্যালয় সমূহ সম্পূর্ণ অনুপযোগী। হিন্দু প্রথানুসারে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ বাস করিত এবং এখানকার বিলাতী প্রথানুসারে বোর্ডিংএ ছাত্রগণ বাস করে। এই উভয় প্রথানুযায়ী ছাত্র নিবাস থাকাতে গুরু, শিষ্যের সকল প্রকার কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে সুবিধা পান এবং ছাত্রগণ প্রথম হইতেই সদ্ব্যবহার ও বাধ্যতা কার্য্যে করিতে শিখিয়া ক্রমে সর্ব্ব সদ্‌গুণালঙ্কৃত হইয়া উঠে। আধুনিক বিদ্যালয়ে এপ্রকার শিক্ষা কিছুই হয় না। আবার স্কুলের বাহিরে যে কার্য্য করিবে তাহারও পথ বন্ধ করা হইয়াছে। পুস্তকের তালিকা

এতদূর বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে বালকেরা কেবল মাত্র খাবার ও ঘুমাইবার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সময় ব্যতীত সকল সময়ই পাঠ অভ্যাসে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়। ফলে বিদ্যাশিক্ষায় কলঙ্ক হইয়াছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে যেরূপ অসদ্ব্যবহারান্বিত, ভক্তিহীন, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য উচ্ছৃঙ্খল ও হিতাহিত বিবেচনা বর্জ্জিত লোক দেখিতে পাওয়া যায় তেমন মূর্খদের মধ্যে দেখা যায় না।

এক্ষণে যাহাতে হিন্দু প্রথানুসারে চতুষ্পাঠী অথবা বিলাতী প্রথানুসারে বোর্ডিং স্কুল হয় তাহারই চেষ্টা করা আশু প্রয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু বোর্ডিং স্কুল ব্যয়সাধ্য। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে গেলে বালক প্রতি ১৫৲ টাকা মাসিক খরচ পড়িবে। ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং যদি বোর্ডিং প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বেকার চতুষ্পাঠী প্রথা চালান হউক। মিশনরিরা প্রথমে স্কুল করিয়া চতুষ্পাঠী প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে। তাহাদের অকাতর পরিশ্রমে চতুষ্পাঠীর সকল কার্য্যই তাহাদের স্কুলে সাধিত হইত; তাহারা ছাত্রদিগকে স্কুলে পড়াইত এবং সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ছাত্রদের ব্যক্তিগত কার্য্যের সহায়তা করিত; কিন্তু মিশনরিরা ভিন্ন যখন অন্য লোকেও স্কুল করিতে আরম্ভ করিল তখন লোকে ভাবিল না যে কেবল স্কুলই চতুষ্পাঠির পরিবর্ত্তে যথেষ্ট নহে; ইহার উপর স্কুলের বাহিরে ছাত্রগণের তত্ত্বাবধারণের জন্য যে মিশনরিদের অকাতর পরিশ্রম ছিল তাহাও প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষায় এইরূপে যে বিষ প্রবেশ করিল তাহার জ্বালায় এখন সমগ্র দেশ ছটফট করিতেছে; এখনও যদি ইংরাজী ঢঙে চলিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে আরও

ব্যয় করিয়া বোর্ডিং না করিলে দেশের দুর্দ্দশা রাখিতে ঠাঁই থাকিবে না। এখন শতকরা বার জন মাত্র ইংরাজী পড়িয়া শিক্ষিত হইয়াই মা বাপের, ভাত বন্ধ হইয়াছে, শতকরা ৫০ জন শিখিলে না জানি তাঁহাদের কি দুর্গতি হইবে।

উপসংহারে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা করিতে এবং ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা না পাইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না এই অন্ধবিশ্বাস দূর করিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি প্রার্থনা করি। বিষয়টি যেরূপ গুরুতর তাহাতে ইহার উপযুক্ত পর্য্যালোচনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তবে মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে অতি সামান্য সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে ভাবিয়া আমার এই কিঞ্চিৎ অংশ তচ্চরণে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মানস-পরিণয়।

(১)

বৈশাখ মাস। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। বিল্বগ্রামে মুখোপাধ্যায়দের ছাদের উপর দুইটী বালিকা, শৈলবালা ও হেমলতা, উপবিষ্টা। ছাদ বিস্তৃত, ছাদের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান, পশ্চিমে আম্রকানন অনতিদূরে একটী মন্থরগতি ক্ষীণকায়া নদী। শৈলবালা কুমারী. হেমলতার অঙ্গে বিবাহচিহ্ন বিদ্যমান, উভয়ে সমবয়স্কা। উভয়েই সুন্দরী, ঈষদ্বিকশিত চৈনিক ক্যামেলিয়া ফুলের মত; পরন্তু শৈলবা-

বালার রূপমাধুরীতে কি যেন একটু "ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী" ভাব, যাহা হেমলতার নাই, যাহা রূপসিগণের মধ্যেও অতি বিরল। ছাদের বহির্বাটী সংলগ্ন একটী দ্বারপথে একজন যুবাপুরুষকে আসিতে দেখিয়া দুইটী বালিকাই উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমলতা অগ্রসর হইয়া বলিল "দাদা বাবু ছাদে শুইবেন কি, বালিস আনিয়া দিব ?"

যুবক বলিলেন "আন"।

হেমলতা নিম্নতলে যাইবার সময় বলিয়া যাইল "অমনি মা শুয়েছেন কি না দেখিয়া আসি।"

শৈলও হেমলতার অনুগামিনী হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু তাহার গতিপথে বাধা পড়িল। যুবক তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "শৈল পালাও কেন, হেম এখনি আসিবে। তোমার সহিত আমার দুই একটী কথা আছে।"

শৈল নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ। সে একবার যুবক অনন্তকুমারের মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই অধোমুখী হইল। কিন্তু সেই সরল চাহনি অনন্তকুমারের কাব্যরসাসক্ত জীবনকে তড়িৎবেগে পদ্যময় করিল। তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, যে তাঁহার সম্মুখস্থ ব্রীড়াসঙ্কুচিত মুখখানি অধিক সুন্দর, কি তাঁহার মস্তকোপরি শুভ্রসূক্ষ্ম মেঘাবরণ মধ্য হইতে পরিদৃশ্যমান চাঁদটী অধিক সুন্দর। কিন্তু এ সন্দেহ ক্ষণিকের জন্য, কারণ তিনি চন্দ্রের প্রতি আর চাহিলেন না, তাহার রজতকিরণ-বিভাসিত ধরিত্রীর ঘুমন্ত মুখচ্ছবির দিকেও ফিরিলেন না, এবং নদীর পরপারে এক জন মধুরকণ্ঠে গীতলহরী তুলিয়াছিল, তিনি সঙ্গীতানুরাগী হইয়াও সেদিকেও কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি ও মন সমস্তই শৈলর জ্যোৎস্নাস্নাত মূর্ত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু বোধহয় তন্দ্রামগ্না প্রকৃতির আবেশকান্তি, চন্দ্ররশ্মি ও গীতধ্বনি,

সকলে মিলিয়া শৈল-মূর্ত্তির সহিত যোগ দিল ও অনন্তকুমারকে বিকল করিল। নতুবা যে অনন্তকুমারকে স্নেহময়ী জননীর পঞ্চ-বর্ষ-ব্যাপী অনুরোধ, আত্মীয় স্বজনের উপদেশ, বন্ধুবর্গের যুক্তিতর্ক দ্বিতীয়দার-পরিগ্রহণে সম্মত করাইতে কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই অনন্তকুমার কেন আজ কম্পিতস্বরে শৈলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"শৈল তুমি কি আমাকে চিরসুখী করিবে ? মনে করিয়াছিলাম আর সংসারী হইব না, কিন্তু কয়েক মাস হইল আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তোমাকে সমর্পণ করিতে পারি এরূপ মনোমত পাত্র মিলিল না ; অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার মনের অদম্য আবেগের গতিরোধ করিতে পারিলাম না। আমি জানি তোমার মত বালিকা সংসারে সহজে মিলে না ; আর আমার জীবন মরুময়, ইহাও আমি জানি। কিন্তু মানুষ স্বার্থপর, আমিও সেই মানুষ। আমাকে বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি ?"

অনন্তকুমারের এই অনর্গল বক্তৃতার পূর্ণ মর্ম্ম-বোধ করিতে শৈল সে সময়ে সমর্থা হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সে উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। কারণ সে যেন অধিকতর সঙ্কুচিতা হইয়া গেল।

শৈল চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সে কুলীনব্রাহ্মণ কন্যা। অনন্তকুমারও ব্রাহ্মণ বংশীয়, কিন্তু তিনি কৌলীন্যমর্য্যাদায় শৈল হইতে অপকৃষ্ট স্তরে অবস্থিত। শৈল "নৈকষ্য" তিনি "ভঙ্গ।" শৈলর মাতা অনন্তকুমারের বাটীতে নামতঃ পাচিকা শ্রেণীভুক্তা, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ও তাঁহার কন্যা, অনন্তকুমারের আত্মপরিবারের মধ্যে গণ্য ও তাঁহার বিশেষ যত্নে প্রতিপালিতা। শৈলর মাতা

বিধবা এবং প্রৌঢ় বয়স্কা। তাঁহার আচার ব্যবহারে, তিনি যে তাঁহার অবস্থাতীত উন্নত শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কোন আত্মীয়ের অনুকম্পায় তিনি কন্যার সহিত অনন্তকুমারের লক্ষ্মীমন্ত সংসারে প্রবেশ করিয়া বৎসরাতীত কাল বিল্বগ্রামে বাস করিতেছেন। তিনি এককালীন নিঃসম্বল ছিলেন না ; তাঁহার যে অর্থ ছিল তাহাতে তাঁহার এক প্রকার স্বাধীন ভাবে দিনপাত হইতে পারিত। অনন্তকুমারের আশ্রয় লইবার প্রধান কারণ শৈলর বিবাহ। শৈলই তাঁহার অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলোক, এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি শৈলকে উৎকৃষ্ট পাত্রে দান করেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ অর্থ ছিল না যাহাতে ঐ বাসনা পূর্ণ হয়। তাই তিনি দয়াবান ও ঐশ্বর্য্যশালী অনন্তকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী। অনন্তকুমার শৈলকে সৎপাত্রে বিবাহ দিবার জন্য যথাযোগ্য অর্থব্যয় করিতে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত। অনন্তকুমারের বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে। তিনি শ্রীমান, শিক্ষিত, আদর্শচরিত্রবান এবং গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালী। বর্ষীয়সী জননী এবং একমাত্র ভগ্নী হেমলতা ভিন্ন, তাঁহার নিকটসম্পর্কীয় আর কেহ ছিল না। ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় স্বর্গগত পিতৃদেব তাঁহার বিবাহ দেন, এবং বিবাহের তিন মাস পরেই তাঁহার অপ্রাপ্তযৌবনা পত্নী উদ্বাহবন্ধন উপেক্ষা করিয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। বিবাহের পর আর পতিপত্নীর সাক্ষাৎ হয় নাই। অনন্তকুমার আর বিবাহ করেন নাই। এত দিন তাঁহার মত ছিল, বিবাহ দুইবার হয় না, পরিণয়-সম্মিলন মরণাতীত। এবিষয়ে স্ত্রীপুরুষ একই নিয়মাধীন। কিন্তু শৈল বোধ হয় মেস্‌মার্ সাহেবের শিষ্যা ; যদি বিজ্ঞান প্রতিবন্ধক না থাকিত তাহা হইলে আমরা বলিতাম শৈলর প্রবলতর জৈবচৌম্বক শক্তি অজ্ঞাতভাবে অনন্তকুমারের মতি-

বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। নতুবা আত্মাভিমানী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনন্তকুমার আজ তাঁহার আশ্রিতার নিকট উপযাচক ভাবে দণ্ডায়মান কেন!

শৈলকে মৌনী দেখিয়া অনন্তকুমার বলিলেন "শৈল চুপ করিয়া রহিলে যে, তুমি কি আমায় ভালবাসনা,—আমি কি তবে ভ্রান্ত?"

যদি এই প্রণয়সম্ভাষণ চন্দ্রালোকে না হইয়া, দিনমানে হইত, তাহা হইলে অনন্তকুমার দেখিতে পাইতেন, যে শৈলর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছে, তাহার বিম্বাধর স্ফুরিত হইতেছে। অনন্তকুমার জ্ঞানী হইয়াও "মৌনই সম্মতির লক্ষণ" এই প্রচলিত বাক্যটী ভুলিয়া গেলেন এবং উপন্যাসপাঠানুরাগী নবীন প্রেমিকের চিরপ্রথানুসারে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "শৈল তবে কি তুমি আমার হইবে না?"

এই নির্ম্মম বাক্যে শৈল মাথা তুলিল এবং আর একবার অনন্তকুমারের দিকে চাহিল। যদি দৃষ্টির বাক্‌শক্তি থাকিত তাহা হইলে অনন্তকুমার শুনিতে পাইতেন, যে শৈল মুখরা বলিকার ন্যায় বলিতেছে 'ছি! তুমি এত অরসিক, নিঃসহায়া বালিকাকে কি এত ক্লেশ দেয়, এত দিন দেখিয়া এখনও কি জাননা যে তোমার প্রতি ভালবাসার আমি অন্ত খুঁজিয়া পাই না। আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ ভালবাসি কি না! যদি নয়নহীনা ও হৃদয়হীনা হইতাম, তাহা হইলে ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতাম কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি নিতান্ত নিরুপায়,—আমার কায়মন সমস্ত তোমারই।'

কিন্তু অনন্তকুমারের মস্তিষ্কের তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শৈল-চক্ষুর এই অব্যক্ত ভাষা তিনি যে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ। তবে তাঁহার জ্ঞানশক্তি যে এককালীন অন্তর্হিত হয় নাই, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

কারণ তিনি শৈলরদিকে আর দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অধিকতর সোহাগ ভরে বলিলেন—

"তবে মাকে জানাই, তোমার মার অনুমতি লই,—বিবাহের দিন স্থির করি।"

অনন্তকুমার জানিতেন তাঁহার মতই চিরদিন তাঁহার জননীর মত, আর তিনি ইহাও জানিতেন যে শৈলর মাতা তাঁহার একান্ত পক্ষপাতিনী।

শৈল এইবার প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইল যে সে মূক বালিকা নহে। সে অতি মৃদুস্বরে বলিল "যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন।" উদ্যান হইতে ঝিল্লীকুল হুলুধ্বনি তুলিল, একটী শিবা ভগ্নকণ্ঠে শাঁক বাজাইল। চন্দ্রমা একখণ্ড নীরদবসন টানিয়া যেন একবার মুখ ফিরাইলেন,—অতবড় আকাশে কেবল দুই একটী নক্ষত্র-বালিকা নিষ্প্রভনয়নে চাহিয়া রহিল।

অনন্তকুমার নিজের ভাবে বিভোর। তিনি এইবার বোধ হয় কেবল মাত্র বাক্যালাপে পরিতৃপ্ত না হইয়া একটা কিছু রুচি-বিরুদ্ধ কায করিয়া বিলাতী কোর্টশিপের অবিকল নকল করিয়া ফেলিতেন; কিন্তু হেমলতা ঠিক্ এই সময়ে মস্তকোপাধান হস্তে প্রত্যা-গমন করিয়া বলিল—

"দাদা বাবু এই বালিস এনেছি।" শৈল রক্ষা পাইল।

(২)

অনন্তকুমারের বিবাহের আর, অধিক দিন বিলম্ব নাই। অনন্ত-কুমারের নবঅনুরাগভরা হৃদয় বিজনতা-প্রার্থী হইলেও তিনি তাঁহার মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাটী আত্মীয় কুটুম্বগণে পরিপূর্ণ। সকলেই এ বিবাহে আনন্দিত এবং

পাত্রীর রূপে ও গুণে ছিদ্রান্বেষণ-প্রিয়া স্ত্রীবর্গও মুগ্ধা। অনন্তকুমারের বন্ধুগণ তাঁহার পত্নী-নির্ব্বাচন ক্ষমতার শতকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশীদিগের মধ্যে পরনিন্দারত ও পরশ্রী-কাতর লোকের একেবারে অভাব ছিলনা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্যসভার এক বৈকালিক অধিবেশনে অনন্তকুমারের সমবয়স্ক একজন সঙ্গতিপন্ন যুবক বলিলেন "রাঁধুনীর মেয়ে বিয়ে করে অনন্ত এইবার বনিয়াদি মুখুর্য্যে বংশটার নাম ডোবালে দেখ্‌ছি।" প্রস্তাব কারীর ভ্রাতৃকন্যার পুষ্পোৎসব উপলক্ষে, পাঁচালী শুনিতে ও আনুসঙ্গিক আচারে যোগদান করিতে, হেমলতাকে না পাঠাইয়া, অনন্তকুমার উক্ত আচারঘটিত সমারোহ ব্যাপারের, অস্তিত্বলোপ-বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি অনন্তকুমারের প্রতি বীত-রাগ। আর একজন প্রবীণবক্তা পাত্রীর বয়স ও দারিদ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন অভদ্রোচিত উক্তি করিলেন। ইনি অনন্তকুমারের পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধের সময়, অপ্সরীর্নিন্দিত গণিকার কোকিল কণ্ঠে, হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, অনন্তকুমারের পরলোকগত পিতৃ-আত্মার উদ্দেশে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ছিলেন ; কিন্তু অনন্তকুমার এই সুপরামর্শ অবহেলা করিয়া ঐ কীর্ত্তন কার্য্যে পুরুষ গায়ক নিয়োজনে, আপনার কলাচর্চ্চার ও সৌন্দর্য্যানু-রাগের অভাব পরিব্যক্ত করিয়া ছিলেন। সেই অবধি ইনি অনন্ত কুমারের রুচির চিরবিরোধী। যাহা হউক অনন্তকুমারের স্বপক্ষ দলের প্রাধান্য হেতু, এই সকল মন্তব্য অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষণ অভাবে তাদৃশ স্ফূর্ত্তি পাইল না। এবং বোধহয় যে এই সুশ্রাব্য বচনগুলি অনন্তকুমারের কর্ণকুহর পবিত্র করে নাই, অথবা করিয়া থাকিলেও তিনি ইহাদের উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

গাত্রহরিদ্রার দিন প্রাতে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব গোলযোগ উপস্থিত হইল। পাত্রী এবং তাহার মাতা উভয়েই নিরুদ্দেশ। অনুসন্ধানে জানা গেল যে প্রহরাতীত রাত্রে একজন অপরিচিত পুরুষ ও এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক একটী পীড়িতা রমণীকে লইয়া গ্রামের নদীঘাটে সংলগ্ন একখানি নৌকায় আরোহণ করে। আর কোন সন্ধান নাই। শৈলর মাতৃ ও পিতৃগ্রামবাসী লোকেরা কোন সংবাদই দিতে পারিল না। হারানিধির পুনঃপ্রাপ্তি আশায় অনন্ত কুমারের অকাতর অর্থব্যয়, অদম্য চেষ্টা ও আয়াস, এবং পরিশেষে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ, সমস্তই নিষ্ফল হইল।

(৩)

উক্ত ঘটনার পর চারিমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস। আকাশে জলদাবরণ, সুখতপনের অদর্শনে ধরণীবদন তমোমলিন ও অশ্রুসিক্ত; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। অনন্তকুমার তাঁহার পাঠাগারে অন্যমনে উপবিষ্ট। তাঁহার বাহ্যাবয়বের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে চেনা যায় না। ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একটী মোড়ক দিয়া গেল। তিনি মোড়কটীর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, দুই গাছি স্বর্ণবলয়,—তাঁহারই প্রদত্ত শৈলর অঙ্গাভরণ। তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল, বলয় যুগল ভূমিতে পতিত হইল। তাঁহার চিরাভ্যস্ত স্থৈর্য্য পরক্ষণেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। তিনি মোড়ক, মধ্যে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিয়াই শৈলর মাতার হস্তাক্ষর চিনিলেন। লিপি খানি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"প্রাণাধিক

তোমার নিকটে আমি গুরুতর অপরাধিনী। আমার অপরাধের বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ কত উন্নত ও সদয়

তাহা আমি জানি, তাই আশা করি তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিবে। শৈলর আর অনুসন্ধান করিও না, সে এজগতে নাই। অভাগিনীর দুই বর্ষ বয়সের সময় বিবাহ হয়, তাহার স্বামী এখনো জীবিত। তুমি সধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, কিন্তু এবিষয়ে সমস্ত অপরাধই আমার। শৈল তাহার শৈশব-পরিণয়ের কথা কিছুমাত্র জানিত না। আমার পরলোকগত স্বামী, আমার সম্পূর্ণ অমতে, একটী বিংশতিদার-পরিণীত, নিঃস্ব ও নিরক্ষর নৈকষ্য ব্রাহ্মণের সহিত দুগ্ধপোষ্যা বালিকাকে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করিয়া, কুলীন কন্যার ভাবী বিবাহদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই ঘৃণিত বিবাহে বাধা দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সমস্ত আয়াসই বিফল হইয়াছিল। আমার স্বামী মদ্যপ ছিলেন; পাশব অত্যাচারের ভয়ে আমি নিরস্ত হই। এই বিবাহ আমাদের তীর্থপর্য্যটনের সময় কাশীধামে হয়, এবং এই ঘটনার একপক্ষ পরেই আমার বৈধব্যদশা ঘটে। এই সময়ে আমি একটী দুঃসাহসিক কার্য্য করিলাম। প্রাণাধিকা কন্যার চিরদুঃখ মোচনের জন্য মাতা সকলি করিতে পারে, বিস্মিত হইও না। শৈলর স্বামীকে মাসিক দুইটী রৌপ্যমুদ্রা উৎকোচ-স্বরূপ আজীবন প্রদান করিতে আমি প্রতিশ্রুত হইলে, দরিদ্র ও মাদকসেবী ব্রাহ্মণ এই বিবাহ ব্যাপার গোপন রাখিতে স্বীকৃত হইল। আমি স্বদেশে, পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। শৈলকে আয়তি-চিহ্ন ধারণ করিতে দিই নাই এবং দেশের কেহই এই বিবাহের কথা জানিতে পারে নাই। এক্ষণে বৃদ্ধ পিতাই আমার একমাত্র অভিভাবক হইলেন; স্বামীকুলে কেহই ছিল না। তুমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছ যে আমার পিতা ধনবান ছিলেন; অভাব কাহাকে বলে তাহা শৈলকে জানিতে দিই নাই; এবং তাহাকে সুশিক্ষিতা করিয়া

ছিলাম। আমার পিতার মৃত্যু, ও কিরূপে তিনি ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েন এ সমস্ত তুমি অবগত আছ। কেন তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলাম ইহাও তোমায় স্মৃতিপথে আনয়ন করা নিষ্প্রয়োজন। আমি কৃতঘ্ন নহি, বড় দুঃখ রহিল তোমার অপার দয়ার—যত্নের—স্নেহের প্রতিদান দিতে পারিলাম না। বড় আশা করিয়াছিলাম তোমার সাহায্যে শৈলকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিব; এ বিবাহে সমস্ত পাপের ভার কেবলঃআমারই মস্তকে পড়িত,—শৈলর জন্য আমি অনন্ত-নরক ভোগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। পরে সেইদিন আসিল—এ দুঃখিনীর জীবনে অতুল-সুখ-স্বপ্ন সন্দর্শনের দিন আসিল; যে দিন শুনিলাম তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্বের পাণিগ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প, আমি মনে করিলাম সমস্ত স্বর্গ আমার করতলগত। কিন্তু হায়! বিধাতার এক ফুৎকারে আমার সমস্ত দুরাশা জলবুদ্বুদের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বিলীন হইয়া গেল।

শৈলর স্বামী আমার নিকট হইতে নিয়মিতরূপে অর্থ পাইতে ছিল। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম, সে আমাদের আশ্রয়স্থানের সন্ধান রাখিত। সে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল যে তুমি শৈলর প্রতি একান্ত অনুরাগী এবং তাহাকে বিবাহ করিতে মানস করিয়াছ; তোমার ঐশ্বর্য্যের কথাও তাহার অবিদিত ছিল না। সে স্থির করিল তাহার অর্থাগমের একটী উপযুক্ত অবসর উপস্থিত।

নরপশু কাল বিলম্ব না করিয়া, যে দিন আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, সেই দিন রাত্রিকালে আমার সহিত দেখা করিল। সে পরিচারকগণের নিকট আমার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং বহির্বাটী সংলগ্ন কক্ষটীতে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমি পাষণ্ডের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে এবং অযথা অর্থকামনায় ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি

নাই; কিছু উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিয়া ছিলাম। শৈল ঘটনাক্রমে আমার অন্বেষণে পার্শ্বের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করে। বুদ্ধিমতীর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে বিলম্ব হয় নাই। তাহার অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম সে বিলুপ্ত-চেতনা। কলঙ্ক প্রচার ভয়ে, ত্বরিতপদে আমার গহনা ও সঞ্চিত অর্থের বাক্সটী আনয়ন করিলাম, এবং এক বসনে, সেই ঘৃণ্য নর-পিশাচের সাহায্যে শৈলকে বহন করিয়া, সকলের অলক্ষ্যে আম্র-কাননের দ্বার দিয়া বাটী হইতে নির্গত হইলাম। পরে তাহারই আনীত নৌকায় বিল্বগ্রাম ত্যাগ করিলাম। তখনও আশা ছিল অর্থ প্রলোভনে সেই নির্দ্দয়কে বশীভূত করিব। কিন্তু শৈলই আমার প্রস্তাবের সমূহ অন্তরায় হইল; সে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে স্থির ভাবে বলিল, যে প্রাণ থাকিতে তোমার পবিত্র ভবনে আর সে প্রবেশ করিবে না। বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে সে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছিল তাহা আমার মর্ম্মেমর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অগত্যা তাহাকে লইয়া একটী দূরবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অর্থ পাইয়া শৈলর স্বামী আমার আদেশ মত কার্য্য করিল; কিন্তু হায়! এই উত্তপ্ত বাত্যায় আমার শৈল-কুসুম শুকাইয়া গেল। সেইরাত্রেই তাহার জ্বর হইল, তাহার হৃৎপিণ্ডে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল; সে চারি মাস শয্যাশায়ী ছিল। তাহার বিশুষ্ক বদন, আকুল নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক দৃষ্টি, আমাকে সময়ে সময়ে জ্ঞানহারা করিত। যখন দেখিলাম তাহার জীবনের আর কোন আশাই নাই, তখন মনে করিয়াছিলাম তোমার সহিত তাহার একবার শেষ সাক্ষাৎ করাইয়া দিই। কিন্তু ইহাতেও পাষাণী বাধাদিল,—বলিল, এজীবনে তোমার সহিত দেখা

করিবার তাহার অধিকার নাই। সে তাহাকে আমার প্রতারণার অংশভাগিনী মনে করিয়া কঠিন অন্তর্দাহ ভোগ করিয়াছিল।' কিন্তু শেষ অবস্থায় তাহার মনে শান্তি আসিয়াছিল। গত পরশ্ব দিন প্রভাতসমীরের শীতল স্পর্শ ও বিহঙ্গম-কাকলী তাহার সুষুপ্তিভঙ্গ করিলে সে আমাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, যে যাহাকে ভালবাসে, মরণের পর কি তাহাকে দেখিতে পায় ?" আমি বলিলাম,—"তোমার মত পবিত্রা ও সুশীলার সকল কামনাই ভগবান পরজীবনে পূর্ণ করেন।" শান্তির মধুর হাস্যরেখা তাহার অধর কোণে দেখা দিল, মন্দভাগিনী ঘুমাইল, তাহার সকল দুঃখের চিরাবসান হইল।

আমারও জীবনের কায শেষ হইয়াছে। লোকালয়ে আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না।

শৈলর হতভাগিনী জননী।"

(৪)

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অনন্তকুমার তাঁহার পাঠাগারের পূর্ব্বকথিত স্থানে একাকী উপবিষ্ট। প্রৌঢ়বয়সে তাঁহার আকৃতিতে বার্দ্ধক্যচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। সহসা কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং নবঅরুণছটা সঙ্গে করিয়া একটী হেমকান্তি প্রফুল্লমুখে নবম বর্ষ-বয়স্ক বালক চঞ্চল চরণে তাঁহার নিকটে আসিল। বালক তাঁহার দিকে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "মামা বাবু আপনার চোখে জল কেন ? আপনার হাতে ও কি ?"

অনন্তকুমার ক্ষিপ্রহস্তে শৈলর স্বর্ণবলয়দ্বয় সম্মুখস্থ টেবিলের মধ্যে লুকাইয়া কহিলেন "কৈ কিছুই না।"

বালক প্রশ্ন করিল "আজ নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবেন না?" আর একটী তিন বর্ষ বয়স্ক শিশু এই সময়ে দ্বার দেশে দেখা দিল এবং বলিল "আমি দাব"।

অনন্তকুমার শিশুটিকে ক্রোড়ে করিলেন, বালকটীর হাত ধরিলেন এবং নদীতীরে চলিলেন। এই পুত্রদ্বয় হেমলতার। তাহারা মাতুলের নয়নপুত্তল এবং তাঁহার প্রিয়তম সহচর।

অনন্তকুমার আর বিবাহ করেন নাই। দ্বিতীয়দার-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার মতের পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি যৌবনে যেরূপ বলিতেন সেইরূপ পুনরায় এখনও বলেন, 'জীবনে বিবাহ একবার হয়, দুইবার হয় না।' কিন্তু এক্ষণে বিবাহ শব্দে তিনি তাঁহার জনক-জননী সংঘটিত পরিণয় ব্যাপারকে উল্লেখ করেন, কি, সেই নীলাকাশ-তলে, শশধর সমক্ষে, নয়নে নয়নে, তাঁহার শৈলর সহিত যে হৃদিবিনিময় হইয়াছিল, সেই ঘটনাটী তাঁহার মানসপথে উদিত হয়, তাহা অনন্ত কুমারই জানেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

মর্ম্মকথা।

ঊর্দ্ধে মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ—নিম্নে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী অচল ভাবে নিপতিত—সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে জীবজগৎ পরিভ্রাম্যমান। এই অনন্ত জীবজগতের তুলনায় তুমি আমি কত টুকু ভাই! ঐ দেখ কত আসিতেছে কত চলিয়া যাইতেছে, কত লোক ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে কত লোক পথিপার্শ্বে ক্রন্দন পরায়ণ! কত

লোক আসিয়াছে কিন্তু যাইবার বিলম্ব বুঝিয়া রঙ্গরস বিভোর; কত লোক চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে বিবেচনায় নিরাশায় জীবন্মৃত; শত শত লোক গন্তব্য পথে পদার্পণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে আবার শত শত নরপিশাচ উন্মত্তের ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া পাপের পদে স্বেচ্ছাবিক্রীত হইতে একান্ত যত্নপর!

ঐ দেখ! অগণিত নক্ষত্র নিচয় সুনীল নৈশাকাশে কেমন ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে, প্রস্ফুটিত প্রসূন পুঞ্জের মনপ্রাণহর সুস্নিগ্ধ সৌরভে দিক্ আমোদিত, কেলিপরতন্ত্র বিহঙ্গম গণের সুমধুর স্বর চতুর্দ্দিক কেমন আকুলিত করিতেছে, অমল ধবল তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ কেমন উন্নত মস্তকে চির বিরাজিত! অনন্ত সংসারে কোথাও অনন্ত সুখের প্রবল প্লাবন প্রবাহিত, কোথাও দারুণ দুঃখের ভীষণ দাবানল দাউ দাউ প্রজ্বলিত; কোথাও মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিরন্ন আসন্ধ্যা দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া রিক্ত হস্তে হতাশ হৃদয়ে জীর্ণ কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, কোথাও ঘৃত দুগ্ধ মাখন ছানা পায়স পিষ্টকের অপরিমিত আয়োজনে শৃগাল কুকুরের উদর পূর্ণ হইতেছে; কেহবা জীর্ণ বস্ত্রাভাবে দারুণ শীতে থর থর কম্পমান, কেহবা সুচারু চিত্রিত সুবর্ণ খচিত রাঙ্কব কৌষেয় বাসে বিজড়িত হইয়া বিশালবপুর শোভা সম্পাদনে নিযুক্ত; পর্ণ কুটিরাভাবে কত লোক বৃক্ষতলসার করিয়া শীতাতপের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে, কত লোক বা প্রাচীর বেষ্টিত প্রহরী-রক্ষিত সুরম্য সৌধোপরি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ান রহিয়া বিলাসিতার উচ্চগ্রামে অবস্থিতির পরিচয় প্রদান তৎপর! ফলতঃ সংসার বড়ই রহস্যময় ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা তোমার আমার সাধ্যয়ত্ত নহে।

সংসার অনন্ত, ভাব অনন্ত, লীলা অনন্ত, কর্ম্ম অনন্ত, জীব অনন্ত, যেন

অনন্ত সংসারে অনন্ত কালের জন্য অনন্তের বাজার বসিয়াছে! এ বাজারের সময় নাই, অসময় নাই, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, শীত বাত আতপে এ বাজারের হ্রাস বৃদ্ধি নাই রোগ শোক আধিব্যাধি এবাজারে, বিকিকিনি বন্ধ করিতে পারে না, শত শত উষ্ণশ্বাস, শত শত কাতর ক্রন্দন, শত শত মর্ম্মপীড়া—অশ্রুপ্রবাহ—দীনদৃষ্টি—সজল নয়ন এ বাজারের বিশাল বক্ষে নিশিদিন দৃষ্টি গোচর হইলেও এ বাজার অবিচলিত অক্ষুণ্ণ থাকে। কাহার সাধ্য এ বাজার ভাঙ্গিতে পারে! কাহার ক্ষমতা এবাজারের নিয়ম ভঙ্গ করে!!

এই অনন্ত ভবের বাজারে তুমি আমি কি জন্য আসিলাম বলিতে পার কি? কোন্ মহান গূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য আসিয়াছি চিন্তা করিবার অবসর অনুসন্ধানের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছ কি? ধনিন্! তুমি কি ধনমদে উন্মত্ত হইয়া ধরাকে সরার ন্যায় বিবেচনা করিয়া কাঙ্গাল কুলকে ক্রন্দন করাইবার জন্যই জগতে আসিয়াছ? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিভূষিত পুরুষপুঙ্গব! তুমি এমন স্ফীত বক্ষে সগর্ব্বে সদর্পে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া আমাকে—দীন হীন আমাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিলে কেন? দীন আমি যে তোমারই সম্মুখে তোমারই আদেশে যদৃচ্ছালাঞ্ছিত হইলাম, কেন? দীন দেখিয়া কি দয়া হয় না; কাঙ্গাল কুলের কোটরগত জ্যোতিঃহীন চক্ষুর উষ্ণঅশ্রু কি তোমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারে না? হে সুখ সম্ভোগ নিরত বিলাসি! তুমিও আমার দীনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হওনা কেন বলিতে পার কি? তুমিও মানব, আমিও মানব অভিধায় অভিহিত; যাঁহার অপার করুণা বলে তুমি জগতীতলে আসিয়া রঙ্গরস বিভোর ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছ তাঁহারই করুণা-কণায় আমিও মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দীনতায় দিনযাপন করি-

তেছি। যে পরম পিতার আদেশে আজ তুমি মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতি-পত্তি আত্মীয় স্বজন দাস দাসী পরিবেষ্টিত, তাঁহারই অব্যর্থ আদেশে আমি এইরূপ কাঙ্গাল বেশে সহায় সম্পদ হীনাবস্থায় দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে দিবানিশি পরিভ্রমণ করিতেছি। তুমিই যে তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী আর আমি যে কেহ নহি ইহা মনে করিও না। সুতরাং আবার বলি রাগ করিও না ভাই! তুমিও মানুষ আমিও মানব নামে পরিচিত তবে পার্থক্য এই যে তুমি সুখের ভাগী, আমি দুঃখের অধিকারী, তোমার চক্ষে আনন্দাশ্রু, আমার বিশীর্ণ বদনের বিবর্ণ চক্ষে দুঃখের জল দিবানিশি ঝরিতেছে! তোমার অত্যল্পমাত্র শোকে কত লোক কত প্রবোধ দেয়, শোকাপনোদনের জন্য কত উপায় অবলম্বন করে, আর আমার পুত্রকলত্র বিয়োগেও কেহ "আহা" করিবার নাই, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আমি নিঃস্ব দুঃস্থ আমি মানব নামের অযোগ্য শ্রষ্টার সৃষ্টি বহির্ভূত?

তুমি বলিতে পার, কর্ম্মফলে তুমি সুখসাগরে সন্তরণ পরায়ণ আমি দুঃখের দারুণ দাবদাহে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি ও অভাবের মর্ম্মভেদী অবসাদে একান্ত অবসন্ন; কর্ম্মফলে তুমি রাজা আমি তোমার প্রজা, তুমি ধনী আমি নির্ধন। কৃতকর্ম্ম ফলে তুমি সুখের অম্লান জ্যোৎস্নায় নিমজ্জিত, আর আমি দুঃখের পূতিগন্ধ পরিপূরিত চিরঅন্ধকার সমাচ্ছন্ন নিরয়ে নিমগ্ন; ইহা ঠিক্, কর্ম্মফলে মানব সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দের অধিকারী ইহা সঠিক্ বলিয়া সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বলত ভাই! একবার বুকে হাত দিয়া পরমপিতার মহান্ নাম লইয়া শপথ করিয়া বলত ভাই! সেই কর্ম্মফল বিচার করিবার তুমি কে? তোমার কি অধিকার আছে? যিনি কর্ম্মফলের বিচারক সে বিচার তিনিই করিবেন, তুমি কেন তাহা বলিয়া

উপহাসাস্পদ হইতে অগ্রসর হও? সুতরাং যেদিন দেখিব তুমি আমাকে মানব মনে করিলে—যে দিন বুঝিব তুমি আমাকে তোমারই ভ্রাতা বলিতে ইচ্ছুক হইয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার অধিকারী হইলে সেই দিন বুঝিব তুমিই প্রকৃত বড়—প্রকৃত মহৎ—প্রকৃতই মানব! নতুবা আমার এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হৃদয়ে কি এ চিন্তা উদিত হওয়া অন্যায় যে "আমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" কিন্তু আমার ভাগ্যগুণে কি তুমি আমাকে আমার ন্যায় দীনহীনকে মানব বলিতে সাহসী হইবে?

আমি দীন বলিয়া তুমি আমাকে দেখিলে ঘৃণা কর, মনুষ্য মধ্যে নগণ্য বলিয়া উড়াইয়া দেও, ভাই! ইহা তোমার কোন্ বিবেচনার কার্য্য? তুমি ত সভ্য—শিক্ষিত—সংস্কৃত—মার্জ্জিত, দীন দেখিলে উপেক্ষা করিতে হয় ইহা জগতের কোন্ অভিধানে লিখিত আছে? দীনগণকে পায়ে ঠেলিয়া আত্মাভিমানীর আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয় শুনিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। তুমি ধনী বলিয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছ সত্য; খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রসারতা নিবন্ধন সমাজের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত সত্য, কিন্তু তোমার সমাজ কি আমার সমাজ নহে? তোমার সেই মানবসমাজ কি আমাকে দূরে রাখিতে পারিয়াছে? যদি বল আমাকে লইয়া আমার ন্যায় অভাবনিষ্পেষিতকে লইয়া সমাজ নহে তবে আমি কি বলিতে সাহস করিতে পারি না যে তোমার সমাজ অপূর্ণ তোমার সামাজিকতা অপূর্ণ আর সেই সঙ্গে তুমিও অপূর্ণ হইয়া আপনাকে পূর্ণত্বের রত্ন সিংহাসনে সমাসীন করিতে সর্ব্বথা যত্নপর। হইতে পারে আমার ধন নাই মান নাই বিদ্যাবুদ্ধিরও সম্পূর্ণ অভাব কিন্তু এই বলিয়া তুমি আমাকে মানবসমাজ বহির্ভূত করিতে চাও কেন তাহা আমার এই সংকীর্ণ হৃদয়ের ধ্যান ধারণার বহির্ভূত।

ভাগ্যগুণে তুমি বড় হইয়া অতুল ধন সম্পত্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি মান সম্ভ্রমের অধিকার লাভ করিয়াছ, আর আমি অদৃষ্টদোষে দৈববিড়ম্বনায় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তিরস্কার অবমাননা সহ্য করিতেছি। চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়ে তোমার বিশাল উদর পরিপূরিত আর আমি প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও খোসা ভূষি দ্বারা নিদারুণ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতে একান্ত অপারক। তাই বলিয়া কি আমাকে এত ঘৃণা করিতে হয়, এরূপ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে হয়। মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একজন দীনহীনকে পায়ে ঠেলিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করা কি মানবের উচিত? বুঝিলাম না ধনিন্! তুমি কোন্ বিজাতীয় মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত—কোন্ প্রাণে, মানব হইয়া মানবকে এরূপ নীচতায় নিমগ্ন করিতে চাও—কেমন করিয়া একজন অনাহারক্লিষ্ট শুষ্ককণ্ঠ কাতরপ্রাণ কাঙ্গালকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছ।

আর একটি কথা—তোমাকে ধনী বলে কে ভাই! তোমাকে মানী বলিবার কয়জন আছে—আর কয় জনই বা যশোগরিমায় তোমার বক্ষকে গর্ব্বোন্নত করিতেছে। তোমার ন্যায় যাহার ধন আছে মান আছে সহায় সম্পদ গাড়ী জুড়ী আছে সে কি তোমাকে ধনী বলে? কখনই না—তুমি তাহার সমশ্রেণীর লোক সুতরাং তাহার নিকট তোমার খাতির যত্ন আদর অতীব অল্পই। তোমার যে এত "নাম" সে কেবল আমারই জন্য; দীন আমি তোমাকে রাজা বলি, ধনী বলি, প্রভো! বলিয়া সম্বোধন করি, "হুজুর হুজুর" করিয়া তোমাকে শূন্যগর্ভগর্ব্বে উন্নত করিয়া তুলি।

দীন দুঃখে কাতর হইলে কি মানীর মান হানি হয়? কাঙ্গাল কুলের উষ্ণশ্বাসে কর্ণপাত করিলে ঘৃণিত হইতে হয়? না—নিঃস্ব দুঃস্থ

বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করিলে লোকে হেয় জ্ঞান করে? আত্মোদর পূর্ণ-করাকেই যিনি জীবনের সার সর্ব্বস্ব বিবেচনা করেন তাঁহার ন্যায় মনুষ্যত্ব হীন দৃষ্টিশক্তি বিরহিতের কথা বলিতেছি না। যিনি মানব পদ বাচ্য মানব, হৃদয় যাঁহার দেবভাবাপন্ন, অন্তর যাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সুশোভিত, প্রাণ যাঁহার পরোপকারোৎসর্গীকৃত তাঁহার সেই নরদেবতার নিকট ছোট বড় নাই, ধনীনির্ধন নাই, সুন্দর কুৎসিত আত্মপর নাই; তিনি সকলকেই আপনার বলিয়া জানেন, সকলকেই আপনার করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার—সেই নরশ্রেষ্ঠের প্রশান্ত উন্নত হৃদয় দীন দুঃখে সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত থাকেন। ইঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য—ঈদৃশ নরদেবতা এই স্বার্থপূর্ণ সংসারে আজকাল অতীব বিরল।

পুণ্যভূমি ভারতভূমি যে চিরদিনই কঠোর নির্দ্দয় ব্যবহারে কাঙ্গাল-কুলেকে মর্ম্মাহত করিত তাহা নহে; ভারতের পবিত্র ভূমিতে যে চিরদিনই আত্মোদর পূরক স্বসুখনিরত পুরুষপ্রবরগণ জন্মজীবন লাভ করিয়া আত্মোদর পূর্ণ করতঃ সংসারলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে। তবে যেদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারত-বাসীর শিক্ষণীয় হইয়াছে বিলাসিতা বিষম বেগে বিস্তৃতি লাভ করিয়া ভারত সন্তানের অস্থি মজ্জায় বিজড়িত হইয়াছে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অধর্ম্মস্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্য প্লাবিত করিয়াছে সেই দিন ভারত বাসীর ঘোর দুর্দ্দিন! আর সেই দিন হইতেই ভারতবাসী বাক্‌সর্ব্বস্ব বলিয়া পরিচিত হইতেছে সেই দিন হইতেই ধর্ম্মের নামে ঘোর ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে পরোপকার শব্দ ভারত হইতে পলায়নপরায়ণ হইয়াছে—দীন হীন অনাথ আতুর পথের কাঙ্গালের মুষ্টিভিক্ষাও সেই দিন হইতেই বন্ধ হইয়াছে। সেই

জন্যই বলিতেছি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পরোপকারী দীন দুঃখ কাতর পুরুষপুঙ্গবের আবির্ভাব হয় না। নিঃস্বার্থ পরোপকার শব্দের সদ্ব্যবহার এখন অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন! ফলতঃ ভারতভূমি এখন আর কর্ম্মভূমি নহে বাক্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং যাঁহারা দেশের মাননীয় তাঁহারাও কেবল কথা লইয়া বাক্ বিতণ্ডা করিয়া সভাসমিতিতে করতালি প্রদান করিয়া আর টেবিল চাপড়াইয়া ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। রাগ করিও না ভাই! ধনী তোমরা আমাদের সহায় সম্বল, জ্ঞানী তোমরা আমাদের ন্যায় হীনের আশ্রয় স্থল! তোমরা যদি আমাদের না দেখিবে রক্ষা না করিবে তবে আর ভারতের কাঙ্গাল কুলের কে আছে! তাই আজ করজোড়ে কাতরকণ্ঠে তারস্বরে বলিতেছি ভাইরে! যাহাতে দয়া, দীন-বৎসলতায় প্রিয় নিকেতন ভারতের পবিত্র নাম সংরক্ষিত হয়, পুণ্যভূমি ভারতভূমির স্নেহ বাৎসল্য, বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভারতের সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইয়া জন্মভূমি ভারতের চিরসম্মানিত নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। কেবল অনুকরণ প্রিয়তার বাহ্যিক চাকৃচিক্যে ও বিলাসিতায় মজিয়া জাতীয় জীবনে কলঙ্ক আরোপিত করিও না।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

ঘোড়ামারা—রাজসাহী।

ফুলের সাজি।

সৈনিক-পুরুষ।

(১)

ওই বাজে রণভেরী !
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই,
বিদায় হৃদয়েশ্বরী ;
ওই বাজে রণভেরী !
শেষ বিদায়ের দাও আলিঙ্গন,
মুছ আঁখি বারি, দাওগো চুম্বন,
বিদায়ের শেষ স্মৃতির লিখন,
মুদ্রিত হোক অধরে ;
মুহূর্ত্তেক পরে তোমাতে আমাতে,
কত শত দূরে হইবে থাকিতে,
উভ অদৃষ্টের সুকঠিন পাতে,
কি লেখা আসিবে ঘুরে।
ফিরায়োনা মুখ, ঢেকোনা অঞ্চলে,
হ'য়েছে সময়, রয়েছে সকলে
আমা তরে, ওগো ওই পথ চেয়ে ;
ভাবে কেন মোর দেরী ;
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই
বিদায় হৃদয়েশ্বরী ;
ওই বাজে রণভেরী !

(২)

বড়ই কঠিন সময় এ বটে,
কর্ত্তব্যের কিন্তু আদেশ নিকটে ;
বিদায় ! বিদায় ! ভুলোনা সঙ্কটে,
যতদিন দেহে প্রাণ ;
গরীয়সী যিনি স্বরগ হইতে,
'জন্মভূমি,' মোরে এসেছে ডাকিতে ;
রাজরাণী দেছে শিরোপা শিরেতে,
রাখিতে দেশের মান।
কেন তুমি কেঁদে আকুলিতা বালা !
মুছে ফেল দূরে হৃদয়ের জ্বালা,
ধর দৃঢ় করে ওবরণ ডালা,
বাজাও শঙ্খ ফুঁকারী ;
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই
বিদায় হৃদয়েশ্বরী ;
ওই বাজে রণভেরী !

(৩)

সরল হৃদয়ে ভালবাসা দিয়ে,
হ'য়েছ নিশ্চিন্ত পুরুষে অর্পিয়ে,
চাহ নাকি তারে 'পুরুষ' দেখিয়ে
লভিতে চরম সুখ ?
কর্ত্তব্য বিহীন কর্ম্মচ্যুত হ'য়ে,
কাপুরুষ যত সংসারেতে জীয়ে,
তা'র সাথে নিজ পতিরে মিশায়ে
কেন গো বাড়াও দুঃখ !
জয়যুক্ত হ'য়ে আসিব ফিরিয়া,
হৃদয়ে ধরিব এমনি করিয়া,
অথবা প্রান্তরে আত্ম-বলি দিয়া,

পশিব স্বরগ-পুরী ;
পদাতি, আরোহী, ব্যাকুল সবাই
বিদায় হৃদয়েশ্বরী ;
ওই বাজে রণভেরী
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ম্যাকবেথ পাঠে।

ঘোর দুরাকাঙ্খা—ভাল দেখাইলে কবি!
কিরূপে প্রলুব্ধ করে ক্ষীণদৃষ্টি নরে—
কুমতি ডাকিনী বেশে করে অঙ্কুরিত
বিষবৃক্ষ ধীরে ; কুটিলা কামিনী করে,
সিঞ্চিয়া উৎসাহ বারি, সে তরু বর্দ্ধিত।
কুআশা কুয়াশা সম ঢাকি' জ্ঞান-রবি
দেখায় সে বৃক্ষে দোলে ফল মনোহরা—
মনোহরা, কিন্তু হায় অন্তর্বিষ ভরা
দেখেও দেখেনা নর মুগ্ধ ভাবী সুখে ;
নাশে প্রতি প্রতিবন্ধ নেহারি সম্মুখে,
দুষ্কৃতির পর পর দুষ্কৃতি আচরি
বধবধি তীক্ষ্ণ বিষ হৃদয় জর্জ্জরি,
ভেদিয়া মরম স্থান মস্তিষ্কে না পশে—
জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি আদি লুপ্ত হয় শেষে॥
শ্রীগিরিশচন্দ্র নাহা।

স্মৃতি।

সুখের বসন্ত গিয়াছে চলিয়া
বিশুষ্ক কানন রয়েছে পড়ি ;
কোকিল ঝঙ্কার হয়েছে নীরব
প্রতিধ্বনি বনে ফিরিছে ঘুরি
পড়েছে ঝরিয়া সাধের কুসুম
সৌরভ রয়েছে এখনো তা'র ;
রয়েছে আজিও শুষ্কফুল দল
ছিঁড়িয়া গিয়াছে প্রণয়-হার।
ডুবেছে তপন পশ্চিম গগনে
রয়েছে কোমল রক্তিম ভাতি ;
সুখ শান্তি গেছে জন্মের মতন
পোড়া প্রাণেতবু রয়েছে "স্মৃতি।"
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

শিশু।

মোমের পুতুল ওই খেলিছে সম্মুখে
উঠিতেছে পড়িতেছে বিভোর কৌতুকে।
মরুময় সংসারের ক্ষুদ্র জলাশয়,
শোক পূর্ণ পৃথিবীর আনন্দ আলয়।
কি মধুর হাসি আছে তোমার আননে,
কি স্নিগধ জ্যোতিঃ আছে সুন্দর নয়নে।
দেহ বদ্ধ সরলতা ধরায় উদিত,
বিমোহন ছবি হেরে সবে পুলকিত।
কল্পনার তুলি দিয়ে অঙ্কিত ওকায়া,
সদা আনন্দিত নাহি বিষাদের ছায়া।
নাহি শোক নাহি হিংসা সদা মুখে হাসি
ও মোহন হাসি হেরে আনন্দেতে ভাসি।
হাসি হাসি মুখে কভু বিষাদের রেখা,
অকস্মাৎ কোথা হোতে যদি দেয় দেখা,
প্রশান্ত সলিল মাঝে তরঙ্গের প্রায়
ক্ষণ কাল দেখা দিয়ে তখনি মিলায়।।

সুখ আশে সহে লোক কত যে যাতনা,
তবহাসি লাভ তরে কেহত কাঁদেনা।
হেসে হেসে শিশু তুই নাচ বারবার,
দুঃখময় ধরাতল হাসুক আবার।
শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী।

মধ্যস্থ।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, হয়ে গেছি নিশিদিন ধরি'
নয়ন ও মরমের বিচারি বিবাদ;
যুক্তি সব ফুরায়েছে মিটাইতে গিয়া
ক্ষুদ্র এক প্রাণী লয়ে চির বিসম্বাদ;
অবসন্ন হৃদয়ের নয়ন যুগল,
যাপি তাহাদের তরে নিদ্রাহীন রাতি,
বিরাম নাহিক তবু; তুচ্ছ কথা ল'য়ে
তবু তারা সারাদিন রহিয়াছে মাতি।
সৌন্দর্য্য কমল রূপে কেন তুমি সখি!
এসেছিলে নন্দনের নিকুঞ্জ হইতে,
প্রাণের আঁখির কাছে দেখা দিয়াছিলে,
অমল শিশির সিক্ত অরুণ প্রভাতে!
কেন তুমি আবেশের প্রথম স্বপনে,
ফুটেছিলে দীন এক হৃদয় কাননে।
শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

নিন্দুক।

আপন রসনা কর শাসন
নিজ প্রতি দৃষ্টি রাখ অনুক্ষণ,
নিন্দুক আপনি সুখ না পায়!
অনর্থক দেয় পরেরে বেদন
অবিশ্বাস তা'রে করে সর্ব্বজন,
অবিশ্বাসী পাপী নিজে হয়!

পর চক্ষে অশ্রু করিলে পাতন,
আপন হৃদয়ে লাগে সে বেদন
তারদুঃখে দুঃখী কেহ না হয়।

পৃথিবীতে ভাল বাসে না তাহারে,
ঘৃণার নয়নে সকলে নেহারে,
ঘৃণিত জীবন তার ধরায়।
শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

নীরবে

আমি নীরবে এসেছি, নীরবে যাইব,
নীরব জগৎ বাসিব ভাল;
নীরব নিশীথে, নীরবে বসিয়ে,
আঁধার হৃদয়ে জ্বালিব আলো।
নীরব প্রান্তরে যাইয়া নীরবে
নীরব সুরেতে গাহিব গান,
সঙ্গীতের স্রোতে অনন্ত বিমানে
ভাসাইয়া দিব আপন প্রাণ।
আমি, নীরবে হাসিব নীরবে কাঁদিব
নীরবে খেলিব আপন মনে,
নীরব ভাষায় প্রাণ খুলে কথা
কহিব নীরব প্রকৃতি সনে।
নীরব নয়ন নীরবে মুদিব
নীরবে ফেলিব আঁখির জল,

যদি দেখে কেহ ক্ষতিনাই তায়
নীরব অশ্রুই অবলাবল।
শ্রান্ত জীবনের নীরব বেদনা
যদি কেহ কভু শুনিতে চায়,
কাহার(ও) কথায় দিবনা উত্তর
হইয়া থাকিব বধির প্রায়।
শ্রীমতী চঞ্চলাবালা দাসী—বর্দ্ধমান।

কত দূর?

দিয়ে আশা, ভালবাসা কেমনে ভুলিলে?
দিয়ে আশা, আশানাথ! কেন পাঠাইলে?
'ছাড়ি' তব পদ-প্রান্ত
হয়েছি হে পথ-ভ্রান্ত,
পথি-শ্রমে হ'য়ে ক্লান্ত ভুলেছি তোমায়;
কেন বল ওহে নাথ! পাঠালে আমায়?
আগে যদি জানিতাম,
নাহি পদ ছাড়িতাম,
প্রলোভনে নাহি মোরে ভুলাতে পারিতে,
এ দীনে চরণে স্থান হ'ত নাথ দিতে।
ভাবিলাম কত সুখে র'ব নিরন্তর,
কত সুখে সুখী সদা রবে এ অন্তর;
সে সুখ-স্বপন হায়!
চলি' গেছে নিরালায়,
কল্পিত সুখের জ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিল;
এত যে আশা দিলে কিছু না মিটিল!
বৃথা আশে আশ্বাসিত,
হয়ে ছিল ভ্রান্ত চিত,
প্রায়শ্চিত্ত নিরাশায় হয়েছে তাহার;—
বৃথা প্রলোভনে মুগ্ধ হবে না সে আর।
সুদূর শৈবালময় পথে অবিরত
চলিতে স্খলিত পদ, থাই থতমত;
ভাবি—যাব তাড়াতাড়ি,
এই উঠি, এই পড়ি,
পথের নাহিক শেষ—অসীম অপার;
প্রতি পদে খসে পদ এ পথে আবার!
তাই বলি, ওহে পিতঃ!
বিষম সংসার-পথ
এপথে তোমার মন্ত্র থাকে কি এমনে,
এখন বলহে নাথ! তরিব কেমনে?
নাহি হেরি এবে আমি কোনও উপায়!
অনুতাপে অনুদিন দগ্ধ প্রাণ হায়!
এবে দেব, যাহে তরি,
তব ও পদ বিতরি;
কর তা'র—অভাগার উপায় বিধান;
নতুবা ফিরায়ে লও তোমার এ প্রাণ।
বলহে কমলাকান্ত!
আমি বড় পথ-শ্রান্ত,
তোমার আজ্ঞায় দেব! ঘুরেছি প্রচুর;
আরো কত আছে বাকী? বল, কতদূর?
শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়—কোন্নগর।

হেমন্ত বর্ণন।

আইল হেমন্ত ঋতু ধরাতল মাঝে;
ধরণী সাজিল পুনঃ অভিনব সাজে।

শুকাইল নদীনদ লুকাইল ঘন ;
দিন দিন হিমময় হয় সমীরণ।
অন্ধকার করি' পড়ে নিশিতে শিশির ;
হেম তনু হৈমান্তিক নোয়াইল শির।
চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের তেজ হ'ল হীন ;
প্রায় ঘরে ঘরে সবে পীড়ার অধীন।
ফল হীন ফুল হীন তরু গুল্ম লতা ;
হেমন্ত হরিল শরতের মধুরতা।

শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ—গোবরহাটী।

এমায়া কেমন।

যে গেল—সে চ'লে গেল কোথা ?
এলনাত কভু ফিরে আর।
রেখে গেল ঘোর মর্ম্মব্যথা !
হাহুতাশ শোক যন্ত্রণার !
সংসারের এত যে মমতা,
এতই যে প্রেম-আলাপন,
নিমেষে সকলি ভুলে গেল !
কেটে গেল প্রাণের বাঁধন !
এত কান্না মাথা কুটা কুটি,
এলনা এলনা ফিরে আর।
গেল কোথা? পশেনাকি সেথা-
সংসারের এত হাহাকার ?
জনকজননী স্নেহাদর
প্রিয়া-প্রেম মধুর মিলন ;
প্রাণ পুতলির আধ হাসি
মনে সেথা পড়েনা কখন ?
সংসারের এই অভিনয় !
তবু কেন—তবু কেন মন
মায়া ফাঁস কাটিতে না পারে ?
সংসারের এ মায়া কেমন ?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।
মহিষাদল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চিতোরের কোন রাজ্ঞী খ্যাতা ইতিহাসে,
প্রভাতে তপনকরে কি ফুল বিকাশে ?

—পদ্মিনী।

কি না হ'লে বাঙ্গালীর ভোজন না হয়,
কি ভুলিলে সতরঞ্চে স্থির পরাজয় ?

—চাল।

* * *

স্বামী—পুরুষে জীবনে দুইবার স্ত্রীলোকের স্বরূপ আদৌ বুঝিতে পারে না।

স্ত্রী—সত্যি নাকি ? কখন্ কখন্ ?

স্বামী—বিবাহের পূর্ব্বে আর বিবাহের পরে।

* * *

মানুষের খোলস্—বিশ্ব স্রষ্টার এই বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে কত যে অদ্ভুত জীব আছে তাহার ইয়ত্বা নাই। আমেরিকায় মণ্টিএল প্রদেশে প্রাইস নামকএক ব্যক্তি বাস করেন। যেমন সরীসৃপেরা মধ্যে মধ্যে গাত্রচর্ম্ম ত্যাগ করে তদ্রূপ এই ব্যক্তি জন্মাবধি প্রতিবৎসর একবার করিয়া নিজদেহের খোলস্ ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার বয়স এখন প্রায় ৪৪বৎসর। ছয়মাসের শিশু অবস্থায় ইঁহার মাতা প্রথমে এই ব্যাপার লক্ষ্য করেন, সেই অবধি প্রতি বৎসর ২৪শে জুলাই তিনি গাত্রচর্ম্ম উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারেন। প্রথমে তাঁহার বিবমিষা হয় ও ত্বকের স্পর্শ অনুভব শক্তি লোপ পায়। ক্রমে চর্ম্ম লোল হইয়া পড়ে। তার পর তিনি কব্জির চারিধারে ছুরিদ্বারা মণ্ডলাকারে কাটিয়া দেন এবং একটি পেন্সিলের সাহায্যে দস্তানার ন্যায় ছালাখানি খুলিয়া ফেলেন। মুখ মণ্ডল এবং দেহের অপর স্থান হইতেও ঐ প্রণালীতে খোলস্ ছাড়ান হয় কেবল মাথা হইতে মরা-মাসের ন্যায় উঠাইতে হয়। খোলস্ উঠিবার পর প্রায় দুই সপ্তাহ গাত্রের কোমলতা প্রযুক্ত শয্যাগত থাকিতে হয় সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে একবার ত্বক্‌মোচন করিলে সেখানকার ডাক্তারেরা খোলস্‌টা যত্ন করিয়া আদত রাখিয়া দিয়াছেন। হাতের খোলস্ অবিকল দস্তানার ন্যায় এবং দুইজন লোক সবলে উহাকে টানিয়া ছিঁড়িতে পারে না। তাঁহার নয় বৎসরের একটি কন্যা আছে সে কিন্তু এরূপ রোগগ্রস্থ নয়। এবং

তাঁহার নিজেরও ইহার দরুণ বিষয় কর্ম্মের কিছু ক্ষতি বা শরীরের অসুখ নাই। কত শত ডাক্তারে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু কেহ ইহার কারণ নিরাকরণে সমর্থ নয়।

* * *

চুম্বন কাহিনী—দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত প্যারাগেতে (Paraguay) একটী অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। যে কোন স্ত্রীলোকের সহিত পরিচয় হইবে তাহাকে চুম্বন করিতে হয়। ইউরোপের রোমানিয়া (Roumania) প্রদেশে প্রতি বৎসর এক মেলা হয় তাহাতে চুম্বন করিবার সাধ সকলেই পুরাইয়া লয়। রুসিয়াতে (Russia) নিয়ম আছে Easter দিনে প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবাধে চুম্বন করিতে পারে।

* * *

পক্ষী বাজি—জাপানের অন্তর্ব্বর্ত্তী নাগাসাকিতে এক বাজীকর পক্ষীর স্বরূপ আতস বাজীতে প্রস্তুত করিতে পারে। তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ জীবন্ত পক্ষীর ন্যায় আকাশ মার্গে বিচরণ করে ও জীবন্ত পক্ষীর অনেক অঙ্গভঙ্গীর অনুরূপ ভঙ্গী করে। চারিশত বৎসরের অধিক সময় অবধি সেই বাজীকর পরিবারের প্রত্যেক বংশের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ঐ অদ্ভুত পক্ষীর নির্ম্মাণ কৌশল শিখিয়া আসিয়াছে।

* * *

শিশু। বাবা, দুটো পয়সা দাও না, বরফ কিন্‌বো, বড় গরম বোধ হচ্ছে।

পিতা। গরম বোধ হয়ে থাকে ত বরফ কিনে বাজে পয়সা নষ্ট

করবার দরকার নাই, আর আমার কাছে আয়; এমন ভূতের গল্প বল্‌বো যে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

* * *

ধূমহীন তামাক। একদুষ্ট বালক তামাসা করিবার জন্য কোন চুরুট ওয়ালার দোকানে গিয়া বলিল "ধূমহীন তামাক তোমার দোকানে পাওয়া যায় কি?" দোকানদার অপ্রতিভ না হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "যথেষ্ট", এবং এক বোতল নস্য বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল।

* * *

'কালা নাম ঘুচিবে'। এক জন বিখ্যাত অষ্ট্রীয়ান ভ্রমণকারী কিছু দিন পূর্ব্বে সুদানে (Soudan) গমন করেন ও তথা হইতে একজন মসিবর্ণ কাফ্রি ভৃত্য ভিয়েনাতে (Vienna) আনয়ন করেন ও কয়েক মাস গত হইল ঐ কাফ্রির স্নায়বিক কোন পীড়া (nervous disease) উপস্থিত হইলে, একজন বিখ্যাতচিকিৎসক তাহার রীতিমত বৈদ্যুতিক চিকিৎসার (Systematic Electrisation) ব্যবস্থা করেন। ঐ চিকিৎসায় কাফ্রিটি দিন দিন বল পাইতে ও আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার অঙ্গার নিন্দিত চামড়া স্থানে স্থানে সাদা হইতে লাগিল। আরও চার মাস চিকিৎসার পরে তাহার সমস্ত শরীরের চামড়া সাধারণ ইংরাজের চামড়ার ন্যায় সাদা হইয়া গেল। কৃষ্ণকায় কাফ্রি শ্বেত হইল, কিন্তু তাহার শ্বেতকায় ও ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ঘন কুঞ্চিত কেশ রাশি এবং স্থূল ওষ্ঠদ্বয় তাহাকে কিম্ভুত কিমাকার করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের দেশের নরনারীর গঠন ত মন্দ নয়, তবে ঐ চিকিৎসা এদেশে প্রবর্ত্তন করিলে "কালা আদ্‌মি" নাম ঘুচিতে পারে না কি?

চোখ উঠার ঔষধ। (১) রক্ত চন্দন স্তন দুগ্ধে তামার পাত্রে ঘসিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা সারে।

(২) বড় পানার পাতা অল্প পরিমাণে লবণ দিয়া হাতে রগড়াইয়া যে দিকের চক্ষে পীড়া, সেই দিকের কানে রস দিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে বসিয়া থাকিয়া পরে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

(৩) সামুকের জল চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা সারে।

* * *

ফোড়া পাকাইবার ঔষধ। (১) কাঁটানটিয়ার শিকড়ের ছাল বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করত ৩। ৪ বার প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে।

(২) সাবানের ফেণা ও চিনি মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে।

(৩) আতাফলের পাতা বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকে।

* * *

প্রসব ব্যথার ঔষধ। অত্যধিক এবং অনিয়মিত প্রসব বেদনায় ক্লোরোফরম্ আঘ্রাণ করান অপেক্ষা বাহ্যিক প্রয়োগ করাই সুবিধা। এক অংশ ক্লোরোফরম দুই বা তিন অংশ অলিভ্ অয়েল (জলপাইয়ের তেল) সহ মিশাইয়া পেটের উপর মালিশ করিয়া গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যথা নিয়মিত এবং ফলপ্রদ হয়। ইহাতে ক্লোরোফরম্ আঘ্রাণ করান জন্য যে ভয়, তাহা নাই। রোগী সজ্ঞান থাকে, নাড়ী, শ্বাস প্রভৃতি নিয়মিত এবং বমনাদি হয় না। "চিকিৎসক" হয়।

* * *

দুগ্ধ হইতে বোতাম প্রস্তুত। দুগ্ধ হইতে এখন বোতাম প্রস্তুত হইতেছে। এই কথাটি শুনিলেই কেমন বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই দুগ্ধ হইতে এখন বোতাম তৈয়ার হইতেছে। লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ড নামক স্থানে ইহার ৩টী কারখানা আছে। দুগ্ধ কাটিয়া গেলে, এই সকল কারখানার কর্ম্মচারিগণ সস্তা দরে তাহা ক্রয় করেন এবং উহা হইতে মাখন তোলেন। তার পর ইহা হইতে জলীয় অংশ পৃথক করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে উত্তাপগৃহে লইয়া উত্তপ্ত করেন। এইরূপে আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই বোতামের বর্ণ কখনও বিকৃত হয় না দেখিতে ঠিক হাড়ের সাদা বোতামের ন্যায়। হাড়ের বোতামের অর্দ্ধেক ব্যয়ে ইহা প্রস্তুত হয়। "সোম প্রকাশ" ২৩এ আশ্বিন।"

* * *

চিকাগো রমণীর নূতন সক। আজ কাল চিকাগো রমণীদিগের ঘুড়ি উড়াইবার অত্যন্ত সক হইয়াছে, কিন্তু উহাও একটু নূতন ধরণের। নিমন্ত্রিতা রমণীগণ রাত্রে নিমন্ত্রণ কর্ত্রীর বাড়ির ছাদের উপর একত্রিত হন ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুড়ি উড়াইয়া অতিবাহিত করেন। ঐ ঘুড়ি এক এক খানি ৬ফিট অর্থাৎ চার হাত লম্বা। ঘুড়ির সূতায় বহু সংখ্যক কাগজের লণ্ঠন বাঁধিয়া দেওয়া হয়, আর ঘুড়িতে সংলগ্ন বহুবিধ বাজির সহিত বৈদ্যুতিক তার যোগ করিয়াদেওয়া হয়। তদ্দ্বারা ঐ সকল বাজি ফাটিয়া গিয়া চারি দিক আলোকিত হয়।

* * *

রাজ্যহীন রাজগণ। নির্ব্বাসিত বা সিংহাসনচ্যুত ভূপতি-গণের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে যত অধিক জগতের ইতিহাসে আর কখন তত ছিল কিনা সন্দেহ। ইউরোপের এমন

কোন দেশ নাই যেখানে কোন না কোন নরপতি নির্জ্জনে অতীত সৌভাগ্যের চিন্তায় কাল যাপন করিতেছেন। ফরাসী দিগের ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী (তৃতীয় নেপোলিয়নের মহিষী), ইউজিনী, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ফারস্‌বরো নামক স্থানে প্রায় বিশ বৎসরকাল নিভৃত বাস করিতেছেন। হাওয়াইএর রাণী বিলিউওকালা পি, যিনি ইতিপূর্ব্বে হাওয়াইএ একাধিপত্য করিতেন তিনি এক্ষণে একজন সামান্য রমণীর ন্যায় আমেরিকায় দিনপাত করিতেছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার সিংহাসনটি নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র অতীত গৌরবসূচক নামটি এখনো তাঁহার নিজের সম্পত্তি স্বরূপ আছে।

মাদাগাস্কর দ্বীপের রাণী রানাভোলা ফরাসী কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া আলজিরিয়ায় নজর বন্দী অবস্থায় দুঃখ-জীবন যাপন করিতেছেন।

আফ্রিকা মহাদ্বীপেই পতিত রাজগণের সংখ্যা অধিক। সামরী, প্রেম্পে, মোয়াদ্দা, বেহাঞ্জিন, নানা এবং আরও অনেক সিংহাসনচ্যুত রাজা এক্ষণে সেই অজ্ঞাত-প্রায় মহাদ্বীপের মধ্যস্থলে বসিয়া—শ্বেতঙ্গেরা তাহাদের রাজ্য আক্রমণ না করিলে, তাঁহাদের জীবনের গতি কিরূপ হইত তাহা চিন্তা করিতেছেন। সামরী ক্রীতদাস হইতে তরবারির সাহায্যে রাজ্যস্থাপন করে—ফরাশিরা তাহাকে বন্দী করিয়াছে, সে এখন আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কেভ্‌স্‌ নামক স্থানে মৃতকল্প হইয়া বাস করিতেছে। বেহাঞ্জিনকে ফরাসিরা ছয়বৎসর হইল ডাহোমীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া মার্টিনিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। প্রেম্পে, বেনিনের ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ; ইনি ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী পরিচ্ছদ এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ক্রীতদাস হত্যা করিয়া আমোদ করিতেন, এবং এখন তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব-স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য রাজত্বের অভাবে পোষাকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ম্মদেশের ভূতপূর্ব্ব

রাজা গিব, এক্ষণে ভারতের পশ্চিমোপকূলে বসিয়া সাগরজলে উপল খণ্ড ক্রীড়ায় নিযুক্ত আছেন। বিশপ হানিংটনের হত্যাকারী উগণ্ডার রাজা, মাওয়াঙ্গা এখন বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বপাপের অনুতাপ করিতেছে ; এবং আফ্রিকার আর একটি রাজমুকুটধারী নানা এক্ষণে আফ্রিকায় ইংরাজ কারাবাসে আপনার পূর্ব্ব ভোগবিলাসের স্মৃতির রোমন্থন করিতেছে। স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন প্রাপ্ত সার্ভিয়ার রাজা মিলান, দ্যূত ক্রীড়ায় তাহার রাজ্যের পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড নষ্ট করিয়া বোধ হয় পুনরায় সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার মহিষী ও পুত্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নিজরাজত্বে সেনাসংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

বসন্তোৎসব ও ধূলিখেলা। দুটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হরিসেনাদলের একাদশ ও দ্বাদশ সম্বাৎসরিক উৎসবে গঠিত। প্রবন্ধ দ্বয়ে ভাষার ছটা ও ভাবের বৈচিত্র আছে।

বীর ভূমি। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা, আকার ডিমাই ৪ ফর্ম্মা, বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রথম ভাগ ১ম সংখ্যা। ভূমিকা পাঠে জানা গেল যে পরিচালকেরা অর্থের প্রয়াসী নহেন। "যাহাতে বীরভূমের অধিবাসীদের মানসিক চরিত্র উন্নত হয়, তাহাদের মধ্যে অসার ও কদর্য্য সাহিত্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়া সুসাহিত্য পাঠের স্পৃহা প্রবল হয়, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে স্বাবলম্বন ও সৎসাহস বৰ্দ্ধিত হয়" এই পত্রিকার তাহাই প্রধান লক্ষ্য হইবে। আর একটি লক্ষ্য বীরভূমের প্রাচীন ও লুপ্ত ইতিবৃত্তের সম্যক আবিষ্কার ও প্রচার। উদ্দেশ্য ও লেখার প্রণালী দেখিয়া আমাদের ভরসা হয় যে "সৎসঙ্গের" প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করিলে এই নব প্রচারিত পত্রিকা কালে বীরভূমের গৌরব রক্ষা করিবে।

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। নবেম্বর, ১৮৯৯ সাল। একাদশ সংখ্যা।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া

এত দিন পরে পড়েছে কি মনে
দিদি তব ছোট ভাইটীরে;
আসিয়াছ তাই স্নেহমাখা মুখে
বরষিতে আশীর্ব্বাদ শিরে।
এস এস দিদি, কর আশীর্ব্বাদ,
দুর্ব্বাধান দাও শিরোপরে;
গলায় দুলায়ে দাও ফুলহার
তাম্বুল গুবাক দুই করে।
ললাটে আঁকিয়া দাও ধীরে ধীরে
চুয়া চন্দনের দুটী ফোঁটা;
স্নেহময় তব অমিয় আশিসে
যমের দুয়ারে পড়ে কাঁটা।

তোমার আশিস্ ধারা বরষিছে শিরে,
পুষ্পাসার হ'তে সুরলোক;
অতীতের অন্ধকার যেতেছে টুটিয়া
পেয়ে প্রাণে স্নেহের আলোক।
শৈশব জীবন মম উঠিছে জাগিয়া
হেরে তব স্নেহময় মুখ,
করুণ নয়ন হ'তে কিরণ ফুটিয়া,
বিতরিছে অভিনব সুখ।

মনে পড়ে দিদি সেই ছেলে খেলা যত,
তোমার রচিত খেলাঘর;
বসিয়ে আপন সাধে কত কি ব্যঞ্জন,
রাঁধিতে গো হরষ অন্তর।
সাজাতে পুতুলগুলি, খাওয়াতে তা'দের,
কভু দিতে তা'দের বিবাহ;
যেতাম তোমার সাথে ফুল তুলিবারে,
খেলিতাম দোঁহে অহরহ।

সাজান সে খেলাঘর যদি আমি কভু,
করিতাম উলট পালট;
তোমার বকুনি শুনে, অমনি আমার
ফুলিয়া উঠিত দু'টী ঠোঁট
যেতাম মায়ের কোলে, সস্নেহ চুম্বনে
মা আমায় করিত সান্ত্বনা;
তুচ্ছ খেলা লয়ে দিদি আমার কারণে
মা'র কাছে খাইতে লাঞ্ছনা।
হয়তগো অভিমানে নয়নের কোণে,
দেখা দিত দু'টী মুক্তাফল;
মায়ের করুণ প্রাণ যাইত গলিয়া,
মুছে দিত নয়ন সজল।
শৈশব মূরতি তব রহিত ফুটিয়া,
আলো ক'রে আমাদের ঘর;
মুখের খাবার দিতে তুলিয়া আমায়
করে কত সস্নেহ আদর।
আজ আনিয়াছ দিদি সামগ্রী সম্ভার,
দিতে মোরে স্নেহ উপহার:
তা'র চেয়ে স্নেহভরা হ'বে কি ইহারা
তা'র চেয়ে হবে কি সুতার?

তখন ভগিনী-স্নেহ ছিল মূর্তিমান,
চোকে চোকে রাখিতে আমায়;
কৃত্রিম জননী-স্নেহ করিত বিরাজ
পুতুলের কৃত্রিম মায়ায়।
সে খেলা সমাপি' গেলে পতির আলয়
হ'লে তাঁর জীবন সঙ্গিনী;
স্নেহময়ী দিদি তুমি আমাদের ঘরে,
সে ঘরের হইলে গৃহিণী।
সুকৃতির ফলে তব, বিধির কৃপায়,
কোলে পেলে সন্তান সন্ততি;
জননীর স্নেহ বহে প্রবল হইয়া,
রুধিয়া ভগিনী-স্নেহ গতি।
আরো কত নবস্নেহ আসি ধীরে ধীরে,
করিবে হৃদয় অধিকার;
পুরাতন স্নেহগুলি হ'য়ে যাবে ম্লান,
ঢাকিবে তা'দের অন্ধকার।
নয়নের অন্তরাল হ'লে কিছু দিন,
ভুলে থাকা জগতের রীতি;
অভিজ্ঞান চিয়াইয়ে দেয় তাই প্রাণে,
ভুলে থাকা অতীতের স্মৃতি।
তাই বুঝি দিদি আজ তোমার পরাণে
জাগিয়াছে ভগিনীর স্নেহ;
মনে পড়ে গেছে বুঝি ছোট ভাইটীরে
মনে পড়ে গেছে পিতৃ-গেহ।
তাই বুঝি স্নেহসুধা বরিষণে আজ
প্রাণে সাধ গিয়েছে তোমার;
তাই বুঝি পরাইলে স্নেহমাখা মুখে
আজি এ আশিস্ ফুলহার।

মানস তমস হর আশিস্-মালায়
উজলিত আমার হৃদয়;
নন্দন কবিতাকুঞ্জে সুরবালা করে
সুরচিত শ্লোক সুধাময়।

তোমার আশিস্-ধারা বরষিছে শিরে
স্মাসার হতে সুরলোক,
অতীতের অন্ধকার যেতেছে মিলায়ে,
পেয়ে প্রাণে স্নেহের আলোক।

শৈশব জীবন মম উঠেছে জাগিয়া,
হেরে তব স্নেহময় মুখ ;
করুণ নয়ন হতে কিরণ ফুটিয়া
ঢালিতেছে অভিনব সুখ।

যুদ্ধ নীতি।

পাঠক! ক্ষমা করিবেন, আমরা একটু সে কাল সম্বন্ধে আত্ম-গরিমায় প্রবৃত্ত হইতেছি; আমাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নহে কিম্বা যুদ্ধ-নীতি শিক্ষা দেওয়া নহে, কিন্তু সে কাল ও একালের যুদ্ধ নীতির তুলনা করা মাত্র। মহর্ষি মনুর সময়ে আর্য্য সমাজ কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এই তুলনা হইতে কথঞ্চিৎ বুঝা যাইবে। মনু কহিয়াছেন :—

এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥
যদিতে তু ন তিষ্ঠেয়ুরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতাঞ্চনকৈর্বশমানয়েৎ ॥　মনু ৭।১০৭।৮

যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায়ের দ্বারা তাহাদিগকে বশে আনিতে হইবে। যদি প্রথমোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে শত্রু না স্থির হয়, তবেই যুদ্ধ করা বিধেয়। যুদ্ধ অতীব প্রশংস্য বলিয়া যদিও স্মার্ত্তশাস্ত্রে কীর্ত্তিত, তথাপি ভগবন্মনুর উপদেশ—প্রথমে সাম, দান ও ভেদ চেষ্টা করিতে হইবে। সাম অর্থাৎ প্রিয় বাক্যাদি ভদ্রোচিত ব্যবহার; দান অর্থাৎ ধনরত্নাদি দান; ভেদ অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ ইত্যাদি এই সকল উপায়ে সফল না হইলে

যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। একালেও ঠিক্ ঐ প্রকার একটী নিয়ম আছে। ১৮৪৬খ্রীঃ অব্দে প্যারিস নগরের কংগ্রেসে স্থির হয় যে যোদ্ধৃ-পক্ষেরা যুদ্ধের পূর্ব্বে কোনও মধ্যবিৎ বন্ধু বা নিঃস্বার্থ সম্রাট দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইবেন এবং এই নিয়মই সভ্যজাতি মাত্রেই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। সেকালে যে মধ্যস্থ মীমাংসা প্রচলিত ছিল, তাহা স্মৃতি শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে প্রসঙ্গানুক্রমে উদাসীন রাজার দ্বারা মীমাংসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যুদ্ধ ঘোষণা—সে কালে যুদ্ধ প্রারম্ভেই যুদ্ধ ঘোষণার অভিপ্রায়ে দূত প্রেরণ রীতি ছিল ; এই রীতি অতি উন্নত সভ্য সমাজের লক্ষণ ; কিন্তু ইয়ুরোপ খণ্ডেও এপ্রকার উন্নত রীতির লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ব্যবহার শাস্ত্র-বেত্তা সুপণ্ডিত ব্লাক্‌ষ্টোন বলিয়াছেন যে স্বদেশমধ্যে কোনও প্রধান নগরে বা রাজধানীতে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট। স্বরাজ্যে যুদ্ধ করার নিয়ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু শত্রু পক্ষকে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ আক্রমণ করা নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার। যাহাই হউক আধু-নিক ইতিহাসে এই প্রথা প্রচলিত না থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ড ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লণ্ডনের রয়াল এক্‌স্‌চেঞ্জ নামক অট্টালিকায় ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, রুশরাজকে কোনও সংবাদ দেওয়া হয় নাই। এস্থলে প্রাচীন গ্রীশের কথা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। এতদ্দেশে দূত প্রেরণ করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং তন্নিকটবর্ত্তী ইটালিয়ান জাতি এইনিয়ম অনুসরণ করিত না বলিয়া ইহাদিগকে তৎকালীন সভ্যসমাজের বহির্ভূত করা হইয়াছিল।

যুদ্ধে অন্যায় অত্যাচার বিধেয় নহে। একান্ত আবশ্যক না হইলে বিজিত পক্ষের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করা উচিত নহে। এই

নিয়ম মহর্ষি মনুর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিত আছে। বাস্তবিক এই নিয়ম চলিত না থাকিলে প্রতি যুদ্ধেই যে কত ক্ষতি হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইংরাজ-যুদ্ধ-শাস্ত্র মতে জল ও খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত করা অন্যায়। কিন্তু অন্যান্য উপায় সকল অগর্হিত, যথা—জলে ও খাদ্যদ্রব্যে অপদ্রব্য মিশ্রণ ও পানাহারের অনুপযুক্ত করা—এই প্রথা স্মার্ত্তমতে বা আধুনিক রীত্যনুসারে অন্যায় নহে—

"Any other means or instruments of destruction are legitimate, including the cutting off of water supplies, and the mixing with water of substances which evidently make it undrinkable."

(French Manual 1884, p. 13.)

মনু কহিয়াছেন :—

উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রঞ্চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েৎ তথা॥

বিষাক্ত শস্ত্রাদি বা যে সকল শস্ত্র অনর্থক কষ্টদায়ক সে সকল ব্যবহারও এক্ষণে গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ঠিক ইহাই স্মার্ত্তশাস্ত্রের উপদেশ। মনু কহিয়াছেন :—

নকূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানোরণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥ মনু ৭। ৯০॥

কূটশস্ত্র অর্থাৎ বহির্কাষ্ঠাদিময় কিন্তু অন্তর্গুপ্ত নিশিত শস্ত্রাদি যুদ্ধে অব্যবহার্য্য। কর্ণ্যাকার শস্ত্রাদি অর্থাৎ যে শস্ত্রের ফলকাদি বক্র ও শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বহিষ্কৃত করা দুরূহ, দিগ্ধ অর্থাৎ বিষাক্ত ও

অগ্নি প্রদীপ্ত তেজন শস্ত্র সকল যুদ্ধে অব্যবহার্য্য। পাঠক দেখিবেন সে কালে কোনও প্রকার অগ্নিদীপ্ত তেজোময় শস্ত্র ছিল বটে, কিন্তু সে সকল যুদ্ধে অব্যবহার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আজিকার সভ্যতায় সে দয়াপ্রকাশের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদিগের যে সকল উপায় প্রদর্শন করিতেছে, আমরা তাহার সহকারে বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপকৃত অসভ্যজাতিদিগকেও উৎপীড়িত করিতে ক্রটী করি না। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক উপায় অধুনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যে সকল উপায় স্মৃতিশাস্ত্রে গর্হিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। পলাতক বা নিরস্ত্র যুদ্ধবিমুখ সৈন্যের বধও নিন্দিত। মনু কহিয়াছেন :—

> ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
> ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনাং।
> ন সুপ্তং নবিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
> নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্॥
> নায়ুধবাসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরীক্ষিতম।
> ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥

ব্রুসেলস্ নামক নগরীতে ১৮৭৪ সালে যে সম্রাটসভা হয় তাহাতে স্থির হয় যে বিষাক্ত শস্ত্রাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। যুদ্ধদর্শক অথবা যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত, নিরস্ত্র, আত্মরক্ষার উপায়বিহীন, ও তবাস্মীতি বাদী ব্যক্তিগণ অবধ্য। বিপক্ষের ধন ধান্যাদি বিনষ্ট করাও নিন্দনীয়। মনুও কহিয়াছেন :—

> ক্ষেমাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধি করীমপি।
> পরিত্যজেন্নৃপোভূমিমাত্মার্থমবিচারয়ন্॥

ক্ষেম্য শস্যপ্রদ বা শস্যযুক্ত ভূমি রাজা বিনষ্ট করিবেন না।

দুর্গাবরোধের বিষয় স্মৃতিশাস্ত্রে কতকগুলি নিয়ম আছে, কিন্তু সে গুলির স্পষ্ট উল্লেখ, অধুনা মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। স্মার্ত্ত-মতে দুর্গ নানা প্রকার; যথা—মরুবেষ্টিত বা ধন্বদুর্গ; ইষ্টক বা পাষাণ নির্ম্মিত মহীদুর্গ, জল বেষ্টিত অব্দুর্গ; মহাবৃক্ষ কণ্টকগুল্মাদি বেষ্টিত বার্ক্ষ দুর্গ; চতুর্দ্দিকে হস্ত্যশ্বসেনাদি পরিবৃত নৃদুর্গ ও পর্ব্বতের উপরি-স্থিত গিরিদুর্গ। স্থান বিশেষে এই সকল দুর্গ রচিত হইত। ইংরাজ সভ্যতানুমত যে সকল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, সে সকল অপেক্ষা ভারত-বর্ষীয় ইষ্টকাদি নির্ম্মিত দুর্গ গুলি সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। এই সকল দুর্গাবরোধের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। কেবল সুরক্ষিত নগর ও দুর্গ অবরোধ করা যাইতে পারে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ব্রুসেল্‌স্ নগরে যে মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ইউরোপের সকল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, অরক্ষিত নগর বা দুর্গ সকল অবরোধ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যে নগর বা দুর্গ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তাহাকে আক্রমণ, অবরুদ্ধ ও যন্ত্রাদি দ্বারা বিনষ্ট (Bombard) করা যাইতে পারে; কিন্তু এই স্থলে অবরুদ্ধ নগরীর কর্ত্তব্য যে নগরস্থিত বিদ্যা মন্দির, ধর্ম্মমন্দির, মঠ, বিজ্ঞান ও শিল্পমন্দির সকল চিহ্নিত করিয়া রাখেন, নচেৎ এই সকল স্থান নষ্ট হইলে দেশীয় সভ্যতা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু এই সকল স্থানে সৈনিকেরা লুক্কায়িত থাকিতে পাইবে না।

যুদ্ধ কালে অসভ্য জাতীয় সেনা ব্যবহার পদ্ধতির উল্লেখ মনু-সংহিতায় পাওয়া যায়, এবং সেই পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। মনুসংহিতায় দেখা যায়, যে সেকালে ভল্লযোদ্ধাদিগকে যুদ্ধে সহায়তা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিরাট্, পঞ্চাল, প্রভৃতি দেশ হইতেও সেনাহরণ করা হইত। আধুনিক ইতিহাস পাঠে

অবগত হওয়া যায় যে ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে রুশ ও হঙ্গারীরাজ মধ্যে যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন রুশরাজ ককেশীয় জাতীয় সৈন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। মার্কিণে ইংরাজ ও ফরাসী রাজ্য মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে ফরাসীরা মার্কিণ দেশবাসী অনেক অসভ্যজাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুরস্কেরাও ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে সার্ভিয়দিগের বিপক্ষে কতিপয় ককেশীয় এবং বাশীবাজুক নামক জাতির সাহায্য লইয়াছিলেন। গুপ্তহত্যা শাস্ত্রবিগর্হিত এবং আধুনিক কালেও গুপ্তহন্তাদিগকে সমগ্র মানবজাতির শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিত হালেক বলিয়াছেন ;—"Such an act is now deemed infamous and execrable, both in him who executes and in him who commands, encourages or rewards it." এই সংক্রান্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটী উন্নতদৃষ্টান্ত আছে ও এই দৃষ্টান্ত সমস্ত রাজ্যেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য এ দৃষ্টান্তটী এই—ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশ মধ্যে ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে যে ভয়ানক যুদ্ধ বিপ্লব হয়, সেই যুদ্ধের সময়ে একজন বিদেশীয় ব্যক্তি আসিয়া তৎকালীন ইংলণ্ডের মন্ত্রীবর মহামতি ফক্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে। অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তার পর এই বিদেশী ব্যক্তি ফক্স সাহেবকে বলেন, যে ইংলণ্ডরাজের যদি আজ্ঞা হয় তবে তিনি মহাবীর নেপোলিয়নকে হত্যা করিয়া তাঁহার মস্তক আনিয়া দিবেন। শুনিবামাত্র মহামতি মন্ত্রীবর তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাজদ্বারে নীত করেন। রাজাজ্ঞা হয় যে, সেই ব্যক্তিকে ফরাসী দেশের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হউক ও ফরাসীমন্ত্রী টালীরণ্ডের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই উন্নত আচরণ সকল রাজ্যে অনুসৃত হয় না। স্পেন দেশীয় রাজা ফিলিপ (দ্বিতীয়) ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার

শত্রু উইলিয়ম প্রিন্‌স্‌ অফ্‌ অরেঞ্জকে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে যুদ্ধসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে আধুনিক সভ্যতানুমোদিত নিয়মগুলি কতকাংশে স্মার্ত্ত নিয়মের ন্যায় উন্নত বটে কিন্তু অনেকাংশে আধুনিক সভ্যতা তাৎকালিক সভ্যতাপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এই বিষয় সম্যক্‌ বিচার করিতে হইলে প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া যায়। বস্তুতঃ এ বিষয় একখানি পুস্তক লেখা যায়। কিন্তু আমরা পাঠককে অধিকক্ষণ অবরুদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না সুতরাং মন্তব্যটী অতি সংক্ষেপে বলিয়া পাঠকের নিকট বিদায় লইলাম।

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

লাখপতি বাবু।

লাখপতি বাবু মস্ত বড় লোক—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। সরস্বতীর কৃপা না থাকিলেও, লক্ষ্মী ও গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে জনসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি; (গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ—যে হেতু উপাধিলাভার্থ অকাতর দানে লাখপতি বাবু কখনই কুণ্ঠিত নহেন।) এককড়ি বাবু অশেষ গুণালঙ্কৃত ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও গৃহস্থ ব্যক্তি, কাযেই এককড়ি বাবু যখন কোনও কার্য্যোপলক্ষে লাখপতি বাবুর বাড়ি গমন করিলেন, লাখপতি বাবু বিশেষ সমস্যায় পড়িলেন, সমস্যা—কি বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণ করিবেন। এককড়ি বাবুকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতে তাঁহার লজ্জা ও

অপমান বোধ হয়, হইবারই কথা। আবার "তুমি" বলিয়া অমন একটা বিদ্বান্ ও গুণবান ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করাটাও ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ তিনি নিজে যখন সরস্বতীর ত্যজ্যপুত্র। অগত্যা তিনি "আপনি" বা "তুমি" দুয়ের কোনটা ব্যবহার না করিয়া বলিলেন, —"অনেক দিন পরে আসা হ'ল, শরীর গতিক ভাল ত? বাড়ির সব মঙ্গল?" "আজ্ঞে হাঁ, বাড়ির সব মঙ্গল, আমার নিজের বড় অসুখ গিয়াছিল শুনিয়া থাকিবেন"—

লাখপতি বাবু—"তা ত শুনিয়াছিলাম, খুব কাহিলও দেখিতেছি, আমি খবর লইতাম"; (কিন্তু আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি তিনি আদৌ এককড়ি বাবুর বিষয়ে কখনও কোনও খবর লইবার জন্য মাথা ঘামাইতেন না।) "যা হোক, এখন আরাম হওয়া হয়েছে কি"? এককড়ি বাবুর ইহা অপেক্ষা অধিক অভ্যর্থনার আশা করাই অন্যায়। পাঁচকড়ি বাবু, সাতকড়ি বাবু ও ওপাড়ার নকড়ি বাবুর ভাগ্যেই ইহার বেশী ঘটে না, তা তিনি ত এককড়ি বাবু মাত্র!

কিন্তু ধনপতি বাবুর প্রকাণ্ড জুড়ি যখন লাখপতি বাবুর বাড়ির ফটকে দাঁড়াইল, তখন কাযেই লাখপতি বাবুকে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে হইল "আসুন, আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ-কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, তাই আপনার মত লোকের দর্শন পেলেম; আপনার ছেলে পিলেরা ভাল আছে ত? আপনার সেই যে টেরিয়ার কুকুরটার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ভাল হইয়াছে ত?" অবশ্য সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে করমর্দ্দনটাও হইল; (কর্ণ মর্দ্দন প্রথাটা প্রচলিত করিলে কিরূপ হয়?) ধনপতি বাবুর টেরিয়ারের খবর হইল, আর এককড়ি বাবুর ছেলেদের খবর লওয়া হইল না বলিয়া এককড়ি বাবুর দুঃখের কারণ নাই, উহাতে লাখপতি বাবুর বিশেষ দোষ ও নাই; "আপনি"

"তুমি" বিবর্জ্জিত ভাষায় কিরূপে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "ছেলে কেমন্ আছে" ? ঐরূপ প্রশ্নে কার ছেলে বুঝিয়া উঠা দায়। ওরূপ স্থলে ওরূপ প্রশ্ন না করাই ভাল বিবেচনায় লাখপতি বাবু খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন।

লাখপতি বাবু প্রত্যহ বৈকালে প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো গাড়ি চড়িয়া চিৎপুর রোডের ভিতর দিয়া হাওয়া খাইতে যান। প্রশস্ত সারকিউলার রোড়ে না গিয়া সঙ্কীর্ণ ও জনপূর্ণ চিৎপুর রোড দিয়া হাওয়া খাইতে যাইবার কারণ আমরা ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে অনুমান হয় সারকিউলার রোডের ধারে মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের কবর-স্থান থাকাতে তথাকার বায়ু বোধ হয় দূষিত, সেইজন্য সেই রাস্তা বড়লোকদিগের পরিত্যজ্য। আর চিৎপুর রোড দিয়া যখন লাখপতি বাবু হাওয়া খাইতে যান, তখন্ যে হাওয়া খাওয়াই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য সে বিষয়ে তিল মাত্র সংশয় নাই, নতুবা অমন একাগ্রচিত্তে বরাবর ঊর্দ্ধমুখে থাকিবেন কেন ? হেল্‌থ্ অফিসার নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন অধোমুখে থাকিলে গাড়ির ও রাস্তার ধূলা চক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনিষ্ট সংঘটন্ করিতে পারে, এমন কি অন্ধ হইবারও সম্ভাবনা আছে, তাই শুধু অমূল্য রত্ন চক্ষুদ্বয় স্নিগ্ধ ও নিরাপদ রাখিবার জন্য তাঁ'র ঊর্দ্ধদৃষ্টি ; একথা যিনি বিশ্বাস না করিবেন তিনি ঘোর নাস্তিক ও মন্দলোক। তবে যে লাখপতি বাবুর "লিভারি" সুশোভিত চামরবদ্ধ কোমরবিশিষ্ট সহিস পুঙ্গবদ্বয় গোঁফ চোমরাইতে চোমরাইতে সুরমারঞ্জিত চক্ষুর দৃষ্টি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করত, সামনে কেহ না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে "হেই-ই-ও সাম্‌নেওয়ালা বাঁয়ে রোখ্‌কে যাও, হে—এ-এ-এ—ওপ্" বলিয়া হাঁকিতে থাকেন তাহার কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের ঊর্দ্ধদৃষ্টির কারণ কখনও হাওয়া খাওয়া বা চক্ষুরত্ন রক্ষা করা নহে,

যেহেতু তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে ঘোর অজ্ঞ। তাহাদের অকারণ চিৎকার করিয়া নিরীহ পথিকের মনে ভয় সঞ্চার করিবার কারণ আর কিছুই নহে, শুধু বারাণ্ডা-বিহারিণীদিগের চিত্ত আকর্ষণ করা ও তাহাদিগকে ইঙ্গিতে বলা "আমরা এখানে আছি, শুধু বাবুকে দেখিয়া ভুলিও না, আমাদের দিকে একবার তাকাইও"। (তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের হোমরাও চোমরাও চেহারা তাহাদের মুনিবের বসন্তচিহ্নিত শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল অপেক্ষা অধিক রমণীমোহন!)

লাখপতি বাবুর বাড়ি প্রতিবৎসর মহা সমারোহে পূজা হইয়া থাকে, ঐ পূজার উদ্দেশ্য ভগবতীর প্রসাদলাভ করা নহে; ভগবতী অপেক্ষা প্রভাবশালী সাহেব দেবতার প্রসাদ লাভ করা; (দোহাই পাঠক, শালী সাহেব এরূপ Syllable ভাগ করিয়া পাঠ করিবেন না)। সাহেব দেবতার ক্ষমতা যে ভগবতীর অপেক্ষা অধিক সে বিষয়ে যে সন্দেহ করে সে ঘোর মূর্খ! প্রমাণ, সাহেব দেবতা প্রসন্ন হইলে অতি অকর্ম্মণ্য ও নিরক্ষর লোকেও উপাধি ও সম্মান লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবতী অর্চ্চনায় সেরূপ সদ্যফল লাভ হয় কি? সাহেবকে যে দেবতা বলা হইল তাহারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে। হনোলুলুর (Honolulu) একজন বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে "সাহেব" কিনা "স্বাহা ইব" অথবা "স এব", দুই ব্যাখ্যাই আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। "স্বাহা ইব" কিনা স্বাহার ন্যায়, স্বাহা অগ্নির পত্নী, স্ত্রীলিঙ্গ, সাহেব পুংলিঙ্গ, সেইজন্য ঠিক্ স্বাহা নহে, "স্বাহার ন্যায়" বলা হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি স্বাহার ন্যায় যে হেতু তিনি স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ, অতএব এতদ্দ্বারা ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে যে অগ্নি ও সাহেব সমান অর্থাৎ এক, সাহেবই অগ্নিদেবতা। আরও প্রমাণ চাও, অগ্নি উগ্রমূর্ত্তি, সাহেবের ত কথাই

নাই, বিশ্বাস না হয় কেরাণীবেচারাদের জিজ্ঞাসা কর। আরও নিকট (Conclusive) প্রমাণ চাও, অগ্নি সর্ব্বভূক্, সাহেবও তাই। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা "স এব" অর্থাৎ সেই একমাত্র সার ও উপাস্য। এই ব্যাখ্যা শুনিয়াই ত লাখপতি বাবু পূজা বাড়িতে সাহেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাহেব ত আর প্রতিমার ন্যায় মাটির পুতুল নয় যে ব্যাসিলিপূর্ণ (?) ময়লা গঙ্গাজল আর চালকলা খাইয়া কলেরায় ভুগিবে, তাই লাখপতি বাবু সাহেবের জন্য Burgundy, Scotland, প্রভৃতি নানা দেশ হইতে বিশুদ্ধ নির্ম্মল পানীয় ও "গ্রেট ইষ্টারন্ হোটেল" নামক পবিত্র তীর্থস্থান হইতে নানাবিধ ভোগ আনাইয়া থাকেন। তিনি নিজে যে ঐভোগ খান না একথা বলিলে তাঁহাকে ঘোর অভক্ত বলা হয়, কিন্তু তিনি ভক্ত শিরোমণি, তাই মধ্যে মধ্যে ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া তাঁহাকে টেবিলের নীচে পতিত হইতে দেখা যায়, এবং তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সযত্নে শয্যায় শায়িত করা হয়—পাছে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয়!

লাখপতি বাবু বড় লোক ব্যতীত গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাড়িতে কখনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান না, অনেক উপরোধে যদি বা যান ত দু' পাঁচ মিনিট বসিয়া উঠিয়া আসেন, জলগ্রহণ করেন না। কারণ উহাতে তাঁহার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির মানের হানি হইতে পারে। তাই "শরীরটা বড় খারাপ খারাপ, বড় অম্বল হইয়াছে" এইরূপ একটা ওজর করিয়া উঠিয়া আসেন। কিন্তু আমরা সন্ধান লইয়াছি বাড়িতে আসিয়া তিনি অনাহারে থাকেন না, বেশ চর্ব্বচূষ্য লেহ্য আহার করিয়া অম্বলের ঔষধ স্বরূপ কিঞ্চিৎ মাত্রায় সুরারূপ পেয় সেবন করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রণ বাটিতে ত আর তাহা চলিবে না, 'সিলেক্ট পার্টি' হইলে অন্য কথা ও অন্য ব্যবস্থা।

লাখপতি বাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী মনে করেন তিনি মহারাণী ভিক্টো-রিয়া। পাড়ার সকল স্ত্রীলোকে তাঁহার অসাক্ষাতে যাই বলুক না কেন, তাঁহার সাম্‌নে তাঁহার যথেষ্ট স্তুতিবাদ করে, খালি ডেপুটিবাবুর স্ত্রী শিক্ষাভিমানিনী বলিয়া ও হাকিমের স্ত্রী বলিয়া তাঁহাকে বড় একটা খাতির করেন না বরং ঘৃণা করিয়া থাকেন। লাখপতি বাবুর পত্নীও এইজন্য ডেপুটি-পত্নীর উপর বড় চটা। পাড়ার সকলের নিকট বলিয়া থাকেন মাগীর দেমাক্‌ দেখেচ, ভাতার ৩। ৪ শ' টাকা মাহিনে পায় ব'লে মাগীর এত অহঙ্কার, আমরা মনে করলে ৩। ৪ শ' টাকা মাহিনে দিয়ে অমন পাঁচটা ডেপুটীকে মুহুরি রাখ্‌তে পারি। কই এই যে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার এত ঐশ্বর্য্য, আমি কি তার জন্যে অমন দেমাক ক'রে বেড়াই। এই সে দিন আমাদের উনি কিসের জন্য জানি না, ৫০০০৲ টাকা দান কল্লেন, বল্লেন বড়মান বাড়্‌বে, তা কই ওর ডেপুটি ভাতার করুক দেখি অমন দান? তা'র ক্ষমতা নেই"। লাখপতি বাবুর দানের পরিচয় গবর্ণমেণ্ট জানে আর যাহারা খবরের কাগজ পড়ে তাহারা জানে, গরীব দুঃখীরা জানে না, কারণ বড়লোকের বাড়িতে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ, এক মুঠো ভিক্ষা চাহিতে গেলে জবরদস্তসিং দ্বারবানের নিকট গলাধাক্কা খাইতে হইবে। বাস্তবিক তাহাদের গলাধাক্কা খাওয়াই উচিত; তাহাদের একটু আক্কেল নেই, প্লেগ ও নানা বিধ রোগের বীজ পরিপূর্ণ ময়লা দুর্গন্ধময় চিরকুট পরিয়া কোন্‌ সাহসে বড়লোকের বাড়ি ঢুকিতে যায়?

উপদেশ।

কোন স্থানে অশীতি বর্ষের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অতি বৃদ্ধ হইলেও সূর্য্য অনুদয়ে গঙ্গাস্নান—পরে দুই দণ্ড কাল দেবার্চ্চনা ও অপরাহ্ণে হবিষ্য আহার করিয়াই দিনাতিপাত করিতেন। এক দিবস তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আপন যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গা স্নানে যাইতেছেন। তখন গ্রীষ্মকাল! চারিদিকে বিহঙ্গগণ সুমধুর স্বরে ঝঙ্কার দিতেছে, কেহ ডানার ঝটপট শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। নিশাচরেরা লোকভয়ে ভীত হইয়া এদিক ওদিক দিয়া পলাইতেছে। নিশাবসানে সমীরণ বড়ই মনোমুগ্ধকর,—এমন কি অশীতি বর্ষের বৃদ্ধেরও ঐ ফুরফুরে মলয় পবনে মনকে উল্লাসিত করিয়া তুলিতেছে। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন এবং স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ও একখানি নামাবলির দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিয়া পুনরায় যষ্টি সাহায্যে অতি ধীর পদক্ষেপে গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি গন্ধমূষিক বৃদ্ধের পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিলেন, ওদিকে গায়ত্রী উচ্চারণও বন্ধ হইয়া গেল; তিনি তখন ঐ অবস্থায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে এখন দেহ ত অপবিত্র হইল কি করি? তিনি আর একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন দিনমণি তখন রক্তিম বর্ণে পূর্ব্বদিক আলো করিয়া উদয় হইতেছেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঐ অবস্থায় থাকি-

য়াই উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—"হা হতোস্মি! আজ আমার কি হইল? এখন আমার দেহ অপবিত্র, ওদিকে আকাশেও দিনমণি উদয় হইয়াছেন—অম্যুদয়ে স্নানং বিধিঃ সেজন্য এখন আর গঙ্গা স্নানও হইতে পারে না। কিন্তু এই অপবিত্র দেহে আজ দেবার্চ্চনাদি কোন কার্য্য হইবেনা।" তাঁহার এই করুণ রোদনধ্বনি শুনিয়া অনেকেই নিকটে আসিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ কাহাকেও কোন উত্তর না দিয়া ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছেন; সে জন্য অনেক মন্দমতিরা তাঁহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু ব্রাহ্মণের রোদন থামিল না। অবশেষে এক সন্ন্যাসী সেই পথে যাইতেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একজন সত্যনিষ্ঠ অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আকাশের দিকে চাহিয়া কেবল রোদন করিতেছেন। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের এপ্রকার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া, তিনিও ব্রাহ্মণের মত রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় অনেকক্ষণ এইরূপ রোদন করিতেছেন, কেহ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। অশীতি বর্ষের ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে ভাল, আমার শরীরই অপবিত্র হইয়াছে সেজন্য আমি রোদন করিতেছি, কিন্তু এ সন্নাসীর রোদনের কারণ কি?

ব্রাহ্মণ স্বীয় অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন আচ্ছা বাপু আমার দেহ অপবিত্র হওয়ায় আমি রোদন করিতেছি কিন্তু তোমার রোদনের কারণ কি?

সন্নাসী তখন ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "মহাশয় আমি আপনারই ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতেছি! কেন না আপনার ঐ পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া ছুঁচ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া আপনি এত ক্রন্দন করিতেছেন

কিন্তু অপনি কি জানেন না যে এখনই একটী কুক্কুট ঐ পদদ্বয়ের মধ্যে দিয়া যাইবে ; কারণ সেও বলিতে পারে যে আপনি যখন ছুঁচকে যাইতে দিয়াছেন আমিও ঐ পথে যাইব। তৎপরে আবার একটী কুকুর ঐ পথে যাইবার জন্য অনুবোধ করিবে ও ক্রমে ঘোড়া ও হস্তী প্রভৃতি সকল জন্তুই ঐ পথে যাইবে। তখন আপনার প্রাণ সংশয় জানিবেন। এই কারণ বশতঃ আমি এত ক্রন্দন করিতেছি।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

সন্ন্যাসী—এখন আপনার ঐ পথ বন্ধ করাই আবশ্যক।

ব্রা—তা হইলে কুক্কুট শার্দ্দুল প্রভৃতি জন্তুগণ ?

স—পথ না পাইলে সকলে ফিরিয়া যাইবে।

বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও সেই অবসরে করস্থিত গঞ্জিকাপূর্ণ কলিকায় ধূমপান করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"মানবগণ যদি ভজন সাধন (অর্থাৎ পথ বন্ধ) না করিয়া অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে কেবল এই মাত্র বুঝিয়া আপনার মত রোদন করিত তাহা হইলে দুরদৃষ্ট বশতঃ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কতশত মহা-পাপের জন্য অসংখ্য বিপদজালে জড়ীভূত হইয়া আজীবন নানা ক্লেশ ভোগ করিত, আর আপন অদৃষ্টের দোষ দিয়া ঈশ্বরের উপর কত দোষারোপ করিত।

কেবল মাত্র অদৃষ্টবাদী হইলে ভুল করা হয়। কেন না যদি আপনি আপনার ভাবী বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ব্রতাদি দেবার্চ্চনার দ্বারা সে সকল পথ বন্ধ না করেন, কিম্বা আপনার রোগ শান্তির জন্য আদেশ মত ঔষধ সেবন না করেন, তাহা হইলে

আপনাকে এজগতে নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি ঐ সকল গ্রহশান্তির জন্য সেই পরমারাধ্য দয়াল পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার আদেশমত (শাস্ত্রানুযায়ী) ক্রিয়া কলাপ যথাবিধি করেন, তাহা হইলে সময়ে আপনিও রোগমুক্ত হইয়া সেই আনন্দময়ের আনন্দ বাজারে যাইবেন; তখন এই সকল নিরানন্দ পূর্ণানন্দে পরিণত হইবে এবং জগত সুন্দর দেখিবেন।

"দেখুন আপনার চক্ষুর উপর যতক্ষণ লাল বর্ণের চসমা থাকে, আপনি সকল বস্তুই তখন লাল দেখিতে থাকিবেন; কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে সবুজ রঙ্গের চসমা ধারণ করিলে এতক্ষণ যে সকল বস্তু লাল দেখিয়া চক্ষুদ্বয় টনটন্ করিতেছিল, তখন ঐ সকলই অতি স্নিগ্ধকর বোধ হইবে। সনাতন পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের এই গূঢ়রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন তিনি কদাপি আপন দরিদ্রতার জন্য ঈশ্বরের উপর অন্যায় দোষারোপ করেন না। তাঁহারা যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন সর্ব্বদাই আনন্দে থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনাকে সুখী বোধ করেন।"

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। বৃদ্ধও সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস ঘোষ।

অদৃষ্ট পরীক্ষা।

প্রথম স্তবক।

মুসলমান শিবির আজ আনন্দ ও সমারোহের চিত্র বিশেষ। শীঘ্রই রাজপুতকুলভূষণ প্রাতাপের সহিত ভীষণ যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধাবসানে কে মরিবে কে বাঁচিবে তাহার নিশ্চয় নাই। বিশেষতঃ ভারতপূজ্য বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতগণ তাহাদের শত্রু। পাছে সৈনিকবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই ভীত হয় এই ভাবিয়া রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহ ও যুবরাজ সেলিম তাহাদিগকে আনন্দ-স্রোতে নিমগ্ন হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

এইরূপ সমারোহপূর্ণ শিবির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুইটি যুবক। একখানি অনাবৃত কাষ্ঠাসন তাঁহাদের উপবেশন স্থান। তাহার উপর বসিয়া যুবকদ্বয় একমনে সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতে ছিলেন। উভয়েরই উচ্চপদস্থ সৈনিকের বেশ; অথচ উভয়েই নিরস্ত্র। কক্ষ মধ্যে কোথাও অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। উভয়েই রাজপুত বংশোদ্ভূত। একটী যুবকের প্রশস্ত ললাট দেশে গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ কেশ রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বদনশ্রী অতীব সুন্দর। ইনি সম্ভ্রান্ত ও ধনীকুলোদ্ভব--নাম সদাশিব রাওল।

দ্বিতীয়টি প্রথমাপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘাকার, বদনশ্রী আরও সুন্দর এবং প্রীতিপ্রদ। আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন প্রান্তে ঈষৎ কালিমা—কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। বিষাদ মাখান বদনমাধুর্য্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। বংশগৌরবেও ইনি হীন নহেন,—কিন্তু দরিদ্র,—নাম কনক সিংহ।

সদাশিবের বাটীর সন্নিকটস্থ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বাল্যকাল হইতে উভয়ে পাঠাভ্যাস করিতেন। কনক দরিদ্র হইলেও সদাশিবের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। সেই ভালবাসার অনুরোধে কনক প্রায়ই সদাশিবের বাটিতে যাতায়াত করিতেন। সদাশিবের এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। সদাশিব, কনক ও লীলা তিনটিতে প্রায় সর্ব্বদাই একসঙ্গে ক্রীড়া করিত। তন্নিবন্ধন কনক ও লীলায় বড় ভালবাসা জন্মিয়াছিল। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই ভালবাসা প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল।

কিন্তু বুদ্ধিমান কনক এখন হইতেই বুঝিলেন যে লীলার সহিত তাঁহার বিবাহ একরূপ অসম্ভব। লীলা ধনী কন্যা—কনক দরিদ্র সন্তান। বংশ মর্য্যাদায় অনুরূপ হইলেও মিলন সম্ভাবনা কোথায়? বুদ্ধিমান কনক হৃদয় বাঁধিলেন,—লীলার সহিত দেখা শুনা একেবারে বন্ধ করিলেন। চিরচঞ্চলা কমল প্রিয়াকে স্বকরতলগত করিতে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। অসীম অধ্যবসায় ও একাগ্রতাবলে রাজকীয় এক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

একদিন একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত কনকের সাক্ষাৎ হইল, নানা কথাবার্ত্তার পর বন্ধুবর কহিলেন—"সম্প্রতি সদাশিব রাওয়ের ভগ্নীর সহিত আমার বিবাহ হইবে। আমার বন্ধুবান্ধব ছাড়া আত্মীয় স্বজন আর কেহ নাই। আশা করি, তুমি সেই কার্য্যে সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবে।"

বজ্রাহত পথিকের ন্যায় কনক কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিলেন। পরে কার্য্যানুরোধের ছলে মিত্রবরকে বিদায় দিলেন। তাঁহার বন্ধুর বিবাহ— লীলার সহিত! আজ তাঁহার বড় সুখের দিন! কনকের

চিরবর্দ্ধিত সকল আশা এক কথায় ভাসিয়া গেল। পৃথিবীতে মানব-জাতির আশার এইরূপেই অবসান হইয়া থাকে।

কিছুদিবস পরে রাজপুত মুসলমানে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। যুদ্ধকার্য্যে মন সম্পূর্ণরূপে অন্যদিকে ব্যাপৃত থাকিবে ভাবিয়া, কনক প্রতাপের সৈন্যদলে প্রবেশ করিলেন; এবং কার্য্য পটুতায় শীঘ্রই এক সেনা নায়কের পদে উন্নীত হইলেন।

এখানে সদাশিবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কনক কিন্তু তাঁহাকে পুরাতন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সদাশিবও যুদ্ধ বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় উপযুক্ত সময়াভাবে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

একদা কনক ও সদাশিব বিপক্ষ সেনার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণার্থ শিবির সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে একদল অশ্বারোহী তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। বল প্রাধান্য থাকায় তাঁহারা আত্মরক্ষায় নিরস্ত হইলেন,—শত্রু সৈন্যবিপক্ষ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া স্বশিবিরে লইয়া গেল।

এইরূপে বন্দী অবস্থায় যুবকদ্বয় সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতেছিলেন। উভয়েই যথাসাধ্য স্ব স্ব বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিলেন। সদাশিবের মুখ হইতে সময়ে সময়ে আনন্দধ্বনি নিঃসৃত হইতেছিল। কিন্তু কনকের স্থির ধীর বদন শ্রীতে কেবল একটু মাত্র বিষাদের হাসি। প্রতি-বারেই তিনি ক্রীড়ায় জয় লাভ করিতেছিলেন, তথাপি সেই বিষাদ মাখা হাসি টুকু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল না।

যুবকদ্বয় নিবিষ্ট চিত্তে ক্রীড়ামগ্ন আছেন; হঠাৎ পটমণ্ডপদ্বারে একটী গোলযোগ বাধিল। তাঁহারা কি হইয়াছে দেখিবার জন্য উঠিতে ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র একজন রাজপুত সেনা ও অপর দুই জন

মুসলমান সৈনিক তাঁহাদের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজপুত সৈনিক কহিলেন "মহাশয়গণ! আপনাদের মধ্যে এক জন মরিতে প্রস্তুত হউন। আমাদের একজন সেনানায়ককে রাজপুতেরা হত্যা করিয়াছে। মহারাজ মানসিংহ তজ্জন্য আপনাদের মধ্যে একজনকে বধার্থে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অতএব আপনাদের একজনকে আমার সহিত আসিতে হইবে।

সদাশিব স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু কনকের বৃহৎ চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেই বিষাদের হাসিটুকু ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইল, অধর প্রান্ত একটু বিস্ফারিত হইল, তিনি যেন আর একটু হাসিলেন। পরে সদাশিবের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "ভাই, সদাশিব, অনেক দিন হইতে মৃত্যুকামনা করিয়া আসিতেছি। আজ সুযোগ উপস্থিত! কিন্তু স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়া যবন নিপাত করিতে করিতে যে মরিতে পারিলাম না, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়। কি করিব মা ভবানীর বোধ হয় সে ইচ্ছা নয়। জানত, ভাই, এজগতে আপনার বলিতে আমার কেহ নাই। তোমার মাতা, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, পদমর্য্যাদা সবই আছে; আমার কিছুই নাই। অতএব আমিই চলিলাম।

বাক্যস্ফূর্ত্তির পূর্ব্বেই একজন মুসলমান বলিয়া উঠিল "মহাশয়! মিছামিছি বাক্‌যুদ্ধের প্রয়োজন দেখি না। একটু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি আপনারা দাবা খেলিতেছিলেন। পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করুন; তিনবার খেলিতে হইবে। যিনি শেষ বাজী হারিবেন তাঁহাকে আমরা মনোনীত করিব। ইহাতে কেহ কথা কহিতে পারিবেন না। অতএব শীঘ্র এই "অদৃষ্ট পরীক্ষা" ক্রীড়া আরম্ভ করুন।

সদাশিব ইতিপূর্ব্বে বার বার হারিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু হৃদয়াবেগ দমন করিয়া তিনি কহিলেন "তাহাই হউক।" কনক ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার কপাল দেশে বিষাদের রেখা আরও একটু গাঢ়তর হইয়া আসিল! প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ কিয়ৎক্ষণ তিনি চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। তৎপরে সেই বিষাদের হাসি সুচারু অধরে ফুটিয়া উঠিল। কনক বলিলেন—"ভাল! আমিও সম্মত আছি।"

ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সদাশিব যত্ন ও মনোযোগ সহকারে খেলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঐ কিস্তা! সদাশিব তোমার রক্ষা নাই।—ঐ মাৎ! সদাশিবের কপাল ঘর্ম্মসিক্ত হইল।

দ্বিতীয় বাজী—আরম্ভ হইল! সদাশিব বড়ই ভুল চালিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আর কনক!—হতভাগ্য কনক যথেচ্ছ ভাবে চালিতে লাগিলেন।—তথাপি এ বাজীও সদাশিব হারিলেন। আর তাঁহার আশা কোথায়?

হতাশচিত্তে সদাশিব পুনরায় গুটিকাসজ্জিত করিলেন। গভীর মনঃ সংযোগ সহ খেলিতে চেষ্টা করিলেন।—কিন্তু তাঁহার মন কোথায়?—তাঁহার মৃত্যুনিশ্চয়। কনককে তিনি কিছুতেই হারাইতে পারিবেন না।—সতরঞ্চ ক্ষেত্র হইতে তাঁহার মন অন্যমার্গে প্রধাবিত হইল। মাতা, আদরের ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, বিষয়, সম্পদ একে একে তাঁহার মানস-পথে উদিত হইতে লাগিল। তিনি ভুলিয়া গেলেন। কনক সদাশিবের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাকে বলিলেন—"সাবধান! কিস্তী।" সদাশিব চমকাইয়া উঠিয়া কিস্তী রক্ষা করিলেন। কনক যাহাতে নিজে পরাজিত হয়েন সেইরূপ ভাবে চাল চালিতে লাগিলেন।—সদাশিব—বড়ই ঘর্ম্মাক্ত—হঠাৎ

কাষ্ঠাসন হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন!—ঐ কনক বুঝি হারিলেন। সদাশিব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিস্তী! মাৎ!"

কনক সেইরূপ বিষাদ-হাসি হাসিয়া প্রশান্ত চিত্তে রাজপুতকে কহিলেন "মহাশয়, আমি প্রস্তুত! অগ্রসর হউন!" এই বলিয়া সবেগে শিবির বাহিরে আগমন করিলেন। সৈন্যত্রয় তাঁহার অনুগমন করিল।

সদাশিব এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কনক যখন কারাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি স্বার্থপরতাবদ্ধ হইয়া, যে জ্ঞান শূন্য কায করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরে সহসা বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রহরী বাধা দিল। তখন নিরাশ মনে ভূ-শয্যায় বসিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট আছেন হঠাৎ কে যেন তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিল। তিনি সবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—দেখিলেন—সম্মুখে রাজপুত সেনানায়ক।—কহিলেন—"চলুন মহাশয়! আমিও প্রস্তুত আছি।"

বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে রাজপুত কহিলেন—"মহাশয়, আমি আপনার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা লইয়া আসি নাই। আপনার মৃত বন্ধুর পত্র লইয়া আসিয়াছি।"

সদাশিব বিস্ফারিত লোচন যুগল রাজপুত সৈনিকের বদনোপরি স্থাপন করত কহিলেন—"তবে সত্য সত্যই কি কনক মৃত?"

রাজপুত কহিলেন—"আমি তাঁহার বধাজ্ঞা প্রদান করিয়া এখানে আসিয়াছি। পথিমধ্যে বন্দুকের আওয়াজও শুনিয়াছি, এতক্ষণ সব শেষ হইয়া গিয়াছে।"

সদাশিব শূন্য নয়নে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শারীরিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। রাজপুতের ভীম প্রতিহিংসানল শিরায় শিরায় জ্বলিয়া উঠিল। সৈনিক পুরুষ এই সকল লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহাশয়! একটী কথা আছে; আপনার বন্ধু মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি পত্র আপনাকে লিখিয়াছেন! অনুগ্রহ করিয়া পত্র খানি গ্রহণ করুন। আপনি বীর পুরুষ, বিধি-লিপি পূর্ণ হইয়াছে; তজ্জন্য বৃথা অনুতাপে প্রয়োজন কি?—জানেন ত সকলকেই ঐ পথে যাইতে হইবে—সকলকেই একদিন মরিতে হইবে।"

সদাশিব—পত্র গ্রহণ করত আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন, "কিন্তু, অসহ্য! বড়ই অসহ্য—রাজপুত বীরের কুকুরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন বড়ই অসহ্য।"

রাজপুত সৈনিক আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সদাশিব নীরবে পাঠ করিলেন—

ওঁ ভবানী।

"সদাশিব—তোমাকে—আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা লীলার সহোদরকে—বাঁচাইবার জন্য আমি মরিলাম।

তোমার নিকটেই আজ প্রথম হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম। কেন করিলাম? কারণ আজ আমার মহাপ্রস্থান। আশা করি স্বামীসহ লীলা সুখে থাক্—আর তুমি;—তুমি প্রতাপসিংহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া যবন নিপাত কর। এক দুঃখ রহিল—মহারাণা প্রতাপের পার্শ্বচর হইয়া যবন নিপাত করিতে করিতে মরিতে পারিল না।

আর এক কথা—আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা তোমার সকলই জানা আছে। আমি অনাথ আমার কেহ নাই। লীলাকে বলিও সকলই তাহার—সে যেন ভিখারীর ধন বলিয়া চরণে না ঠেলে। আর না! বিদায়—

কনক সিংহ।”

সদাশিব স্তম্ভিত! তাহার হৃদয়ে বন্ধু-বিচ্ছেদানল এতক্ষণ হুহু শব্দে জ্বলিতেছিল। এক্ষণে তিনি এই পত্র পাঠে একেবারে ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। হায়! সেত একদিনের জন্যও তাহার মনের কথা বলে নাই। তাহা হইলে ত লীলা তাহারই হইত। লীলার অদৃষ্টে অমন স্বামী নাই—আজ কি সর্ব্বনাশই সংঘটিত হইল। কনক ত মরিয়াছে—লীলা যদি একথা শুনে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মরিবে। হায়! নিজের জীবনের জন্য কেন এত ব্যগ্র হইয়াছিলাম?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সদাশিব ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। সারা রাত্রি ভীষণ ভাবনা-কুজ্‌ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন রহিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল।

দ্বিতীয় স্তবক।

উক্ত ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। সদাশিব সৈনিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন মোগলের উপদ্রব অনেক কমিয়াছে। বীরপুঙ্গব প্রতাপ-বিক্রমে পর্য্যুদস্ত হইয়া মোগলেরা নিরস্ত হইয়াছে।

সদাশিব একদিবস অশ্বারোহণে পার্ব্বত্য প্রদেশ ভ্রমণে বহির্গত

হইয়াছেন। এই খানেই তিনিও কনক মোগল কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার মলিন ছায়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পতিত হইয়া অরণ্যানীকে কালিমাময় করিতে লাগিল। সদাশিব বাটী ফিরিতে ছিলেন। হঠাৎ অদূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি তাঁহার শ্রবণ পথে প্রবেশ করিল। তিনি অশ্বকে সংযত করিয়া ফিরিতেছিলেন, সহসা বনপ্রান্ত হইতে অশ্বারোহী বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

উভয়ে উভয়কে দেখিলেন। সদাশিব সবিস্ময়ে আরোহীকে নিরীক্ষণ করিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধমনীতে যেন রক্তস্রোত শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজপুতের সাহস তাঁহার হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল—কহিলেন "একি স্বপ্ন? না মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছে?"

আগন্তুক অশ্বারোহী আরও সদাশিবের কাছে আসিলেন। পরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—"না, সদাশিব, স্বপ্ন নহে। মৃত ব্যক্তিও জীবন লাভ করে নাই। আমি মরি নাই, সন্দেহ থাকে এই দেখ,—তোমার ন্যায় আমারও রক্ত মংাস গঠিত দেহ! আমারও ধমনীতে তোমার ন্যায় রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। নিকটেই আমার বাসস্থান—আমার সহিত সেখানে আইস। সমস্ত কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।

কনক সিংহ অশ্ব চালাইয়া দিলেন,—সদাশিবও দ্বিরুক্তি না করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে পর্ব্বত শ্রেণী পশ্চাৎ করিয়া তাঁহারা একটী মনোহর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটী সুদৃশ্য বৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া উভয়েই অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। কনক সদাশিবের হস্ত ধারণ করিয়া একটী বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

উভয়ে উপবেশন করিলে পর কনক সিংহ কহিলেন "সদাশিব, আমি মরি নাই। বধ্য ভূমিতে লইয়া গেলে পর সেই পত্র খানি লিখিয়া তোমাকে দিবার জন্য রাজপুতের হাতে দিলাম। সে ব্যক্তি আমায় মৃত্যুর আজ্ঞা প্রদান করিয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিল। আমি মরিতে প্রস্তুত হইলাম। এমন সময়ে একদল অশ্বারোহী সবেগে আসিয়া ঘাতকদিগের উপর পড়িল। ঘাতকগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। এদিকে অশ্বারোহীদিগের ভীম তরবারী আঘাতে তাহারা একে একে ধরাশায়ী হইল। আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন একটি সজ্জিত অশ্ব আনিয়া আমাকে আরোহণ করিতে বলিল। এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমিও কোন কিছু না বলিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিলাম। পরে এখানে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম যে আমার এক মাতুলই আমার উদ্ধার কর্ত্তা। ইনি একজন সম্পত্তিশালী ও শক্তি সম্পন্ন জায়গীরদার। সম্প্রতি ইহাঁর একমাত্র পুত্র বিয়োগে বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। আমাকে পাইয়া যেন তাঁহাকে কতকটা প্রকৃতিস্থ দেখিলাম। সেই অবধি এখানেই আছি। মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুতে আমিই এক্ষণে তাঁহার পদ ও সম্পত্তির এক মাত্র অধিকারী।"

সদাশিব গদ গদ ভাবে কনককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "কিন্তু ভাই আমাদের খোঁজ লও নাই কেন?"

কনক সিংহ কহিলেন—"প্রথমে খোঁজ করিয়াছিলাম কিন্তু অনুসন্ধান পাই নাই, পরে ভাবিলাম আর কাহার জন্য খোঁজ করিব? ভাই, তুমিতো সবই জান।"

সদাশিব উত্তর করিলেন—"কেন ভাই? কাহার জন্য খোঁজ

করিবে বলিতেছ কেন? লীলা অদ্যাপি জীবিতা। সে সন্ন্যাসিনী ব্রত অবলম্বন করিয়াছে—তোমা ভিন্ন কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না।"

কনক কহিলেন—"সেকি? লীলার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই? আমার কোন এক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই লীলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। সেই জন্যই মৃত্যু কামনা করিয়া সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ওঃ মনুষ্য কি প্রতারক!

সদাশিব উৎফুল্ল নয়নে কহিলেন—"ভাই, সে সব পুরাতন কথায় আর কায নাই। লীলা কাহাকে বিবাহ করিবে? সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর কাহারাও পানে চাহিবে না। এত দিন সে তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিল—আমিও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহার সঙ্গে ছিলাম, প্রায় এক পক্ষ হইল আমরা দেশে ফিরিয়াছি, লীলা ত ভাই, তোমারই।"

সদাশিব নিবৃত্ত হইলেন।—কনকের হৃদয় ভরিয়া আসিল, তিনি দুই হস্তে নয়ন দ্বয় আবৃত করিয়া এক মনে, এক প্রাণে, অনাদি, অনন্ত, করুণার আধার সেই পরমপিতার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

উপরোক্ত ঘটনার একপক্ষ পরেই কনক সিংহের প্রকাণ্ড প্রাসাদ শচীবিনিন্দিত, সুকুমার কান্তি রমণীর কমনীয় নয়ন নিঃসৃত জ্যোতিঃতে আলোকিত হইল।

লীলা ও কনক এই অভাবনীয় অদৃষ্ট পরীক্ষার ফলে সুখী হই-

লেন। কনক লীলার আগ্রহে সর্ব্বদাই এই "অদৃষ্ট পরীক্ষার" গল্প বলিতেন। লীলা তাঁহার পানে অনিমিষলোচনে চাহিয়া থাকিত।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রাখিলে তোমারি।

(১)

লো সুন্দরি—

বিশ্বসম্মোহিনী তব মোহিনী মূরতি
তাহার পূজারি আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ;
একান্তে বসিয়া পূজি' তব রূপ-জ্যোতিঃ
প্রেমের মন্দিরে পাতি হৃদয়-আসন।
কেন আজি অকস্মাৎ হেরি ভাবান্তর,
ঘূর্ণিত লোচন, দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ কর?
রয়েছ বর্ষণোন্মুখ ঘন প্রায় বসি'!
হর, রোষানল দেবি' আন মুখে হাসি।
ডরায় পরীক্ষা দানে এ দীন পূজারি;
মারিলে মারিতে পার রাখিলে তোমারি।

(২)

হে ইংরাজ—

তনুমন প্রাণ সঁপে আপিস মন্দিরে,
তোমায় নিয়ত পূজি' রৌপ্য সিদ্ধি তরে।
আপিসের বড় বাবু আদিষত করি',
সেবি' সেসকল দৈত্যে তপোবিঘ্নকারী।
মন্ত্রের অশুদ্ধি বুঝি কোথায় দেখিয়া,
সরোষে গর্জ্জিয়া তাই পুঁথি আছাড়িয়া
কলার্ক মহলে এলে নিভাঁজ ব্রিটন!
বিদ্যুৎবেগেতে উঠে সবুট চরণ!!
দেহ তত্ত্ববিদ আমি, দিনু পিঠ পাতি,
বৈজ্ঞানিক উপায়েতে সহ্য হ'তে লাথি।
সাধ্য আছে ক্ষমাভিক্ষা, দুইকর জুড়ি'
তাড়ালে তাড়াতে পার রাখিলে তোমারি

(৩)

রে মৃত্যু,—

মানময়ী সুন্দরীর হেরিয়া আনন,
উথলে তরল প্রাণ নয়নের প্রান্তে।
তাহাতেই হয়ে থাকে শরীর পতন,
ক্ষণেকের মধ্যে ইহা বিদিত দিগন্তে।
অথবা গৌরাঙ্গ-বুট দেহে বুলাইলে,
ফাটে প্লীহা—লভে মৃত্যু কালাচাঁদ কুলে।
শিশুকাল হ'তে আমি পড়েছিপুস্তকে,
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কোথা কে।
তবু আধখানি প্রাণ রাখিয়াছি ধরি',
লইলে লইতে পার রাখিলে তোমারি।

শ্রীভাগবত ধর্ম্মঃ।

(৫)

চারিটী অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে অহঙ্কার তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও . বুদ্ধিতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এক্ষণে চিত্ত সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার আবশ্যক, যেহেতু চিত্তই আমাদিগের উন্নতি ও অবনতির একমাত্র কারণ। যথা—

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদং।
যদাহুর্ব্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকং॥ ২০
স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতনঃ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা॥ ২১

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩ স্ক। ২৬ অ।

শ্রীধরস্বামীর টীকা—

প্রসঙ্গাচ্চতুর্ব্যূহোপাসনমাহ। যত্তদিতি সর্ব্বাগম প্রসিদ্ধত্বমাহ।
স্বচ্ছং বিশদং, শান্তং রাগাদিরহিতং।
ভগবতঃ পদং উপলব্ধি স্থানং অতএব বাসুদেবাখ্যং
যদাহুঃ অয়মর্থঃ অধিভূতরূপেণ তস্যৈব মহানিতি সংজ্ঞা।
অধ্যাত্মরূপেণ চিত্তমিতি উপাস্যরূপেণ বাসুদেব ইতি।
অধিষ্ঠাতা তু তস্য ক্ষেত্রজ্ঞঃ।
এবমহঙ্কারে সঙ্কর্ষণ উপাস্যঃ রুদ্রোঽধিষ্ঠাতা।
মনসি অনিরুদ্ধ উপাস্যঃ চন্দ্রোঽধিষ্ঠাতা।
বুদ্ধৌ প্রদ্যুম্ন উপাস্যঃ ব্রহ্মাধিষ্ঠাতেতি জ্ঞাতব্যং॥

অস্যার্থঃ—

যত্তৎ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ এই চিত্ত সত্ত্বগুণ যুক্ত, সচ্ছ (প্রতি-বিম্বগ্রাহী), শান্ত (রাগাদি রহিত) ভগবতঃ পদং (ভগবৎ প্রতিবিম্বের

গ্রাহক, অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হইলে, এই চিত্তেই ভগবৎদর্শন ঘটিয়া থাকে), অতএব উপাস্যরূপে এই চিত্তই বাসুদেব, এবং মহত্তত্ত্বের স্বরূপ, এবং অধিষ্ঠাতারূপে ক্ষেত্রজ্ঞঃ। এইরূপে অহঙ্কার তত্ত্বের উপাস্য দেবতা সঙ্কর্ষণ এবং রুদ্র অধিষ্ঠাতা। মনস্তত্ত্বের উপাস্য অনিরুদ্ধ এবং চন্দ্র অধিষ্ঠাতা। এবং বুদ্ধিতত্ত্বের উপাস্য প্রদ্যুম্নদেব এবং ব্রহ্মা অধিষ্ঠাতা। এই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই চারিটী শ্রীভগবানের পুরুষাবতার। ইহাকে চতুর্ব্যূহ কহে। শাস্ত্রেতে জলের সহিত এই চিত্তের উপমা দৃষ্ট হয় যথা "যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা" অর্থাৎ জলের পরা প্রকৃতি যেরূপ স্বচ্ছতা (প্রতিবিম্বগ্রাহা), এবং শান্ত অর্থাৎ ফেনতরঙ্গাদি রহিত, অবিকার অর্থাৎ লয়বিক্ষেপ-রহিত, এই চিত্তও সেইরূপ। জল স্বভাবতঃ নির্ম্মল এই চিত্ত স্বভাবতঃ নির্ম্মল, নির্ম্মল জল যেরূপ সমস্ত পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম, এই চিত্তও সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাশা, জিহ্ব ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বহির্বিষয়গুলি অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, গ্রহণে সমর্থ। এক্ষণে চিত্তের বিষয় গ্রহণ ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে যথা—

সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণের মধ্যে কেবল সত্ত্বগুণই জ্ঞানময় বা প্রকাশ স্বভাব। মানবচিত্ত ঐ সত্ত্বগুনযুক্ত বলিয়াই উহা জ্ঞানময় বা প্রকাশ স্বভাব। মানব চিত্তই সমস্ত জড় বিষয়ের জ্ঞাতা বা প্রকাশক। যদি কেহ বলেন যে চিত্তই যদি প্রকাশ স্বভাব হয়, তবে তাহাতে এক কালীন বা যুগপৎ সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত না হয় কেন? অর্থাৎ কি কারণে এই জ্ঞানময় মানবচিত্ত যুগপৎ সর্ব্ববস্তু জানিতে বা স্মরণ করিতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর এই—

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়ার অপেক্ষা থাকায় বস্তু সকল কখন

জ্ঞাত কখন বা অজ্ঞাত অর্থাৎ প্রতিবিম্ব কালে জ্ঞাত, অন্য সময়ে অজ্ঞাত থাকে। মানবচিত্ত প্রকাশ স্বভাব জ্ঞান স্বভাব বটে, কিন্তু তাহাতে বস্তু প্রকাশ হইবার অন্য একটি কারণ আছে। সে কারণ কি ? তাহা বলিতেছি। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা চিত্তে যে বস্তুর আকার অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ চিত্ত ইন্দ্রিয় পথে নির্গত হইয়া যে বস্তুতে উপরোক্ত হইবে, সেই বস্তুই চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, অন্য বস্তু অপ্রকাশ্য থাকিবে, ইহাই নিয়ম, ইহাই তাহার স্বভাব। সেই জন্যই বস্তু থাকিলেও, চিত্ত প্রকাশ স্বভাব হইলেও যুগপৎ বা এক সময়ে সকল বস্তু প্রকাশিত হয় না।

চিৎ স্বরূপ আত্মা বা পুরুষ এই চিত্তকে সর্ব্বদা জানেন বা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মা অপরিণামী, সেই জন্য তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার জ্ঞাতা বা সাক্ষী। তাৎপর্য্য এই যে চিত্ত প্রকাশ স্বভাব বটে, কিন্তু সেও স্বয়ং প্রকাশ নহে। তাহারও অন্য এক প্রকাশক আছে। সেই প্রকাশক নিত্য চৈতন্যরূপ আত্মা। মানবচিত্ত যেরূপ বাহ্য বিষয়ের প্রকাশক, আত্মা ও সেইরূপ চিত্তের প্রকাশক বা জ্ঞাতা। তবে যাহা বস্তু গন্ধ চিত্তে প্রতিবিম্বিত না হইলে প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাহার্য্য ব্যতীত কোনও বস্তু চিত্তের জ্ঞেয় বা প্রকাশ্য হইতে পারে না, কিন্তু চিত্ত আত্মার নিকট সর্ব্বদাই জ্ঞেয়। সেই জন্য আমাদিগের চিত্তে যখন যে ভাবে উদিত হয়, আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি।

অনাদি ঈশ্বর বৈমুখ্য দোষে চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ এই আত্মা দেবমায়া বিমোহিত অর্থাৎ অবিদ্যা শক্তি দ্বারা তাহার জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, তিনি আত্মহারা হইয়াছেন, অর্থাৎ আমি কে ?

তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। এবং জ্ঞান স্বভাব এই চৈতন্য সন্নিধান বশতঃ মানব চিত্তে ঐ প্রকাশ শক্তি আবির্ভূতা হয়। অর্থাৎ চিত্ত স্বচ্ছ ও সত্ত্বময় হইলে ও আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না, আত্মা তাহাকে চৈতন্যই প্রকাশিত করে। নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মা সচ্ছ স্বভাব চিত্তে অবিষ্ট অথবা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই অবিবেক বশতঃ চিত্তকে অহং অর্থাৎ আমি এইরূপ অভিমান হইয়া থাকে। অজ্ঞান শিশু দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, প্রতিবিম্বকে যেমন "আমি" বলিয়া তাহায় প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ অনাত্মচিত্তেতে আত্মার অহং (আমি) এই অভিমান জন্মিয়াছে। সুতরাং রূপ রস, শব্দ, গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্য বস্তু সকল ইন্দ্রিয় প্রণালীর দ্বারা যেমন চিত্তে প্রকাশিত হয়, "আমি দেখিতেছি", "আমি শুনিতেছি" ইত্যাদি আত্মার অভিমান হইয়া থাকে। ফল কথা আত্মা কিছুই করেন না, আত্মা সম্পূর্ণ অকর্ত্তা। দেহ ধর্ম্মাদি অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে ঐ সকল কার্য্যে অহং কর্ত্তা এই রূপ অভিমান থাকা প্রযুক্ত আত্মাই ঐ সকল কর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন যথা—

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মানেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিনো নির্বৃতাত্মনঃ॥
কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখ দুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥

অস্যার্থঃ—

এবং পরাভিধ্যানেন, প্রকৃতিরেবাহং ইতি মননেন, প্রকৃতে গুণৈঃ ক্রিয়মানেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বমাত্মনি মন্যতে। ইত্যন্বয়। অর্থাৎ পরকে আমি অর্থাৎ প্রকৃতিই "আমি" এইরূপ জ্ঞান হওয়াতে সত্ব রজঃ ও তমঃ প্রভৃতি প্রাকৃত গুণ দ্বারা এই সংসারে যাবতীয় কার্য্য হইতেছে, আত্মা ঐ সকল কার্য্যে আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তদস্য পুরুষস্য সাক্ষিমাত্রত্বাৎ অকর্ত্তুরেব সতঃ কর্ম্মভির্বন্ধঃ। অর্থাৎ সেই জন্য আত্মা অকর্ত্তা, কেবল, সাক্ষি স্বরূপ হইয়াও তাহার এই কর্ম্মবন্ধ। ঈশ অর্থাৎ অপরতন্ত্র হইয়া ও তাহার এই ভোগপারতন্ত্র। নির্বৃতানঃ অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও তাহার এই জন্ম মৃত্যু প্রবাহ রূপ সংসার দুঃখ হইতেছে।

কার্য্য কারণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং দেবতাবর্গ এ সকলের তত্তদ্ভাব প্রাপ্তি বিষয়ে, পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া থাকেন, কেন না কুটস্থ আত্মার স্বতঃ বিকার নাই কিন্তু সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে আত্মা তাহাকেই কারণ বলিয়া থাকেন। কেননা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি কার্য্য মাত্রই জড়াবসান, এই জন্য তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য পরন্তু ভোগ জ্ঞানাবসান এই জন্য তাহাতে চৈতন্যের প্রাধান্য।

অনাদি কাল হইতে ঈশ্বর বৈমুখ্য দোষে ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক আত্মার এই স্মৃতিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অর্থাৎ যাহা আমি নহে, তাহাতে (সেই দেহেতে) "আমি" জ্ঞান, এবং যাহা আমার নহে, তাহাতে (পুত্র কলত্রাদির দেহেতে) "আমার" জ্ঞান অর্থাৎ অহং মম অভিমানকেই ভব রোগ বলে। এক্ষণে যদি কেহ বলেন যে অনাদি অজ্ঞানই এই ভব

রোগের নিদান, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ দ্বারা জীব ভবরোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না কেন না শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে দেহ হইতে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অতএব আমি দেহ নহি তাহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে জ্বলন্ত অঙ্গার যদি আমার দেহের কোন স্থানে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে দেহের সেই স্থান দগ্ধ হইবে, কিন্তু আমি দেহ হইতে পৃথক জ্ঞান সত্বেও "উহু পুড়ে মরিলাম" বলিয়া চীৎকার করি কি জন্য? আত্মা চৈতন্য বস্তু, জড়ের ধর্ম্ম উহাতে নাই। অর্থাৎ আত্মা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বা অগ্নিতে দগ্ধ, বায়ুতে শুষ্ক অথবা জলেরদ্বারা ক্লেদ যুক্ত হন না। যথা—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ॥
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
শ্রীভগবদগীতা। ২য় অঃ।

অতএব জানা যাইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না, আর হইবেই বা কি প্রকারে? বায়ুপশমের জন্য পিত্তদমনের ঔষধ প্রয়োগে ফল হয় কি? ভবরোগের নিদান হইল ঈশ্বর বৈমুখ্য দোষ, অতএব ঈশ্বরে উন্মুখ হওয়াই উহার প্রকৃত ঔষধ! অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশ্বরে ভক্তি যোগই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীবসন্তলাল মিত্র,
শ্রীবৃন্দাবন।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি?

বিষয়টী বড় গুরুতর। জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি—এ কঠিন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার; কারণ সৌন্দর্য্য

সকলের চক্ষে সমান নহে। আমার নিকট যাহা অতীব কমনীয় বলিয়া বোধ হয় অন্যের নিকট তাহা সুন্দর না হইলেও হইতে পারে। যাহাকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভাবিয়া আমি হয়ত অতি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, অন্যে হয়ত তাহা দেখিয়া উপহাস করিলেও করিতে পারেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখিয়া কাহারও অন্তর পুলকিত হয়, কেহ বা তাহার বীভৎস দৃশ্য ভালবাসেন। স্বচ্ছ যমুনার জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, চন্দ্রালোকে সমস্ত জগৎ বিধৌত, মন্দ সমীরণ স্পর্শে যমুনার জল কাঁপিয়া উঠিল দেখিয়া কোন সৌন্দর্য্য-ভিখারী-প্রাণ বিস্ময় গান গাহিলেন—

"হেন নিশি, একাআসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভেসে যায়।"

আবার এমন হৃদয়ও আছে, যাহার উৎস এ প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে জাগরিত হয় না। গগনমণ্ডল ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইবে, চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ মূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিবে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও খেলিয়া অন্ধকারকে অধিকতর ঘনীভূত করিবে, তবে তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন। তাই বলিতেছি সৌন্দর্য্য এক প্রকার নহে। মনুষ্যের রুচি এবং মানসিক প্রবৃত্তি অনুসারে সৌন্দর্য্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি কখনও এক হয় না। অবস্থা অনুসারে দেশকাল ভেদে প্রবৃত্তির পার্থক্য হইয়া থাকে এবং সেই পার্থক্যের জন্যই সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন বিভিন্ন আকার। এই কারণেই প্রথমে বলিয়াছি প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে কি তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ কথা নহে। সকলের জন্য এক সাধারণ উত্তর এপ্রশ্নের হইতে পারে না ; কেননা জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, এ প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক না কেন তাহা কখনও সর্ব্ববাদী সম্মত হইতে পারে না।

ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি—যিনি ঈশ্বরের ধ্যানে সতত নিমগ্ন, পরমার্থ ধ্যান যাঁহার একমাত্র জ্ঞান, ঈশ্বরে ভক্তি যাঁহার একমাত্র সহায় এবং সম্পদ, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি' তিনি বলিবেন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই জীবনের সৌন্দর্য্য, ঈশ্বরের ভক্তিমালা যাঁহার হৃদয়ে অহরহঃ বিদ্যমান তিনিই প্রকৃত সুন্দর। নাস্তিককে জিজ্ঞাসা কর জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, তিনি বলিবেন নৈতিক উন্নতিই জীবনের সৌন্দর্য্য। ঈশ্বরে ভক্তি কর বা না কর, যাহা কল্পনা বহির্ভূত তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর বা না কর কিন্তু জ্ঞান এবং শিক্ষানুমোদিত সৎপথ বিবর্জ্জিত হইও না। সমাজের উন্নতি সাধন কর, সমাজকে ঈশ্বর বলিয়া ভয় কর, মনুষ্যজাতির দুঃখে সহানুভূতি দেখাও এবং অন্যকে প্রতারিত করিয়া নিজে সুখী হইতে প্রয়াসী হইও না, তাহা হইলেই জীবনের সৌন্দর্য্য লাভ করিবে। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা কর প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি? সন্ন্যাসী বলিবে আত্মার স্বাধীনতাই জীবনের সৌন্দর্য্য। কিসের জন্য সংসার, কয় দিনের জন্য সংসার, নদী হৃদয়ে শসবিঃ প্রায় আজ আছে কাল নাই এবং সংসারের প্রতি এত লালসা কেন? যাহা মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইতে পারে, একজনের অভাবে যে সংসার তোমার নিকট দুঃখের আগার হইতে পারে তাহার প্রতি এত ভালবাসা কেন? এ বন্ধন ছিন্ন কর, বিজন বনের নিবাসী হও, ছার সংসার পানে আর চাহিও না, কঠোর ব্রত ধারণ কর, সংসারের মায়া সংসারের সুখের আশা জীবনের যাহা কিছু সব বিসর্জ্জন কর, আত্মা স্বাধীন হইবে, উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইবে। যিনি গৃহী তিনি বলিবেন 'সংসারের ভালবাসাই জীবনের সৌন্দার্য্য'। যে মায়ার আধিক্য বশতঃ আমরা দুঃখের জীবনও ছাড়িয়া যাইতে চাহিনা সেই মায়াই আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব।

"This length of road, this rude bench one torturing hope endeared" সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয়, সংসারের লোককে আমরা ভালবাসি, সেই ভালবাসার আবির্ভাবে সংসারে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই তাহাই জীবনের সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মত কেন, তাহার কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক সৌন্দর্য্য কি, আর মনুষ্য জীবনেই বা প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, আমরা সেই সম্বন্ধে এখন দু চারিকথা বলিব। সৌন্দর্য্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য এবং অন্তরের সৌন্দর্য্য। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য যতই মহৎ হউক না কেন আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ পদার্থ। সুতরাং আমরা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কথা পাড়িব না, অন্তরের অথবা প্রকৃত সৌন্দর্য্য যাহা তাহাই নির্দ্দেশ করিব। এ সৌন্দর্য্য কি ? কোন পদার্থের সদ্‌গুণকেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলে। কোকিলের সৌন্দর্য্য তাহার কুহু স্বর; ফুলের সৌন্দর্য্য তাহার সুগন্ধি, চন্দ্রের সৌন্দর্য্য তাহার সুস্নিগ্ধ রশ্মি। এই সমুদায় গুণ যদি ইহাদের না থাকিত তাহা হইলে কবি জগতে আজ ইহাদের এত গৌরব থাকিত না। সক্রেটিসের কদাকার চেহারা আজ কেহই মনে করিয়া রাখিত না, যদি তাঁহারা অন্তরে অশেষ গুণাবলী লুক্কায়িত না থাকিত—যেমন জন্মিয়াছিলেন তেমনই বিলীন হইয়া যাইতেন। এসমস্ত কথায় অনেকে মনে করিতে পারেন বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। আমি সে কথা বলিতেছি না। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় বাহ্যিক সৌন্দর্য্য যে নিষ্প্রভ এবং সামান্য তাহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। যাহাই হউক প্রকৃত সৌন্দর্য্য অন্তরের জিনিষ—বাহিরের নহে। তাহাই যদি না হইবে রাজার

ছেলে রাজা হইয়া রাজ্য ছাড়িবে কেন? আমরা সকলে পার্থিব সুখের প্রয়াসী। ধন সম্পদ পাইলে আমাদের জীবনের আশা মিটিল। পর্ব্বত পরিমাণ উচ্চ অট্টালিকা সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া থাকিবে, মেদিনী কাঁপাইয়া দাপটের সহিত চৌঘুড়ি হাঁকিব, সম্পদশালী হইয়া অন্যকে নিষ্পীড়ন ও পদদলিত করিব এবং যে বাসনাই হউক না কেন হৃদয়ে আসিবামাত্র তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিব, ইহাই যদি করিতে পারিলাম তবে মনে মনে একটু অহঙ্কার জন্মিল একটু সুখও হইল, কেন না হাম্‌তো বড়া হ্যায়। এইত আমাদের সৌন্দর্য্যের চরমসীমা। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যাহার এ সমুদায় কিছুরই অভাব ছিল না, সে ব্যক্তি সে সমুদায়ই পরিত্যাগ করিল। রাজ্য ছাড়িল, নব প্রসূত সন্তান ছাড়িল, পিতামাতা ভাই বন্ধু পরিজন সংসার যাহারা সুখ এবং বন্ধন, সে সব পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্য মান পায়ে ঠেলিয়া সংসারে যে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত কি অন্য কিছুর তুলনা হয়? তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন, তাঁহার পরদুঃখ কাতরতা, জীবের উদ্ধার সাধনের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা, অকাতরে পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার অকপট বাসনা এ সমুদায় কি বুদ্ধ দেবের জীবনের অতুল সৌন্দর্য্য নয়? বুদ্ধ দেবের জীবনের কেন, এ সমস্ত গুণ কি মনুষ্য জীবনের সৌন্দর্য্য নহে? কোন প্রাণী একাল পর্য্যন্ত আত্মবিসর্জ্জন এবং পরদুঃখে সহানুভূতি ব্যতিরেকে এসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন বলিতে পার? আলেকজণ্ডর এবং সিজার, উভয়েই প্রথিত নামা। স্বীকার করি তাঁহাদের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল। সিজার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু নিজের হৃদয়ের রাজা হইতে পারিয়াছিলেন কি? দক্ষিণ বাহুতে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল, বটে কিন্তু হৃদয়ে

তাঁহার কতটুকু শক্তি ছিল ? ক্লিয়োপেট্রার লাবণ্য-রজ্জুতে কি তিনি বাঁধা পড়েন নাই? রাজা হইবার অদম্য পিপাসা কি তাঁহার হৃদয়ের বলবতী ছিল না ? দুই হস্তে অসি ধারণ করিয়া মনুষ্য জাতির রক্তে জগৎকে কি প্লাবিত করেন নাই? আজ তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া এ সংসারে কে মহৎ হইয়াছে ? তিনি মহৎ হইয়াছিলেন কিন্তু ভাবিয়া দেখ যে মহত্ব এখন কোথায়? অসীম সংসার পানে চাহিয়া দেখ তিনি জগতের কি উপকার করিয়া গিয়াছেন ? কিছুই নহে—যে রক্তপাত হইয়াছিল তাহা বহুকাল হইল ধুইয়া গিয়াছে এখন আর তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। তাই বলি বাহুবল অতি সামান্য। বাহুবলের সহায়তায় জীবনের উন্নতি হয় না—সংসারেরও উপকার হয় না। নৈতিক বলই প্রকৃত বল। যত প্রকার শক্তি জগতে আছে সমুদায়ই নৈতিক বলের নিকট নতশির হইবে। আজই না হউক কালই না হউক দশদিন পরে হইবেই হইবে। নৈতিক বলের ধ্বংশ নাই। সংসার ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব বহুকাল হইল অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, কিন্তু আজও লোকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার চরিত্রের আদর্শ লইয়া মহৎ হইতেছে। পরদুঃখ কাতরতা এবং অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য ছিল—শত শত লোক সেই আদর্শ ধরিয়া তাহাদের চরিত্র অলঙ্কৃত করিবে।

নৈতিক বল ও বাহুবলের দৃষ্টান্ত দেওয়াতে আলেকজণ্ডার এবং সিজারের চরিত্রে দোষারোপ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ ভাবিবেন না যে ওয়াসিংটনের ন্যায় বীর চূড়ামণিকে আমরা ভালবাসি না। তিনি বাহুবলে স্বদেশে স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু বাহুবল অপেক্ষা তাঁহার নৈতিক বল অধিক প্রবল ছিল।

মাতৃভূমি বৈরী পদতলে নিষ্পেষিতা হইতে ছিল ইহা তাঁহার বীর-হৃদয়ে অসহনীয় হইয়াছিল—তাই অসি ধরিয়াছিলেন। আমি বড় হইব, স্বদেশ বাসী আমাকে পূজা করিবে, এ অসার আশা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার মনে এরূপ দুরভিসন্ধিছিল না যে দিগ্বিজয় করিতে গিয়া অসংখ্য দেশ ভস্মীভূত করিবেন। স্বদেশ উদ্ধারের জন্য খড়্গ ধরিয়াছিলেন সে অভিলাষ পূর্ণ হইলে সে অসি আবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে যাঁহার দম্ভ নাই, নিপীড়িতের দুঃখ মোচনের জন্য যিনি অসি ধরেন, তিনি মহৎ ভিন্ন আর কি? বৃথা শোণিত প্রবাহে পৃথিবীকে ভাসাইতে তাঁহার বাসনা ছিল না, যাহা অনিবার্য্য তাহাই ঘটিয়াছিল। বাহুবল বাঞ্ছনীয় যদি নৈতিক বলের অনুবর্ত্তী হয়—নহিলে নিকৃষ্ট জীবের মধ্যেও বহুল পরিমাণে শারীরিক বল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ওয়াসিংটনের বীরত্ব, নৈতিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং তাঁহার জীবন সৌন্দর্য্যময়।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, একথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক কথা লিখিলাম। আমরা আত্ম বিসর্জ্জন এবং পরদুঃখকাতরতা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিয়াছি মাত্র। ইহা ভিন্ন অন্যান্য গুণও চরিত্রের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিনয় একটী প্রধান গুণ। তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত যীশুখ্রীষ্ট এবং আমাদের অতুলনীয় অক্ষয় গৌরব স্তম্ভ শ্রীচৈতন্যদেব। ইঁহারাও আত্মত্যাগ এবং বিশ্বজননী প্রীতির আদর্শ। বুদ্ধদেবের ন্যায় ইঁহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন। "আমি মহৎ" ইঁহারা এ জ্ঞান বর্জ্জিত ছিলেন। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেন। তাহার জন্য কতদুঃখ লাঞ্ছনাই যে অকাতরে সহ্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যিশু প্রাণে মরিলেন কিন্তু

শত্রুগণ যখন তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতেছে তখনও তাঁহাদেরই জন্য মঙ্গল কামনা—ইহাপেক্ষা সৌন্দর্য্য আর কি হইতে পারে জানি না। এই অমানুষিক সৌন্দর্য্যের গুণেই ইউরোপ খণ্ডে যীশু খ্রীষ্টকে এবং বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করা হয়।

আপনাদের সম্বন্ধে এই তিন জন যোগীঋষির দৃষ্টান্ত দিলাম, যেন না প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাঁহাদেরই ছিল। সেই জন্য কি সকলকে সংসার বিরাগী হইতে হইবে ? তাহা নহে—এই সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া মহৎ হইতে হয়, আর প্রকৃত মহত্বই বা কি, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাদের মত হউক ইহা অভিপ্রেত নহে। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত লইয়া জগৎ উন্নত হউক ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সংসারে থাকিয়া কি উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইতে পারে না ? অবশ্যই পারে। সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

পরদুঃখে যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, দুঃখীর শোকাশ্রু মুছাইবার জন্য যিনি সর্ব্বদা অঞ্চল প্রসারিত করিয়া থাকেন, তিনিই মহৎ। নিঃসহায়কে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য Wilberforce এর প্রাণ ব্যকুল হইয়াছিল তাই ইতিহাস তাঁহাকে লইয়া উজ্জ্বল। সতীদাহ দেখিয়া রামমোহন রায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাই তিনি আজ বঙ্গদেশের গৌরব। বিদ্যাসাগরের চিতানল আজও যেন ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে। সে মহাত্মার মহিমা কখনও কি নিষ্প্রভ হইবে ? সে জীবনের সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ কখনও নির্ব্বাণোন্মুখ হইবে না। বঙ্গদেশে বিধবা নাম বিলুপ্ত হইবে না, কেহ বিদ্যাসাগরকে ও ভুলিবে না। দীন দুঃখীর অশ্রুজল কখনও শুকাইবে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহানুভূতিও কেহ বিস্মৃত হইবে না, ইহারা সংসারী ছিলেন। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার সহিত সংগ্রাম করিয়া মহৎ হইয়া-

ছিলেন। পরদুঃখ কাতরতা সহৃদয়তা আত্মবিসর্জ্জন ইহা সংসারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। এই সমস্ত গুণাবলী অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হও। জীবন সুন্দর হইবে। পরদুঃখ মোচনে ব্রতী হও। এই প্রকৃতিই জীবনের মহত্তর সৌন্দর্য্য—ইহা ভিন্ন মহত্বর গুণ আর কি হইতে পারে জানি না। অসার সংসারে, ক্ষণ স্থায়ী জীবনে যদি কিছু সার থাকে, তবে সে স্বার্থ-ত্যাগ এবং পরহিত ব্রত। সেই জন্যই কবি বলিয়াছেন "ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলিয়া যায়—তবে পরোপকার সে শান্ত।"

শ্রীআশুতোষ পাড়ে।

কৃষ্ণনগর।

কালিদাস প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কালিদাসের স্বভাববর্ণনা অতি চমৎকার। তিনি মেঘদূতে পর্ব্বত নদী ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাকালে পারস্য প্রভৃতি দেশের এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে বিশিষ্টরূপে চক্ষে দেখিয়াও সেরূপ বলা যায় না। বনের শোভা কি চমৎকার! কুমার সম্ভবে হিমালয়বর্ণ-নাদি এরূপ চমৎকার যে সেরূপ নেত্রগোচর করিয়া উপলব্ধি করা নরের পক্ষে সাধ্যাতীত। এই ত স্থলশোভা সম্বন্ধে। অগাধ সমুদ্র অনন্ত জলরাশি গণ প্রান্তে গগনের সহিত মিশিতেছে—যেন নাচে বারি রাশির নীলপ্রভা গগনের নীলিমার সহিত মিশিতেছে। আহা জলধির সৌন্দর্য্য কালিদাসই দেখিয়াছেন। বর্ণনা পাঠে প্রাণ মন যেন পুল-কিত লয়। একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতিবেলা লবনাম্বুরাশে
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

তা'র পর রথারোহণ পূর্ব্বক ত্রিদিব হইতে ভূতলে অবতরণ। পাঠক! এদৃশ্য দেখিলে কি মন আনন্দে উথলিয়া উঠে না? ইহাও কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' দেখাইয়াছেন। অতঃপর আর স্বভাব বর্ণনার বাকি কি রহিল? ভূতল পাতাল ও স্বর্গ তিন ভুবনের দৃশ্যই কলিদাস দেখিয়াছেন। ঋতুসংহার নামক গ্রন্থে কালিদাস গ্রীষ্ম বর্ষাদি ষড় ঋতুবর্ণনাতে পত্রপুষ্পফলে বসুমতী কিরূপ সুসজ্জিতা হন তাহাও দেখিয়াছেন। আবার মানবাদি সকলের লীলাদিও বর্ণনা করিয়াছেন। দেবগণের কার্য্যকলাপ, ঋষিগণের যাগযজ্ঞ, শূরগণের বীরত্ব কাহিনী; দেবাসুরের যুদ্ধ, নৃপতিগণের ধর্ম্মকর্ম্ম, প্রজাপালন ইত্যাদি সমস্ত কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন।

কালিদাসের সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে দেখা যায় যে তিনি বিশেষ কিছুই বর্ণনা করিতে বাকি রাখেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে কালিদাস চরিত্রসৃষ্টি তত অধিক করেন নাই কিন্তু তৎপ্রণীত গ্রন্থে তিনি বিভিন্নচরিত্র ব্যক্তি অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন দেখা যায়। রঘুবংশে তিনি মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। উহাতে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট চরিত্র নৃপতিবৃন্দেরও বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভব কাব্যের উমাচরিত্র কালিদাসের চরিত্র সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা। নলোদয়ে নলরাজাও সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তারপর মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকত্রয়ে অনেক প্রকার চরিত্র পাওয়া যায়। কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ

তৎকালে সমাজে যত প্রকারের লোক দৃষ্টিগোচর হইত তত প্রকার চরিত্রই কালিদাস আঁকিয়াছেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার চরিত্রের লোকই কালিদাসের নাটকান্তর্গত।

অভিজ্ঞান শকুন্তল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। ইহাতে যেন তাঁহার সমস্ত বিষয়ের কেন্দ্রীকরণ হইয়াছে। ইহাতে রাজা, ঋষি, বিদূষক, কঞ্চুকী, ধীবর, রাজপুরুষ, শ্রেষ্ঠি, দিব্যপুরুষ, অপ্সরা, রাক্ষস সমস্তই আছে। বিদেশীয় জার্ম্মাণ মহাকবি গেটে শকুন্তলার অনুবাদ পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন ;—"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের, অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"

অনেকে মহাকবি কালিদাসের সহিত মহাকবি সেক্ষপীয়রের তুলনা করিয়া থাকেন। দুইজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা সুকঠিন। কেহ বলেন কালিদাস ভারতের কবি আর সেক্ষপীয়র জগতের কবি। পণ্ডিতবর উইলসনের মতে কালিদাস সেক্ষপীয়র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটককার। উইলসন লিখিয়াছেন ;—"যদি সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্য কেহ একস্থানে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অধ্যয়ন করুন।" তবেই দেখা যাইতেছে যে এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমারা দেখিতে পাই যে যাহা সুন্দর তাহাই কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা সুন্দর নহে তাহার অবতারণা করেন নাই। সেক্ষপীয়র সুন্দর অসুন্দর সমস্তই দেখাইয়াছেন।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্গত রাগদ্বেষ হিংসাদি কালিদাস আদৌ অঙ্কিত করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে একটী ইয়াগো বা ম্যাকবেথের ন্যায় প্রকৃতির লোক কদাচ দৃষ্ট হয়।

কালিদাসের সহিত ভবভূতিরও তুলনা হইতে পারে। উভয়েই একদেশীয় মহাকবি। উভয়েই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত দুইজনে সমসাময়িক নহে এইমাত্র প্রভেদ। ভবভূতি পরবর্ত্তী কবি। কালিদাসের রচনায় মাধূর্য্যগুণ প্রধান। ভবভূতির রচনায় ওজো গুণ প্রধান। অথবা কালিদাসের রচনা অমৃতময়ী, ভবভূতির রচনা অম্লামৃতময়ী। ভবভূতির বীররসের অবতারণা প্রকৃতই চমৎকার। কালিদাসের বীররসের অবতারণা বড় অধিক তেজস্বিনী বোধ হয় না। রঘুবংশে অজরাজার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ এবং অবশেষে সম্মোহন বাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক উহাদের নিদ্রিত করণ,—এই বিবরণও উত্তর চরিতে রামের সহিত লবকুশের যুদ্ধ এবং পরস্পরের বীর বাক্য প্রয়োগ এই দুইটী একত্রে পাঠ করিলে উক্ত কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

কালিদাসের সময়ে অধিকাংশ লোক কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছিল। উহাদের আত্মসংযম ছিল না। সুখভোগকেই উহারা জীবনের হেতু ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে স্বর্গের সেতু মনে করিত। কালিদাস নিজেও ঐ দোষ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। উঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই আদিরসাশ্রিত।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার 'রত্নগণ' মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাঁহার তুল্য বিদ্বান ব্যক্তি তৎকালে ছিল কি না সন্দেহ। তৎকালে প্রচলিত সকল বিদ্যাতেই তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। চতুঃষষ্ঠী কলাতে তিনি বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নামক

নাটকে তিনি নৃত্যগীতাদিতে যে পারদর্শী ছিলেন তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীনাটকেও নাটক সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ভূতত্ত্ববিদ্যা ভূগোল বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতিতে ও স্বাস্থ্য বিষয়ে, স্বপ্ন ফলাফল বিষয়ে কালিদাসের বিশেষ জ্ঞান ছিল। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক কথা তাঁহার কাব্য মধ্যে পাওয়া যায়। 'রঘুবংশে রঘুর জন্মকালে পাঁচটি নক্ষত্র তুঙ্গস্থান অধিকার করিয়াছিল' 'চন্দ্র দর্শনে সমুদ্র উথলিয়া উঠে, প্রভৃতিই উহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার কাব্য পাঠে তৎকালের প্রচলিত আচার ব্যবহার, রীতি নীতি অনেক জানিতে পারা যায়। ফল কথা কালিদাস একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে থাকিলে ও তাহা পাঠকে অপ্রীতিকর নহে। তিনি যাহাই লিখিয়াছেন। তাহাই মধুরর হইয়াছে৭ আর কোনও কবির রচনা ওরূপ মধুর হয় নাই। কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল বলিয়াই তাঁহার লেখনী হইতে অবিরত অমৃতময়ী রচনা বাহির হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন গুপ্ত।

সমাপ্ত।

নাটকের অপর পৃষ্ঠা।

বৃদ্ধ ও যুবা।

শৈশবপুর—পল্লিগ্রামস্থ চণ্ডিমণ্ডপ।

যুবা।—আপনাদের সেকেলে সবই এক রকম। বসে বসে ভড় ভড় করে তামাক খাচ্চেন। তামাক নিয়ে এসরে, হুকা নিয়ে এসরে, জল পোররে, ছিঁচ্‌কে দাওরে, হুকায় তেল মাখাওরে, টিকে নিয়ে

এসরে কলকে নিয়ে এসরে, টিকে ধরাও রে ; তবে এক ছিলিম তামাক খেতে পারা যাবে। আমাদের কোন ল্যাটা নেই—চুরুটটী আন, দেশলাইটী বার কর—আর টান। অত হ্যাঙ্গামা নেই।

বৃদ্ধ। ইংরাজদের গুটুকুও তোমাদের মিষ্টি লাগে। আবহমান কাল থেকে এই চলে আসৃচে। এত দিন এর দোষ বেরুল না এখন দু'পাত ইংরাজী বই উল্‌টে একেবারে দিগ্‌গজপণ্ডিত।

যুবা। কেন মশাই, চুরুটে কি দাঁতের গোড়া শক্ত হয় না ?

বৃদ্ধ। ও চুরুট খাবার একটা অছিলা। যদি তামাকের নেশাই কত্তে হয়, তাহা হইলে তামাক খাওয়া ভাল। তামাকের কাট হুঁকার নলচের ভিতর কত জমে দেখেছ ? তোমাদের অত শত দেখা অদেখা আর এখন নাই। এখন কিসে লোকে সাহেব বলিবে তাই হলেই হলো। পচা গরমীতে মরিবে তবু গায়ের এক বস্তা কাপড় খুলিবে না। এখন তোমাদের কাছে হিন্দুদের একাদশী মন্দ, নিরামিষ ভোজনে শরীরের জোর হয় না, বাঙ্গালীর কাপড় চোপড় গুলা ঝ লঝলে ; সব জাতির মাথার একটা আবরণ দেওয়ার প্রথা আছে হতভাগা বাঙ্গালীদের কিছুই নাই। এই রকম গোটা কতক বুকনি আদর করে রেখেছ।

যুবা। মশাই ধান ভান্‌তে শিবের গীত নিয়ে এলেন। হচ্ছিল তামাকের কথা, তা না হয়ে এক লম্ফে লঙ্কা পার।

বৃদ্ধ। তোমাদের নিকট এখন বুড়োরা হনুমান হয়ে গিয়েছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলের হাতে হাতে পরিচয় দিচ্চো। শিক্ষার দোষই এই—তোমার দোষ কি ? এখন বাপকে দেখে গুড্‌ মর্ণিং কোরে, সেক্‌হ্যাণ্ড করো। বাপের সুমুখে ব'সে দাঁতের গোড়ার শিথিলতার পরিচয় দাও। গুরুহজমি হয়েচে বলে দু এক পাত্র সেবনের ব্যবস্থা

করে ফেলো। উঃ কি স্পর্দ্ধা—কি দৃপ্ততা! সাবাস্ ইংরাজী শিক্ষা! একবারে উচ্ছন্ন গেছে।

যুবা। আপনার সঙ্গে পারবার যো নেই। খান মশাই আপনি তামাক খান।

বীণাবৈচিত্র্য।

সে দিন পূর্ণেন্দুকরবেষ্টনে ধরিত্রী সোহাগ বিহ্বলা; মাধব মলয় মারুতে সুরভি কুসুমপরাগ বিজড়িত; পল্লবে পল্লবে চন্দ্রকরোজ্জল নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ কোমল সরস শ্যামলতা; তটিনীবক্ষে নৃত্যময়ী গীতময়ী রজত সুষমাময়ী ললিত তরঙ্গলতা; শুভ্রালোক বিমণ্ডিত বিটপীশাখে সুপ্ত বিহগমিথুনচয়; ক্বচিৎ পরপুষ্টবধূ সহায় পুংস্কোকিল, চূতমুকুলাশনে পীতশোণিম কণ্ঠে, সুশুভ্র বিশ্বশান্তি তাহার পঞ্চম রাগিণীতে মগ্ন করিয়া, রাজ চক্রবর্ত্তী মনোভবের বিজয় ঘোষণা দিকে দিকে প্রচার করিতেছিল; বিশ্ব জুড়িয়া জীবিত সর্ব্বস্বের গৌরব মহিমা সম্যক প্রকটিত ছিল।

আমি রজনী প্রথমযাম পরিণয়োৎসব বিধূনিত বান্ধব গেহে অতি-বাহিত করিয়া, সুধাকর প্রেমানুরাগিণী নিরুপমা বাসন্তী নিশীথিনীর উজ্জ্বল সুধা, প্রেয়সী সাথে মিলিয়া পান করিবার আশে উদ্বেগ হৃদয়ে দ্রুতচরণ বিক্ষেপে প্রেয়সীপ্রেম চন্দ্রালোকিত সদন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম গৃহে উপস্থিত হইয়া, ধীরে নিঃশব্দসন্তর্পণে শয়নকক্ষে যাইলাম কিন্তু হায়! আমার প্রেমবিমুগ্ধা চকোরনয়না নির-ভিমানিনী হৃদয়-ভাগিনী কোথায়! পিতৃগৃহ হইতে এখনও কি

ফিরিয়া আসে নাই?—এই সযত্ন রচিত পুষ্পমালিকা কার কণ্ঠে দিব? কাহারই বা মৃণালভুজযুগে এই কুসুমবলয় পরাইব? অন্তরের শ্রেষ্ঠ সাধ ছিল, এই কোমলতম শিরীষপুষ্প যুগল কর্ণমূলে দুলিয়া দুলিয়া সুন্দরী সীমন্তিনীর কোমলতম ললাম কপোলের কেমন শোভা বৰ্দ্ধন করে—অনিমেষ নয়নে তাহাই দেখিব। এই বকুল পুষ্পময়ী মৌঞ্জী মেখলা তাহার সরস নিতম্ব বেষ্টন করিয়া তাহাকে কতই না মনোরমা করিয়া তুলিত। এই কুসুম মঞ্জীর তাহার চরণ রাজীবের স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া পুষ্প জীবন সার্থক করিত না কি? হায়! এ পুষ্পসাজ সেই পুষ্প কোমলারই যোগ্য—তাহারই জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নীরবে কিয়ৎক্ষণ বিমুক্ত দক্ষিণ বাতায়নে দাঁড়াইয়া নৈরাশ্য পীড়িত মানসে বাসন্তী প্রকৃতির উচ্ছলিত রূপ যৌবন শোভা দেখিতে লাগিলাম; পরে, রূপ নিমগ্ন নয়নদ্বয় রভসক্লান্তিভরে নিমীলিত হইয়া আসিলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনিচ্ছায়, জ্যোৎস্নাপুলকিত অমল শয্যায় অলস দেহভার ফেলিয়া দিলাম।

তার পর, কি জানি কখন, কোন শুভ মুহূর্ত্তে কি দিব্য রূপ-ভূষায় বিভূষিতা হইয়া, মনস্বিমোহন উদ্দাম অধৈর্য্য-প্রসূ কোমল সুরভি সিঞ্চিত মধুর মণ্ডনে পরিশোভিতা, মানস-সরসী-নীরে সদ্যস্নাতা কোন স্বপ্নপুরসুন্দরী, বামবাহু দিব্য ফুলতন্ত্রী বেষ্টিত করিয়া, কমলসুকোমল দক্ষিণ করপল্লবে আমার অলসিত দেহ কণ্টকিত করিল। অহো! সেই স্পর্শ, সেই নীরব স্পৃহনীয় বিম্বকল্প অধরপুট, সেই অস্ফুটগুঞ্জন প্রাণ অনীক্ষিতপূর্ব্ব অপরূপ তন্ত্রী, সেই সুরভিত মুক্ত চিকুর বিকাশ, সেই মুখশশী!

নিভৃত পালঙ্কপার্শ্বে সুন্দরী তন্বঙ্গী বর্ত্তুল তর্জ্জনী স্বীয় অধর শোণিমায় স্থাপিত করিয়া, নীরব ইঙ্গিতে নয়ন নীলোৎপলের নিঃশব্দ

তাবা আমাকে জানাইল; আমি মন্ত্র-পরিচালিতের মত তাঁহার সহিত কোন্ নিরুদ্দেশ মোক্ষপথে নীরবে চলিলাম।

সৌন্দর্য্য মহিষী প্রভাত অরুণের হিরণোজ্জল কিরণ শিখা মণ্ডিতা সঞ্চারিণী কুসুম পুঞ্জ শোভিতা কিশলয়বতী বল্লরীর ন্যায়; দিকে দিকে সম্মুখে পার্শ্বে আভরণ রাশির জ্বলন মণিমালার চন্দ্ররশ্মি বিচ্ছুরিত দীপ্তিমণ্ডল বিকীর্ণ করিতে করিতে; আর কি জানি কেমন নিখিল মনমুগ্ধকর, সহধর্ম্মচারিণীর কোমলকান্ত সুধীর প্রেমবাহিনীর ন্যায় প্রিয়তমার স্নিগ্ধস্বাদু প্রথম চুম্বন সুধার ন্যায়, অতীন্দ্রিয় জগতের মূর্ত্তিমতী করুণার স্নেহ-ভাষিতের ন্যায়, সুমধুর সঞ্জীবনী সুরভি রাশি দশ দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া; মুখরনূপুরগুঞ্জরিত মৃদুল চরণারবিন্দবিক্ষেপণে ধরণীবক্ষ রোমাঞ্চিত করিতে করিতে— গৌরাঙ্গী সুরাঙ্গনা অমরাবতীর নন্দন কাননোপম উপবন মধ্যস্থলে সরসীর শীতল শুভ্র শিলাতটে উপবেশন করিয়া আমাকে নিজ পার্শ্বে বসাইল। তখন স্বরগ পূর্ণেন্দু নিশীথ অম্বরের অনন্ত নীলিমার মধ্য-স্থলে বিরাজিত, ভূতল চন্দ্রমার নিরুপম রূপরাশি দেখিয়া নিশ্চল, নাতি শীতোষ্ণ মলয় সমীরে স্বেদসিক্ত কপোলা দেবললনার শ্রম জনিত দ্রুত নিশ্বাস আর নীরবতা। তাহার স্বেদশীকর পরিশোভিত রক্তিম কপোলে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে এমনই মনোহারিণী করিয়া তুলিয়াছিল যে, মর্ত্ত্যভূমিতে এমন কোনও নর-ভাষা নাই যাহা দ্বারা সেই অতুল কান্তি সেই অপার্থিব শ্রী সেই অনুভব গ্রাহ্য দিব্য সুষমা বর্ণনা করা সম্ভব হইতে পারে।

পরে, সেই মৌনা রমণী আপনার বিচিত্র বীণা লইয়া বাজাইয়াছিল, যেন আমার সম্মুখে শতদল বাসিনী দেবী বীণাপাণি! কিন্তু এ বীণার একি ত্রিভুবনাশ্রুতপূর্ব্ব নীরব ঝঙ্কার! শ্রুতিপথে ইহার ত কোন

পরিচয় পাই না! সে রাগিণীতে ছিল কেবল অনুপম মাধুর্য্য—সে মাধুর্য্য ভাবময়, সোহাগ পূর্ণ; ছিল কেবল বর্ণ—সে বর্ণ দেখিয়া চম্পকবধূ লজ্জায় অবনত মুখী; আর ছিল কোমল মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ম্মল স্নিগ্ধতা—তাহা অমৃতেও আছে কি না জানি না।

কতক্ষণ আমি বিস্মিত নয়নে সেই বীণাবাদিনীর মুখচন্দ্রে চাহিয়া ছিলাম বলিতে পারিনা, কখন সেই অদ্ভুত রাগিণী শ্রবণ জনিত মোহ ভাঙ্গিয়া ছিল তাহা আপনিই জানিতে পারি নাই। হৃদয়ের আবেগ কলাপ বাহিরে প্রকাশ করা ভাষার সাধ্যাতীত হইয়াছিল। অশ্রুপরিপূরিত নয়নে ললনার করযুগল ধরিয়া সহসা বলিয়াছিলাম, "দেবি! কিছুই বুঝিলাম না; একি নিষ্ঠুর রঙ্গ—একি সৃষ্টি ছাড়া নিয়মে নবনীকোমল নারী তুমি কুলিশ কঠিন হইলে!" হায়! সেই নিষ্ঠুরা বচনহীনা স্বপন উদ্‌ভ্রান্তা জ্যোৎস্না পরিপ্লুতা, সেই বিস্ময়কারী তন্ত্রী ধারিণী কেবল নীরবে হাসিল। আমার তপ্ত অশ্রু তাহার সুকোমল করপল্লবে পড়িল।

তখন সে পূর্ণ সোহাগে সেই নিভৃত সরস্তীরে শীতল জ্যোৎস্নায় চিরবাঞ্ছনীয় চুম্বনসুধা দানে সকল তৃষা মিটাইল। আমি সকল ভুলিলাম আর কোনও কথা বলিবার সামর্থ বা অবসর মাত্র রহিল না—সেই অনুরাগ পীযূষার্ণবে আপনাকে হারাইলাম।

* * *

উষার বিহগ কূজনে জাগরিত হইয়া দেখিলাম, আমার পার্শ্বে সুপ্তি মগ্না শিথলকুন্তলা পুষ্পময়ী ললিত বনিতার তনু দেহলতা—তাহারই কেশপাশে অঙ্গবাসে সেই নিরুপম সুরভিবিস্তার—আর, তাহার বাহুপাশে তাহারই ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, স্বরগের ধাত্রী, ধরণীর শুভ সুষমা, স্নেহলালিতা সুকুমারী শিশু কন্যা—দম্পতীর সুখ!

তখন্ বুঝিলাম সেই স্বপ্নবাস্তব জড়িত স্বর্গে, সেই কৌমুদীফুল্ল প্রশান্ত মালঞ্চ সরোবর তীরে, সেই সর্ব্বজীব বিস্ময়কারিণী নিখিলচিত্ত-হারিণী অপরূপ ধারিণী ঐন্দ্রজালিক বীণা—সেই সৌরভময়ী সোহাগ-ময়ী কমনীয় কোমল মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ম্মল স্নিগ্ধতা কি!

ফুলের সাজি।

আবাহন।

এস, সখি, এস ঘরে
অলস সৌন্দর্য্য ভরে,—
শূন্য সিংহাসন' পরে কর অধিষ্ঠান!
দরিদ্রের ক্ষুদ্র পুর
মহাগন্ধে সুমধুর
পরিপূর্ণ হোক্ সদা নন্দন সমান!
অঙ্গে তব স্বর্গছায়া—
কনক-অরুণ-মায়া—
বসতি ক'রেছে সুখে শত মহিমায়!
গোপনে কল্পনা রাণী
আননে বসন টানি'
হাসিছে বধূর মত মুগ্ধ পিপাসায়!
তুমি শক্তি—তুমি প্রাণ,
তুমি গৃহ-উপাদান,
তুমি বেদ—তুমি মন্ত্র—শাস্ত্রের বচন!
তোমারি পরশ বশে
হেথা অমঙ্গল খসে,—
তোমারি চুম্বনে মরে দুর্ব্বল মরণ!

পুষ্পরথ সুমহান্
করিতেছে অধিষ্ঠান,—
চঞ্চল হ'তেছে সখি, তোমারি লাগিয়া!
কোটি স্বপ্নরূপে আজি
অমরা নিলয় ত্যজি'
উঠিয়া পবিত্র কর বাহনের হিয়া!
হেথা নিত্য প্রেমগীতি
তুলিতেছে দিবারাতি
প্রণয়-উচ্ছ্বাসরাশি পূর্ণ প্রতিভায়!
প্রকৃতি আনন্দসুরে
দাঁড়ায়ে আছেন দূরে
তোমারে আনিতে দেবি বন্ধন-সীমায়!
সীমন্তে ধরিয়া লাজ,
অঙ্গে পরি' পূত সাজ
অগ্রসর হও, সখি, মরতের পানে!
সুরভি নিশ্বাস-বাসে
দূর কর, মৃদু হাসে
কালের করাল প্রীতি অমরতা দানে!
অনন্ত বন্ধনে মিলি'
দুজনেতে নিরিবিলি,

আঁকি এস মহাদৃশ্য বক্ষে জগতের!
মানব মুগ্ধের পারা
হইয়া আপন-হারা
অপলকে নেহারিবে লীলা সৌন্দর্য্যের!
দেব-পুণ্যময় প্রাণ
ছাড়ি' পরিচিত স্থান
বিরাজ করিবে হেথা নব সুষমায়!
প্রণয়ের পারাবার
উপবনে সুকুমার
পরিণত হ'বে ধীরে রক্তিম উষায়!
সেথা কত পুষ্পকলি
আলস্য-সোহাগে ঢলি'
ফুটিবে বিচিত্র ভাবে নক্ষত্র মতন!
কল্পনা সরস্বতী
মানস আনন্দে অতি
সুবর্ণ অঞ্চলে তার করিবে চয়ন!
চন্দ্রিকার সূত্র আনি,
পুণ্যসম অনুমানি,
গাঁথিবে পাছিয়া প্রীতি গৌরবের হার!
সেই মাল্য কণ্ঠে তুলি'
দিবে সে আপনা ভুলি,—
মিলন সার্থক হ'বে তোমার-আমার!
আজি এ পূর্ণিমা নিশি
স্বপনে র'য়েছে মিশি,—
লাবণ্যে লেগেছে হাসি ত্রিদিবের ছায়!
আশিস্-যৌতুক আনি'
গৃহে এস পুষ্পরাণি—
কৌতুকে কাটুক কাল কোটি কামনায়।

শ্রীবঙ্কিম বিহারী দাস।

কর্ম্মদেবী।

ভীষণ সমর মাঝে বিদ্যুৎ বরণী
হের হের নাচিতেছে বীরেন্দ্র রমণী
রে বীরেন্দ্র রমণী।

বিকচ কমল মুখ দীপ্ত বীর ভাবে
কবচ আবৃত দেহ উন্নত গৌরবে
খরসান অসি করে, শ্বেত অশ্ব পৃষ্ঠোপরে,
বিংশতি নক্ষত্র*মাঝে কেরে ওই ফেরে
চপলা অম্বর ক্ষেত্রে বুঝি খেলা করে
রে বুঝি খেলা করে।

উদ্দীপক রাগে বামা সম্বোধে বাহিনী
নাচে রণরঙ্গে অশ্ব, কাঁপিছে মেদিনী।
"সমর সিংহেরমান, রাখিতে সঁপিব প্রাণ"
বলে বামা "আমি যেরে বীরেন্দ্র রমণী
বীরেন্দ্র রমণী আমি বীরধর্ম্ম জানি
রে বীরধর্ম্ম জানি।

"দেখাব সম্মুখ যুদ্ধে কুতব সাহাকে
স্বাধীনতা মেবারেরে থাকে কিনা থাকে।
বাপ্পারও বংশধর, তোমরা সুধীর,
গৌরবে অটল রাখি চিরোন্নত শির
চল সবে অগ্রসরি, ভবানী স্মরণ করি,
দেখাও এ আর্য্য ভূমে আছে কিনা বীর
রে আছে কিনা বীর।

দেখুক কুতব সাহা বীর-লীলা আজি
রে বীর-লীলা আজি।
সিংহের বনিতা আমি, বীরভূমি জন্মভূমি,
জানে কি সে বীরাঙ্গনা বীর সাজে সাজি
ভাসাবে সমরাঙ্গন অরাতির শোণিতে
রে অরাতির শোণিতে।

---

* কথিত আছে বিংশতিজন রাওত বা প্রধান রাজপুরুষ কর্ম্মদেবীর সহিত এই যুদ্ধে যোগ দেন।

ভেবেছে কি সে যবন হরি' স্বাধীনতা ধন
ছলিবে কর্ণেরে*এই কর্ম্মদেবী থাকিতে
রে কর্ম্মদেবী থাকিতে।"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

হৈমবতী।

নাহিক নিদাঘ-নিশা, মেদুর বরষা,
গিয়াছে শরৎ-শশী মিথুন ভরসা,
কল্যাণী কল্পনে অয়ি! ললিত ললনা
ধরণী সহসা যেন মোহ নিমগনা!
দিনের সুদীর্ঘ ক্লান্তি, নিদ্রাহীন নিশি,
সজল জলদ-কোলে সচকিত হাসি,
সশিরে! নির্ম্মল নভে সুধাংশুর শোভা
নাহিক এখন আর নারী মনোলোভা।
নাহি চাঁপা, নাহি যূথী, সুরভি মালতী
তরুলতা হত শোভা হিমানীতে সতি!
আছে শুধু হিমপাণ্ডু অলস চন্দ্রিকা,
প্রান্তর—হিমগারে—সুপ্তনীহারিকা:—
শুভক্ষণে শুচিস্মিতে হে সরমবতি!
হেমন্তে উজল হেমে হও হৈমবতী।

অঙ্গে তুমি লহ লহ কনক কিঙ্কিনী
চরণে সুবর্ণময় মুখর শিঞ্জিনী,
অন্তরের হেম কান্তি প্রেম অনুরাগে—
বিকশি' কপোলে তব দিক্ স্বর্ণরাগে;
হিমশুভ্র প্রকৃতির নীহার-নিলয়ে
রাখ রাঙ্গা পা'দু'খানি তোমার সুন্দরি!
সঞ্জীবিত হোক্ ধরা অসীম বিস্ময়ে
উঠুক হিরণ্ রবি হিমানী সম্বরি'।
নয়ন-নীলিম-কোণে মৌন শুভ বাণী
চেতনা আসুক বিশ্বে হে নিখিল-রাণি।
নাহি গীতি, নাহি গন্ধ, পল্লব উন্মেষ
তিক্ত সখি! ধরিত্রীর হিমক্লিষ্ট বেশ:—
ঘুচাও এ অবসাদ অয়ি সীমন্তিনি!
মৃত-হিম হৃদয়ের তুমি সঞ্জীবনী।

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

বৈরাগ্য।

কবে ছাড়ি মোহন সংসার নিকেতন,
প্রবেশিব নিত্য নিত্য আনন্দ কানন?
কবে জীর্ণ কন্থা গায় দিয়ে বেড়াইব?
পথিকের, বালকের, ভয় জন্মাইব?
নগর বাসীরা মোরে দেখিয়া হাসিবে?
ক্ষিপ্ত বলি' কবে মোর গায় ধূলি দিবে?
ইন্দ্রিয় নিকরে কবে সুখে পরাজিব?
কবে বল ফল মূলে উদর তোষিব?
কবে সেই ব্রহ্মসনে হইবে মিলন?
হেন সুখে কবে হবে সময় যাপন?

শ্রীঘনেন্দ্রনাথ বসু।

---

* কর্ম্মদেবীর পুত্র।

কেন দেখিনু তাহায় ?

কেন দেখিনু তাহায় ?
আধ অন্ধকার ছায়,
জোছনায় ভায়,
নব বাসন্তী সন্ধ্যায়।

দেখিনু তাহায় ?
আকাশের তারা শশী,
সে মুখের সুধা হাসি,
জীবনের বাসন্তী সন্ধ্যায়।

কেন দেখিনু তাহায় ?
মৃদুল জোছনা লোকে,
হাসিতে ছিল পুলকে,
জীবনের বাসন্তী সন্ধ্যায়

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

অতৃপ্ত বাসনা।

(১)

শুনে যদি মিটিত রে মনের পিয়াস,
দেখে যদি ঘুচিত রে জীবনের আশ,
তবে প্রাণ কেন হায়
আরো যেন কিছু চায় ;
কেন আরো শত গুণে হ'তেছি নিরাশ !
তবে কি এ ধরা মাঝে,
শান্তি নাহি কোন কাযে,
নাহি কিরে কোন কাযে সুখের আভাস।
চিরকাল দুঃখে রব মিটিবে না আশ।

(২)

হে বিধি ! তোমার হিয়া এতই কঠিন,
চিরকাল আমারে কি রাখিবে মলিন ?
হৃদয়ের ভাল বাসা,
জীবনের সার আশা,
তাওকি বাসিতে হায় দিবেনা দুদিন !
চিরকাল শোকভারে,
রাখিতে আচ্ছন্ন ক'রে,
এনেছ কি ধরাপরে, ওহে প্রেমাধীন !
চিরকাল পৃথিবীতে রব আশাহীন ?

শ্রীরঙ্গলাল রায়। কাঁথি।

ব্যথিত

১

শুধু ছুটে আশা সার।
দেখেছিনু মরীচিকা, দেখেছিনু প্রহেলিকা,
দেখেছিনু রূপ-বহ্নি তীব্র লালসার ;
স্মৃতির আলোক মাখি' ভেসেছিল দুটী আঁখি
—স্মরি সে বিহ্বল দৃষ্টি—ক্ষুদ্র বালিকার।
এবে ছুটে আসা সার।

২

তুলিয়াছি যবনিকা ;
ছুটে এসে দেখি শুধু, দূরে সে বালিকা বধূ,
দূরে গেছে রবি-তাপে স্বচ্ছ নীহারিকা ;
শ্রাবণের স্নিগ্ধ নীরে, কাঁদিয়াছি নত শিরে,
ভাদর মুছায়ে গেছে শ্রান্ত অশ্রুধার ;
সে কই এলনা আর !

৩

প্রবাসে কাঁদিত প্রাণ;
সেও ভাল সেও ভাল, এযেগো আঁধার কালো
কত আশা, কত প্রীতি নিরাশায় ম্লান।
রাঙা মেঘ রাঙাঠোঁটে তারকাচুমিতেছোটে,
ভ্রমর গুঞ্জরি' উঠে, গায় প্রেম-গান।
কি কঠিন তার প্রাণ!

৪

থাক সে পাষাণী বালা:
সেযানিয়ে সুখেথাকে, থাকসে, ডেক'না তা'কে
সাজা'ব বাসর মোর ল'য়ে অশ্রুমালা;
কেন মরি ঘুরে ঘুরে? রয়েছে—থাকসে দূরে
চুরি ক'রে উদাসীর উদাসীন প্রাণ,
নিয়ে তার অভিমান!

৫

শুধুছুটে আসা সার!
কেন লুকোচুরি খেলা? উঠিব প্রভাত-বেলা
মাধবী-মালতী-বনে জাগাব উষার;
আবাহন-প্রেম গীতি, প্রেম তান নিতি নিতি
ব'বে প্রেম মন্দাকিনী হৃদে অলকার;
মুছে ফেলি অশ্রুধার।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী। কোন্নগর।

যেওনা।

কি দোষে কেন গো নাথ
যাবে মোরে ছাড়িয়ে।
পায়ে পড়ি সব কথা,
শুনি বল খুলিয়ে।
অথবা কি ব্যথা নাথ
পেয়েছ ও হৃদয়ে।
যার তরে যেতে চাও
অধিনীরে তেজিয়ে।
তুমি গেলে কি লয়ে গো,
এবিজনে থাকিব।
ব্যথা পেলে কার বুকে,
মাথা রাখি কাঁদিব।
কার আদরেতে আমি,
আদরিণী হইব।
নিশা জাগি কার সাথে,
কত কথা কহিব।
সুহাসিনী বলে হায়,
কপোলে কে চুমিবে
আঁখি জল দেখি মোর,
আঁচলে কে মুছিবে॥
কার পা' দুখানি লয়ে,
হৃদে রাখি সেবিব।
কার মুখ পানে চেয়ে,
এজীবন যাপিব।
দেবতা চাহিনা আমি,
তুমিই দেবতা মোর।
তব পদে প্রাণ ঢালি,
যেন থাকি হ'য়ে ভোর॥
শেষ নিবেদন মম,
নাথ তব চরণে।
তুমি গেলে আমি হায়,
মরিব গো জীবনে॥

শ্রীমতী হেমলতা দাসী। ব্যাজড়া।

শারদীয় পূর্ণশশী।

কেমন বরণ তব
কিবা শোভাময় কব
ভাসে নীল গগনের কোলে।
শারদীয় পূর্ণ শশী
মুখে উজলিছে হাসি
দেখি যথা জাহ্নবীর কূলে॥
ক্ষণে দেখা নাহি পাই
হও ঢাকা মেঘে ওই
ভাবি তাই সদা মনে মনে।
আবার তোমায় দেখি
পুলকে জুড়ায় আঁখি
কত কথা কহি বন্ধু সনে॥
আকাশে তোমার ছবি
পারে কি রচিতে কবি?
হাসে স্বর্ণ জালেতে কানন।
গঙ্গার বিশাল বক্ষ
ভাসে তরী লক্ষ লক্ষ
কিরণেতে আনন্দ ভুবন॥
বসে আছ তারা কূলে
হীরা মণি মুক্তা স্থলে
তব কাছে আসিছে চকোর।
ফুল্ল রূপ সুধা পান
করিয়া প্রফুল্ল প্রাণ
ঘুরে ঘুরে আবেশে বিভোর॥
হাসে চাঁদ গগণেতে
হাস তুমি পৃথিবীতে
তুলি তব যশের কিরণ।
সাধি সব নিজ কায
ধরাকে পরাও সাজ
মিলাইয়া রতনে রতন॥

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসাক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

উভয়ে অপ্রতিভ।—রোগী। ডাক্তার বাবু, আপনাকে ডাকাইয়াছি সত্য, কিন্তু বলিতে কি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার আদৌ আস্থা নাই।

ডাক্তার। তা না থাক্, এই যে গোচিকিৎসকের প্রতি গরুর ভক্তি হয় না, কিন্তু আরাম হয়ত বটে।

* * *

নগেন। তোমার স্ত্রী কি বড় বাচাল?

যোগেন। তা' আর বল্‌তে, সে হাঁ না করে হাই তুল্‌তে পারে না

টেলিফোনে বিবাহ।—সুসভ্য মার্কিন দেশে ৭৮ মাইল দূরবর্ত্তী থাকিয়া হেন্‌রি রাণ্ট (Henry Rantz) ও নেলী ম্যাক্‌সেল (Nellie Maxwell) সম্প্রতি টেলিফোনের দ্বারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বর New Yorkএ পুরোহিতের দ্বারা মন্ত্র পড়াইয়া কয়েকজন বন্ধুসহ তারঘরে গেলেন; অপর দিকে Willamsport নামক স্থানে কন্যাযাত্রীরা কন্যা লইয়া সেই সময় অপেক্ষা করিতে ছিলেন। টেলিফোনে উভয়ের মন্ত্রোচ্চারণ করাইয়া প্রাণের আদান প্রদান হইয়া গেল। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাকে অঙ্গুরী পরাইয়া দিল এবং বরের হইয়া চুম্বন করিল। এই বিবাহ আইন সঙ্গত, এবং শুদ্ধ নূতনত্বের খাতিরে তাহারা এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। বাকী এখন টেলিফোনে জন্ম ও মৃত্যু !!

***

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।—কোনও নাট্যশালায় শুম্ভ নিশুম্ভের অভিনয় হইতেছে এমন সময় গ্যাস কোম্পানীর লোক কএক মাসের বাকী পাওনার তাগাদা করিতে আসিল। নাট্যশালার অধ্যক্ষ সে সময় রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রের অভিনয় করিতেছিলেন। তাঁহার ভৃত্য অনেক মিনতি করিয়া তাগাদাদারকে প্রভুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিল, কিন্তু সরকারি লোক দিনের বেলা রঙ্গভূমি বন্ধ থাকাতে কয়েক বার আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পায় নাই ; তাই রাত্রে এই সুযোগে বড় জুলুম আরম্ভ করিল। বলিল—এখনি টাকা পরিশোধ না করিলে গ্যাস পাইপ কাটিয়া আলোক বন্ধ করিব। ভৃত্য বেগতিক দেখিয়া একটা লম্বা মোটা জামা জড়াইল ও একটা

কৃত্রিম দাড়িগোঁফ পরিয়া ও একখান তরবারি ঝুলাইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রভুর সম্মুখে আভূমিনত অভিবাদন করিয়া নাটকীয় স্বরে বলিল ;—

"হের দেব! দাঁড়াইয়া দ্বারে দৈত্য,
চাহে কর নহে উপাড়িবে সূর্য্যে;
নিভাবে দেউটী অমরার।"

অধ্যক্ষ মহাশয় ভৃত্যকে হঠাৎ তদবস্থায় দেখিয়া এবং তাহার বাক্য ও ভঙ্গিতে ব্যাপার কতক বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

"যাও দ্বারি, ত্বরায় ভেটিব ছুষ্টে ত্রিদিব তোরণে।"

* * *

মুখস্থ বিদ্যা।—Prince of Wales মান্দ্রাজে একটি স্কুল পরিদর্শনে আসেন। যদি তিনি কোনও ছাত্রের সহিত কথা কহেন এই জন্য 'Your Royal Highness' কথা কয়টি ভালরূপে সকলের কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুবরাজ একজনকে একটি Prismatic Compass দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কি? বালক থতমত খাইয়া বলিল, 'As Royal Compass your prismatic Highness.'

* * *

উঁচু কপাল।—দুষ্ট বালক স্কুলে মারামারি করিয়া কপাল কাটিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁরে, কপাল কাট্‌লি কি ক'রে?

বালক। কই, বাবা?

পিতা। ওই যে তোর কপাল প্রায় এক ইঞ্চি কাটা?

বালক। ও আমি নিজে কাম্‌ড়েছি।

পিতা। তবে রে পাজি, নিজের কপাল নিজে কাম্‌ড়ালি কি করে?

বালক। কেন বাবা, চেয়ারের উপর উঠে নাগাল পেলুম, তার পর কাম্‌ড়ালুম ?

* * *

সজাগ পিতা।—উপরোক্ত বালক একদিন দেখিল ছাদের উপর একটা ঘুঘু বসিয়া রহিয়াছে ; সে পিতাকে অনেক বার ঘুঘু শিকার করিতে দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাহারও শিকার করিবার সখ হইল। আস্তে আস্তে পিতার ভরা বন্দুকটি আনিয়া যে ঘরে তা'র পিতা নিদ্রা যাইতেছিল সেই ঘরের জানালা হইতে ঘুঘুটী লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িল। অবশ্য ঘুঘুর কিছু হইল না, কিন্তু তার পিতা শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ভীতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল। বালক অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জিত ভাবে বলিল "বাবা, তোমার ঘুম ত খুব সজাগ, আমি এত সাবধানে আস্তে আস্তে বন্দুকের ঘোড়া টান্‌লুম, তবুও তুমি উঠে পড়লে !"

* * *

চতুরে চতুরে।—কোনও শীত প্রধান দেশে একটী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া একটী স্ত্রীলোক ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছে। এক দয়াবান ব্যক্তি তাহার হস্তে একটী পয়সা দিতে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "একি, এ যে দেখছি মাটীর শিশু !" স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ঠাণ্ডা বলে আসল শিশুকে বাড়িতে রেখে এসেছি।" ভদ্রলোকটী তাহার হস্তে একটী অচল পয়সা দিয়া বলিল "ভাল পয়সা গুলো বাড়িতে রেখে এসেছি।"

* *

রুষ রাজ্যে ষাট প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়।

* * *

প্রয়োজনীয় পুস্তক।—পুস্তক বিক্রেতা।—সাঁতার সম্বন্ধে এর চেয়ে ভাল বই আর নাই। এ বই এক খানা বাড়িতে থাকিলে হঠাৎ কোন বিপদ হ'লে খুব উপকার হ'তে পারে।

পল্লিগ্রামবাসী ক্রেতা। সত্যি নাকি?

পুস্তক বিক্রেতা। নিশ্চয়ই, আপনি যদি কখনও জলে ডুবেন, তখনি ১০৩এর পাতা খুলে দেখ্‌বেন কিরকমে আত্মরক্ষা করিতে হয়।

* * *

প্রশ্নোত্তর। কে মানে না পরলোক পুণ্যপাপ চয়?
—নাই যার হৃদয়েতে পরলোক ভয়।

*

কে ভাবে সুখের সেতু বিষয় সেবন?
—মহেশের প্রতি প্রীত নহে যার মন।

*

কে নিন্দে আনন্দমনে দেখিয়া সুজন?
—দ্বেষের দেশেতে করে বসতি যে জন।

কে করে অন্যায় পথে সদা বিচরণ?
—স্বার্থসিদ্ধি প্রতি যার নিয়ত নয়ন।

* * *

অনিদ্রার ঔষধ।—ক। কাল ঘুম হ'য়ে ছিল ত আমার উপদেশ মত ১ থেকে গুণতে আরম্ভ করে ছিলে?

খ। হ্যাঁ, আঠার হাজার পর্য্যন্ত গুণে ছিলেম।

ক। তার পর বুঝি ঘুম এল?

খ। না, তার পর দেখি সকাল হয়েছে, কাযেই উঠ্‌তে হ'ল।

উত্তরাধিকারীর ভাবনা নাই।—এক জন কৃষক কিছু টাকা জমাইয়া ছিল। আর একজন কৃষক একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই তুই অত টাকা করবি কি?"

প্রথম কৃষক। কেন ছেলেকে দিয়ে যাব?

দ্বিতীয় কৃষক। যদি ছেলে না হয়?

প্রথম কৃষক। তাহ'লে পৌত্ত্রকে দেব।

* * *

কার্য্যকারিতা রায়।—মার্কিণ যুক্তরাজ্যের একজন বিচার-পতি কোনও মূর্খ আসামীর প্রতি সামান্য অপরাধে এই আজ্ঞা দেন যে যতদিন না সে লেখা পড়া শিখিবে ততদিন তাহাকে কারাবাসে থাকিতে হইবে। আর একজন আসামী লেখা পড়া জানিত, তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইল যে পূর্ব্বোক্ত কয়েদীকে কারাগৃহে লেখা পড়া শিখাইতে পারিলেই তাহার অব্যাহতি হইবে। তিন সপ্তাহ পরে কয়েদীদ্বয় নিজ নিজ কার্য্য করিয়া মুক্তি পাইয়াছিল।

গান।

কাতরে কি নিদয় হলে? (ওমা তারা)
বিঘোরে পড়িয়ে শ্যামা ডাকি গো মা বলে।
হইয়া পাষাণের সুতা, জাননা স্নেহ মমতা,
পড়ি পাগল পঞ্চ মাথা সবাই দাতা চিরকেলে।
দেখিছ মা ত্রিনয়নে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পানে,
তারিতে তাপিত জনে, ব্যথা লাগে হৃদ্‌কমলে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন, দেখায় মা বিকট বদন,
এখনি বধিবে জীবন রাখ মা চরণ তলে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রয়াস, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

ELM PRESS : CALCUTTA.

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। ডিসেম্বর, ১৮৯৯ সাল। দ্বাদশ সংখ্যা।

দু'খানি ছবি।

(১)

প্রেমময়ি, এত প্রেম শিখিলে কোথায়?
থাকিয়ে কি সুরপুরে, এনেছ কি বুকভ'রে
পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম স্বার্থ বিরহিত,
জুড়াতে তাপিত ধরা পূর্ণহৃদি প্রেমে ভরা
ঢালিছে অমিয় ধারা তাই অবিরত?
তাই কি গো দেবি তুমি এসেছ হেথায়,
প্লাবিতে এ মরু হৃদি প্রেমের ধারায়?
এত প্রেম প্রেমময়ি শিখিলে কোথায়?

(২)

আত্মত্যাগ শিখাইতে মানবে ধরায়
পরকে আপন ক'রে, আপনারে পর ক'রে
সুখে সহ অকাতরে ক্লেশ নিরন্তর।
প্রখর রবির কর, শিরে ধরে গিরিবর,
হৃদয়ে তটিনী স্নিগ্ধ বহে ঝর ঝর
প্রেমময়ী মন্দাকিনী তোমারো হৃদয়
নিভায়ে মানসতাপ কি মধুর বয়
এত প্রেম প্রেমময়ি শিখিলে কোথায়?

(৩)

প্রেমেতে সৃজন বিশ্ব ধাতা প্রেমময়
প্রেমেতে প্রকৃতি ভাসে, যতনে পুরুষে তোষে,
পুরুষ প্রকৃতি প্রেমে নিমগন রয়;
রবি শশী গ্রহ তারা, সসাগরা বসুন্ধরা,
হয় সবে মাতোয়ারা প্রেম মহিমায়!
ভায় বিশ্ব সে অনন্ত প্রেমের প্রভায়।
অসীম অনন্ত আরো তর্ব ও হৃদয়
এত প্রেম প্রেমময়ি শিখিলে কোথায়?

(৪)

শান্তিময়ি, এত শান্তি কোথা হতে দাও?
মনব্যথা ঘুচাইতে, আঁখিজল মুছাইতে

তাপিত পরাণে সদা ঢাল সুধাধার
শান্ত ও নয়ন জ্যোতিঃ,স্নিগ্ধসুকোমলঅতি
মরমে পশিয়ে নাশে পাপ অন্ধকার।
সস্নেহ নয়নে যবে মুখ পানে চাও
মধুর বচনে যবে বেদনা সুধাও
বল দেখি অত শান্তি কোথা হতে দাও?

(৫)

মূর্ত্তিমতী শান্তি তুমি এমরু সংসারে,
জীবনের কোলাহল, নানা চিন্তা হলাহল,
আকুলিত করে যবে ব্যাকুল হৃদয়,
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, ফেরে নর যবে গেহে,
তোমার ও মুখ হেরি কত শান্তি পায়;
মরম বেদনা বুকে তোর সমাদরে
সব দুখ, সব জ্বালা তখনি পাশরে,
কে বলে স্বরগ নাই এমরু সংসারে?

(৬)

রজত কিরণ ধৌত শান্ত সে প্রকৃতি
ছড়াইয়ে রূপ রাশি, ঢালিয়ে কৌমুদীহাসি
হৃদয়ের তমোরাশি পারে কি ঘুচাতে?
কি শান্তি মধুর কান্তি,এজগতে দিতে শান্তি
শান্তিময় পরমেশ প্রেরিলা ধরাতে,
তাঁহারি সে প্রতিকৃতি তব ও মুরতি,
প্রেম শান্তি একাধারে বহি দিবারাতি,
সকারে মানব হৃদে ভক্তি স্নেহ প্রীতি।

কবি কিট্‌স্।

কাব্যজগতে কিট্‌স্ যেন একজন অতিথি। ভাল করিয়া 'কিট্‌স্'কে কেহ চিনিতে পারিল না। কীটদষ্ট অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমকলিকা যেমন আপন মাধুর্য্য প্রকাশিত হইতে না হইতে, হৃদয়ের "সুরভিসম্ভার" ছড়াইতে না ছড়াইতে ম্লানমুখে শতধা হইয়া ঝরিয়া পড়ে, 'কিট্‌স্'ও তেমনি আপনার অসামান্য প্রতিভার সম্যক বিকাশ হইতে না হইতেই ইহলোক হইতে অকালে অপসৃত হইয়াছেন।

সুগায়কের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত অর্দ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে যেমন, একটা ঘোরতর অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, 'কিট্‌স্'এর জীবনী পড়িলেও

তেমনি নিদারুণ অশান্তি হৃদয়টাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া ফেলে"।

'কিট্‌স্‌' যেন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাকে এতশীঘ্র সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। মৃত্যুর একটা ভয়ানক ত্রাস যেন সর্ব্বদাই তাঁহার মনে লাগিয়া থাকিত। কিট্‌স্‌এর অনেকগুলি কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের এক এক স্থানে এমন করুণভাষায় এমন গভীর নৈরাশ্য ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সমালোচনা করিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে নিদারুণ অবসাদে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। নিম্নে তাহার কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

> "Stop and consider! life is but a day;
> A fragile dewdrop on its perilous way
> From a tree's summit; and a poor Indian's sleep
> While his boat hastens to the monstrous steep
> Of Montmorenci. Why so sad a moan?
> Life is the rose's hope while yet unblown;
> The reading of an ever changing tale;
> The light uplifting of a maiden's veil;
> A pigeon tumbling in clear summer air;
> A laughing schoolboy, without grief or care,
> Riding the springy branches of an elm."

আর এক স্থানে আছে;—

> "May these joys be ripe before I die."

একজন কোমল শিশুকবির মুখে এমন নৈরাশ্যের কথা শুনিলে কে স্থির থাকিতে পারে? কাহার চক্ষে জল না আসে?

শুধু কবিতায় নহে কিট্‌স্‌ বন্ধুদিগের নিকট যে সমস্ত চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে ও তিনি মধ্যে মধ্যে আপন সংকীর্ণ জীবনের কথা ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছেন।

কিট্‌সের জীবনী অতি সহজ এবং অতি সাধারণ। ইহাতে ঘটনা বৈচিত্রের বিশেষ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাল্য জীবন।—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে Moorfields (London)এ কিট্‌সের জন্ম হয়। শৈশবে Enfieldএর একটী সামান্য স্কুলে কিট্‌সের হাতে খড়ি হয়। বাল্যকালে কিট্‌স্ বড়ই দুরন্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি খেলায় রত থাকিতেন। পাঠে তাঁহার এক বিন্দু মনোযোগ ছিল না। সমপাঠিদিগের সহিত বিবাদ বিষম্বাদ করাই তাঁহার একমাত্র আমোদ ছিল। বিদ্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ Latin 'লাটীন' অভ্যাস করিয়া কিট্‌স্ জন্মের মত মাষ্টার মহাশয়ের নিকট বিদায় লইলেন।

আট বৎসরের সময় কিট্‌সের পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার অসীম স্নেহে কিট্‌স্ পিতৃশোক ভুলিতে ছিলেন। কিন্তু হায়! দেখিতে দেখিতে সেই স্নেহময়ী জননীও কিট্‌স্‌কে একাকী ফেলিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন! সংসারে এখন তাঁহার সহায় নাই, সম্পদ নাই, আত্মীয় নাই! 'কিট্‌স্' আপনার শিশু ভাইগুলিকে লইয়া অকুল সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। 'কিট্‌স্' তখন পনর বৎসরের সংসারানভিজ্ঞ উদ্ধত বালক।

কবিতার বিকাশ।—যৌবনের প্রারম্ভে 'কিট্‌সের' কবিতার বিকাশ হয়। শৈশবে তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত প্রচ্ছন্ন ছিল। শুভক্ষণে কিট্‌সের এক বন্ধু তাঁহাকে Spenserএর 'Faery Queene' পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'Faery Queene' পড়িয়া কিট্‌স্ বড়ই সুখানুভব করিলেন। Spenserএর অসাধারণ কবিত্ব, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং অসামান্য লিপি কুশলতা দেখিয়া 'কিট্‌স্' একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 'কিট্‌স্'

'Faery Queene'এর কবিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। বলিতে কি 'Faery Queene' পড়িয়াই কিট্‌স্‌ কবি হইবার সংকল্প করিলেন। একথাটা অনেকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। ইচ্ছা, করিলেই কি মানুষ কবি হইতে পারে? কখনই নহে। "Poet is born not manufactured" একথা ধ্রুব সত্য। কিট্‌স্‌ প্রকৃত কবির হৃদয় লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'Faery Queene' কেবল তাহার ঈশ্বর প্রদত্ত নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। তাহার হৃদয়স্থিত বদ্ধ কবিতাস্রোতের পথ মুক্ত করিয়াছিল। বাইশ বৎসর বয়সে কিট্‌সের প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পর কিট্‌স্‌ চার বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অন্যান্য কাব্যগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়। আমরা স্থানান্তরে কিট্‌সের কবিতাগুলির আলোচনা করিব।

প্রণয়ে কিট্‌স্‌।—কিট্‌স্‌ একটী বালিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। বালিকার নাম ফ্যাণী (Fanny)। ফ্যাণীর সহিত প্রতিদিন একবার দেখা না হইলে কিট্‌স্‌ অস্থির হইয়া উঠিতেন। সে দিন তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না। ব্যাকুলহৃদয়ে সতৃষ্ণ নয়নে 'কিট্‌স্‌' প্রতিদিন মুক্ত বাতায়ন পথে 'ফ্যাণীর' প্রতীক্ষা করিতেন। ভক্ত যেমন আপন আরাধ্যা দেবীর দর্শনে হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করে 'কিট্‌স্‌'ও আপন হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী ফ্যাণীর মূর্ত্তি দেখিয়া তেমনি সুখানুভব করিতেন।

'কিট্‌স্‌' যখন প্রথম 'ফ্যাণী'কে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর। ফ্যাণীর সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে প্রণয় কি পদার্থ বোধ হয় কিট্‌স্‌ তাহা কখনই অনুভব করেন নাই।

কিট্‌স্ প্রণয়ীকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এক স্থানে 'কিট্‌স্' লিখিয়াছেন "A man in love, I do think cuts the sorryest figure in the world" একথাটা কিট্‌সের পক্ষে যতদূর খাটে অন্য কাহারও পক্ষে ততদূর খাটে কিনা সন্দেহ।

কিট্‌স্ গোপনে আপন মনে ফ্যাণীর মূর্ত্তি পূজা করিতেন। আপন গভীর প্রণয়ের কথা কিট্‌স্ একদিনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। কিন্তু হায় যখন বালিকা 'ফ্যাণী' কিট্‌সের প্রণয় প্রতিদানে অসমর্থা হইল তখন তাঁহার কোমল সরল হৃদয় যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিট্‌স্ সেই নিরাশ প্রণয়ের অসহ্য যন্ত্রনায় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক 'ফ্যাণীর' প্রতি কিট্‌সের প্রগাঢ় হতাশ প্রণয়ই তাঁহার অকাল মৃত্যুর মূল কারণ!

"He lifted up his eyes,
And loved her with that love which was his doom."

কিট্‌সের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রণয় পত্রগুলি পাঠ করিয়া বাল্যবন্ধু 'সেভারন্' বলিয়াছিলেন—"But for this case (love to Fanny) he would have lived many years."

ফ্যাণীর প্রণয়ে হতাশ হইয়া কিট্‌স্ দৃঢ়চিত্তে কবিতা দেবীর উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি কাব্যালোচনায় ফ্যাণীকে ভুলিয়া যাইতে পারিবেন কিন্তু হায়! ফ্যাণীকে ভুলা আর তাঁহার জীবনে হইল না! স্কট্ (Scott) যথার্থই বলিয়াছেন—

"He who stems a stream with sand,
And fetter flame with flence band,
Has yet a harder task to prove
By farm resolve to conquor love."

কিট্‌সের কবিতা।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌবনের প্রারম্ভে কিট্‌সের কবিতার বিকাশ হয়। একুশ বৎসরের পূর্ব্বে কিট্‌স্ কোন কবিতা লিখেন নাই। ১৮১৭ সালে কিট্‌সের বয়স যখন ২২ বৎসর তখন তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়, সেই সময় হইতে কিট্‌সের প্রতিভা স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এবং ১৮২১ সালে ২৬ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু সেই প্রবল স্রোতের বর্দ্ধিত শক্তিকে জন্মের মত প্রশমিত করিয়া দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে কিট্‌স্ ৬ বৎসর কাল মাত্র কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ঠিক ৬ বৎসর বলিলেও অন্যায় হয়, কারণ, শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা এবং মানসিক অশান্তিতে কিট্‌সের অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কিট্‌সের কাব্যের সৃজন এবং অমরত্বের সংস্থাপন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সাহিত্যজগতে একটা অতি গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। তোমার আমার জীবনের কত ছয় বৎসর বৃথা কার্য্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে আরও হয়ত কত ছয় বৎসর নষ্ট হইবে কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

কিট্‌সের কবিতাগুলি সাধারণত তিনি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ সনেট্ এবং আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগে 'Endymion', তৃতীয় ভাগে Lamia, Isabella, Eve of St. Agnes এবং Hyperion.

কিটসের কবিতাগুলি ক্রমশ উন্নতির দিকে চলিয়াছে। কিট্‌স্ বলিতেন "আমি ফুলের বিকাশ দেখিতে বড় ভালবাসি।" পাঠক একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন তাঁহার

কবিতার বিকাশও ফুলের বিকাশের মত। প্রথম ভাগে কবিতা কোরকে, দ্বিতীয় ভাগে ফোটনোন্মুখ, তৃতীয় ভাগে পূর্ণ বিকশিত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কিট্‌সের কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। আমরা যে তিন ভাগে তাঁহার কবিতা বিভাগ করিয়াছি পাঠক নিজে সেই বিভাগানুসারে একবার কিট্‌সের গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন কাব্যজগতে অপূর্ব কিট্‌স্ কিরূপ অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণতার রাজ্যে অগ্রসর হইয়া ছিলেন।

কিট্‌সের জীবন অসম্পূর্ণ তাহার কবিতাও অসম্পূর্ণ, এই অসম্পূর্ণতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগেই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

কিট্‌সের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন "ইহা সাহিত্য জগতে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিবে।" কিন্তু হায়! তেমন কিছুই হইল না। কিট্‌সের বই পড়িয়া কেহ বড় প্রশংসা করিল না। সেই বন্ধুটীই আবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "Alas! the book might have emerged in Timbuctoo with far stronger chance of fame and approbation." কিট্‌সের প্রথম কবিতাগুলি যদিও সাধারণের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে তবু একটু নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাহাতে কিট্‌সের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিট্‌সের কয়েকটী কবিতার এমনি অসাধারণ সৌন্দর্য্য যে পড়িলেই মোহিত হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Sleep and Poetry, How many bards gild the lapses of time, On Woman এবং On Solitude প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। Sleep and Poetry পড়িয়া একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—"It is a flash of lightening that will rouse men from their occupation" বাস্তবিক এ কবিতাটী স্থানে স্থানে

এমনি সুন্দর হইয়াছে যে পড়িলে কবিকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। "How many bards gild the lapses of time" নামক (Sonnet) সনেট্‌টীতে রচনার বেশ চাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। Horace Smith এই কবিতাটী পড়িয়া বলিয়াছেন "একজন বালকের পক্ষে এত অল্প কথায় এমন সুন্দর ভাব প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। আমরা তাহার কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিতেছি।

"So the unnumbered sounds that evening store ;
The songs of birds—the whisp'ring of the leaves—
The voice of waters the great bell that heaves
With solemn sound—and thousand others more,
That distance of recognizance bereaves,
Make pleasing music, and not wild uproar."

কিট্‌সের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা বড়ই বলবতী ছিল। এবং সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। "There was in him keenest sense of enjoyment and beauty"

কিট্‌সের নিকট—

"A thing of beauty is a joy for ever :
Its loveliness increases ; it will never
Pass into nothingness ; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams etc."

অতি সহজে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিতেন বলিয়াই কিট্‌স্‌ প্রাচীন গ্রীক্ কাব্যের এবং ভাস্কর্য্যের এত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আজীবন কেবল সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন— "এ জগতে সৌন্দর্য্যই সত্য এবং যাহা সত্য তাহাই সুন্দর।" কিট্‌সের এই প্রগাঢ় সৌন্দর্য্যানুরাগে একটা দোষ ছিল। তিনি কেবল বহিঃ

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রবেশ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার কাব্য অসম্পূর্ণ। কাব্যে যে দুই দিকেই সমান দৃষ্টি রাখিতে হয় কিট্‌স্ তাহা জানিতেন না। বঙ্গকবিগুরু বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "কাব্যের অন্তঃ প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়।......যখন বহিঃ প্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃ প্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃ প্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃ প্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়-পরতা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তি), অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। কিট্‌স্ এই ইন্দ্রিয়পরতা দোষে দোষী। তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বড়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিট্‌সের Endymion এ সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য বাহ্য প্রকৃতির। একজন সমালোচক (Mr. Stephen) কিট্‌সের Endymion পড়িয়া বলিয়াছেন He admired more the external decorations than felt the deep emotions. আর একজন (Sidney Colvin) কিট্‌সের কথা বলিয়াছেন "He delighted in leading you through the mazes of elaborate description but was less conscious of the Sublime and the Pathatic কিট্‌সের অসাধারণ বর্ণনাশক্তি ছিল, কিন্তু মানবহৃদয়ের গভীর ভাব অঙ্কনে তিনি তেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। যিনি কিট্‌সের "Hymn to Pan" পড়িয়াছেন তিনি জানেন সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাঁহার কিরূপ নৈপুণ্য ছিল।

কিট্‌স্ যে প্রকৃতির পূজা করিতেন তাহাও কেবল সৌন্দর্য্য

উপভোগ করিবার জন্য। তিনি কবি Wordsworthএর মত প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতে অস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইতেন না। Wordsworth প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার খুলিয়া মহামূল্য মণিমুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন, আর কিট্ স্ কেবল দূরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

Wordsworth প্রকৃতির মধ্যে একটা "living spirit" দেখিতে পাইতেন, কিন্তু কিট্ স্ দেখিতে পাইতেন কেবল "Beauty"।

কিট্ স্ তাঁহার অভাব বুঝিতেন। Endymionএর ভূমিকায় তাহা সরল ভাবে স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু কিট্ স্ সাহিত্য-জগতে একটা অবিনাশী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন "(Filling himself for verses fit to live)" হায় মৃত্যু তাঁহার হৃদয়ের আশা পূর্ণ হইতে দিল না।

কিট্ সের সমস্ত উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি এক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয়। ১৮১০ সালে তাঁহার Lamia, Isabella, Eve of St. Agnes, এবং Hyperion প্রকাশিত হয়। পুস্তকের গুণের কথা ছাড়িয়া যদি কেবল পরিমাণের কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়।

Endymion অপেক্ষা Hyperionএ কিট্ স্ অনেক উন্নতি করিয়াছেন। প্রকৃত কাব্যের হিসাবে Hyperion সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক, তথাপি যে সমস্ত গুণ থাকিলে কাব্য নিখুঁত হয় Hyperionএ তাহার অনেকগুলি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। Hyperionএ Endymionএর মত পদলালিত্য নাই, ছন্দোবিন্যাস নৈপুণ্য নাই, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি নাই কিন্তু ইহাতে কিট্ সের অন্তর্দৃষ্টি আছে। Shelley বলিয়াছেন "Hyperion had the character of one of the antique desert fragments"।

Byron স্বীকার করিয়াছেন 'It seemed actually inspired by the Titans and as sublime as Æschylus'।

Eve of St. Agnesএর বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। Lamia, এবং Isabella ইংরেজী সাহিত্যে আদরের সামগ্রী। কিট্‌সের 'Ode' গুলি কবিতার রাজ্যে এক একটী উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। তাঁহার "Ode to Nightingale" Shelleyর "Skylark"র সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

কিট্‌সের সম সাময়িক লোকে তাঁহার কবিতার যে সমালোচনা করিয়াছেন সে সমালোচনা বড়ই তীব্র: তাঁহারা কেবল এক দিক দেখিয়াছেন। প্রাণপণে কিট্‌সের দোষ বাহির করিয়াছেন কিন্তু গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। Quarterly Review এবং Blackwood's Magazineএ কিট্‌সের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহাতে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া কবিকে গালি দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বলেন সেই সমালোচনাই কিট্‌সকে খুন করিয়াছে। সেলি (Shelley) সেই বিশ্বাসেই Adonais রচনা করেন এবং Byron তাঁহার Don Juanএর একস্থানে বলিয়াছেন "John Keats who was killed by one critique." কিন্তু এবিশ্বাস নিতান্ত ভুল। কিট্‌স্ যদিও অতিশয় অসহিষ্ণু ছিলেন, রমণী সুলভ লজ্জাশীলতায় যদিও তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিতেন তবু তাঁহার হৃদয়ে বল ছিল। Byron তাঁহার "Hours of Idleness' এর সমালোচনা পড়িয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য "English bards and Scotch Reviewer" লিখিয়াছিলেন। কিট্‌স্ কিন্তু তেমন কিছুই করেন নাই। তিনি নীরবেই সকল কথা সহ্য করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

দুইটী চিত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "মাধবীকঙ্কণ" উপন্যাসের আখ্যান বিষয়ের সহিত স্বর্গগত ইংরাজ মহাকবি টেনিসনের "এনক্ আর্ডেন" (Enoch Arden) পুস্তিকার গল্পাংশের একটী ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই সাদৃশ্যের ছায়াবলম্বনে উভয় পুস্তকের নায়কের চিত্র দুইটী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া পরস্পরের চরিত্র পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

পুস্তকদ্বয়ের মূলঘটনার সাদৃশ্য, স্ফুটতর করিয়া নিম্নে বিবৃত হইল-

মাধবীকঙ্কণ। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র দুইটী বালকই বালিকা হেমলতাকে ভাল বাসিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নরেন্দ্র প্রতিদানে বালিকার ভালবাসা পাইল, কিন্তু ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া সুদূর প্রবাসে যাইতে হইল। অদর্শনেও নরেন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু বহুদিন পরে যখন প্রণয়ীযুগলের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, তখন হেমলতা শ্রীশচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী। নরেন্দ্র হেমলতার পত্নীধর্ম্মাচরণের পথে কণ্টক স্বরূপ না হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিল।

এনক্ আর্ডেন। এনক্ আর্ডেন ও ফিলিপ্ রে (Philip Ray) দুইটী বালকই একটি বালিকা অ্যানি লীকে (Annie Lee) ভাল বাসিত। যৌবন কালে অ্যানি, এনক্‌কে প্রিয়পতি রূপে গ্রহণ করিল, কিন্তু বিধিবশে এনক্, অ্যানিকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে গমন করিল। প্রবাসে এনকের পত্নীপ্রেম অটুট রহিল, কিন্তু বহুবর্ষ পরে যখন অ্যানি পুনরায় এনকের নয়ন পথে পড়িল, তখন সে ফিলিপের

পরিণীতা পত্নী। এনক্ তাহার প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া অ্যানির জীবন বিষময় করিল না। সে তাহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অজ্ঞাত বাস করিল।

সাদৃশ্য এই মাত্র, কিন্তু উভয় পুস্তকের প্রভেদ বহুতর। মাধবী-কঙ্কণ একখানি চরিত্র ও ঘটনাবহুল বৃহৎ ঐতিহাসিক চিত্রময় উপন্যাস; এনক্ আর্ডেন একটী বিরল-চরিত্র ক্ষুদ্র পদ্য-গল্প (Idyll)। পুস্তক-দ্বয়ের তুলনায় সমালোচনা অসম্ভব এবং পৃথক ভাবে সমালোচনাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। পরন্তু কেবল মাত্র নায়ক চরিত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর মাধবীকঙ্কণ উপন্যাসের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি নির্ভর করে না, এই কথাটী যেন পাঠকের স্মরণ থাকে।

আমাদের আলোচ্য দুইটী চিত্র—নরেন্দ্র ও এনক্;—

হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথ! বিধাতা তোমাকে দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই এজগতে পাঠাইয়া ছিলেন। যে দিন তোমারই পিতার প্রতিষ্ঠিত বীরনগরের গঙ্গা সৈকতে তোমার প্রথম সাক্ষাৎ পাইলাম, সেই দিনই মনে হইল বুঝি তোমার অদৃষ্টে সুখ নাই। তুমি তখন দশম বর্ষীয় বালক মাত্র, তোমার মুখ খানি বড় সুন্দর, কিন্তু তুমি অত ক্রোধ পরায়ণ কেন? তুমিও বালির ঘর, করিতেছ, শ্রীশ বালক, শ্রীশও করিতেছে তাহাতে তোমার অত রাগ কেন? হেমকে তুমি বড় ভালবাস? ভালবাস তাহাতে ক্ষতি কি, হেমও ত তোমাকে ভালবাসে, তোমার কাছেই ত সে বেশীক্ষণ ছিল। শ্রীশও তাহাকে ভালবাসে, শ্রীশের কাছে কি সে এক বারও যাইবেনা? তোমার নিজের হাত কাঁপিয়া ঘর ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া কি শ্রীশ ও হেমের গায়ে বালুকা ছড়াইয়া দিতে হয়? শ্রীশ শান্ত

প্রকৃতি, সে তোমার অত্যাচার সহ্য করিল, হেম তোমাকে ভাল বাসে সে তোমার অভিমান-ক্রন্দনে সমবেদনা প্রকাশ করিল, তোমাকে কত সান্ত্বনা করিল। কিন্তু অপরে কি সেরূপ করিবে। তাই বলিতে ছিলাম, তুমি যেরূপ অভিমানী ও ক্রোধ পরবশ, বুঝি তোমার অদৃষ্টে শান্তি সুখ ঘটিবে না। কিন্তু নরেন্দ্র তুমি কি করিবে, ক্রোধ পরায়ণতা এবং তেজস্বীতাই তোমার স্বভাব। বোধ হয় তোমার সমরপটু স্বর্গগত বীর পিতার নিকট হইতেই তুমি এই তেজস্বীতা পাইয়াছ। তুমি বালক, জান না, যে ঐ তেজস্বী স্বভাব ভিন্ন, তোমার পিতার যে অতুল বৈভব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতেছ, তাহার কপর্দ্দকেও তোমার অধিকার নাই। তুমি মনে করিতেছ, তোমার অভিভাবক, তোমার পিতৃ অন্নে পালিত পিতার বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নবকুমার, তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তোমাকে সমস্ত বিষয়াদি প্রত্যর্পণ করিবে? তুমি বালক, হয়ত এচিন্তা তোমার মনে এখনো উঠে নাই, কিন্তু উঠিলে মনের অতি প্রান্তভাগেও এই আশাকে বিন্দুমাত্র স্থান দিও না। জানিও সংসারে অর্থই অনর্থের মূল, অর্থ বা অর্থজনিত সম্ভ্রম লোভে মানব কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দেয়, বন্ধুত্ব বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করে, কৃতজ্ঞতা নির্ব্বোধের মস্তিষ্কবিকার—প্রসূত আকাশকুসুম বলিয়া হৃদয়ে দলিত করে। তোমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। নরেন্দ্র তুমি আশৈশব মাতৃ পিতৃহীন, তোমার উগ্র প্রকৃতি দেখিয়া দুঃখ হয়, কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমাকে আত্মসংযমী হইতে কে শিক্ষা দিবে; প্রেমময়ী, দেবীস্বরূপিণী শ্রীশচন্দ্রের বালবিধবা ভগ্না শৈবলিনী? তুমি উদ্ধত, বালক স্ত্রীলোকের কথা শুনিবে কেন; তাহার সহিত তোমার কোন শোণিত সম্বন্ধ

নাই, আর সকল সময়ে সে তোমাদের বাটীতে থাকেও না। তোমার সর্ব্বস্বাপহারক স্বার্থপর নবকুমার ? তাহার প্রয়োজন !

আমরা যখন নরেন্দ্রের দ্বিতীয় বার দর্শন পাইলাম, তখন সে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক, পদার্পিত-মাত্র-যৌবন, উন্নত কায়, শ্রীমান, তেজস্বী পুরুষ। হেমলতার প্রতি তাহার বাল্য প্রেম যৌবনের প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইয়াছে, এবং সে জানিয়াছে যে হেমও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। হেমের প্রণয় অব্যক্ত, কিন্তু তাহার সতৃষ্ণ চাহনীতে, তাহার প্রতি কার্য্যে নরেন্দ্রকে এই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রণয়ের গভীরতা জানাইয়া দেয়। প্রণয়িণীর প্রেমলাভই যদি নরেন্দ্রের একমাত্র চিন্তা হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্র এখন সুখী। কিন্তু [illegible]র অবিচ্ছেদ প্রেমমুখ-সন্দর্শন পথেও অচিরে নরেন্দ্র বাধা পাইল। নরেন্দ্রের উদ্ধত ও অসহিষ্ণু স্বভাবই তাহার বিপক্ষতাচরণ করিল, এবং তাহার সুখ ভঙ্গের অব্যবহিত কারণ হইল। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রের শ্রীশের উপর ঈর্ষা। বাল্যকালে উভয়ের চরিত্র-পার্থক্য হেতু এবং হেমের স্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে, নরেন্দ্র শ্রীশের প্রতি বীতরাগ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদিও সে জানিয়াছিল, যে হেমের প্রণয় লাভ-কল্পনা ভ্রান্ত শ্রীশের পক্ষে, অলীক সুখ স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিলেও, শ্রীশের সহিত অপ্রণয়ের নরেন্দ্র অপরাপর কারণ পাইয়াছিল। সে অবগত হইয়াছিল যে হেমের সহিত বিবাহ দিবার জন্যই, হেমের পিতা নবকুমার, শ্রীশকে লালন পালন করিতেছে, এবং শ্রীশই নবকুমার কর্ত্তৃক অপহৃত, নরেন্দ্রর পৈত্রিক বিষয় বিভবের ভাবী উত্তরাধিকারী। সুতরাং শ্রীশের উপর আক্রোশ নরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক। শ্রীশ যে স্বয়ং নিরপরাধ, এবং নরেন্দ্রের শত অত্যাচার, আপনার ধীর ও সংযমী স্বাভাবগুণে অহরহঃ

মার্জ্জনা করে, ক্রোধান্ধ নরেন্দ্র তাহা দেখিয়াও দেখিত না। সে একদিন নিজ দোষে শ্রীশের সহিত কলহ করিল ও তাহাকে কটুভাষায় গালি দিল, এবং এই অযথাচরণের জন্য নবকুমার তাহাকে সুতীব্র ভৎসনা করিলে, নরেন্দ্র প্রত্যুত্তরে তাহার বহুদিন-সঞ্চিত ক্রোধরাশি নবকুমারের উপর মর্ম্মভেদী বাক্যে ব্যয়িত করিল। নবকুমার সুযোগ পাইল, নরেন্দ্রকে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল।

নরেন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার লাভের সহিত এনক্‌কে আমরা যে অবস্থায় প্রথম সন্দর্শন করি, তাহার সাদৃশ্য বড় চমৎকার। এনক্‌কে যখন আমরা প্রথম দেখিতে পাইলাম তখন নরেন্দ্রর ন্যায় এনক্‌ও বালক, এনক্‌ও আশৈশব মাতৃপিতৃহীন। সে, অপর একটী বালক ফিলিপ এবং একটী সুন্দরী বালিকা অ্যানির সহিত, সুদূর ইংলণ্ডের একটী ক্ষুদ্র বন্দরে, ফেণিল তরঙ্গ-তাড়িত সাগরসৈকতে, বালুকাগৃহ নির্ম্মাণ, ও সেই ক্ষণভঙ্গুর ক্রীড়াগৃহগুলির সমুদ্র তরঙ্গে ধ্বংসাবলোকন আমোদে রত ছিল। নরেন্দ্রের ন্যায় এনক্‌ও চঞ্চল, বলবান এবং তেজস্বী। এনক্‌ও ফিলিপ, অ্যানিকে বধূ সাজাইয়া, পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিনের জন্য গৃহস্থ খেলা খেলিত। কিন্তু এনক্ শারীরিক বলের অখণ্ডনীয় যুক্তিতে ধীর প্রকৃতি ফিলিপকে পরাস্ত করিয়া ক্রমাগত সপ্তাহব্যাপী কালই হয়ত, অ্যানিকে আপনার কাল্পনিক পত্নীরূপে অধিকার করিত। হেমলতার ন্যায় অ্যানি মধ্যস্থা হইয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিত।

উভয় বালকই অ্যানিকে ভাল বাসিত এবং যখন তাহারা যৌবনের ঊষালোকে নিজ নিজ হৃদয়ের প্রেমমন্দিরে দৃষ্টিপাত করিল, তখন

উভয়েই দেখিল যে অ্যানি মূর্ত্তিই সেখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে অচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রণয়িণীর প্রেম লাভ বিষয়ে এনক্‌ও নরেন্দ্রের ন্যায় ভাগ্যবান হইল। মানব অন্তরের যে নিগূঢ় কারণ বলে, হেমলতা শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি শ্রীশের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া নরেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল, যে কারণে শৈবলিনীর প্রণয়, পুরুষোত্তম চন্দ্রশেখরের প্রতি ধাবিত না হইয়া, প্রতাপকে আশ্রয় করিয়াছিল, যে কারণে গুইনিবিয়ার (Guinevere) দেবোপম আর্থরের (Arthur) গভীর প্রেমের প্রতিদান না করিয়া লান্সলটের (Lancelot) প্রতি আসক্তা হইয়াছিল, সেই কারণেই অ্যানি ধীর ও সহিষ্ণু ফিলিপের প্রণয়ে আকৃষ্ট না হইয়া, এনক্‌কে পতিত্বে বরণ করিল।

বিবাহের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর নব দম্পতীর পরম সুখে অতিবাহিত হইল। এনক্‌ একজন অসম সাহসিক ও নিপুণ নাবিক এবং ধীবরশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইল। তাহার পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থে, পতিপত্নীর অনন্ত প্রেম-বিনিময়ে, এবং পুত্রকন্যার আনন্দ কোলাহলে এনকের দরিদ্র গৃহ সুখের আবাসভবন হইল। কিন্তু তাহার পর পরিবর্ত্তন আসিল। দুর্দ্দৈববশতঃ এনক্‌ একটী অর্ণবপোতের উচ্চমাস্তুল হইতে পতিত হইয়া বহুদিন শয্যাশায়ী রহিল। ক্রমে তাহার সংসারে অভাবের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখা দিল। এবং এনক্‌ আরোগ্য লাভ করিয়া দেখিল, যে তাহার ব্যবসায়ে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাপর ব্যাঘাত আবির্ভূত হইয়া তাহার উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এনক্‌ তাহার পত্নী ও সন্তানগণকে দারিদ্র্য কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল হইল। এই সময়ে তাহার পরিচিত একজন্ পোতাধ্যক্ষ তাহাকে নাবিকরূপে সুদূর চীনরাজ্যে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। এনক্‌ দারিদ্র্যের ঘনান্ধকার হইতে

বাণিজ্যে আশাতীত ধনোপার্জ্জনের এবং স্বর্ণকিরণ মণ্ডিত ভবিষ্যৎ সুখের প্রদীপ্ত চিত্র দেখিল। সে এই সুসংবাদ ঈশ্বর প্রেরিত মনে করিল। এবং অ্যানির ক্রন্দন ও আপত্তিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া, আপনার বিষম বিরহবেদনা কল্পনায় বিচলিত না হইয়া, অ্যানি ও তাহার সন্তানগণকে অভাবের কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনাকে পাষাণকঠিন করিল;

> "He not for his own self caring but her,
> Her and her children, let her plead in vain;
> So grieving held his will and bore it thro."

এইরূপে নরেন্দ্র ও হেমের ন্যায় এনক্ ও অ্যানির, ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদ ঘটিল। নরেন্দ্র ও এনকের অবস্থার প্রধান প্রভেদ এই যে বিচ্ছেদ সময়ে অ্যানি এনকের পরিণীতা স্ত্রী, হেম নরেন্দ্রের প্রণয়াকাঙ্খিনী মাত্র। এনকের পুনর্ম্মিলনের আশা ছিল, নরেন্দ্রের মনে যে ঐ আশা ছিল না, তাহা নহে কিন্তু রোষে, ক্ষোভে, ও সময়াভাবে, সে আপনার মনের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে নিরাশ অন্তরে হেমের নিকট বিদায় লইয়া ছিল। কয়েক বৎসর সম্ভোগে, এনকের প্রণয় তৃষ্ণা কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত হইলেও তাহা, অপেক্ষাকৃত বয়ঃ কনিষ্ঠ নরেন্দ্রের অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্খা অপেক্ষা, প্রখরতায় কিছু মাত্র ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না সুতরাং বিদায় কালীন মনোবেদনা উভয়ের পক্ষেই সুতীব্র হইয়াছিল। নরেন্দ্র বিদায় কালে হেমকে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিল—

"নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত ভাল বাসিত, রমণীর হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু অদ্য এ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল * * * অদ্য হইতে অরণ্যে অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিব।"

* * শ্রীশচন্দ্রের সহিত তোমার পিতা তোমার বিবাহ দিবেন তাহা জানিতাম, সে জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিয়াছি।"

পরে মাধবীলতা রচিত একগাছি কঙ্কণ হেমের হস্তে পরাইয়াদিয়া বলিল "* * হেম, বোধ হয় তুমিও আমাকে কিছুদিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যতদিন নরেন্দ্রের জন্য তোমার স্নেহ থাকিবে; ততদিন এই মাধবী কঙ্কণটী রাখিও, যখন অভাগাকে ভুলিয়া যাইবে, জাহ্নবী জলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও।"

এই কথাগুলি শুনিলে মনে হয় যেন নরেন্দ্র হেমলতাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা কিছু মাত্র রাখে না, এবং হেমের পরপত্নীত্ব যে অবশ্যম্ভাবী ইহাও তাহার ধ্রুব বিশ্বাস। যদি তাহাই হয়, তবে হেমকে তাহার প্রণয় চিহ্ন ধারণ করিতে বলা যে অসঙ্গত অনুরোধ তাহা নরেন্দ্রের মনে আসিল না। যাহা হউক নরেন্দ্র তখন রোষে ক্ষোভে বিকৃত মস্তিষ্ক, সুতরাং অসহিষ্ণু নবীন হতাশ প্রেমিকেরা সাধারণতঃ যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে নরেন্দ্র সেইরূপই করিল। সে যতদূর পারিল হেমলতাকে কাঁদাইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিদায় গ্রহণ করিল।

এনকের পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ চিত্রটী অন্যরূপ। অর্দ্ধবর্ষ ব্যাপী মহার্ণব যাত্রার তৎকালীন অশেষ বিপদসঙ্কুলতার কথা বিদিত হইয়াও, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী এনক্‌, অ্যানির সহিত পুনর্মিলনের আশা রাখিত। সুতরাং সে আপনার সম্ভাবিত অনুপস্থিতি কালের জন্য পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, শোকবিহ্বলা পত্নীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইল। এবং আপনার অন্তরের দুঃসহ যাতনা গোপন রাখিয়া অ্যানির মানসফলকে পুনর্মিলন ও ভাবীসৌভাগ্য সম্পদের বিমোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়া, কত আশ্বাস বাক্য বলিল, কত শুষ্ক হাসি হাসিল—

"Annie, this voyage by the grace of God.
Will bring fair weather yet to all of us.
Keep a clean hearth and a clear fire for me,
For I'll be back, my girl, before you know it."

নরেন্দ্রের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে, যে হেমের সহিত পুনর্মিলনের আশা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা, তাহার প্রবল অন্তর্দাহ প্রভৃতি চিত্তবিকার ও শারীরিক পীড়ার প্রশমিত হইলেই প্রকাশ পাইল। ঐ চিন্তাই তাহার প্রকৃতিস্থ হৃদয়ের সমস্ত স্থান অধিকার করিল। সে নবকুমারের কবল হইতে, আপনার পৈত্রিক জমিদারী উদ্ধার করিবার জন্য বঙ্গের সুবাদার শাহসুজার নিকট আবেদন করিল,—উদ্দেশ্য, কৃতকার্য্য হইলে স্বার্থপর নবকুমার নরেন্দ্রকে কন্যাদান করিবে। আবেদন অগ্রাহ্য হইল, কিন্তু নরেন্দ্রকে তেজস্বী দেখিয়া সুবাদার রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারিলে, তাহাকে অন্য জমিদারী পুরস্কারের আশা দেখাইল। অগত্যা সেই আশার সহিত নরেন্দ্রের হৃদয়ে হেমকে পুনঃপ্রাপ্তির আশাও বিজড়িত হইল।

তিন বৎসর পরে নরেন্দ্র সেই সুবাদারের পক্ষে, কাশীর রণক্ষেত্রে অতুল সাহস দেখাইয়া আহত হইল; এবং পীড়িত অবস্থায় ঘটনাক্রমে দিল্লিতে নীত হইল। আরোগ্য লাভ করিয়া সে রাজস্থানে গমন করিল, এবং যুদ্ধে আহত অবস্থায় তাহার প্রাণদানকারী একজন রাজপুত যোদ্ধার (গজপতিসিংহ) পক্ষ হইয়া পুনরায় যুদ্ধকার্য্যেও লিপ্ত হইল। পরে বিষাদিত অন্তরে উদ্দেশ্য রহিত ভাবে কিছুকাল রাজস্থানেই পরিভ্রমণ করিল।

সে এখন শুনিয়াছে যে বহুদিন হইল হেম, শ্রীশের সহিত পরিণয় বন্ধনে ইহজীবনের মত আবদ্ধা হইয়াছে। তথাপি, সে হেমকে দেখিবার জন্য, তাহাকে আপনার বিষাদ কাহিনী শুনাইবার জন্য

নিরতিশয় ব্যাকুল হইল। অপর এক ব্যক্তি তাহাকে বুঝাইয়াছিল, যে নরেন্দ্র যে ভাবে হেমকে দেখিতে চাহে, সে ভাবে পরস্ত্রীকে দেখা দূরের কথা, চিন্তা করাও পাপ। সে আরও বুঝাইল যে তাহার সহিত হেমের সাক্ষাৎ হইলে, শ্রীশের পবিত্র সংসারে অশান্তি উপস্থিত এবং হেমের মহা অনিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; অতএব হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে মহাপাপে লিপ্ত হইবে। নরেন্দ্র স্বীকার করিল যে সে ঘোর পাপিষ্ঠ এবং মুখে বলিল—

"হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাঁহার শরীরের একটী কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য, আমি জীবন দিতে পারি। * * আমি হেমলতাকে এজীবনে দেখিতে চাহিনা।"

কিন্তু সে কার্য্যকালে আপনার বাক্য রক্ষা করিল না। সে একবার ঘটনাক্রমে হেমের অজ্ঞাতে তাহাকে আগ্রায় দেখিতে পাইল। কিন্তু সে দেখায় সন্তুষ্ট না হইয়া, হেমকে পুনরায় দেখিবার জন্য সে মথুরায় গমন করিল। সে জানিত যে এই সাক্ষাৎ তাহার মনের অতৃপ্ত বাসনা অধিকতর প্রজ্বলিত করিবার জন্য, এবং হেমের সর্ব্বনাশ সাধন মানসে তাহার উপর প্রতিহিংসা-পরায়ণা কোন শত্রু রমণী (জেলেখা) কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। তথাপি সে গমন করিল।

ইহাতে বুঝা যায় যে বহুবৎসর অদর্শনেও নরেন্দ্রের হৃদয়ে হেমের প্রতি প্রণয় লালসার কিছুমাত্র নিবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু সে প্রণয়ে নিঃস্বার্থতা বা পবিত্রভাবের অভাব দেদীপ্যমান। নরেন্দ্র এখন বালক নহে, বহুদর্শী হইয়াছে, বিপদ এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ তাহাকে শিক্ষিত করিয়াছে। তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞানে সে নিজে অজ্ঞ হইলেও, অপরে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত

উপদেশ ও শিক্ষা পদতলে বিদলিত করিয়া সে দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য, অসংযত আবেগের বশীভূত সাধারণ নবীন প্রেমিকের ন্যায় কার্য্য করিল। যদিও সে হেমের প্রতিমূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া আর একজন রূপসী রমণীর (জেলেখার) প্রগাঢ় প্রণয়ে অবহেলা করিয়া প্রণয়ের জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল বটে—কিন্তু সে রমণী যবনী, এবং সে কৌশলে নরেন্দ্রকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল প্রকাশ্য ভাবে নহে, সুতরাং তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ যে জীবন ভয় উপেক্ষা করিয়াও সেই রমণীর অযাচিত প্রেমপূজা প্রত্যাখান করিয়াছিল, তাহাতে সে যে কিছু বিশেষ প্রশংসনীয় আত্মত্যাগ বা অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিল এরূপ নহে।

তাহার পর পরস্ত্রী হেমের সহিত যখন নরেন্দ্রের মথুরার দেব মন্দিরে সাক্ষাৎ হইল, তখনও নরেন্দ্র তাহার নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিল।

হেমলতার অন্তরেও নরেন্দ্র-দর্শন বাসনা বড়ই বলবতী ছিল। সেও প্রকৃত সাধ্বীস্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করে নাই। সে বয়স্থা হইলে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে সে স্বামীর নিকট নরেন্দ্রের প্রতি নিজ অনুরাগের কথা প্রকাশ করে নাই; তদ্‌গতপ্রাণ পতিকে প্রতারণা বাক্যে ভুলাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিবার আশায় তীর্থদর্শনে আসিয়াছিল; সে পরপত্নী হইয়াও নরেন্দ্রের প্রণয় চিহ্ন অঙ্গ হইতে বিচ্যুত করে নাই, এবং সে নরেন্দ্রকে অনুক্ষণ চিন্তা করিত। কিন্তু সে নিজ মনের দুর্ব্বলতার জন্য একান্ত-মনে অনুতাপ করিত এবং শৈবলিনীর ধর্ম্মোপদেশ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া মনের বলের জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত। এবং নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শৈবলিনী

তাহাকে তাহার স্ত্রীধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিলে, সে নরেন্দ্রের সমক্ষে যেরূপ মনের বল দেখাইল, তাহা অস্বাভাবিক বোধ হইলেও প্রশংসনীয়। কিন্তু সে নরেন্দ্রকে যে কথাগুলি বলিল, তাহা সাধ্বী হিন্দুস্ত্রী মাত্রেরই নিকট হইতে আমরা প্রত্যাশা করি, তাহাতে ধর্ম্মজ্ঞানের অসাধারণত্ব কিছুমাত্র নাই। এবং যখন আমরা প্রতারিত শ্রীশের কায়িক ও মানসিক সৌন্দর্য্য, অনন্যসাধারণ পত্নীপ্রেম এবং পত্নীর প্রতি অচল বিশ্বাসের কথা স্মরণ করি, তখন আমাদের মনে হয়, যে হেমের বক্তৃতা যদি অন্যরূপ হইত তাহা হইলে আমরা তাহাকে কৃতঘ্না এবং পাপীয়সী বলিতে বাধ্য হইতাম। হেম, নরেন্দ্রকে কর্ত্তব্য-বিস্মৃত বিকলচিত্তের ন্যায় দেখিয়া স্নেহকরুণস্বরে বলিল,—'সে পরস্ত্রী, সুতরাং এক্ষণে উভয়েরই বাল্যকালের প্রণয় বিস্মৃত হওয়া উচিত। নরেন্দ্রকে বিধাতা পরাক্রম ও যশ দিয়াছেন ও হেমকে দেবতুল্য স্বামী, শৈবের ন্যায় ননদিনী, ধন ও ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, সুতরাং উভয়েরই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

ইহাতে নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল "হেমলতা আমি এতদিন তোমাকে জানিতাম না, তুমি মানবী না দেবী? এরূপ সহিষ্ণুতা, এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান, আমি এজগতে দেখিনাই, কখন দেখিব না।"

সীতা দময়ন্তীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সতী-ধর্ম্মানুষ্ঠানের অল্পদর্শিতা দেখিয়া আমরাও বিস্মিত হইলাম এবং তাহার দুর্ভাগ্যে দুঃখিত হইলাম। নরেন্দ্র কি হেমকে অন্যরূপ দেখিতে আশা করিয়াছিল?

যাহা হউক পরে, নরেন্দ্রকে ভবিষ্যতে যখনই দেখিবে, তখনই হেম আহ্লাদিতা হইবে, এবং বিপদে পড়িলে বীরনগরে তাহাকে সমাদরে আশ্রয়দান ও সেবা শুশ্রূষা করিবে এইরূপ বাক্যে আশ্বস্ত

করিয়া হেম নরেন্দ্রকে তাহার প্রদত্ত প্রণয়চিহ্ন মাধবীকঙ্কণটী হস্ত হইতে মোচন করিতে অনুরোধ করিলে, নরেন্দ্র হেমকে জিজ্ঞাসা করিল—

"হেম, তবে কি জীবনের জন্য, আমাকে বিস্মরণ করিবে?"

কি অদ্ভুত স্বার্থপর প্রশ্ন! হেমকে পুনরায় আশ্বাস দিতে হইল যে সে ভগ্নীভাবে নরেন্দ্রকে ভাল বাসিতে প্রস্তুত, এবং বুঝাইতে হইল, যে তাহার প্রদত্ত প্রণয়চিহ্ন ধারণে হেমের দোষ আছে।

নরেন্দ্র তখন আপনার অন্তরের কলুষভাব সত্বেও পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া মাধবীকঙ্কণটী মোচন করায় কোন দূষিত ভাব দেখিল না। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে নরেন্দ্রের সময়ে পরনারীর করপল্লব ধারণের পবিত্রভাব ভারতে অজ্ঞাত ছিল। যদিও হেমলতা নিজেই প্রণয়-মোহ মুগ্ধা নায়িকার ন্যায় নরেন্দ্রকে ঐ কার্য্য করিতে প্রণোদিত করিয়া ছিল, তথাপি হেম তখন নরেন্দ্রকে ভগ্নীরচক্ষে দেখিতেছে, এই বিশ্বাসে হেমের অবিমৃষ্যকারিতা মার্জ্জনীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু নরেন্দ্রের হৃদয়ে যে হেম-লতার বক্তৃতায় ভ্রাতৃভাবের ছায়াও স্পর্শ করে নাই, তাহা হয় তাহার মস্তিষ্কের জড়তা বা চিত্তবিকার বশতঃ সে বুঝিতে পারে নাই, নতুবা বুঝিয়াও তাহার কর্ত্তব্যনীতি পালন করিতে সে অসমর্থ ছিল।

এই ঘটনার পর যদিও নরেন্দ্র আপনার নিদারুণ দুঃখভার বুকে লইয়া সন্ন্যাসী হইল, কিন্তু সে বিরাগী হইল না। নতুবা এতদেশ থাকিতে সে বীরনগরের কাছে আসিয়া বাস করিবে কেন? তাহার পর নিজের সামর্থ থাকিতে পরান্নে প্রতিপালিত হওয়া যে অধর্ম্ম, তাহা নরেন্দ্রনাথের মনে, (আমাদের জাতিগত দুর্ভাগ্য বশতঃ,) উদিত হয় নাই। সে দিবাভাগে (যখন দেশ বিদেশ

হইতে তাহাকে লোকে দেখিতে আসিত) ধ্যান করিত এবং রাত্রে পরদুঃখ মোচনের জন্য ব্যস্ত হইত !

হেমলতার বিবাহের দশবৎসর পরে সে নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসীভ্রমে দেখিতে যাইলে, নরেন্দ্র আত্ম গোপন রাখিয়া হেমকে আশীর্ব্বাদ করিল "পতিব্রতা হও।" নরেন্দ্রের কথা মনে পড়িলে এখনও হেমের মুখে বিষাদ ছায়া পড়ে বটে, কিন্তু গৃহত্যাগী চিরদুঃখী ভ্রাতার জন্য অশ্রুপাত করিতে ভগ্নীর অধিকার আছে, সে নরেন্দ্রকে বীরনগরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সাদরে আহ্বান করিয়া মনের বলের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছিল ; আমরা আশা করি নরেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নরেন্দ্র তুমি পরস্ত্রী চিন্তা বিস্মৃত হও, অথবা যদি তাহা অসম্ভব বিবেচনা কর, তাহাকে ভগ্নীভাবে দেখিতে শিক্ষা কর ; তোমার সন্ন্যাসী সজ্জায়, এবং বহুবর্ষব্যাপী ধ্যানে কোন বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। তুমি তোমার প্রিয়তমা হেমকে "জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন" বলিয়া আশিস্ করিলে বটে, কিন্তু তোমার নয়ন কোনে অশ্রু কেন ?

ইহার পর নরেন্দ্র চিরতরে নিরুদ্দেশ হইল। নরেন্দ্র যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া ছিল, কিন্তু তাহা পরের জন্য নহে। সে বীরনগর হইতে কোন দূরবর্ত্তী লোকালয়ে বাস করিলে হেমের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, বরং নরেন্দ্র সুখে আছে শুনিলে হেমের অন্তরে যেটুকু অসুখ ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইত। মানবের দুঃখমোচন ব্যপদেশেও তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ কর্ম্মক্ষেত্রে লিপ্ত থাকিয়া ধনবান হইলে, কেবল মাত্র মুখের সান্ত্বনা বা কায়িক শুশ্রূষা ব্যতীত দুঃখী বা আর্ত্তদিগকে সাহায্য করিবার, সে অধিকতর

উপযোগী হইতে পারিত। অতএব নরেন্দ্রের লোকালয়ত্যাগ ও পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন, আপনার অসংযত ও বিষাদময় হৃদয়ের শান্তির জন্য, সুতরাং উহা পরহিতে আত্মোৎসর্গ নহে। নরেন্দ্রের কার্য্যগুলি অসাধারণ অথচ অসুন্দর, আদর্শের দিকে গমনোন্মুখ অথচ তাহার নিকট পঁহুছিতে পারে নাই।

নরেন্দ্র, তুমি তেজস্বী, তুমি কৃতজ্ঞ, তুমি স্বদেশের দুঃখে কাঁদিয়াছিলে, তুমি বাঙ্গালী হইয়াও বীর, তোমার প্রেমপূজা আজীবন স্থায়ী, তুমি মহৎ হইতে পারিতে তোমার প্রেম বিশ্ববিসারী হইতে পারিত। কিন্তু হায়! তোমার মনের দুর্ব্বলতা ও সংকীর্ণতা এবং উচ্চধর্ম্ম শিক্ষার অভাব, তোমার মহত্বের পথে বিষম অন্তরায় হইয়াছিল। তোমার প্রেম সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা স্থায়ী, কিন্তু সে প্রেমে পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ ভাবের বিকাশ অতি অল্পই হইয়াছিল। যদি মথুরায় দেব মন্দিরে তুমি তোমার প্রণয়পাত্রীর নিকট হইতে উপদেশ ও বাধা না পাইতে, যদি সে তোমাকে অনুমাত্র প্রশ্রয়দান করিত, তাহা হইলে তুমি যেরূপ দুর্ব্বলচিত্ত এবং সেণ্টিমেণ্টাল, তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে আমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু নরেন্দ্র! তুমি জন্ম দুঃখী এবং তোমার দুঃখভার কত দুর্ব্বিষহ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি;—আমরা তোমার সমবেদক, তোমার জন্য অশ্রুপাত করি।

এনকের অগ্নিপরীক্ষা নরেন্দ্রের অপেক্ষা কঠিনতর। এবং এনক্ ম্লেচ্ছদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই পরীক্ষাদান সময়ে ধর্ম্মজীবন ও আত্মত্যাগের যে সুউচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, হিন্দুসন্তান নরেন্দ্রনাথ তাহার নিম্নস্তরও অতিক্রম করিতে পারে নাই।

দীর্ঘ সপ্তবর্ষকাল ব্যাপী নির্ব্বাসন বা জীবন্মৃত্যুর পর এনক্ যখন, আশায়, উৎকণ্ঠায় কম্পিত হৃদয়ে, ইহজীবনের স্বর্গ, সুখের কেন্দ্রস্থল, গৃহে ফিরিল, সে দেখিল, তাহার গৃহ শূন্য, সে তাহার জীবনসর্ব্বস্ব ধর্ম্মপত্নী, যাহার সুখের জন্য, সে গৃহত্যাগ করিয়া সুদূর মহাসাগর পারে ধনোপার্জ্জন করিতে গিয়াছিল, যাহার প্রেমমুখ পুনঃ-সন্দর্শন আশায়, জলমগ্নপোত হইতে রক্ষা পাইয়া সে বহুবর্ষ জন-মানব শূন্য দ্বীপে অশেষ ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়াছিল, সেই অ্যানি, পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী, সে ফিলিপের বিবাহিতা স্ত্রী। এনকের দুঃখ ও নৈরাশ্য কল্পনা করিতেও আমাদের ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এনক্ যখন শুনিল যে বর্ষের পর বর্ষ, কত যন্ত্রণা, কত অভাব, কত আকুলতা,,কত নৈরাশ্য সহ্য করিয়া অ্যানি তাহার জন্য আশাপথ চাহিয়াছিল, সে যখন শুনিল যে ফিলিপ,'তাহার পুত্রকন্যাকে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, ও পিতৃযত্নে লালন পালন ও শিক্ষিত করিয়াছে, সে যখন শুনিল যে অ্যানি কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হইয়াও, এবং অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও ফিলিপের গভীর প্রেমপূজা গ্রহণ করে নাই, সে যখন ফিলিপের সহিষ্ণুতা ও সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা শুনিল, তখন সে অ্যানি বা ফিলিপের প্রতি কোন রূপ দোষারোপ করিল না।

কিন্তু আপনার ঘনতমসাচ্ছন্ন ভবিষ্য আকাশের প্রতি স্বতঃই তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ; সে ভয়ানক দৃশ্যে তাহার হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল, সে ভাবিল, 'বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হইলাম, মরিলাম না কেন'। কিন্তু সেই ভস্মীভূত সুখাশার শ্মশানভূমে দণ্ডায়মান হইয়াও, এনক্ তাহার ইহসুখের স্বর্গ, প্রাণের প্রাণ অ্যানি যে সুখে আছে, সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল, এবং রজনীর অন্ধকারে

জনমানবের অদৃশ্যে, উন্মুক্ত বাতায়নপথে, ফিলিপের শান্তিময় ও সুখময় গৃহে, অ্যানি ও পুত্র কন্যার প্রেম মুখ সন্দর্শনে, আপনার হৃদয়ের প্রবল পিপাসা একবার মিটাইল। চর্ম্মচক্ষে নিজের প্রিয়তম ধন পরের কক্ষগত অবলোকন করা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে কত কঠিন, তাহা এনক্ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। কিন্তু সে যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সে আর আপনার জন্য ভাবিল না, সে কেবল ভাবিল যদি তাহার জীবিত বার্ত্তা প্রকাশ পায় তাহা হইলে অ্যানি ও ফিলিপের জীবন বিষময় হইবে এবং তাহাদের সুখের ভবন চিরতরে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এনক্ আত্মগোপন রাখাই তাহার জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিল। যে পুত্র কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিবার সুখাশায়, সে দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, আত্মপ্রকাশ ভয়ে সে সুখেও এনক্ আপনাকে বঞ্চিত করিল। সে এই কঠোর আত্মত্যাগ সম্পাদনের জন্য জগদী-শ্বরের নিকট মনের বলের প্রার্থনা করিল—

> "O God Almighty, blessed saviour, Thou
> That didst uphold me on my lonely isle
> Uphold me Father, in my loneliness
> A little longer! aid me, give me strength
> Not to tell her, never to let her know.
> Help me not to break in upon her peace.
> My children too! must I not speak to these?
> They know me not. I should betray myself.
> Never: No father's kiss for me—the girl
> So like her mother, and the boy, my son."

জগদীশ্বর এনকের কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য তাহার ভগ্ন হৃদয়ের অসহনীয় বেদনা কথঞ্চিত প্রশমিত করিল।

বহুবর্ষ নির্জ্জন-বাস হেতু আকৃতিগত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন

এনক্‌কে আত্মগোপন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিল। 'এনকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু সে পরান্নে পালিত হওয়া ঘৃণিত বোধ করিল, এবং ভগ্নশরীরে যথা সাধ্য পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। সে শুনিয়াছিল যে তখনও অ্যানির মনে মৃত এনকের পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন আশঙ্কা সময়ে সময়ে দুঃস্বপ্নের ন্যায় উদিত হয়; তাহার প্রিয়তমার অন্তর হইতে এই অশান্তির অপনয়ন করিতে পারিবে ভাবিয়া পীড়িত এনক্‌ দুঃখের মধ্যেও সুখ পাইল, সে তাহার শেষের দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বৎসরেক পরে জগদীশ্বর তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন, এনক্‌ ইহজন্মের মত শয্যাশায়ী হইল। সে অ্যানিকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত ভাল বাসিত এই কথা জানাইয়া যাইতে পারিবে ভাবিয়া তাহার বিশুষ্ক বদন উৎফুল্ল হইত। অন্তিম সময়ে নয়নপুত্তল পুত্রকন্যার মুখ সন্দর্শনের সাধ মানবহৃদয়ে বড়ই অনিবার্য্য হইয়া উঠে, এনক্‌ সেই প্রবল প্রলোভনও সম্যক্‌ দমিত করিয়া তাহার জীবনের কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিল। এনক্‌ যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার ইহজগতের শেষ দিন উপস্থিত প্রায়, সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া, অ্যানিকে অনন্ত প্রেমানুরাগ, পুত্রকন্যাকে সস্নেহ মঙ্গলকামনা এবং ফিলিপকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ, তাহার মৃত্যুর পর জ্ঞাপন করিবার আদেশ দিল। এবং প্রেমভরে অ্যানির ভাবী সুখদুঃখের কথাও সে ভাবিল, পাছে অ্যানির ভবিষ্য জীবনে শান্তির ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় সে অ্যানিকে তাহার মৃতমুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিবার কথা বলিয়া রাখিল।

ইহার পর তৃতীয় রাত্রে জগৎপিতা তাঁহার সন্তাপিত সন্তানকে প্রেমমধুরস্বরে আহ্বান করিলেন, এবং যখন তাঁহার শান্তি-শীতল

ক্রোড়ে এনক্ স্থান পাইল, তখন স্বর্গের অনন্ত সুখজ্যোতিঃ তাহার নয়নাভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত।

ধন্য এনক! তুমি মহাবীর, তুমি যে উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান, আদর্শ পত্নীপ্রেম দেববাঞ্ছিত আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলে, তাহা দুর্ব্বল মানবকে চিরদিন শিক্ষাদান করিবে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

পরিচয়।

১

স্বদেশ হিতৈষী আমি এবার যে হয়েছি!
আমি বটে নব্য ভব্য,
তথাপি বিলাতী দ্রব্য
ব্যবহার একেবারে পরিহার করেছি।

২

পরেছি ঢাকাই ধুতি,
যদিও বিলাতী সুতি,
তথাপি বুনেছে ইহা দেশী কারিগর:
হলেই বা কুড়ি টাকা জোড়াটার দর।

৩

খাটি এ দেশীয় সিল্ক,
যেন কনডেন্স্ মিল্ক
কি মোলাম ঝক্‌ঝকে, সফেদ সুন্দর!
র‍্যাঙ্কিন কোম্পানি বটে,
একোট দিয়েছে ছেঁটে
সেখানে যে খাটে দেশী দরজী বিস্তর।

৪

হের এদেশের মুচি, করেছে কেমন শুচি,
আমার এ পশমের পাদুকা নির্ম্মাণ;
যদিও রিতদীনারী,
বিলাতি পশম ধরি,
তুলেছে বিচিত্র ফুল, গঁপে মন প্রাণ।

সাহে[illegible]রা যবে,
আসে কোন মহোৎসবে
নিমন্ত্রণ রক্ষাতরে আমার ভবন,
পরাই তাদের আনি,
দেশী পরিচ্ছদ আনি
আমার দেশানুরাগ প্রবল এমন।

৬

কালাপেড়ে শিমলার,
পাঞ্জাবী চুনটদার,
সাহেবেরা পরে হ্যাট, কোট, প্যান্ট, ছেড়ে;
বিবিরা গাউন ছাড়ি,
সাজে যেন জুজুবুড়ী
বাঙ্গালিনী, পেয়ে দেশী শাড়ী হাতীপেড়ে।

৭

তোমরা [illegible],
এ [illegible]
পরিছ দু'চাকা [illegible] কাপড়,
ছি [illegible] লজ্জা,
ফেলিয়ে দেশীয় সজ্জা
দেশীয় আচারে শুধু [illegible] বড়?

৮

আমার ড্রয়িং রুম,
(অ[illegible] [illegible])
প্রতিনিশা বাজে বটে হারমনিয়ম
রচেছি জাতীয় গীত,
হয় তায় [illegible]
যদিও রয়েছে ভাঙ্গা সেতার, সারঙ।

৯

পারিস্‌কে দিয়ে ফাঁকি,
এদেশী এসেন্স রাখি
যদিও বিলাতি সুরা তার উপাদান
শিশিটাও—বটে, বটে,—নাহি পারত্রাণ

১০

আমি আট্‌টায় উঠি,
পান করি দেশীয় 'টি'
মিশায়ে হুইস্‌কি হয়ে নিরুপায়;
(কোথায় পাবে খাঁটি দুধ দেশী গোয়লায়!)
দিই বটে ফর্সা চিনি,
জর্ম্মনীর আমদানী
যদিও গেছে দর ডিউটিটা হয়ে।
কবে হবে দেশী চিনি শাদা হাড়েধুয়ে?

১১

কথা কই বাঙ্গালায়
যদিও মিশায়ে যায়
গোটাকত মাঝে মাঝে ইংরাজী বচন
ঝটপটও করি বটে
(পাছে সাহেবেরা চটে)
ইংরাজীতে হয়ে গেছে অভ্যাস কেমন!
তথাপি আমার মত হিতৈষী কজন?

১২

কত যে চাঁদার খাতা,
সই করি পাতা পাতা
কত টাকা দিই এই দেশের কারণ,
(টাইটেল্ হলনা তবু মনের মতন।)

১৩

আমি দেশের তরে,
ব্যয় করি অকাতরে
মুখের কথায় নয় কাজে পরিচয়
তোমরা এমনি বোকা,
উপায় করিয়া টাকা
বিলাতি দ্রব্যের মোহে কর অপচয়!

১৪

চাও যদি দেশ হিত
কর কর্ম্ম সমুচিত
দিয়েছি যেমন আমি দেশ হিতে মন,
আমারে আদর্শ ভেবে
অতএব চল সবে,
স্বদেশ উদ্ধার তরে করি প্রাণ পণ।

শ্রীদেশহিতৈষী।

উপেক্ষিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা গেজেটে এম্ এ, পরীক্ষোত্তীর্ণর তালিকায় যেদিন প্রবোধচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হইল, সেইরাত্রেই ডিষ্ট্রিক্টজজ মিঃ—সেন, পরম লাবণ্যবতী কন্যা লাবণ্যপ্রভার বিবাহসম্বন্ধটা প্রবোধের সহিত পাকাপাকি করিবার জন্য প্রিয়বন্ধু জগদীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডেপুটীবাবু জগদীশচন্দ্রের বাঙ্‌লো জজ সাহেবের বাঙ্‌-লোর কাছেই। বাল্যকাল হইতে উভয়ের সৌহৃদ্য।

যে সময়ে, যে অবস্থায় মানবের হৃদয়ে স্বার্থপরতার কৃষ্ণ ছায়া পতিত হয় না, যখন তাহার হৃদয় দেবতার মত সরল, অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, যে সময়ে সীমাহীন ভালবাসা মানবশিশুর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পুর্ণ করিয়া রাখে, সেই চির প্রফুল্ল শৈশব অবস্থা হইতে প্রবোধ ও লাবণ্য পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া আসিতেছে। লাবণ্য যখন মাতালের মত চপল চঞ্চল চরণে টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে, ঘর বাহির মাতাইয়া তুলিত, ধাত্রী, ভৃত্য প্রভৃতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তখন প্রবোধ ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক মাত্র। কিন্তু সেই বাল্য অবস্থা হইতেই প্রবোধ লাবণ্যকে অপার্থিব স্নেহ চক্ষে দেখিত, তাহাকে পাইলে সে অপর কার্য্য ভুলিয়া যাইত। তখন হইতেই উভয়ের মধ্যে কিসের একটা টান পড়িয়াছিল।

ছুটির সময় স্কুল কলেজবন্ধ হইলে, প্রবোধ অবসর মত বালিকা লাবণ্যের পাঠ বলিয়া দিত, তখন গৃহশিক্ষকের কাছে লাবণ্য পড়িতে যাইতে চাহিত না।

লাবণ্যের কয়েকটি মহৎ দোষ ছিল,—সে বড় চঞ্চল, বড় অভিমানিনী,

বড় গর্ব্বিতা তাহার বিশাল কৃষ্ণতারকোজ্বল, নয়ন যুগলে চঞ্চলতার, স্বেচ্ছাচারিতার ছায়া সর্ব্বদাই দর্শকের মনে কেমন একটা ভীতির আভাস জাগাইয়া তুলিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, সে পিতা মাতার বড় আদরের কন্যা। তাই সে প্রায় সকল কার্য্যেই একটু স্বাধীন মত চালাইতে চাহিত। নিজ দাম্ভি-কতায় চরণতলে অপরকে দলিত করিতে পারিলে তাহার বড় আহ্লাদ, বড় আনন্দ বোধ হইত।

কিন্তু প্রবোধকে সে স্নেহের চক্ষে দেখিত। কেবল প্রবোধের কাছেই তাহার উদ্ধত প্রকৃতি, চঞ্চল স্বভাব, শান্ত শিষ্ট বালকের প্রতিভা-দীপ্ত প্রেম-পূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেই, সে আপনা হইতেই কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত।

উভয়ের পিতা শৈশব হইতেই এই বালক বালিকার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট একত্র করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। প্রবোধ ও লাবণ্য তাহা জানিত।

জগদীশ বাবুর সহিত বিবাহের পাকা পাকি বন্দোবস্তের প্রস্তাবের পর জজ বাহাদুর বলিলেন যে দুইবৎসরের জন্য প্রবোধের বিলাত যাওয়া আবশ্যক। সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষাটা দেওয়া হউক। ব্যয়ভার তিনি নিজেই লইবেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া অসিবার পর শুভ বিবাহের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

সামাজিক প্রথামত বিবাহের চুক্তি কাগজ পত্রে বিধিবদ্ধ ও স্বাক্ষ-রিত হইল। বন্দোবস্ত সবই পাকাপাকি রকম হইয়া গেল; কেবল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সামাজিক ও লৌকিক আচার ব্যতীত বিবাহের আর আর সমুদয় ব্যাপারই সম্পন্ন হইল।

বিলাত যাত্রার দিন উভয়ের একবার দেখা হইল। কেহ কিছু

বলিতে পারিল না। প্রবোধের হৃদয় মধ্যে তখন এক অনন্ত, ভাষা-হীন, উদাস ভাব মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। দুইটী ভবিষ্য বৎসর যেন দুইটী দুরারোহ পর্ব্বতের মত তাহার ক্লিষ্ট কল্পনায় প্রভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লাবণ্যের আর দিন কাটেনা। প্রবোধের বিলাত যাওয়ার পর হইতেই লাবণ্যের মনে কেমন একটা বিশাল, যুগব্যাপী শূন্যতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কেমন একটা আকুল আকাঙ্খা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার মত তীব্র জ্বালায় তাহার হৃদয়ের কোমল স্থলগুলি ব্যথিত করিত; মরুভূমির তৃষ্ণার মত সীমাহীন শুষ্কতৃষা তাহার প্রাণের মাঝে উষ্ণশ্বাস ফেলিত। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না কেন তাহার এ ক্ষুধিত জ্বালা, এ দুর্দ্দমনীয় উষ্ণ তৃষা! প্রবোধের জন্য কি?

প্রতি মেলে নিয়মিত সময়ে প্রবোধের সুদীর্ঘ, কবিত্বপূর্ণ পত্র আসিত। পত্রের প্রতিছত্রে, প্রতিশব্দে প্রতিঅক্ষরে কত আশা, কতভরসা, কতভবিষ্য সুখচিত্রের কল্পনা অঙ্কিত থাকিত; কিন্তু পত্রের সে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ত আর তেমন লাবণ্যের উপর আধিপত্য করিতে পারিত না। প্রথম প্রথম পত্র হাতে করিলেই লাবণ্যের হৃদ্‌পিণ্ড সশব্দে ছুটাছুটি করিত, চক্ষে মুখে তাড়িত প্রবাহ বহিয়া যাইত; কিন্তু সে গুলিত আর এখন তেমন করে না! লাবণ্য কি তাহাকে ভুলিতেছিল?

সম্পূর্ণ বিস্মৃত না হউক বৎসরের মধ্যেই লাবণ্য প্রবোধের প্রতি কিছু উদাসীন হইয়া পড়িল। তাহার চঞ্চল প্রকৃতি ক্রমশঃ আরও

চঞ্চল হইয়া পড়িল। লাবণ্য তাহার এ ঔদাসিন্য আমোদে ডুবাইয়া রাখিত। যেখানে উৎসব, লাবণ্য সেখানে অবসর না থাকিলেও অবসর করিয়া লইত। প্রবোধের স্মৃতি—শুধু স্মৃতিতে আর তাহার তৃপ্তি হইত না।

থিয়েটারে যাওয়া বাড়ীতে নিষেধ ছিল। লাবণ্য জননীকে অনুনয় করিয়া সঙ্গে লইয়া রঙ্গালয়ে যাইত। সেখানকার উন্মাদকর নৃত্যগীত, ঝলসিত বিচিত্র দৃশ্যপট, উজ্জ্বল আলোকমালা তাহার উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম কল্পনা সমুদ্রে অতৃপ্ত আকাঙ্খার তরঙ্গ উথলিয়া দিত।

যৌবন জোয়ারে যখন তরঙ্গ উঠে তখন তাহার গতি, তাহার বেগ রোধ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা ভালমন্দ বিবেচনা, তখন মানুষের থাকেনা। এ সময় বড় ভয়ানক, চঞ্চল প্রকৃতির পক্ষে আরও ভয়ানক। লাবণ্যেরও তাহাই হইল। তাহার কল্পনা সমুদ্রে তুফানে উঠিয়াছিল—হৃদয় তরণী কর্ণধার বিহীন, তাহার মন তখন তরঙ্গের টানে ভাসিয়া যাইতেছিল। লাবণ্য শুধু স্মৃতির ক্ষীণ আশায় আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না।

লাবণ্য তাহার এক বাল্য সহচরীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইল। মাতার সহিত বিশেষ, বেশ ভূষার পারিপাট্য ও আড়ম্বরের সহিত সে নিমন্ত্রণ বাটীতে উপস্থিত হইল।

উজ্জ্বলালোকে হলরুম ঝলসিত হইতেছিল। অনেক বড় বড় ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। বিচিত্র বেশ ধারিণী মহিলা ও বালিকারা চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারি মধ্যে, সেই উৎসব তরঙ্গে পড়িয়া লাবণ্যও অনেকটা তৃপ্তি লাভ করিল। সখীর বিবাহ দৃশ্যে তাহারও হৃদয়ের মধ্যে কিসের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তাহার এমন সুখের দিন কবে আসিবে?

কোন ভবিষ্যের অন্ধগর্ভে, অদৃষ্ট যবনিকার পার্শ্বে সে শুভ দিন লুক্কায়িত।

লাবণ্য একটু বিষণ্ন হইল। ছোট খাট দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার বক্ষ ঈষৎ কম্পিত হইল।

সহসা লাবণ্য মুখ তুলিয়া দেখিল কিছুদূরে একদল বয়স্থা স্ত্রীলোকের মাঝে একটী যুবক দাঁড়াইয়া, আর লাবণ্যের জননী নিতান্ত আত্মীয়ের মত তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন। তাহার সইয়ের মাতা ও ভগিনী কাছে দাঁড়াইয়া। লাবণ্য, এরূপ একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত মাতাকে কথা বলিতে দেখিয়া, একটু বিস্মিত হইল। মাতাকে ডাকিবার জন্য সে একটু অগ্রসর হইল। আর অমনি সেই অপূর্ব্বদর্শন যুবকের সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। লজ্জায় লাবণ্যের আর পা উঠিল না।

পরে লাবণ্য মাতার নিকট শুনিল, যুবকটী তাহারই সই সুশীলার মাতুল, কোন বিখ্যাত বিলাত ফেরতের একমাত্র পুত্র মিঃ অবনীমোহন দত্ত, এখন পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর। উপযুক্তা পত্নী অভাবে এখনও অবিবাহিত।

লাবণ্য দেখিল মাতা অবনীমোহনের প্রশংসা শতমুখে করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জন কোলাহলময় বৈচিত্র্যপূর্ণ লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ বোর্ডিংহাউসের কোন অনতিবিস্তৃত সজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া প্রবোধ যখন অভিনিবিষ্ট চিত্তে পুস্তকের অধ্যায়গুলি আয়ত্ব করিতে যত্নবান হইত তখন অনেক সময় তাহার প্রবাসী কল্পনায়, একখানি বিদায়ের অশ্রুশিক্ত সুন্দর মুখের বিষাদছবি ভাসিয়া উঠিত। দুইটি অর্দ্ধস্ফুট

করুণ সম্ভাষণ প্রাণের মাঝে কি আশাময়, কি মোহময় সঙ্গীতের মত অতিলঘু, অতিক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিত! কাণের চারিপার্শ্বে সেই শব্দ তরঙ্গ, মধুর স্বর লহরী, সর্ব্বদা অতৃপ্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার বর্ত্তমানের এই কঠোরতার মধ্যে, অতীতের সেই স্নেহশালিতা কত মধুর, কত জীবন্ত, কত আশাময়! সে দৃশ্য, সে মুখ, সেই আঁখি, সেই হাসি মনে পড়িলে এখনও তাহার শিথিলপ্রায় শৃঙ্খলাহীন হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলি কেমন তালে তালে, কোমলে মধুরে বাজিয়া উঠে! সে রাগিণী কত সুখ স্বপ্নময়!

ছোট খাট "ইণ্ডিয়ান নবাব" বলিয়া ইংরাজ সহাধ্যায়ী মহলে প্রবোধের একটা প্রতিপত্তি ও পশার পড়িয়াছিল। পিতা যথেষ্ট অর্থ পাঠাইতেন। ভাবী শ্বশুরও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠাইতেন, প্রবোধ সুতরাং একটু উঁচু দরেই থাকিত। কিন্তু সে বড় একটা কাহারও সহিত মিশিত না। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ যুবক ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রবোধের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নবান হইতেন; কিন্তু নির্জ্জনতা প্রিয়, শান্তশিষ্ট যুবক নিজের পাঠ্য পুস্তক ও চির সঙ্গিনী কল্পনা ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত ঘনিষ্টতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিত না।

যখন মেঘময় আকাশের মধ্যদিয়া দিবার আলোক পতনশীল তুষার কণার উপর নৃত্য করিত, ঈষৎ প্রবাহিত শীতল পবন, রুদ্ধ কাঁচের বাতায়নে শিশির বিন্দু জমাইয়া দিয়া যাইত তখন যেন কোন মায়া মন্ত্রে প্রবোধের পড়শুনা থমকিয়া যাইত। সে একদৃষ্টে সেই নৃত্যপরায়ণ রবিরশ্মিতে নিজের ভবিষ্য সুখের ছায়া কল্পনা করিত।

আবার নিশীথ রাত্রে যে দিন দরিদ্রের কোহিনুর প্রাপ্তির মত

চন্দ্রের ম্লান আলোক, কুয়াশাসমাচ্ছন্ন রজনীর তিমির অবগুণ্ঠন সরাইয়া, জ্যোৎস্নার তরল উৎস প্রসারিত করিয়া দিত, সে রাত্রটা প্রবোধ কল্পনার মনোরম কুঞ্জেই অতিবাহিত করিয়া দিত, অধ্যয়নের পরিশ্রম খণ্ড কবিতার চরণে অবসর গ্রহণ করিত।

মেলের দিন সমস্ত সময়টা প্রবোধের নিকট অনন্ত যুগ বলিয়া বোধ হইত। সিঁড়িতে যখন ভৃত্যের সাবধানবিন্যস্ত পদশব্দ শুনিতে পাইত, তখন তাহার বুকের মধ্যে বিষম সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইত। উষ্ণশোণিত রাশি, যেন ক্রীড়াশীল শিশুর মত সশব্দে, শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিত। তারপর যখন লাবণ্যের পত্রখানি দেখিতে পাইত, তখন কেমন একটা কম্পন যে আরম্ভ হইত তাহা সহসা প্রবোধ কিছুতেই দমন করিতে পারিত না। তাহার অন্তরে বাহিরে বিষম বিপ্লব বাধিয়া যাইত।

এই রূপে প্রবোধের দিন গুলি মাসে ও ক্রমে বৎসরে পরিণত হইতেছিল।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, প্রবোধ একটু একটু করিয়া দেখিতে পাইল, লাবণ্যের পত্র গুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিতেছে, আর সকল মেলে তাহার পত্রও যেন আসিত না। প্রবোধের পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছিল, সে মধ্যে মধ্যে ভাবিয়া লইত এই জন্যই লাবণ্য আর তাহাকে তেমন নিয়মিত ভাবে পত্র লিখে না। বক্তব্য বিষয় গুলি বোধ হয় সেই জন্যই তত সংক্ষিপ্ত ও কৃত্রিমতা পূর্ণ! ইহাব্যতীত সে অপর কিছু ধারণাই করিতে পারিত না।

মধ্যে মধ্যে তাহার প্রাণের অতি নিভৃত স্থলে কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার অন্ধকার জাগিয়া উঠিত। নিরাশার তিমির ছায়া

তাহার মনের উপর ঘুরিয়া বেড়াইত। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝ খানে সহসা এক সীমাহীন সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন সে লাবণ্যের পত্রগুলি লইয়া বার বার পড়িত।

জগতের কৃত্রিমতা প্রবোধ ভাল করিয়া পাঠ করে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জঙ্গবাহাদুর মিঃ—সেনের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বিবাহের উৎসবামোদ তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক প্রকাণ্ড সিংহদ্বারে নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছিল। নহবতের পরিবর্ত্তে দ্বিতলস্থ গ্যাসালোকিত প্রকোষ্ঠমধ্যে হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ফ্লুট ও বেহালার মধুর শব্দ বড় মিঠা বাজিতেছিল। সুদৃশ্য রেলিং, বারাণ্ডা, গৃহ প্রাচীর, জানালা, দরজা সর্ব্বত্রই বিচিত্র গন্ধমাল্য তরঙ্গাকারে দুলিতেছিল। চারিদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ আনন্দোৎসব।

লাবণ্যের মাতার আজ আর আহ্লাদ ধরে না। এতদিন একটী মাত্র মেয়ের বিবাহের ফুল ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাহাতে পাত্রটী মনোমত। শুধু বড় লোকের ছেলে নয়, বিষয় সম্পত্তি অগাধ, তাহাতে নিজের সংসারে নিজেই কর্ত্তা। অবনী-মোহনের সহিত কি প্রবোধের তুলনা? রূপে গুণে ধন দৌলত সকল বিষয়েই অবনীমোহন শ্রেষ্ঠ! বরাবরই তিনি মনে মনে প্রবোধকে একটু অপছন্দ করিতেন। অত নিরীহ ভাল মানুষ হইলে কি আজকাল চলে? তবে তখন বেশী ভাল পাত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া, পাছে হাতছাড়া হইয়া যায় বলিয়া, তখন মত দিয়াছিলেন; কিন্তু এখন অবনীমোহনের মত, সুন্দর, সুপুরুষ, চালাক, চতুর সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্র পাইয়া তিনি কি আর প্রবোধের হস্তে

একটী মাত্র কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারেন? বিশেষতঃ লাবণ্যের এ বিবাহে অমত নাই। তাই তিনি জজ সাহেবের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ বিবাহ দিতে বসিয়াছেন। আজ কি আর তাঁহার আনন্দ লুকাইবার স্থান ছিল।

জজ বাহাদুরের মুখের ভাব একটু গম্ভীর। মেয়ের বিবাহে যতটা স্ফূর্ত্তি, যতটা আহ্লাদ হওয়া স্বাভাবিক ঠিক ততখানি প্রফুল্লতা তাঁহাতে তখন ছিল না। বিরক্তি লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার স্বভাবপ্রসন্ন মুখখানি ঈষৎ কালিমাময় হইয়া উঠিয়া ছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত তিনি হাসিয়া কথা কহিতে ছিলেন বটে, কিন্তু কোন সূক্ষ্মদর্শী, বিচক্ষণ দর্শক তাঁহার অবস্থা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারিতেন, সব হাসি, সব কথা ঠিক প্রাণের মধ্য হইতে বাহির হইতে ছিল না। অনেকটা কৃত্রিমতা তাহার মধ্যে লুকায়িত ছিল।

যে সুযোগ্য পাত্র মনোনীত করিয়া তিনি বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থ পাঠাইলেন, সেই পুত্র সদৃশ প্রবোধের পরিবর্ত্তে অপর একব্যক্তি তাঁহার জামাতা হইতে চলিল! শুধু তাহা নহে ভগবানকে সাক্ষ্য রাখিয়া দশ জনের সাক্ষাতে তিনি যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর-করিয়াছেন। আজ তিনি মিথ্যাবাদী! যদিও জগদীশবাবু সকল ব্যাপার শুনিয়া স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য গুণে কোন প্রকার বাহ্যিক অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করেন নাই, ও তাঁহাকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ, তিনি ন্যায়ের চক্ষে, সত্যের চক্ষে দোষী।

তিনি পত্নীকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু সে স্বাধীনতা-প্রিয় গৃহিণী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইচ্ছা করিলে

তিনি নিজ ক্ষমতা চালাইতে পারেন সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা মনে উদিত হইলেও কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পত্নীকে তিনি একটু ভয় করিতেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন লাবণ্যের এ বিবাহে নিতান্ত ইচ্ছা। সুতরাং তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিলেন।

আর লাবণ্য?—তাহার আনন্দ, মনোগত অভিলাষ, তাহার বিচিত্র বেশভূষা ও হাস্য, প্রফুল্ল সলজ্জ মুখেই প্রকাশ পাইতেছিল। চপলমতি বালক, পুরাতন ক্রীড়নকের স্মৃতি, নূতন সুদৃশ্য পুত্তলিকা পাইলে যেমন ভুলিয়া যায়, জলের প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্বিত পদার্থ সরাইয়া লইলে যেমন মিলাইয়া যায়, লাবণ্য তেমনি অবনীমোহনের স্পৃহনীয় সংসর্গ পাইয়া, তাহার অযাচিত মনোযোগ, বিচিত্র উপহার ও মিষ্ট, লোভনীয়, চিত্তাকর্ষক কথোপকথনে, প্রবাসী প্রবোধের স্মৃতিকে অবহেলে দূরে সরাইয়া দিল। এত দিনের ভালবাসা, এত দিনের পরিচয়, সামান্য কয়েক মাসের অদর্শনে নিতান্ত হেয় পদার্থের মত পরিত্যক্ত হইল। যৌবনতেজদীপ্ত চপলমতি, অস্থিরচিত্তকে বিশ্বাস করিও না, উন্মাদ আকাঙ্খার প্রবাহে পড়িয়া ভালমন্দ বিচারক্ষমতা থাকে না। নেশার ঘোরে, মত্ততার প্রভাবে, অনেক সময়ে হীরক ও কাচের পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি না।

লাবণ্যের যৌবন নদীতে যে প্রবল উচ্ছাস উঠিয়া ছিল, সে তাহার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। আত্ম, সংযম তাহার ছিল না। তাহার নবীনতেজস্বিনী হৃদয়লতা যে অবলম্বা বৃক্ষের অভিমুখে প্রসারিত হইতেছিল, পোঁছিবার পূর্ব্বে, মিলনের অর্দ্ধপথে, সহসা এক বিস্তৃত ব্যবধান জাগিয়া উঠিল। সে অবলম্বন, সময়ের অন্তরালে, দৃষ্টিচক্ষুর বাহিরে চলিয়া গেল। লাবণ্য সহসা পার্শ্বে দেখিল আর

একটী স্পৃহনীয় অবলম্বন বৃক্ষ। বিবেচনা শক্তি, ধৈর্য্য তাহার সহিল না। প্রতিবন্ধকহীন মহীরুহে সে আপনার কোমল দেহলতা প্রসারিত করিয়া দিল।

চারিদিকে আনন্দোৎসব, উজ্জ্বল আলোক, সঙ্গীত তরঙ্গ। লাবণ্য এক সজীব উৎসের মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। যখন বিবাহ সজ্জায় লাবণ্য ভূষিতা হইতে ছিল, সুদূর জলধিপারে, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া প্রবোধ তখন কত ভবিষ্য সুখের কল্পনা করিতেছিল!

বিবাহের মুহূর্ত্তে, একবার মাত্র লাবণ্যের হৃদয় একটু কাঁপিয়া উঠিয়া ছিল। স্বপ্নবৎ বহুদিনের একটী শপথ, দুইটী বিদায় বাণী, সেই সঙ্গে একটী স্নেহপ্রফুল্ল মুখের ছবি মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা শুধু নিমেষের জন্য। মঙ্গল সঙ্গীতের মোহন তানে, ক্লারিওনেট, হারমোনিয়মের সুরে তাহার ভবিষ্য সুখ চিত্র, অতীত স্মৃতিকে ডুবাইয়া দিল।

* * * * * *

ঘটনাটি যখন সবিস্তারে প্রবোধের নিকট গিয়া পেঁাছিল, তখন পৃথিবীটা যেন দুম করিয়া তাহার কাছে ফাটিয়া গেল। আর যেন একটা তীব্র অন্ধকার তাহার চারি পার্শ্বে হা হা! করিয়া উঠিল। আশে পাশে কাহারা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। প্রবোধ দুই দিন সেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিল না। কাহারও সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিল না। অনেকে তাহার এরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হইল। প্রবোধ একে একে ট্রাঙ্ক খুলিয়া লাবণ্যের, পত্রগুলি, গান, কবিতা সকল বাহির করিল। গৃহের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সে গুলি ক্রমশঃ ভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

পরের মেলে প্রবোধ পিতাকে পত্র লিখিল "যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক; আমাদের পক্ষ হইতে যেন সেজন্য মিঃ সেনের প্রতি কোনরূপ কর্কশ ব্যবহার না হয়।"

প্রবোধ তার পর অধিক মনোযোগের সহিত পড়ায় মন দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যাহারা লোভের আশায় অধিক পাইতে চাহে প্রায়ই তাহারা অধিক ঠকে; আর সঙ্গে অনুতাপের অনলও বেশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বড় সাধ করিয়া অধিক ভাল পাত্র পাইলেন ভাবিয়া জজ গৃহিণী বড় আদরের কন্যাকে মস্ত ধনীর গৃহে দিয়াছিলেন। একের প্রাপ্য অপরকে অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মে সহিল না।

বাহিরের চাকচিক্য, সাজ সজ্জায়, আদব কায়দায় মানবের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি কয়দিন লুকান থাকে? বিশেষতঃ যেখানে যত গোপন করিবার প্রয়াস, যাহা লুকাইবার জন্য বেশী আয়োজন, কেমনই বিধি লিপি, তাহা তত শীঘ্রই আবরণ মুক্ত হইয়া পড়ে। অবনীমোহনের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি গুলি, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি তাহার গোপন করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন করিয়া দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। গৃহিণী দেখিলেন যেমনটী ভাবিয়া ছিলেন, ঠিক্ তেমনটী হয় নাই। লাবণ্য অশ্রুনেত্রে দেখিল তাহার ভবিষ্যজীবন কি অন্ধকারময়, দুঃখপূর্ণ! কিন্তু অনেক বিলম্বে—এখন ত আর গায়ের ক্ষত ফেলিবার জিনিস নহে।

অবনীমোহন প্রথম প্রথম একটু ছাপাইয়া চলিত। কিন্তু যখন দেখিল গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তখন আর সঙ্কোচের মিথ্যা আবরণ কেন? বিলাতীবোতলবাসিনী, লীলারঙ্গিণী, ডিকাণ্টার শোভিনীর

সহিত যে তাহার বহুদিনের পরিচয়, আর উভয়ের মধ্যে যে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা কবুলতি স্বাক্ষরিত হইয়াগিয়াছিল, অবনী-মোহন তাহা আর স্ত্রীর কাছে গোপন রাখিল না। বাগান বাটীতে যে বিড়ালাক্ষী, গাউন পরিহিতা সুন্দরী সসম্মানে বিরাজ করিতে ছিলেন, তিনি যে মিঃ দত্তের পানসঙ্গিনী ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের অংশীদার, অবনীমোহন স্পষ্টতঃ তাহার ব্যবহারে লাবণ্যকে তাহা জানাইয়াদিল। লাবণ্য সকল দেখিত, দেখিয়া স্বামীকে বুঝাইত; শেষে তিরস্কৃতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিত। অনেক দীর্ঘ রজনী সে শুধু উপাধান সিক্ত করিয়া একাকিনী অতিবাহিত করিত। তাহার সে দাম্ভিকতা, সে চঞ্চলতা, সে গর্ব্বা-ভিমান অবনীমোহনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

লাবণ্য কুসুম আর তেমন হাসিত না, তাহার সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

অবনী প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত না। যে দিন স্তব্ধ নিশীথ রাত্রে অবনীমোহন অশ্লীল গান গায়িতে গায়িতে স্খলিত চরণে গৃহে প্রবেশ করিত, অনাদৃতা লাবণ্যের সে দিন এক উৎসব রজনী বলিয়া বোধ হইত।

এইরূপে দীর্ঘ ছয় বৎসর, তাহাদের জীবনরঙ্গভূমে, দৃশ্যপট অন্তরালে মিলাইয়া গেল। সেই দারুণ অশান্তির মধ্যে লাবণ্যের একটী পুত্র ও একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল।

লাবণ্যের পিতামাতা মনের দুঃখে ক্রমান্বয়ে সংসার হইতে দোকান পাট তুলিয়া লইয়াছিলেন। বিষয় সম্পত্তি লাবণ্যের হইয়াছিল। শ্বশুর শাশুড়ীর জন্য যে একটু চক্ষুলজ্জাছিল তাহাদের অবর্ত্তমানে তাহাও আর রহিলনা। নূতন প্রভূত অর্থ হাতে পাওয়ায় অবনীমোহন নিজের

শ্রাদ্ধের পিণ্ড ভালরূপেই করিতে আরম্ভ করিল।

লাবণ্য কেবল নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুপাত করিত। সময়ে সময়ে তাহার ক্ষত, অশ্রুপ্লাবিত হৃদয়প্রান্তে একখানি মূর্ত্তি উদিত হইত। কল্পনায় দেখিত, সেই স্নেহ করুণাময় নয়ন যুগল তাহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। অমনি শিহরিয়া মুদ্রিতচক্ষে সে নিদ্রিত শিশু-কন্যাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিত।

সে শুনিয়াছিল প্রবোধ সিভিল সার্ব্বিসে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তারপর আর কোন সঠিক্ সংবাদ সে পায়নাই। সংবাদ জানিতে ইচ্ছা হইত বটে; কিন্তু যাহার সহিত সে প্রবঞ্চনা করিয়াছে তাহার বিষয় আলোচনা করিবার তাহার অধিকার নাই ভাবিয়া, ইচ্ছাসত্ত্বেও জানিতে চেষ্টা করিত না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে কি আর তাঁহার তেমন অনুগ্রহ থাকে! অবনীমোহনের অমিতব্যয়িতা ও অত্যাচার এত বাড়িয়া উঠিল যে শেষে লক্ষ্মী পলাইবার পথ পাইলেন না। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া মদের দাম, ও পঙ্কজমুখীর পাদপদ্মের ষোড়শোপচারের ব্যয় চলিতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা সুযোগ বুঝিয়া প্রভুর মস্তকে বিলক্ষণ হস্তাবমর্শনের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। প্রভুও সরিসার তৈল যোগে সুনিদ্রার ব্যবস্থায় ছিলেন। তাহাতে সুরাদেবীর অপার মহিমার ধ্যানে তাঁহাকে প্রায় চক্ষু উন্মীলিত করিতে হইত না। খাজনার টাকা যাহা আদায় হইত তাহাও বোতলবাহিনীর পূজায় নিঃশেষ হইত। প্রজারা ক্রমে খাজনা বন্দ করিয়া দিল। মাহিনার অভাবে অনেক কর্ম্মচারী কিছু কিছু গুছাইয়া সরিয়া পড়িল। জমিদারীর

কোন কোন বন্ধকী অংশ বিক্রয় করিয়া লাটের খাজনা দুই একবার চলিল; সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যের পিতৃদত্ত বাড়ীটীও বিক্রয় হইয়া গেল লাবণ্য সকলই বুঝিত, সকলই জানিত; কিন্তু তাহার কোনও হাত নাই। নিজের দুঃখে সে নিজেই বিভোর! তাহার কোন বাল্যসখী তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিল তাহার নামে তাহার পিতৃ দত্ত যাহা কিছু আছে সে যেন অবনীমোহনকে না দেয়। কিন্তু সে কথা লাবণ্য কাণে তুলিত না। সে ভাবিত জীবনের সর্ব্বস্ব যে, সেই, যখন অধঃপতে চলিয়াছে তখন আর আশা ভরসা কি?

বহুদিনের বৃদ্ধ দেওয়ান মাঝে মাঝে আসিয়া লাবণ্যকে জানাইত, পাওনা দারের তাগাদায় আর টেঁকা দায়; তাহাতে লাটের কিস্তি না, দিলে বিষয় নিলামে উঠিবে। লাবণ্য লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিত, সে আর কি করিবে। তাহার বল বুদ্ধি যে সেই নাই। পুত্র কন্যাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে কখন কখন শিহরিয়া উঠিত। একদিন মনে মনে স্থির করিল একবার সে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে তার পর না হয় সে মরিবে।

সেই বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে লাবণ্য প্রায় একাকিনী বাস করিত কয়েকটী অতি বিশ্বস্ত পরিচারক ছাড়া আর আর সকলে চলিয়া গিয়াছিল। অবনীমোহন দুই মাস বাড়ী ছাড়া। টাকার দরকার হইলে দেওয়ানকে কড়া পত্র লিখিত যেমন করিয়া হউক্ টাকা লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তাহার অধঃপতন যে এতদূর গড়াইয়াছে তাহা সে জানিত না। জানিবার আবশ্যক এবং অবসর ও ছিল না।

কিন্তু এমন করিয়াও আর চলেনা। দেওয়ান একদিন সম্পত্তি বন্দক দিয়াও খামখেয়ালি অপরিণাম দর্শী প্রভুর শ্রাদ্ধের টাকা যোগাড় করিতে না পারিয়া অবনীমোহনকে সকল সংবাদ দিল। কি ভাবিয়া অবনী সেই রাত্রে বাড়ী ফিরিল।

অন্য দিন অপেক্ষা সুরাদেবীর অনুগ্রহ আজ কম ছিল। মস্তিষ্কও কথঞ্চিৎ শীতল ছিল, বাড়ীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, সে দর্শনে কিছু আশ্চর্য্য হইল। দেওয়ানের কাছে আনুপূর্ব্বিক সকল শুনিয়া তাহার শরীর মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিল। পরিণামের আকুল দৃশ্য কল্পনায় ভাবিতে ভাবিতে সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আজ তাহার মনের মধ্যে অনুতাপের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিনের পর সে পূর্ব্বের মত লাবণ্যকে আদর করিয়া কথা বলিল।

বিস্মিতা লাবণ্য ভাবিল এতদিনে আবার তাহার শুষ্কমালঞ্চে কি সত্য সত্যই বসন্তের সুরভি কুসুম ফুটিয়া উঠিল? সে সহসা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সেই রাত্রে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের যত অলঙ্কার ছিল সকল স্বামীর হাতে দিল। বিক্রয় করিয়া উপস্থিত দেনা ও লাটের কিস্তির দায় হইতে অব্যাহতি ত পাইবে? তারপর যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে।

কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ হয় তখন কিছুতেই কিছু হয় না। মানসিক উত্তেজনা, ও শারীরিক অত্যাচারে অবনীর শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; নূতন মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আঘাত আর সহ্য করিতে পারিল না সেই রাত্রেই অবনীমোহন শয্যাশায়ী হইল।

* * * * *

প্রায় একটী বৎসর ভুগিয়া অবনীমোহন বাঁচিয়া উঠিল বটে; কিন্তু তাহাতে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। পীড়ার চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যে লাবণ্যের যাহা কিছু সম্বল ছিল সকলত গিয়াছিলই উপরন্তু বসতবাটীও বন্ধক পড়িয়াছিল। লাবণ্যের তখন কোনও দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে এক মনে কেবল ভাবিত কিসে স্বামী

আরোগ্য লাভ করিবেন। আহারের সময় ব্যতীত সে অতি অল্পকালই রোগমুহ্যমান স্বামীর রোগশয্যা ত্যাগ করিত। স্বামীর সকল সুশ্রূষা সে নিজেই করিত।

আবার সেই লাটের কিস্তি আসিয়াছে; কিন্তু অর্থ যোটে নাই। প্রজারা একপয়সা দেয় নাই। দারুণ দুর্ভিক্ষে তাহারা নিজেই খাইতে পায় না, জমিদারের খাজনা দিবে কিরূপে? যাহা সামান্য আদায় হইয়াছিল উদরের পোষণেই গিয়াছে। পীড়িত অবনী মোহন হতাশার দারুণ যন্ত্রণায় শয্যার এ পাশ ও পাশ করিতেছিল।

আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে কিস্তির টাকা না দিতে পারিলে বিষয় লাটে উঠিবে। না দিতে পারিলে কাল পথে বসিতে হইবে। অবনী মোহন ও লাবণ্য দুজনে নীরবে মুখ চাহিয়া বসিয়াছিল। প্রাণের মধ্যে কি ভীষণ অনুতাপের জ্বালা অবনীমোহনের হৃদ্‌পিণ্ড জর্জ্জরিত করিয়া দিতে ছিল। লাবণ্য মুখ লুকাইয়া প্রবাহিত অশ্রু মুছিতে ছিল।

এত ধন, এত দৌলৎ, এত সম্মান, সব বাজীকরের বাজীর মত সহসা কোথায় লুকাইয়া গেল! কেন গেল? অবনীমোহন ভাবিতে ছিল বুঝি তাহারই পাপে, তাহারই দোষে সকলই যাইতে বসিয়াছে অশ্রুমুখী লাবণ্য ভাবিতেছিল বুঝি দেবতার শাপে সব গেল। নিরীহ, শান্ত শিষ্ট, বিশ্বাসীর সহিত প্রবঞ্চনায়, সেই দেব তুল্য হৃদয়ে অমানুষী বেদনা দেওয়ায় আজ এমন সর্ব্বনাশ হইল!

রাত্র প্রভাতে তাহাদের শুধু কপর্দ্দক বিহীন হইতে হইবে না, তাহাদের পথের কাঙাল হইতে হইবে। মাথা রাখিবার স্থান তাহাদের থাকিবে না। প্রভাতে বাড়ীক্রোক হইবে। বাড়ীবন্ধকওয়ালার ডিক্রীর টাকা দিবার দিন কল্য।

তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অবনীমোহন বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। তাহার মস্তকের মধ্যে অগ্নি জ্বলিতে ছিল।

ক্রমে রাত্রি আসিল। হত্যাপরাধীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার মত অসীম যন্ত্রণা পূর্ণ দীর্ঘ রজনী ক্রমে তাহাদের নিদ্রাহীন চক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

একটা গভীর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অবনীমোহন নিজের ঘরে গেল। তাহার মনে একটা ভীষণ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল।

পাওনাদার ও আদালতের পেয়াদা কখনও সময় ভুলে না। নয়টার সময় ডিক্রিদার পেয়াদা সমেত বাড়ী ক্রোক করিতে আসিল।

অবনীমোহন নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন। সহসা কক্ষের আর একটী দ্বার খুলিয়া গেল। পুরাতন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল একটী ভদ্রলোক কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

অবনী কি ভাবিয়া বাহিরে আসিল। লাবণ্য, স্বামীর গম্ভীর মূর্ত্তি ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। স্বামীর বিপদাশঙ্কা করিয়া সেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

ওয়েটীংরুমে একটী ভদ্রবাঙ্গালী বসিয়াছিলেন; অবনীমোহন তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। তিনি অবনীমোহনকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দুইখানি রসিদ যুক্ত কাগজ দিলেন। অবনী থমকিয়া দাঁড়াইল।

মনের ভাব বুঝিয়া, ঈষৎহাস্যে আগন্তুক, বলিলেন—"ভয়ের কোন কারণ নাই, পড়িয়া দেখুন।"

অবনীমোহন পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে সহসা কাগজ দুইখানি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। বিস্ময় বিহ্বল মিঃ অবনীমোহন দত্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা লাবণ্য তাড়াতাড়ি স্বামীর সাহায্যার্থ আসিল। কাগজ দুইখানি তুলিয়া লইয়া সেও পড়িল। পড়িয়া স্বামীর মত বিস্ময়ে সে বলিয়া উঠিল—"একি ইন্দ্রজাল!"

আগন্তুক মধুর স্বরে বলিলেন—"বিচলিত হইবেন না, এ সব প্রকৃত।"

এও কি সম্ভব? অবনীমোহনের সমুদয় সম্পত্তি যাহা এ যাবৎ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে তাহাদের কোন অজ্ঞাত নামা আত্মীয় সেই সমুদয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সকলই লাবণ্যের নামে লিখিয়া দিয়াছেন! বসত বাটীর বন্ধকী টাকা শোধ হইয়া গিয়াছে, তাহারও রসিদ তাহাদের হস্তে। এখন তাহারা পূর্ব্ববৎ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী! এও কি সম্ভব? এমন মহাত্মা বন্ধু এই স্বার্থ পূর্ণ, প্রতারণাময় সংসারে, কে আছেন যিনি এমন লোকাতীত আত্মত্যাগ করিতে পারেন? এমন স্বর্গের দেবতা কে তাহারা ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

অবনীমোহন অভ্যাগত ভদ্রলোকটীকে বলিল—"আপনিই কি—"

বাধা দিয়া তিনি নিতান্ত লজ্জিত স্বরে বলিলেন—"না, মহাশয়, তিনি আমারই পরম বন্ধু।" তারপর আরও মধুর স্বরে বলিলেন—"নাম বলিবার আমার অধিকার নাই; আর তাঁহার নাম জানিবার চেষ্টা কখনও করিবেন না।"

গাড়ী বারাণ্ডায় একখানি জুড়ি অপেক্ষা করিতেছিল। লাবণ্যের বড় ছেলেটী সেখানে খেলা করিতেছিল। একটী সাহেববেশী গাড়ীর মধ্য হইতে বসিয়া বালকটীকে অন্যের অশ্রাব্য মৃদুস্বরে কি প্রশ্ন করিতেছিলেন। আর মধ্যে মধ্যে লাবণ্যকে দেখিতে ছিলেন। সে দৃষ্টিতে কেবল করুণা ও সমবেদনার স্রোত উছলিয়া উঠিতে ছিল লাবণ্য সহসা সে দিকে চাহিল। মুখখানি যেন পরিচিত বোধ হইল।

সাহেব রুমালে মুখ ঢাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। আগন্তুক তথন বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়াছেন।

ক্যোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল সহসা লাবণ্যের মস্তকের মধ্যে তাড়িত বহিয়া গেল। অতীত স্মৃতি মথিত করিয়া একখানি উপেক্ষিত মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। বুক চাপিয়া লাবণ্য সেই খানে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রেল পথ।

আমিত পড়িয়া আছি। অচল, অটল, নিথর জড়জগতের জড় পদার্থের ন্যায়, প্রাণীজগতের অজগর সর্পের ন্যায় একভাবেই পড়িয়া আছি। যেন সীমা নাই, অন্ত নাই, ঠিক সরলভাবেই পড়িয়া আছি। দুই পার্শ্বে কোথাও বা শাল, তাল তমাল, রসাল প্রভৃতি বনরাজি, আমার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; কোথাও বা বহুযোজনবিস্তৃত শ্যামল শস্যপূর্ণ প্রান্তর, আমারই ন্যায় দুইপার্শ্বে ধূ ধূ করিতেছে। আর আমার এই কঠিন প্রাণে বুকে করিয়া পৃথিবীর কোটী কোটী প্রাণীর ভার বহন করিতেছি। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। নীরবে সকলের মন যোগাইতেছি। শয্যাশায়ী পীড়িতের শুশ্রূষার লোক আনিয়া দিতেছি, প্রবাসীকে আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত করিতেছি, প্রেমিকের প্রেম নিধি হাতে তুলিয়া দিতেছি, বিরহীর বিরহ বেদনা দূর করিতেছি, জীবজগতের আহারীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়া দিতেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তাহাদের বাস ভবনে লইয়া যাইতেছি আবার তাহাদের কর্ম্মস্থানে

লইয়া আসিতেছি। এত করিতেছি, কঠিন প্রাণে বুক পাতিয়া এত সহ্য করিতেছি, তবুত মানুষের মন উঠে না! স্বার্থপর জগতে নিঃস্বার্থ উপকার করিয়াও মানুষের সকল সময়ে মন পাই না। মানুষ একবার চাহিয়াও দেখে না এবং একবার ভাবেও না, যে আমি কিরূপে এত ভার বহন করি। আবার মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ সে যদি কখন যান-স্খলিত পদ হইয়া আমার হৃদয় হইতে বিচ্যুত হয়, অমনি আমার উপর তীব্র-দৃষ্টি করিয়া থাকে। তখন আমার বক্ষের উপর চাপিয়া যাইতে প্রতিপদে—বিপদ আশঙ্কা করে, পলকে প্রলয় জ্ঞান করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহাতে আমার দোষ কি? ইহা তোমাদের হটকারিতা কিন্তু ভাই মানব! একবার স্থিরচিত্তে বিমৃষ্যা-কারিতা ও অনভিজ্ঞতার দোষ দেখ। আমি যা তাই আছি। আমার যে পাষাণ হৃদয় তাই আছে। যে ভাবে যেমন রাখিয়াছ যে কার্য্যে যেখানে নিযুক্ত করিয়াছ নীরবে প্রভুভক্তের ন্যায় তাই করিতেছি, কিন্তু হায়! তবু তোমায় মন উঠিল না। আমি কি করিব আমি নাচার। তাই বলি এই স্বার্থপর জগতে তুমি ঘোর স্বার্থ পরিপূর্ণ। তোমার কৃতজ্ঞতা নাই, তোমার প্রত্যুপকার স্বীকার নাই; কারণ বুকপাতিয়া এত করিয়াও শুনিয়াছি যে রেলপথে যাওয়া বড় বিপদ জনক। সে বিপদের কারণ আমি না তুমি? যখন আমি স্বয়ং তোমার আয়ত্তাধীন তখন তুমিত আমাকে যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পার।

আবার তুমি এত গর্ব্বিত, যে বুকের উপর দিয়া সাহঙ্কারে দর্পভরে সমান চলিয়া যাও, ডাকিলেও উত্তর দাও না। কতবার বলি একবার দাঁড়াও, দাঁড়াও, দুইটা প্রাণের কথা কই কিন্তু তুমি এমনি দাম্ভিক যে সে কথায় ভ্রূক্ষেপও কর না। আপন মনে গোঁভরে

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তুমি তবু আমার দুটো দুঃখের কথা শুনিতে চাও না। হায়! সাধ করিয়া বলি, মানব তুমি বড় দাম্ভিক, তুমি বড় গর্ব্বিত, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ। তোমার একদেশদর্শিতার পরিচয় কি দিব! তুমি তোমার বাষ্পীয় যন্ত্রকে (এঞ্জিন) কত যত্ন কর, কত আদর কর, তাহার গা মুছাইয়া দাও, তাহাকে তৈলাক্ত করিয়া মসৃণ কর। দুই বেলা বৃকোদরের আহার যোগাইয়া তাহার জঠরানল পরিতৃপ্ত কর। কিন্তু আমায় যত্ন করা দূরে থাক্ নিদাঘের প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিত কর, বরষার বারিধারায় ডুবাইয়া রাখ, হেমন্তে হিমানীষিক্ত করিয়া কুজ্‌ঝটিকায় আবৃত রাখ, শীতের শৈত্যে সঙ্কুচিত কর এবং বসন্তের মাধুরী হইতে শ্রীহীন করিয়া দাও। বারমাস ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত আমারও বিপর্য্যয় ঘটাও। এইত তোমার, আমার প্রতি স্নেহ, এইত তোমার আমার প্রতি ভালবাসা। তাই বলি তোমার সহৃদয়তা ও তোমার সমপ্রাণতা কোন্ খানে ?

তুমি তোমার বুকে হাত দিয়া বল দেখি তুমি কি পক্ষপাতী নও ? তুমি বলিবে বাষ্পযন্ত্র আমার অপেক্ষা বেশী উপকারী, তাই তাহার এত আদর ; কিন্তু আমি যদি আমার এই পিচ্ছিল ও মসৃণ বুক দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া না দিই তাহা হইলে তাহার সাধ্য কি যে, সে একপদ অগ্রসর হয়। তবে আমার এত হতাদর কর কেন ? তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। তোমরা আপনাদের সমাজ গঠন, ধর্ম্ম সংস্থাপন, নৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি কতশত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। কতশত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছ ও কতশত ধর্ম্মের লোপ করিয়া দিতেছ। অশেষ প্রতিভা ও ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া কতশত অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি সংস্থাপন করত, এই মহীমণ্ডলে যশস্বী ও মহামহিমান্বিত হইতেছ ; কিন্তু তোমাদের হৃদয়রাজ্যের দয়া, দাক্ষিণ্য, সহৃদয়তা,

সমপ্রাপ্তা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি স্বভাবজাত হৃদয়নিহিত সদ্‌বৃত্তি নিচয়ের সম্পূর্ণ স্ফুরিত না হইলে, পরিণামে তোমাদেরও কিছুই থাকিবে না; তোমরাও আবার এই জীবজগতে অতি ঘৃণিত ক্রমি কীট অপেক্ষা অধম হইবে। তাই বলি সহৃদয়তা ও কৃতজ্ঞতা শিক্ষা কর।

আবার তুমি এমনি পরশ্রীকাতর ও অসূয়া পরবশ যে আমার ভাল দেখিতেও পার না। আমি কি তোমাদের এতই ঘৃণিত? ওই যে আমার দুই পার্শ্বে বহুযোজন ব্যাপি প্রান্তর শোভা পাইতেছে, উহাতে তোমরাই হল চালনা কর এবং কত যত্ন করিয়া শস্য উৎপাদন কর; শ্যামলক্ষেত্র মৃদুপবনের ঈষৎ দোলনে তরঙ্গমালা পরিপ্লুত সাগরাম্বুরাশির শোভা ধারণ করে। কিন্তু আমার উপরে এমনি তোমার কোপ যে একটী তৃণ জন্মাইলেও অমনি তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। আমার শোভা সম্পন্ন করা দূরে থাক্ আমাকে আরো শ্রীহীন করিয়া রাখ। তুমি নিজেত কখন নিকটে থাক না, দুই একটা অন্য জীবজন্তুও যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার প্রতি সহানুভূতি করিবে তাহাতেও তোমার বাধা। আমাকে তারের আবরণে বেষ্টিত করিয়াছ, এবং নিজেরাও প্রহরী হইয়া অন্যে যাহাতে না আসিতে পারে সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিতে ক্রটি কর না। আমি কি তোমাদের এতই চক্ষুশূল? তবে যখন দেখ আমার শরীরে আর শরীর নাই, তোমাদের প্রাণী জগতের প্রাণীর ন্যায় কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছি, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, তখন আবার আমার সংস্কারের জন্য প্রবৃত্ত হও। তাহাও স্বার্থজড়িত। ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাবে বলিয়া।

আমি তোমাদের কিনা উপকার করিতেছি? রজকপত্নীর কাপড়ের মোট বহিতেছি। ধীবর পত্নীর রোজের মৎস্যের যোগান

দিতেছি। গোপ গৃহিণীর ছানা, মাখন, ননী সর বহিতেছি। এতেও তোমরা সন্তুষ্ট নও। হা ভাগ্য ! হা অদৃষ্ট !! হা ধর্ম্ম!!! তোমাদের ভিতর আবার কেহ কেহ বলেন যে রেলপথ বিস্তার হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, পল্লীগ্রাম বাসীদের আহারীয় সামগ্রী দুর্মূল্য হইতেছে, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি, আরো অনেক কথা। কিন্তু বিকৃতমস্তিষ্ক বুদ্ধিহীনেরা বুঝেনা যে যেখানে বহুলোক সমাকীর্ণ বড় বড় নগর, সেই খানেই আমি তাহাদের প্রাণ। মানব, ওই যে প্রশস্ত রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ সুধাধবলিত অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল শোভা পাইতেছে, উহাতে তুমি যখন সবান্ধবে ও সপরিবারে সুখ-শয়ানে টানাপাখার হাওয়ায় শ্রান্তি দূর কর, অথবা তবুরা ও হার-মোনিয়মে সুঁর বাঁধিয়া সুললিত বেহাগে আলাপ কর, কিম্বা রমণীর কমনীয় কণ্ঠে প্রাণ ঢালিয়া দাও তখন তোমার প্রয়োজনোপযোগী আহারীয় সামগ্রী না আনিয়া দিলে ও তোমার ভোগবিলাসোপযোগী দ্রব্য সমূহের সংগ্রহ না করিয়া দিলে তোমার হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি কোথায় থাকে ? বণিক্‌গণের পণ্যদ্রব্যের যাতায়াতের সুবিধা পাইয়া আমার প্রাসাদেই তাহারা আপনাপন বাণিজ্যোন্নতি করিতেছে। ধার্ম্মিক-চূড়ামণিগণ গৃহদ্বার ছাড়িয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে নিমেষের মধ্যে যাইয়া আপনা-দের তীর্থমাহাত্ম্য লাভ করিতেছে, সেও আমার কৃপায়। নানা দেশের নানা ভাষায় ও বিভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নূতন প্রণালীতে কত জাতীয় জীবন সৃজন করিতেছ। ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে, ধনীর সুখাভিলাষে, গৃহস্থের গৃহকার্য্যে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত সকল অবস্থায় সকলের সহায়তা করিতেছি। কিছুতেই আমার আলস্য বা ঔদাস্য নাই। কিন্তু তোমাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় আর কত দিব ইহাতেও তোমরা সন্তুষ্ট নও। হায় ! ইহা অপেক্ষা

আর আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? তোমাদিগের অকৃতজ্ঞতা, অধার্ম্মিকতা, স্বার্থপরতা, অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতা এত প্রবল যে অন্যের কথা দূরে থাক্ আপনারাও আপনাদিগের ভাল দেখিতে পার না। আপনারাও আপনাদের উচ্ছেদ সাধনে বিরত নও। ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি, পুত্র পিতার প্রতি, কন্যা মাতার প্রতি, ভগিনী ভগিনীর প্রতি, আত্মীয় স্বজন আত্মীয়স্বজনের প্রতি, প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর প্রতি ও সমাজ সমাজের প্রতি প্রতিদিন ও প্রতিনিয়ত হিংসা করিতেছে ও অধর্ম্মাচরণ করিতেছে। তোমাদের নিকট ধর্ম্ম অধর্ম্ম হইতেছে। প্রয়োজনানুরোধে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইতেছে। স্বার্থান্বেষী হইয়া নীচকে উচ্চ করিতেছ, উচ্চকেও নীচ করিতেছ। তোমাদের গুণ গরিমার কথা কি বলিব। জ্ঞানী অজ্ঞানী হইতেছে অজ্ঞানী জ্ঞানী হইতেছে। পণ্ডিত মূর্খ হইতেছে মূর্খও পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। হায়! তোমরা যে সোপানাবলী আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে উন্নীত করিতেছ, কার্য্যসিদ্ধি হইলেই আবার সেই সোপান শ্রেণীকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না। যে আশ্রিত বৎসল ও প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের আশ্রয়ে এবং যত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে, কালের কঠোর শাসন ও নিয়তির নিয়ত ঘূর্ণ্যমান চক্রের আবর্ত্তনে তাঁহাদের দুর্দ্দশা ঘটিলে, তাহাদিগকেই আবার অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ না। ইহা অপেক্ষা জগতে স্বার্থপরতা ও অধার্ম্মিকতা কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা নরকের ঘৃণিত কৃমি কীট কি হইতে পারে!

আর এককথা, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব। ইহাতেও আমার দোষ নাই। আমি জ্বর সঙ্গে লইয়া আসি না। তোমরা আপন ইচ্ছায় লইয়া আইস। আইন তোমাদের হাতে, স্বাস্থ্যও

তোমাদের হাতে। যাহারা আমায় দোষ দেয় তাহারা বড়ই পক্ষপাতী। আমি নির্দ্দোষ ও নিস্পৃহ। আমার নিজের গতি নাই, কিন্তু আমা হইতেই কোটী কোটী প্রাণীর গতি হইতেছে। আমি স্থির, নিশ্চল, অজাগর সর্পের ন্যায় পড়িয়া আছি; কিন্তু আমার হৃদয় নিহিত শক্তি হইতেই কোটী কোটী মানবের গতি শক্তি ও দর্শন শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। তাই বলি, মানব! আমায় হতাদর করিও না। আমাকে দেখিয়া শিক্ষা কর। প্রকৃতি দেখিয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তির পরিচালনা কর। বিশ্বকে ভাল বাসিতে শিক্ষা কর। বিশ্ব-প্রেমের প্রেমিক হও এবং জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন কর।

ফুলের সাজি।

বিজনে

যুবক।—আজি এবিজনে, নিকুঞ্জ ভবনে
কোথায় আমায় সখি
যত মনোলোভা, স্বভাবের শোভা
এস প্রাণভোরে দেখি।
হোথা তরুশাখে কপোত কপোতী
মধুর প্রণয় সুখে,
হের পরস্পর মিলিয়া বিরলে
চুমিতেছে মুখে মুখে।
আমি যদি সখি তোমার বয়ান
অমনি করিয়া চুমি,
তা'হ'লে সজনি কি করিবে তুমি?

যুবতী।— খুব চেঁচাইব আমি।

যুবক।—বিফল বিফল হ'বে সে সকল
ভেসে যাবে সে নিনাদ;
কে আছে এখানে তুমি আমি বিনে
কে শুনিবে?—কি প্রমাদ!
আমিত এখনি চুমিব সজনি
কি করিবে বল তুমি?
হবে সে কেবল অরণ্যে রোদন—

যুবতী।— তাইত চেঁচাব আমি।

বাসনা।

ধীরে ধীরে বহিছে পবন,
মলয়ার স্নিগ্ধতা লইয়া;
অবনীর শ্রান্ত জীবগণ,
শান্তি-রসে যেতেছে প্লাবিয়া।

অ'

কুসুমের আসব হরিয়া,
গুঞ্জরিছে মত্ত অলিগণ;
মরি মরি কি হর্ষ আসিয়া,
পুলকিত করে দেহ, মন।

কল্লোলিয়া স্বচ্ছ কল্লোি
ফেণ-পুঞ্জ-শোভিত শ
চলিয়াছে করি' 'ক
তীব্র স্রোতে ল'য়ে

বিহঙ্গম সুমধু
বিমোহিত ক'
শুনি' হায়.
উদিতেে

আশা,-
এক ি
কিন্তু
মিশি

ছড়াইছ ২ ত সুধা ধরার উপর ;
তব ওই হাসি দেখে, হৃদয় বিদরে দুঃখে
তাই বলি হেসনারে ওহে শশধর ·
কেন বাড়াইছ দুঃখ এই অভাগার ।

শ্রীচন্দ্রকুমার বসু ।

চিত্রদর্শনে ।

হৃদয়মোহন ওই হরিণ-নয়ন,
ওই বাহুবল্লী, পদ—সুষমার খনি,
ওইযে নিয়েছে হরি' মোর হৃদি খানি,—
এখনি, যে স্বপ্নদেশে করিবে প্রেরণ,—
কুঞ্চিত কুন্তলরাশি—নিকষবরণ,—
মরতে মনোজ্ঞ স্বর্গশোভাবিকাশিনী
অপ্সরী-হাসির ওই মধুরা দামিনী,—
সব চিত্ররেখামাত্র, জড় বিচেতন ।
কিন্তু, আমি ?—অবজ্ঞায়, বিষাদে ডুবিয়া—
প্রণয়-আলোকহীন—একাকী নিশায়,
ঝটিকায়, তরি'পরে রয়েছি বাঁচিয়া ;
প্রণয়ের মূল গান অনন্ত নিদ্রায় ;
ক্লান্ত, ভগ্ন চিন্তাস্রোত গেছে শুকাইয়া,—
হৃদয় উচ্ছ্বাসি' অশ্রু মর্ম্মব্যথা গায় ।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত ।

মাল্যদান ।

শুধু আশা ভালবাসা, শুধু প্রেম অশ্রুময়,
শুধুই নয়ন-জল বিরহের অভিনয় ।
শুধু সে মরম-ব্যথা মরমের তলে গাঁথা,
শুধু বুকে জ্বালারাশি,শুধু প্রাণে শোক-গাথা ।
শুধু হাসি-রেখা মুখে, হৃদয়ে ক্রন্দন ভরা,
নিরাশাপলকেত্রাসে—মিছেপুনঃমালাপরা !
শুধু ক্ষোভ এ জীবনে, শুধুই যাতনা সহি,
শুধুই স্খলিতপদে গিরি-পথ বহি ;
তবে কেন মালাপরি এশোক-জীবনে ফের?
কেন প্রেম-উদ্বোধন ব্যথাময় জীবনের ?
বাসনা ত পুরিবেনা—আর না বালিকা,ওরে!
শত আকর্ষণ দিয়ে বাঁধিওনা মায়া-ডোরে!
নিরাশার ব্যবধানে আশার সংযোগ ক্ষীণ ;
একটানা দিন যাবে—এনিয়ে কি চিরদিন ?

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী,
কোন্নগর ।

বর্ষশেষে ।

আজি এই বরষের পূণ অবসানে,
মনে পড়ে সেই দিন প্রথম তোমার ;
অপার করুণা-বলে, কমল-আসনে ।
লয়েছিনু সবে মোরা তব পূজা-ভার ;
মনে পড়ে যেই দিন সাহিত্য-কাননে,
মাতৃভাষা-মধু-পুষ্প করিতে চয়ন,
স্মরি' বঙ্গভাষা-ক্ষেত্র-মহারথীগণে,
করেছিনু তব' পদে উৎসর্গ জীবন;

আমি মোরা কৃপাময়ি! তোমার সেবায়
হইয়াছে বহু ক্রটি, হ'বে বহু আর;
তথাপি নির্ভর করি তব করুণায়,
যেতে হবে কর্ত্তব্যের পথে, পুনর্ব্বার;

তোমাতে থাকিলে ভক্তি, রাখিলে বিশ্বাস,
অবশ্য ফলিবে কালে দীন এ প্রয়াস।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ছাত্র—পণ্ডিত মশায়! আজ্ আমাদের বাড়ীতে কাষ আছে যাব?

পণ্ডিত।—না না।

উত্তর পাইয়া ছাত্রবর হাসিতে হাসিতে পুস্তকাদি লইয়া গমনোদ্যত হইল।

পণ্ডিত।—কোথায় হে? তোমায় না আমি যেতে বারণ কল্লুম।

ছাত্র। কই মশায়? আপনি ত আমাকে যেতেই বল্লেন।

পণ্ডিত।—(রাগিয়া) কখন্ যেতে বল্লুম?

ছাত্র।—ঐ যে সেদিন আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন—দু'বার "না" বল্লে "হাঁ" বুঝায়, তা' এখন আপনি "না না" দুবার বল্লেন তাই আমি যাচ্চি।

* * *

আগন্তুক।—রমেশ! তোমার ঠাকুরের নাম কি?

রমেশ।—সিংহবাহিনী!

* * *

জাপানে ছেলেদের দুই হাতে লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

* * *

পুরোহিত।—মন্ত্র পড়াইতেছেন—"আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীস্যাং তিথৌ—"